

সিডনি শেলডন

মাস্টার অভ দ্য গেম

অনুবাদ

অনীশ দাস অপু





মাস্টার থ্রিলার রাইটার সিডনি শেলডনের অবিস্মরণীয় রোমাঞ্চউপন্যাস 'মাস্টার অভ দ্য গেম'-এর কাহিনী গড়ে উঠেছে চার জেনারেশনের বাণিজ্য লিপ্সা, লোভ, কামনা আর প্রতিশোধকে ঘিরে। গল্পের শুরু জেমি ম্যাকগ্রেগরকে নিয়ে যে ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে স্কটল্যান্ড ছেড়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাড়ি জমায় হীরের ব্যবসা করে ধনী হবার অভিপ্রায়ে। নানান ঝড়-ঝঞ্ঝা সয়ে সে কোটিপতি হয় এবং প্রতিষ্ঠা করে ক্রুনার-ব্রেন্ট কোম্পানি। তার মেয়ে কেট কোম্পানিটির প্রসার ঘটায় সারা বিশ্বজুড়ে এবং সদরদপ্তর স্থানান্তর করে আমেরিকায়। কিন্তু কেটকে হতাশ করে তার ছেলে হতে চায় একজন চিত্রশিল্পী, ব্যবসায়ী নয়। তবে কেটের দুই যমজ মেয়ে আলেকজান্ড্রা এবং ইভ অন্য রকমের। এদের একজন আবার খুনি...

মাস্টার অভ দ্য গেম-এর প্রতিটি পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অ্যাকশন, রোমান্স এবং এমন কিছু স্মরণীয় চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন লেখক যে পাঠক নিশ্চিতভাবেই উপভোগ করবেন বইটি।

সমালোচকদের মতে, এটি শেলডনের সর্বশ্রেষ্ঠ থ্রিলার উপন্যাস।



বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় থ্রিলার লেখক সিডনি শেলডন। তাঁর প্রথম বই *দ্য নেকেড ফেসকে* নিউইয়র্ক টাইমস অভিহিত করেছিল 'বছরের সেরা রহস্যোপন্যাস' বলে। শেলডন যে ১৮টি থ্রিলার রচনা করেছেন প্রতিটি পেয়েছে ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলারের মর্যাদা। তাঁর সবচেয়ে হিট রোমাঞ্চোপন্যাসের মধ্যে রয়েছে—*দ্য আদার সাইড অভ মিডনাইট, ব্লাড লাইন, রেজ অভ এঞ্জেলস, ইফ টুমরো কামস, দ্য ডুমসডে কন্সপিরেসি, মাস্টার অব দ্য গেম, দ্য বেস্ট লেইড প্ল্যানস, মেমোরিজ অভ মিডনাইট* ইত্যাদি। এই বিখ্যাত লেখক ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে মৃত্যুবরণ করেন।

অনিন্দ্য প্রকাশ



মাস্টার অভ দ্য গেম



সিডনি শেলডন

মাস্টার অভ দ্য গেম

অনুবাদ

অনীশ দাস অপু

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪১৯, ফেব্রুয়ারি ২০১৩

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ৯৫৭ ৩৭ ৬৯, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

বিক্রয় কেন্দ্র
৩৮/৪ বাংলাবাজার মান্নান মার্কেট ৩য় তলা, ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১২ ৪৪০৩, ০১৭১৮-০৮২৫৪৫

বর্ণবিন্যাস
সাইবর্গ কম
১৯১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
সেল ফোন ০১৯১২ ৭০৯৪১৯

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

প্রুফসংশোধক কে.এম. মাসুম
সেল ফোন ০১৯১৩৫০৯৬৭৬

মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ৯৫৭ ৩৭ ৬৯, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

মূল্য ৫০০.০০ টাকা

MASTER OF THE GAME
by Sidney Sheldon Translated by Anish Das Apu
Published by Afzal Hossain, Anindya Prokash
30/1/Ka Hamandro Das Road Dhaka-1100
Phone: 957 37 69, 01711 664970
E-mail: anindya.prokash@yahoo.com

First Published: February 2013

Price: Taka 500.00

US $ 25

ISBN 978 984 414 376 0

উৎসর্গ

খুব কম মানুষকেই আমি আপন করে নিতে পারি। তবে যাদেরকে আমি ভালবাসি, মন থেকেই ভালবাসি। যে মানুষটিকে এ বইটি উৎসর্গ করলাম তাঁকে আমি খুবই পছন্দ করি। কথাটা হয়তো তিনি জানতেন না, আজ জানলেন। আমার শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার সেই কাছের মানুষটি আমার প্রিয় **রহমান ভাই**।

আবদুর রহমান

প্রিয়জন সম্পাদক ও বাচসাস সভাপতি

ভূমিকা

পাঁচ বছর আগে আমি যখন সিডনি শেলডনের বই অনুবাদ শুরু করি জানতাম না এ লেখকের বইগুলো পাঠক মহলে এতটা সাড়া জাগাবে। একে একে তাঁর ১৯টি বই-ই আমি অনুবাদ করে ফেলেছি। সর্বশেষ *'মাস্টার অব দ্য গেম।'* বিস্তৃত পটভূমির সুবিশাল এ উপন্যাস বরাবরের মতোই পাঠকদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধের মতো ধরে রাখবে। প্রতিটি পরিচ্ছদেই রয়েছে দারুণ চমক। বইটি অনুবাদ শেষ করার পরে অনেকক্ষণ আমি মন খারাপ করে বসেছিলাম। কারণ আমার অসম্ভব প্রিয় এ লেখকটির এটাই ছিল আমার অনূদিত শেষ বই।

তবে পাঠকদের মন খারাপ করতে হবে না কারণ মহান এ থ্রিলার লেখক মৃত্যুর আগে বেশ কয়েকটি কাহিনীর আউটলাইন তৈরি করে গিয়েছিলেন। টেলি ব্যাগশ নামে একজন অত্যন্ত প্রতিভাময়ী এক লেখিকা সেই আউটলাইন দিয়ে তিনটি উপন্যাস রচনা করেছেন– *মিস্ট্রেস অব দা গেম, আফটার দ্য ডার্কনেস* এবং *অ্যাঞ্জেল অব দ্য ডার্ক*। বইগুলো পড়েছি আমি। দারুণ! পড়ার সময় মনে হচ্ছিল বুঝি সিডনি শেলডনই লিখেছেন। সেই একই ভাষার কারুকাজ, গতিশীল কাহিনী আর ছত্রে ছত্রে রোমাঞ্চ এবং শিহরণ! শেলডন ভক্তরাও মুগ্ধ হয়ে যাবেন পড়লে। আশা করি আগামীতে ওই বইগুলো আপনাদের কাছে হাজির করতে পারব। সবাই ভালো থাকুন।

অনীশ দাস অপু
ধানমন্ডি, ঢাকা।

অনিন্দ্য থেকে প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই

থ্রিলার

ব্লাড লাইন	মূল	সিডনি শেলডন	২০০.০০
দ্য নেকেড ফেস	মূল	সিডনি শেলডন	১৩০.০০
মর্নিং, নুন অ্যান্ড নাইট	মূল	সিডনি শেলডন	২০০.০০
দ্য বেস্ট লেইড প্ল্যানস	মূল	সিডনি শেলডন	১৭৫.০০
দ্য আদার সাইড অভ মিডনাইট	মূল	সিডনি শেলডন	৩০০.০০
মেমোরিজ অভ মিডনাইট	মূল	সিডনি শেলডন	২২৫.০০
দ্য ডুমসডে কন্সপিরেসি	মূল	সিডনি শেলডন	২৫০.০০
দ্য স্কাই ইজ ফলিং	মূল	সিডনি শেলডন	২২০.০০
দ্য স্টারস শাইন ডাউন	মূল	সিডনি শেলডন	১৪০.০০
টেল মি ইয়োর ড্রিমস	মূল	সিডনি শেলডন	৩০০.০০
রেজ অব অ্যাঞ্জেলস	মূল	সিডনি শেলডন	২৫০.০০
আর ইউ অ্যাফ্রেড অব দ্য ডার্ক?	মূল	সিডনি শেলডন	৩০০.০০
উইন্ডমিলস্ অব দ্য গডস্	মূল	সিডনি শেলডন	২৫০.০০
দ্য স্যান্ডস অব টাইম	মূল	সিডনি শেলডন	৩৩০.০০
দ্য আদার সাইড অভ মি	মূল	সিডনি শেলডন	৩৪০.০০
নাথিং লাস্টস ফর এভার	মূল	সিডনি শেলডন	৩৬০.০০
আ স্ট্রেঞ্জার ইন দ্য মিরর	মূল	সিডনি শেলডন	৩২০.০০
ইফ টুমরো কামস	মূল	সিডনি শেলডন	৫০০.০০
কিশোর সায়েন্স ফিকশন			
অ্যালিয়েন ইনভ্যাসন	মূল	ক্রিস্টোফার পাইক	৬৫.০০
ইনভ্যাসন অভ দ্য নো ওয়ানস	মূল	ক্রিস্টোফার পাইক	৬০.০০
অ্যাটাক অভ দ্য জায়ান্ট ক্র্যাবস	মূল	ক্রিস্টোফার পাইক	৬০.০০
দ্য উইচেস রিভেঞ্জ	মূল	ক্রিস্টোফার পাইক	৬৫.০০
টাইম টেরর	মূল	ক্রিস্টোফার পাইক	৬৫.০০
এলিয়েন ইন দ্য স্কাই	মূল	ক্রিস্টোফার পাইক	৬০.০০
নাইট অভ দ্য ভ্যাম্পায়ার	মূল	ক্রিস্টোফার পাইক	৬০.০০
হরর সায়েন্স ফিকশন			
স্পিসিজ	মূল	ইভন নাভারো	১৫০.০০
ইনভ্যাসন অভ দ্য বডি স্ন্যাচার্স	মূল	জ্যাক ফিনি	১২০.০০
স্পাই থ্রিলার			
দ্য আরব প্লেগ	মূল	নিক কার্টার	১০০.০০
ভৌতিক গল্প সংকলন			
মুণ্ডুহীন প্রেত		অনীশ দাস অপু	২২৫.০০
হরর-সায়েন্স ফিকশন সংকলন			
গ্রহান্তরের বিভীষিকা		অনীশ দাস অপু	২৪০.০০
হরর গল্প সংকলন			
পিশাচ বাড়ি		অনীশ দাস অপু	২২৫.০০

পূর্বাভাস

কেট

১৯৮২

তাঁর জন্মদিন উদযাপন করতে হাজির হয়েছে চেনামুখের কিছু প্রেতাত্মা। অপছায়াগুলো মিশে আছে রক্ত-মাংসের মানুষগুলোর সঙ্গে, তাঁর কাছে দৃশ্যটি মনে হচ্ছে ফ্যান্টাসি, কারণ অন্য আরেক সময় এবং স্থান থেকে আগমন ঘটেছে এই দর্শনার্থীদের, তারা কালো টাই এবং রঙ ঝলমলে সান্ধ্য গাউন পরা অসন্দিগ্ধ অতিথিদের সঙ্গে ড্যান্স ফ্লোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মেইনের ডার্ক হারবারের সিডার হিল হাউজের আজকের পার্টিতে শতাধিক লোক এসেছেন আমন্ত্রিত হয়ে। *তবে এদের মধ্যে প্রেতাত্মাগুলোকে গণনা করা হয়নি*, মনে মনে বললেন কেট ব্ল্যাকওয়েল।

তিনি হালকা পাতলা গড়নের, ছিমছাম ছোটখাট এক নারী তবে চেহারায় আভিজাত্য এবং রাজকীয়ভাব তাঁর শারীরিক উচ্চতা যেন অনেকটাই বৃদ্ধি করেছে। তাঁর মুখের গড়নটাই এমন, একবার দেখলে কেউ ভুলে যাবে না। চওড়া হাড়ের কাঠামো, ভোরের প্রথম ধূসর আলোর মতো চোখ, থুতনিতে ফুটে আছে একগুয়েমির ছাপ, স্কটিশ এবং ডাচ পূর্বপুরুষদের মিশ্রিত রূপ পেয়েছেন তিনি। তাঁর ধবধবে সাদা মখমল কেশরাজি যা একদা ছিল রাতের মতো কালো এবং রেশমী কোমল, ছড়িয়ে রয়েছে কাঁধে আইভরি ভেলভেট ড্রেসের ভাঁজে। তাঁর ত্বক এখনও দ্যুতি ছড়ায়।

নিজেকে আমি মোটেই নব্বুই বছরের বৃদ্ধা ভাবছি না, মনে মনে বললেন কেট। সেই দিনগুলো কই গেল? নৃত্যরত প্রেতাত্মাদের দিকে তাকালেন তিনি।

ওরা জানে। ওরা সেখানে ছিল। ওরা সেসব দিনের অংশীদার ছিল, আমার জীবনের একটি অংশ। বান্ডাকে দেখতে পেলেন তিনি। বান্ডার কালো মুখখানা হাসিতে উজ্জ্বল। ওই তো রয়েছেন ডেভিড, প্রিয় ডেভিড, লম্বা, তরুণ এবং সুদর্শন, তিনি যখন প্রথম ওঁর প্রেমে পড়েন, ঠিক সেই প্রথম দিনের মতো তাঁকে লাগছে দেখতে। ডেভিড তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছেন। তিনি মনে মনে বললেন *শীঘ্রি, মাই ডার্লিং, শীঘ্রি।* আফসোস হলো তাঁর। ইস! ডেভিড আজ বেঁচে থাকলে তাঁর প্রপৌত্রটিকে দেখে যেতে পারতেন।

বৃহদায়তনের কক্ষটিতে চোখ ঘুরছে কেটের। এমন সময় তাকে দেখতে পেলেন তিনি। অর্কেস্ট্রার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, লক্ষ করছে যন্ত্রীদেরকে। অসম্ভব রূপবান একটি বালক, মাত্র আট বছর বয়স ওর। একমাথা ঝলমলে চুল, পরনে কালো ভেলভেট

জ্যাকেট এবং টারটান ট্রাউজার্স। রবার্ট তার প্রো- প্রো পিতামহ জেমি ম্যাকগ্রেগরের প্রতিমূর্তি যেন। মার্বেল ফায়ার প্লেসের ওপর টাঙানো রয়েছে রবার্টের প্রো-প্রো পিতামহের ছবি। কেউ তাকে দেখছে টের পেয়েই যেন ঘুরে দাঁড়াল সে। হাত নেড়ে প্রোপৌত্রকে ইশারা করলেন কেট। তাঁর আঙুলে আলো পড়ে বর্ণচ্ছটা ছড়াল কুড়ি ক্যারেটের হিরের আংটিটি। এ হিরেটা কেটের বাবা একশো বছর আগে একটি বালুকাবেলা থেকে মাটি খুঁড়ে সংগ্রহ করেছিলেন। কেট খুশি হয়ে দেখলেন রবার্ট নৃত্যশিল্পীদের মাঝ থেকে পথ করে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে।

আমি অতীত, ভাবছেন কেট। *আর ও ভবিষ্যত। আমার প্রপৌত্র একদিন ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেডের দায়িত্ব নেবে।* রবার্ট চলে এল তাঁর পাশে, তিনি সরে গিয়ে ওকে বসার জায়গা করে দিলেন।

'তোমার জন্মদিনটা মজা লাগছে তো, গ্রানি?'

'হ্যাঁ। ধন্যবাদ, রবার্ট।'

'ওই অর্কেস্ট্রাটি দারুণ। কিন্তু সুরকারটা দারুণ বাজে।'

প্রোপৌত্রের কথা শুনে এক মুহূর্তের জন্য যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন কেট। পরক্ষণে তাঁর কুঁচকে যাওয়া ভুরু সমান হলো। 'তার মানে সুরকারটিও দারুণ।'

মুচকি হাসল রবার্ট। 'ঠিক ধরেছ। তোমাকে দেখে মনেই হয় না তোমার বয়স নব্বই।'

হেসে উঠলেন কেট ব্ল্যাকওয়েল। 'শুধু তুমি আর আমি যখন একসঙ্গে থাকি বয়সের কথাটা ভুলেই যাই।'

প্রোমাতামহীর হাত ধরল রবার্ট, পরিতৃপ্ত নীরবতার মাঝে বসে রইল, দু'জনের মাঝের বিরাশি বছরের ফারাকটা তাদের মধ্যে এনে দিয়েছে স্বস্তিদায়ক ঘনিষ্ঠতা। কেট ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন তার নাতনী নাচছে। তাঁর নাতনী এবং নাতজামাই নিঃসন্দেহে ড্যান্স ফ্লোরের সবচেয়ে সুদর্শন জুটি।

রবার্টের মা দেখছে তার ছেলে এবং দিদা বসে আছে একসঙ্গে। সে ভাবছিল *কী অসাধারণ এই ভদ্রমহিলা। যেন এক চির তরুণী। কারও ধারণাতেও নেই কত বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার স্বাক্ষী উনি।*

থেমে গেল যন্ত্রসংগীত, সুরকার বললেন, 'ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, এবারে আপনাদের সামনে বাজাতে আসছে মাস্টার রবার্ট।'

প্রোমাতামহীর হাতে মৃদু চাপ দিল রবার্ট, সিধে হলো, হেঁটে গেল পিয়ানোর কাছে। বসল। সিরিয়াস চেহারা, ব্যগ্র একটা ভাব ফুটে আছে, কীবোর্ডের ওপর তার আঙুলগুলো ঝড় তুলতে শুরু করল। ও বাজাল স্ক্রিয়াবিন, যেন জলের ওপর ঢেউ তুলল চাঁদের আলো।

রবার্টের মা ছেলের পিয়ানো বাদন শুনতে শুনতে ভাবছিল *ও একটা জিনিয়াস। বড় হয়ে বিরাট মিউজিশিয়ান হবে।* রবার্ট যেন আর তার শিশু সন্তানটি নয়। ও পৃথিবীর সন্তান। রবার্টের বাজনা শেষ হলে সবাই হাততালিতে ফেটে পড়লেন।

তার আগে, বাইরে পরিবেশন করা হয়েছিল ডিনার। লণ্ঠন, রঙিন ফিতে আর বেলুন

দিয়ে জমকালো সাজানো হয়েছে বৃহদায়তনের জায়গাটি। টেরেসে মিউজিশিয়ানরা বাজনা বাজাচ্ছে, টেবিলে নিঃশব্দে এবং দক্ষতার সঙ্গে পানীয় সরবরাহ করছে বাটলার ও মেইডের দল। ব্যাকারট গ্লাস আর লিমোজি ডিশগুলো শূন্য হবার সঙ্গে সঙ্গে ওগুলো পানীয় এবং খাদ্যে ভরে দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির পাঠানো একটি টেলিগ্রাম পাঠ করা হলো। সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতি কেটের উদ্দেশে টোস্ট করলেন। গভর্নর কেটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। এ জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে স্মরণীয় নারী তিনি। বিশ্বব্যাপী শতাধিক চ্যারিটিতে কেট ব্ল্যাকওয়েলের অকাতর দান তাঁকে কিংবদন্তীতে পরিণত করেছে। ব্ল্যাকওয়েল ফাউন্ডেশন পঞ্চাশটিরও বেশি দেশের জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং জীবন মানের উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। প্রয়াত স্যার চার্চিলের কথা ধার করে বলতে হয়– আমরা তাঁর কাছে এত ঋণী যে, ভাষায় সে ঋণ প্রকাশ করার নয়। কেট ব্ল্যাকওয়েলকে জানবার যতটুকু সুযোগ আমার হয়েছে...

কচু! মনে মনে ভাবছেন কেট। কেউ আমাকে জানে না। লোকটা এমনভাবে বলছে যেন কোনো সন্ন্যাসীনির বন্দনা করছে। সত্যিকারের কেট ব্ল্যাকওয়েল সম্পর্কে জানতে পারলে এ লোকগুলোর প্রতিক্রিয়া কী হবে? আমার এক বছর বয়সে একটা চোর আমাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। আমার শরীরের গুলির ক্ষতটা যদি এদেরকে দেখাই এরা কী ভাববে?

মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন তিনি সেই লোকটির দিকে যে একবার তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল। তিনি চোখ সরিয়ে নিলেন। অন্ধকারে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে, মাথার ওপর ঘোমটা, চেনা যাচ্ছে না চেহারা। দূরে বজ্রপাতের শব্দ, গভর্নর শেষ করেছেন বক্তৃতা, কেটকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন, তাই হাততালি দিচ্ছে লোক। উঠে দাঁড়ালেন কেট, সম্মানিত অতিথিদের দিকে তাকালেন। কথা বলার সময় তাঁর কণ্ঠ দৃঢ় এবং আত্মপ্রত্যয়ী শোনাল।

'আপনাদের যে কারও চেয়ে আয়ুষ্কাল আমার বেশি। আজকালকার ছেলেমেয়েরা হয়তো বলবে 'এসব কোনো ব্যাপারই না।' তবে আমি এতদিন বেঁচে আছি বলে কৃতজ্ঞবোধ করছি, না হলে তো আজ আপনাদের সবার সামনে হাজির হতে পারতাম না। আমি জানি আপনাদের অনেকেই দূরদেশ থেকে এসেছেন আজ রাতে আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে। আপনারা নিশ্চয় ভ্রমণক্লান্ত। সবাই আমার মতো শক্তি পাবেন এমনটি ভাবা নিশ্চয় উচিত হবে না।' তাঁর এ কথায় সবাই হেসে উঠে হাততালি দিয়ে অভিনন্দিত করল।

'একটি সন্ধ্যাকে স্মরণীয় করে তোলার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আমি আজকের দিনটির কথা কোনোদিন ভুলব না। আপনারা যারা বিশ্রাম নিতে চান তাদের জন্য কক্ষ প্রস্তুত। অন্যরা বলরুমে নৃত্য করতে যেতে পারেন।'

আবার বজ্রপাতের আওয়াজ হলো। 'ঝড় আসছে। কাজেই সবাই ভেতরে চলে আসুন।'

ডিনার এবং নৃত্যগীত শেষ হয়েছে, অতিথিরা বিদায় নিয়েছেন, অপছায়াদের নিয়ে এখন

একা কেট। লাইব্রেরিতে বসে আছেন তিনি, অতীতের অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, হঠাৎ দারুণ বিষণ্নতা গ্রাস করল তাঁকে। *আমাকে কেট বলে ডাকবার কেউ নেই,* ভাবছেন তিনি, *ওরা সবাই চলে গেছে।* তাঁর পৃথিবীটা ডুবে গেছে। লংফেলো না বলেছিলেন, 'স্মৃতির পাতারা আঁধারে শোকার্ত শব্দ তোলে?' তিনিও শীঘ্রি অন্ধকারে প্রবেশ করবেন, তবে এখনই নয়। *আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি এখনও বাকি রয়ে গেছে।* মনে মনে বললেন কেট। *ধৈর্য ধরো, ডেভিড। আমি শীঘ্রি আসব তোমার কাছে।*

'দিদা...

চোখ মেলে চাইলেন কেট। তাঁর পরিবার এসে ঢুকেছে ঘরে। তিনি এক এক করে তাকালেন তাদের দিকে। তাঁর চোখ যেন নির্দয় ক্যামেরা, মিস করে না কাউকে। *আমার পরিবার,* ভাবছেন তিনি। আমার অমরত্ব। একজন খুনি, একজন শয়তান, একজন উন্মাদ। ব্ল্যাকওয়েলের কংকালগুলো। *এত বছরের আশা এবং যন্ত্রণায় শেষ পরিণতি কি এই?*

তাঁর নাতনী এসে পাশে দাঁড়াল। 'তুমি ঠিক আছ তো, দিদা?'

'আমি একটু ক্লান্তবোধ করছি, দিদিভাই। যাই, শুয়ে পড়ি গে।'

সিধে হলেন তিনি, পা বাড়ালেন সিড়িতে আর ঠিক তখন ভীষণ শব্দে বাজ পড়ল কোথাও এবং শুরু হয়ে গেল ঝড়। মেশিনগানের বুলেটের মতো বৃষ্টির ফোঁটা এসে আছড়ে পড়তে লাগল জানালার কাচে। কেটের পরিবার দেখছে শিরদাঁড়া খাড়া করে সিড়ি বেয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে ওপরে উঠে যাচ্ছেন কেট। চোখ ধাঁধিয়ে চমকাল বিদ্যুৎ তার পরপরই বিকট শব্দে বাজ পড়ল। কেট ব্ল্যাকওয়েল পরিবারের সদস্যদের দিকে ঘুরে তাকালেন। পূর্বসুরীদের উচ্চারণে বললেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকায় আমরা একে ডনডারসট্রম বলতাম।' অতীত এবং বর্তমানের মিশ্রণ শুরু হলো আবার, তিনি হলওয়ে ধরে হেঁটে নিজের বেডরুমে এগোলেন, তাঁকে ঘিরে থাকল তাঁর একান্ত পরিচিত প্রেতাত্মার দল।

প্রথম খণ্ড

জেমি

১৮৮৩-১৯০৬

এক

'সর্বনাশ! এ দেখছি সত্যিকারের ডনডারস্টর্ম!' বলল জেমি ম্যাকগ্রেগর। স্কটিশ হাইল্যান্ডের প্রবল ঝড়কে সঙ্গী করে সে বড় হয়ে উঠেছে, কিন্তু ঝড়ের এমন তাণ্ডব কোনোদিন প্রত্যক্ষ করেনি। বিকেলের আকাশ অকস্মাৎ ঢেকে যায় বালুর প্রকাণ্ড মেঘে, দিনকে তাৎক্ষণিক পরিণত করে রাতে। কালো আকাশে ঝলকাতে শুরু করে বিদ্যুৎ, আফ্রিকানরা যাকে বলে *উইরলিগ*। এ বিদ্যুৎ যেন পুড়িয়ে দেয় বাতাস, তারপর অনিবার্যভাবে উপস্থিত হয় *ডনডারল্যান*– বজ্রপাত। সবশেষে ভয়ানক বর্ষণ।

বৃষ্টির চাদর আছড়ে পড়ছে সারি সারি তাঁবু আর টিনের তৈরি কুটিরের গায়ে, ক্লিপড্রিফটের ধুলোমাখা রাস্তা পরিণত করেছে কাদার নদীতে। আকাশে ঠোকাঠুকি চলছে বজ্রের, মুহুর্মুহু গজরাচ্ছে, যেন গোলন্দাজ বাহিনীর মতো অবিরাম গোলা নিক্ষেপ করছে একে অন্যের ওপর।

কাঁচা ইট দিয়ে তৈরি একটি বাড়ি বৃষ্টির তোড়ে গলে গিয়ে ধসে পড়তে দেখে দ্রুত একপাশে সরে দাঁড়াল জেমি ম্যাকগ্রেগর। ভাবছিল এ ভয়ংকর বর্ষণে ক্লিপড্রিফট শহরটি আদৌ টিকে থাকতে পারবে কিনা।

ক্লিপড্রিফটকে ঠিক শহর বলা যাবে না। এটা আসলে ক্যানভাসের একটা গ্রাম, ভ্যাল নদীর তীরে সারি সারি তাঁবু আর কুটির নিয়ে গড়ে উঠেছে। এ গ্রামের অস্থায়ী বাসিন্দা সারা বিশ্ব থেকে হিরের লোভে আসা স্বপ্নবাজ কতগুলো মানুষ।

এই স্বপ্নবাজদের একজন জেমি ম্যাকগ্রেগর। সে সদ্যই আঠেরো ছুঁয়েছে, সুদর্শন এক তরুণ, লম্বা, একমাথা সুন্দর চুল, বুদ্ধিদীপ্ত ঝকঝকে ধূসর চক্ষু। তার ভেতরে আকর্ষণীয় একটি সারল্য রয়েছে, রয়েছে অদ্ভুত এক ব্যাকুলতা। সে একজন আশাবাদী মানুষ।

স্কটল্যান্ডের হাইল্যান্ডে বাপের খামার থেকে যাত্রা শুরু করেছিল জেমি। এডিনবরা, লন্ডন, কেপটাউন হয়ে আট হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এখন ক্লিপড্রিফটে পৌঁছেছে। খামারে নিজের অংশীদারিত্ব ছেড়ে দিয়েছে জেমি। ওই খামার বাবা এবং ভাইদের সঙ্গে মিলে গড়ে তুলেছিল সে। তবে এজন্য কোনো আফসোস নেই জেমির। জানে দশ হাজার গুণ লাভ তুলে নেবে সে একদিন। নিজের চেনা পরিমণ্ডলের নিরাপদ বলয় ছেড়ে এতদূরে, এই অজানা দেশে এসেছে শুধু ধনী হবার স্বপ্নের অঞ্জন চোখে মেখে। কঠিন পরিশ্রমে কখনও ভীত নয় জেমি, কিন্তু নিজেদের খামারে গায়ের রক্ত জল করে গতর

খাটিয়ে ক'পয়সাই বা পেত সে, ভাইদের সঙ্গে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করত। তাদের সঙ্গে যোগ দিত বোন মেরী এবং বাবা-মা। কিন্তু আয় উপর্জন হতো সামান্যই। একবার এডিনবরায় একটি মেলায় গিয়েছিল জেমি। কত সুন্দর সুন্দর মন ভোলানো জিনিস দেখেছে। কিন্তু ওগুলো কিনতে টাকা লাগে। টাকা থাকলে জীবনটা হয়ে ওঠে সুখময়, যা ইচ্ছা তা-ই কেনা যায়, অসুস্থতার সময় ভালো ডাক্তার দেখানো সম্ভব। জেমি তার অনেক বন্ধু এবং প্রতিবেশিকে দারিদ্র্যের কারণে চিকিৎসার অভাবে মরে যেতে দেখেছে।

জেমির মনে আছে দক্ষিণ আফ্রিকায় হিরের খোঁজে যাওয়া মানুষজনের কথা শুনে কী দারুণ উত্তেজনা বোধ করেছিল। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হিরের খনি নাকি আছে লন্ডনে, বালুর নিচে লুকিয়ে রয়েছে অজস্র হিরকখণ্ড, গোটা এলাকা জুড়েই নাকি হিরের ছড়াছড়ি, শুধু তুলে নেয়ার অপেক্ষা।

শনিবারের রাতে, ডিনার শেষে পরিবারের সদস্যদেরকে খবরটা বলেছিল জেমি। এঁটো বাসনপত্র তখনও তুলে নেয়া হয়নি, টেবিল ঘিরে বসেছিল সবাই, এমন সময় লাজুক এবং গর্বিত গলায় জেমি বলল, 'আমি হিরের খোঁজে দক্ষিণ আফ্রিকা যাব ঠিক করেছি। আগামী সপ্তাহেই রওনা হব।'

পাঁচ জোড়া চোখ তার দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল যেন সে একটা পাগল।

'হিরে খুঁজতে যাবি তুই?' জিজ্ঞেস করলেন জেমির বাবা।

'তোর আসলে মাথা খারাপ হয়ে গেছে, খোকা। ওটা একটা রূপকথার গল্প–মানুষকে তার দৈনন্দিন কাজ থেকে বিরত রাখতে শয়তানের একটা প্রলোভন।'

'যাবে যে টাকা পাবে কোথায়?' প্রশ্ন করল ভাই আয়ান।

'ওখানে যেতে হলে অর্ধেক পৃথিবী ঘুরতে হবে তোমাকে। তোমার কাছে তো টাকা নেই।'

'টাকা থাকলে তো আর হিরে খুঁজতে যেতাম না আমি,' খেঁকিয়ে উঠল জেমি। 'যেতাম কি? ওখানে কারও কাছেই টাকা নেই। আমি ওদের মতোই একজন। তবে আমার মাথায় বুদ্ধি আছে, শরীরে আছে শক্তি। আমি ব্যর্থ হব না।'

বোন মেরী বলল, 'অ্যানি কর্ড খুব মন খারাপ করবে। ও তোমার বউ হবার স্বপ্ন দেখছে, জেমি।'

জেমি তার বোনটিকে খুবই ভালোবাসে। মেরী তার চেয়ে ছয় বছরের বড়। বয়স চব্বিশ কিন্তু দেখায় চল্লিশের মতো। ও জীবনেও কোনো সুন্দর কিছু পায়নি। *আমি ওর জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস কিনে দেব,* মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল জেমি।

মা নিঃশব্দে এঁটো বাসনপত্র তুলে নিয়ে লোহার সিঙ্কে গেলেন ধুয়ে ফেলতে।

সে রাতে তিনি জেমির ঘরে এলেন। ছেলের কাঁধে আলতো করে হাত রাখলেন। জেমির মনে হলো তার মায়ের শক্তি তার নিজের শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো প্রবাহিত

হলো। 'তোর মন যা চায় তা-ই কর, খোকা। জানি না ওখানে সত্যি হিরে আছে কিনা। তবে থাকলে তুই নিশ্চয় ওগুলোর সন্ধান পাবি।' তিনি ছেলেকে চামড়ার একটি বিবর্ণ, রং-জ্বলা বটুয়া দিলেন। 'এখানে কিছু টাকা আছে। তবে তোকে যে টাকা দিলাম সে কথা কাউকে বলার দরকার নেই। ঈশ্বর তোর মঙ্গল করবেন, জেমি।'

এডিনবরার উদ্দেশে যেদিন যাত্রা করল জেমি, তার পকেটে মায়ের দেয়া পঞ্চাশ পাউন্ড।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রাটা হলো দুঃসাধ্য এবং কষ্টকর, জেমি ম্যাকগ্রেগরের প্রায় এক বছর সময় লেগে গেল ওখানে পৌঁছাতে। এডিনবরায় এক রেস্টুরেন্টে ওয়েটারের চাকরি করে আরও পঞ্চাশ পাউন্ড জোগাড় করল সে। তারপর গেল লন্ডন। মহানগরীর বিশালতা দেখে রীতিমত মুগ্ধ জেমি। তাকে অবাক করল এ শহরের বিপুল জনগোষ্ঠী, কোলাহল, ঘোড়ায় টানা ওমনিবাস যেগুলো ঘণ্টায় পাঁচ মাইল বেগে চলে। সর্বত্র সুন্দর সুন্দর ক্যাবের ছড়াছড়ি, তাতে ঘুরতে বেরোয় মাথায় বড় হ্যাট চাপানো, বাতাসে ঘূর্ণিতোলা স্কার্ট আর হাই বাটনের শু পরা সুন্দরী রমণীগণ। জেমি মুগ্ধ চোখে এই মহিলাদেরকে ঘোড়ায় টানা গাড়ি এবং ক্যাব থেকে নামতে দেখে। তারা বার্লিংটন আর্কেডে কেনাকাটা করতে ঢোকে। এখানকার দোকানপাট নানান প্রাচুর্যে ভরপুর। সুন্দর এবং দামী জিনিসগুলো ঘুরে ঘুরে দেখে জেমি।

সে ৩২, ফিটজরয় স্ট্রিটের একটি বাড়িতে লজিং থাকতে শুরু করল। সপ্তাহে দশ শিলিং ভাড়া, এরচেয়ে সস্তা বাড়ি সে খুঁজে পায়নি। দিনের বেলা তার কাটে জাহাজ ঘাটায়, দক্ষিণ আফ্রিকাগামী জাহাজের সামনে আর রাতের বেলা সে রহস্যময় লন্ডন শহর ঘুরে দেখে। একদিন সে প্রিন্স অব ওয়েলস এডওয়ার্ডকে এক ঝলক দেখতে পেল কভেন্ট গার্ডেনের কাছের একটি রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করছেন। সঙ্গে এক অপূর্ব সুন্দরী নারী। মেয়েটির বাহু জড়িয়ে ধরেছেন এডওয়ার্ড। সুন্দরীর মাথায় ফুলতোলা বড় হ্যাট, জেমি ভাবছিল এই হ্যাটটিতে তার বড় বোনটিকে না জানি কত সুন্দর লাগত।

ক্রিস্টাল প্যালেসে একদিন কনসার্ট দেখতে গেল জেমি। গেল স্যাভয় থিয়েটারে। ওখানে তারা প্রথম বিদ্যুৎ বাতি লাগিয়েছে। কিছু কিছু রাস্তায় বিদ্যুৎ বাতি জ্বলছে, জেমি শুনেছে টেলিফোন নামে অত্যাশ্চর্য একটি যন্ত্র আছে যার সাহায্যে নাকি শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তের লোকের সঙ্গে কথা বলা যায়। জেমির মনে হলো সে ভবিষ্যত দেখছে।

এত এত আবিষ্কার এবং কর্মকাণ্ডের মাঝেও ওই বছরের শীতে ইংল্যান্ড অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে পড়ল। রাস্তাঘাট গিজগিজ করতে লাগল বেকার আর ভুখানাঙ্গা মানুষে, গণমিছিল আর রাস্তায় মারামারি হয়ে উঠল প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। *এখান থেকে আমাকে চলে যেতে হবে।* মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল জেমি। *আমি এসেছি দারিদ্র্যের কবল থেকে রক্ষা পেতে।* পরের দিন জেমি ওয়ালমার ক্যাসল জাহাজে চড়ে বসল স্টুয়ার্ড হিসেবে। জাহাজ চলেছে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে।

সমুদ্রযাত্রা স্থায়ী হলো তিন সপ্তাহ, মাঝখানে মেডিরা এবং সেন্ট হেলেনায় যাত্রাবিরতি দিল কয়লা এবং জ্বালানি নিতে। প্রচণ্ড শীত ওদিকে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগর, জাহাজে ওঠার পরপরই অসুস্থ হয়ে পড়েছে জেমি। কিন্তু নিজের হাসিখুশি ভাবটা ঠিকই ধরে রেখেছে কারণ প্রতিটি দিনই তো সে তার রত্ন-সিন্দুকের কাছে এগিয়ে যাচ্ছে। বিষুবরেখার কাছাকাছি এসেছে জাহাজ, আবহাওয়ায় পরিবর্তন ঘটল। অলৌকিকভাবে শীত হটিয়ে দিয়ে জায়গা দখল করল গ্রীষ্ম। আফ্রিকান উপকূলের দিকে এগিয়ে চলেছে ওরা, রাত এবং দিনগুলো হয়ে উঠল উত্তপ্ত এবং বাষ্পাচ্ছন্ন।

ভোর বেলা কেপটাউনে এসে পৌঁছাল ওয়ালমার ক্যাসল। সরু চ্যানেল, যেটা কুষ্ঠরোগীদের উপনিবেশ রবেন আইল্যান্ডকে মেইনল্যান্ড থেকে বিভক্ত করে রেখেছে, সেখান দিয়ে সতর্কভাবে এগিয়ে নোঙর করল টেবল বে-তে।

সূর্যোদয়ের আগে ডেক-এ চলে এসেছিল জেমি। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখল ভোরের কুয়াশা কেটে গিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে শহরের ওপর ঝুঁকে থাকা টেবল মাউন্টেন। ও আফ্রিকায় এসে গেছে।

জাহাজ জেটিতে ভেড়া মাত্র ডেক ভরে গেল অদ্ভুত সব মানুষজনে। এরা বিভিন্ন হোটেলের দালাল– কৃষ্ণাঙ্গ, হলুদ চামড়া, বাদামী চামড়া এবং লাল চামড়ার লোকজন এসে জাহাজের যাত্রীদের মালসামানা নিয়ে টানা হেঁচড়া শুরু করে দিল। তাদের হোটেলে নিয়ে যেতে চাইছে। ছোট ছোট ছেলেরা দৌড়াচ্ছে খবরের কাগজ, মিষ্টি এবং ফল বিক্রির আশায়। গাড়ির ড্রাইভাররা চিৎকার করে যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। ফেরিঅলারা পানীয় বোঝাই গাড়ি নিয়ে এসেছে ঠেলতে ঠেলতে। বড়বড় কালো মাছিতে জেটি সয়লাব। নাবিক এবং পোর্টাররা ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে ওদিকে যাত্রী-রা তাদের মালপত্র ঠিকঠাক রাখতে গলদঘর্ম হয়ে পড়ছে। নানান ভাষায় বিচিত্র গুঞ্জরণ। এমন অদ্ভুত সব ভাষা জীবনে শোনেনি জেমি।

"Yulle kom vah de kaap, heh?'

'Het julle mine papa zyne wagen gyzien?'

'Wat beduidi?'

'Huistoe!'

এসব কথার একটি শব্দও বুঝতে পারল না জেমি।

কেপটাউনের মতো অদ্ভুত শহর এই প্রথম দেখছে জেমি। এ শহরের প্রতিটি বাড়ির আকার-আকৃতি আলাদা। একটা বড়সড় গুদামঘরের পাশেই হয়তো গড়ে তোলা হয়েছে ইট কিংবা পাথরের দুই-তিন তলা বাড়ি, তার পাশেই আবার ঝালাই করা লোহার ছোট ক্যান্টিন, আর তার পাশের গহনার দোকানের সঙ্গেই রয়েছে তরিতরকারি ও ফল বিক্রেতার দোকান এবং তার পাশে তামাক বিক্রেতার যেকোনো সময় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়া চেহারার দোকান।

রাস্তার নারী, পুরুষ এবং শিশু পথচারীদের হাঁ করে তাকিয়ে দেখে জেমি। আঁটোসাঁটো পায়জামা এবং বস্তা কেটে কোট পরা এক কাফ্রিকে সে দেখল রাস্তায়। কাফ্রির পেছনে দু'জন চীনা, হাতে হাত ধরে হাটছে, পরনে নীল রঙের স্মক ফ্রক (ওভারঅল জাতীয় ঢিলা পোশাক), মাথার লম্বা চুলের বেনী সযত্নে কুণ্ডলী পাকিয়ে রেখেছে মোচাকৃতির খড়ের হ্যাটের নিচে। জেমি দেখল গাট্টাগোট্টা চেহারার লালমুখো বোয়ের চাষীদের, তাদের চুল ঝলসে গেছে রোদের তাপে, এদের ওয়াগনগুলো বোঝাই থাকে আলু, শস্য এবং পাতাবহুল সব্জিতে। পুরুষদের পরনে বাদামী ভেলভেটের ট্রাউজার্স এবং কোট, মাথায় চওড়া কিনারের নরম ফেল্ট হ্যাট, মুখে মাটির তৈরি তামাকের লম্বা পাইপ। পার্সি ধোপা মহিলাদেরকে দেখা গেল মাথায় বড়বড় কাপড়ের গাঁটরি নিয়ে হনহনিয়ে হাঁটছে। রাস্তায় লাল কোট এবং মাথায় হেলমেট পরা সৈন্যেরও অভাব নেই। সব মিলিয়ে ভারী মজাদার একটি দৃশ্য।

প্রথমেই জেমি যে কাজটা করল তা হলো সস্তা ভাড়ার বোর্ডিংহাউজ খুঁজতে বেরুলো। জাহাজের এক নাবিক ওকে পরামর্শটা দিয়েছিল। বোর্ডিং হাউজের মালিক মোটাসোটা, পাহাড়ের মতো বক্ষের মাঝবয়সী এক বিধবা।

জেমির দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'Zock yulle gold?'

অপ্রস্তুত বোধ করল জেমি। 'আমি দুঃখিত– আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'ইংরেজ, অ্যাঁ? এখানে সোনা খুঁজতে এসেছ? হিরে?'

'হিরে। জ্বী, ম্যাম।'

মহিলা ওকে টেনে ভেতরে নিয়ে এল। 'এ বাড়ি তোমার পছন্দ হবে। তোমার মতো তরুণদের জন্য এখানে সবরকমের সুযোগ সুবিধে আছে।'

জেমি ভাবছিল এই মহিলা সেই সুযোগ-সুবিধার একজন কিনা। প্রার্থনা করি তা যেন না হয়।

'আমি মিসেস ভেনস্টার,' কপট বিনয়ে বলল মহিলা। 'তবে আমার বন্ধুরা আমাকে 'ডি-ডি' বলে ডাকে।' হাসল সে, ওপরের সারিতে সোনা বাঁধানো একটা দাঁত ঝিকিয়ে উঠল। 'আমার মনে হচ্ছে আমারা দু'জনে খুব ভালো বন্ধু হতে পারব। যখন যা দরকার হবে আমাকে বলবে।'

'সে আপনার দয়া,' বলল জেমি। 'আচ্ছা এ শহরের একটি ম্যাপ জোগাড় করে দিতে পারবেন?'

ম্যাপ হাতে শহর আবিষ্কার করতে বেরুল জেমি। শহরের এক পাশে রনডেবশ, ক্লেয়ারমন্ট এবং উইনবাগের শহরতলি জুড়ে নয় মাইল বিস্তৃত প্ল্যানটেশন আর দ্রাক্ষাক্ষেত। আর শহরের অন্যপ্রান্তে, সি পয়েন্ট এবং গ্রিন পয়েন্টে মেরিনদের শহরতলী। ধনীদের আবাসিক এলাকা ধরে হেঁটে চলল জেমি। স্ট্রান্ড স্ট্রিট এবং ব্রি স্ট্রিট

জুড়ে রয়েছে বড়বড় দোতলা সুদৃশ্য ভবন। বাড়িগুলোর সমতল ছাদ, খাড়া টেরেস উঠে গেছে রাস্তা থেকে। তবে রাস্তায় অনেক মাছি। বড়বড় কালো কালো মাছিগুলো ঝাঁক বেঁধে ওর ওপর হামলা চালাল। মাছি তাড়াতে তাড়াতে বোর্ডিং হাউজে ফিরল জেমি। কিন্তু এখানেও নিস্তার নেই। ওর ঘর ভর্তি মাছি। দেয়াল, টেবিল এবং বিছানায় গিজগিজ করছে মাছির দল।

বাড়িঅলির কাছে গেল জেমি। 'মিসেস ভেনস্টার, আমার ঘরভর্তি মাছি। ওগুলো তাড়ানোর কোনো ব্যবস্থা করা যায় না?'

হাসিতে ফেটে পড়ল মহিলা। জেমির গায়ে চিমটি কেটে বলল, '*Myn magtig* তুমি ওদের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। দেখে নিয়ো।'

কেপটাউনের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রাগৈতিহাসিক আমলের এবং অপর্যাপ্ত। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে অশুভ চাদরের মতো গোটা শহর ঢেকে দেয় বিকট, বিশ্রী গন্ধের একটা বাষ্প। সে গন্ধ বড়ই অসহ্য। কিন্তু জেমি জানে ওকে এ গন্ধটা সহ্য করে থাকতে হবে। যাবার আগে আরও কিছু অর্থ জোগাড় করতে হবে। 'টাকা ছাড়া ডায়মন্ড ফিল্ডে তুমি টিকে থাকতে পারবে না।' ওকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। 'এখানে নিঃশ্বাস নিতে গেলেও টাকা দিতে হয়।'

কেপটাউনে আসার দিনেই একটি ডেলিভারি ফার্মে ঘোড়ার গাড়ি চালানোর কাজ পেয়ে গেল জেমি। তৃতীয় দিন সে একটি রেস্টুরেন্ট ডিনার শেষে বাসনপত্র মাজার চাকরি খুঁজে নিল। রেস্টুরেন্টের উচ্ছিষ্ট খাবার লুকিয়ে নিয়ে এল সে বোর্ডিং হাউজে। ওই খাবার খেয়ে খিদে মেটাল। তবে এসব নিয়ে ওর কোনো অভিযোগ নেই। সে জানে কোনো কষ্টই তাকে দমাতে পারবে না। তবে নিঃসঙ্গতা ওকে মাঝে মাঝে দারুণ বিষণ্ন করে তোলে। বন্ধু এবং পরিবারকে ও খুব মিস করছিল। একা থাকতে ওর ভালোই লাগে তবে এই নিঃসঙ্গতা ওকে ব্যথিত করে তুলছিল।

অবশেষে জাদুর দিনটি এসে হাজির হলো। ওর পাউচে এখন দুশো পাউন্ড। ও এখন রেডি। আগামীকাল সকালে সে কেপটাউন ত্যাগ করবে ডায়মন্ড ফিল্ডের উদ্দেশে।

দুই

জাহাজ ঘাটের কাছে, কাঠের ছোট্ট একটি গুদামঘরে ইনল্যান্ড ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি ক্লিপড্রিফটের ডায়মন্ড ফিল্ডে যাতায়াতের জন্য প্যাসেঞ্জার ওয়াগন রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করে। সকাল সাতটার সময় গুদামঘরে জেমি পৌঁছে দেখল জায়গাটা লোকে লোকারণ্য। এমন ভিড় ভেতরেই ঢুকতে পারল না ও। ওয়াগনে জায়গা পেতে শত শত ভাগ্যান্বেষী ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি করছে। এরা এসেছে সুদূর রাশিয়া, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি এবং ইংল্যান্ড থেকে। ডজনখানেক বিচিত্র ভাষায় চিৎকার চেঁচামেচি করছে তারা, চারপাশ থেকে ঘিরে থাকা টিকেট বিক্রেতাদেরকে কাকুতি মিনতি করছে টিকেট পাবার জন্য। জেমি এক মোটাসোটা আইরিশকে দেখল রাগে ফুঁসত ফুঁসতে লোকজন ঠেলে বেরিয়ে এল অফিস থেকে। দাঁড়াল ফুটপাতে।

'মাফ করবেন,' বলল জেমি। 'ওখানে হচ্ছেটা কী?'

'কিছুই না,' ঘোঁতঘোত করে উঠল আইরিশ। হারামজাদা ওয়াগনগুলো নাকি আগামী ছয় সপ্তাহের জন্য ভাড়া হয়ে গেছে।' জেমির চোখে তীব্র হতাশা ফুটে উঠতে দেখল সে। 'শুধু তাই নয়, খোকা। হারামীর বাচ্চারা জনপ্রতি যাত্রীর কাছ থেকে পঞ্চাশ পাউন্ড করে ভাড়া নিচ্ছে।'

সর্বনাশ! 'কিন্তু ডায়মন্ড ফিল্ডে যাওয়ার অন্য কোনো রাস্তা নিশ্চয় আছে।'

'দুটো রাস্তা আছে। ডাচ এক্সপ্রেসে চড়ে যেতে পার অথবা পায়ে হেঁটে।'

'ডাচ এক্সপ্রেসটা কী জিনিস?'

'বুলক ওয়াগন। খচ্চরে টানা গাড়ি। ঘণ্টায় দু'মাইল পথ পাড়ি দেয়। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছাতে পৌঁছাতে গিয়ে দেখবে ডায়মন্ড ফিল্ড ফাঁকা। একটি হিরেও নেই।'

হিরেশূন্য খনিতে যাবার কোনো ইচ্ছেই নেই জেমি ম্যাকগ্রেগরের। তাই সে দেরি করতেও চাইল না। সকালের বাকি সময়টা ব্যস্ত থাকল অন্য কোনো যাতায়াতের ব্যবস্থা করা যায় কিনা সে খোঁজে। দুপুরের আগে আগে একটা পথ পেয়ে গেল। একটি অশ্বশলার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল জেমি, চোখে পড়ল একটি সাইনবোর্ড, 'MAIL DEPOT' জানে না কেন, ভেতরে ঢুকে পড়ল ও। দেখল পাটকাঠির মতো সরু এক লোক বড়বড় চিঠির বস্তা ভরছে একটি ঘোড়ার গাড়িতে। তার কাজ দেখল জেমি কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে।

'মাফ করবেন,' বলল ও। 'আপনারা কি ক্লিপড্রিফটে চিঠিপত্র নিয়ে যান?'

'হুঁ। দেখতে পাচ্ছ না মাল ভরছি গাড়িতে।'

হঠাৎ আশার আলো দেখতে পেল জেমি। 'আপনারা কি যাত্রী বহন করেন?'

'মাঝে মাঝে,' চোখ তুলে চাইল লোকটা, পরখ করল ওকে।

'তোমার বয়স কতো?'

অদ্ভুত প্রশ্ন তো! 'আঠেরো। কেন?'

'আমরা কুড়ি-একুশ বছর বয়সের বেশি কোন জোয়ানকে গাড়িতে নিই না। তোমার শরীরে তাগত আছে তো?'

আরও আজব জিজ্ঞাসা। 'জ্বী, স্যার।'

সিধে হলো পাটকাঠি। 'তাহলে কোনো সমস্যা নাই। আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রওনা হব। ভাড়া কুড়ি পাউন্ড।'

নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস হতে চাইল না জেমির। 'বাহ্, দারুণ! আমি আমার সুটকেসটা একদৌড়ে নিয়ে আসছি এবং..

'কোনো সুটকেস আনা চলবে না। শুধু একটা শার্ট আর টুথব্রাশ ছাড়া অন্য কোনো মালের জায়গা হবে না।'

ঘোড়ার গাড়িতে অপাঙ্গে দৃষ্টি বুলাল জেমি। অপরিসর আয়তন, যেমন তেমনভাবে তৈরি করা। রেলিং দিয়ে একটা জায়গা ঘেরা, ওখানে রাখা হয়েছে চিঠির বস্তা। রেলিংয়ের পাশে ছোট্ট এইটুকুন জায়গা, একজন লোক কোনোমতে বসতে পারে ড্রাইভারের পেছন দিকে পিঠ ফিরিয়ে। সন্দেহ নেই খুবই অস্বস্তিকর হবে যাত্রা।

'ঠিক আছে,' বলল জেমি। 'আমি আমার শার্ট আর টুথব্রাশ নিয়ে আসছি।'

জেমি ফিরে এসে দেখল খোলা গাড়িতে একটি ঘোড়া জুতছে চালক। গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট শরীরের দুই তরুণ। একজন বেঁটে এবং কালো, অপরজন লম্বা, সোনালী চুলের সুইডিশ। ড্রাইভারের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিল তরুণদ্বয়।

'এক মিনিট,' জেমি বলল ড্রাইভারকে, 'আপনি না বলেছিলেন শুধু আমি যাচ্ছি?'

'তোমরা সবাই যাচ্ছ,' বলল চালক। 'উঠে পড়ো।'

'আমরা তিনজনে?'

'হ্যাঁ।'

জেমি বুঝতে পারছে না ড্রাইভারের কী করে ধারণা হলো এই ছোট্ট গাড়িতে তারা সবাই এঁটে যাবে। তবু যেতে তো হবেই।

অপর দুই যাত্রীর সঙ্গে পরিচিত হলো জেমি। 'আমি জেমি ম্যাক গ্রেগর।'

'ওয়ালাচ,' বলল বেঁটে, কালো লোকটি।

'পিডারসন,' নিজের পরিচয় দিল স্বর্ণকেশ।

জেমি বলল, 'আমরা সৌভাগ্যবান তা-ই এ গাড়িটির খোঁজ পেয়েছি, তাই না? ভাগ্যিস, সবাই এর কথা জানে না।'

পিডারসন বলল, 'সবাই ঘোড়ার গাড়ির কথা জানে, ম্যাক গ্রেগর। তবে বেশি লোক এতে চড়ে যেতে পারবে না জেনেই এদিকে পা মাড়ায় না।'

জেমি আর কিছু বলার সুযোগ পেল না, হাঁক ছাড়ল ড্রাইভার, 'চলো সবাই।'

তিনজন লোক– জেমি মাঝখানে– চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে বসে রইল গাড়ির সিটে। ভীষণ গাদাগাদি অবস্থা, হাঁটু ছড়িয়ে বসার জো নেই, পিঠ ঘষা খাচ্ছে ড্রাইভারের কাঠের আসনের গায়ে। নড়াচড়া দূরে থাক সুস্থিরভাবে নিঃশ্বাস ফেলাও যাচ্ছে না। *খারাপ না,* মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দিল জেমি।

'যাত্রীরা হুঁশিয়ার,' গানের সুরে বলে উঠল ড্রাইভার, তারপরই কেপটাউনের রাস্তা দিয়ে সবেগে ছুটতে শুরু করল ঘোড়ার গাড়ি ক্লিপড্রিফটের ডায়মন্ড ফিল্ডের উদ্দেশে।

বুলক ওয়াগনে ভ্রমণ তুলনামূলকভাবে অনেক আরামদায়ক। কেপটাউন থেকে হিরের খনিতে যাত্রী বহন করা এই গাড়ি বা ওয়াগনগুলো আকারে বেশ বড় এবং ভেতরে জায়গাও সুপরিসর, শীতকালের জ্বলন্ত সূর্যের উত্তাপ থেকে রক্ষা করতে মাথার ওপর তাঁবুর আচ্ছাদন থাকে। প্রতিটি ওয়াগন ডজনখানেক যাত্রী বহন করে, গাড়ি টানে ঘোড়া কিংবা খচ্চরের দল। রেগুলার স্টেশনগুলোতে বিশ্রাম এবং খাওয়া-দাওয়ার জন্য বিরতি দেয়া হয়। গন্তব্যে পৌঁছাতে সময় লাগে দশ দিন।

কিন্তু মেইল কার্টের যাতায়াত ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। যাত্রাপথে এ গাড়ি কোনো বিরতি দেয় না, শুধু চালক এবং ঘোড়া বদলানোর সময়টুকু ছাড়া। এবড়ো খেবড়ো রাস্তা, মাঠ আর খানা-খন্দে ভরা ট্রেইলে ছুটে চলে গাড়ি প্রচণ্ড ঝাঁকি খেতে খেতে। গাড়িতে স্প্রিং নেই বলে প্রতিটা ঝাঁকুনিতে মনে হয় ঘোড়ার খুরের লাথি লাগছে। দাঁতে দাঁত চেপে জেমি ভাবছিল, *'রাতে গাড়ি নিশ্চয় থামবে, সে পর্যন্ত আমি সয়ে যাব। রাতে খেয়েদেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিয়ে সকালে আবার তাজা হয়ে উঠব।*

কিন্তু সাঁঝের আঁধার ঘনাবার পরে ঘোড়া এবং ড্রাইভার বদলের জন্য মাত্র দশ মিনিট যাত্রা বিরতি ঘটল তারপর আবার টগবগিয়ে ছুটল গাড়ি।

'খানা খেতে কখন থামব?' জানতে চাইল জেমি।

'থামব না,' খেঁকিয়ে উঠল ড্রাইভার। 'আমরা সোজা চলতেই থাকব। ভুলে যাবেন না এটা ডাক-গাড়ি, মিস্টার।'

চাঁদের আলোয় ধুলোভরা, ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে বেদম ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটে চলল ডাক গাড়ি। দীর্ঘ এ যন্ত্রণাদায়ক রাত্রি যেন ফুরাবার নয়। ঝাঁকির চোটে জেমির শরীরের প্রতিটি ইঞ্চি ব্যথায় কনকন করছে, ফুলে গেছে, ফোস্কা পড়েছে। ভয়ানক ক্লান্ত এবং বিপর্যস্ত সে। কিন্তু ঘুমাবার উপায় নেই। একটু তন্দ্রা এসেছে কী পরক্ষণে প্রবল ঝাঁকি খেয়ে ছুটে গেছে নিদ। গায়ে খিঁচ ধরে গেছে, হাত-পা ছড়িয়ে একটু আড়মোড়া ভাঙারও জো নেই। দারুণ খিদে পেয়েছে। জানে না কবে এ গাড়ি থামবে আর মুখে কিছু দিতে পারবে। ছয়শো মাইল রাস্তা পাড়ি দিতে হবে ওদেরকে। শেষতক এ ধকল সামলাতে পারবে কিনা ভেবে রীতিমতো সন্দেহ হচ্ছিল জেমির।

দ্বিতীয় দিনের শেষের দুর্দশা পরিণত হলো শারীরিক যন্ত্রণায়। জেমির অপর দুই ভ্রমণসঙ্গীরও একই অবস্থা। মুখে নালিশ জানানোর ক্ষমতাও তাদের নেই। জেমি এখন বুঝতে পারছে পাটকাঠি কেন তরুণ এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারীদের কথা বলেছিল।

পরের দিন ভোরবেলায় ওরা প্রবেশ করল গ্রেটকারোতে। এখান থেকে মূলত উষর

প্রান্তরের শুরু। ধু ধু তেপান্তর, বিরাট নিস্পাদপ তৃণভূমি ছড়িয়ে আছে নির্দয় সূর্যের নিচে। ডাকগাড়ির যাত্রীরা রোদ, ধুলা এবং মাছির হামলায় কাহিল।

মাঝে মাঝে দুর্গন্ধযুক্ত বাষ্পের পর্দার মাঝ দিয়ে জেমি দেখতে পেল পায়ে হেঁটে দলে দলে লোক যাচ্ছে। কাউকে দেখা গেল ঘোড়ায় চড়ে একাকী রওনা হয়েছে। ডজন ডজন বুলক ওয়াগন যাচ্ছে। আঠেরো বিশটা বলদ টেনে চলেছে ওসব গাড়ি। চামড়ার চাবুক ঝলসে পড়ছে বলদগুলোর গায়ে, গতিতে মন্থর হলেই। প্রকাণ্ড ওয়াগনগুলো নানান জিনিসে বোঝাই, আছে তাঁবু, মাটি খোঁড়াখুড়ির সরঞ্জাম, কাঠের চুল্লি, ময়দা, কয়লা এবং তেলের বাতি। তারা নিয়ে চলেছে কফি, চাল, রাশান হেম্প (ভাং), চিনি, মদ, হুইস্কি, মোমবাতি এবং কম্বল। এসবই ক্লিপড্রিফটে হিরে সন্ধানী মানুষগুলোর বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন।

অরেঞ্জ রিভার পার হবার আগ পর্যন্ত ভয়ংকর প্রান্তরের একঘেয়েমি থেকে রেহাই পাওয়া গেল না। এরপরে ঝোপঝাড়গুলো ক্রমে লম্বা এবং সবুজ হতে লাগল। মাটির রঙ আরও লালচে, বাতাসে দোল খাচ্ছে ঘাসের গোছা, কাঁটাঅলা ছোট ছোট গাছের সারি দৃশ্যমান হয়ে উঠল ক্রমে।

আমি পারব, ভোঁতা অনুভূতি নিয়ে ভাবছে জেমি, *আমি পারব।*

ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীরে আবার আশার ঢেউ জাগল।

টানা চারদিন চার রাত চলল ওদের বিরতিহীন যাত্রা, অবশেষে পৌঁছাল ক্লিপড্রিফটের প্রান্তদেশে।

কী প্রত্যাশা করবে জানত না কিশোর জেমি ম্যাক গ্রেগর। তবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, লাল টকটকে চোখ মেলে সে যে দৃশ্য দেখল তা বোধকরি তার কল্পনাতেও ছিল না। ভ্যাল নদীর তীরে আর মূল রাস্তায় সারি সারি তাঁবু আর ওয়াগনের এক বিস্তৃত দৃশ্যপট ভেসে উঠেছে তার চোখের সামনে। ধুলোভরা রাস্তায় গিজগিজ করছে কাফ্রির দল। পরনে ঝলমলে জ্যাকেট। আছে দাড়িঅলা প্রসপেক্টর, কসাই, রুটিঅলা, চোর, শিক্ষক। ক্লিপড্রিফটের মাঝখানে সার বাঁধা কাঠ আর লোহার কুটিরগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে দোকান, ক্যান্টিন, বিলিয়ার্ড রুম, খাবার ঘর, হিরে ক্রেতা অফিস এবং আইনজীবীদের কক্ষ হিসেবে। এক কোণায় জবুথবু চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রয়াল আর্ক হোটেল, জানালাবিহীন অনেকগুলো কক্ষবিশিষ্ট একটি বাড়ি।

গাড়ি থেকে নামল জেমি এবং সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে। খিঁচধরা পা তার শরীরের ওজন বইতে অস্বীকার করেছে। জমিনেই শুয়ে রইল জেমি, বোঁ বোঁ ঘুরছে মাথা, সিধে হবার শক্তি সঞ্চয় করে অবশেষে খাড়া হলো। টলতে টলতে এগোল হোটেলে, লোকের ভিড় ঠেলে। মানুষ গিজগিজ করছে ফুটপাত আর রাস্তায়। যে ঘরটি বরাদ্দ পেল জেমি নিজের জন্য ওটা খুবই ছোট, দম বন্ধ করা গরম আর মাছি ভরা। তবে ঘরে একটি খাটিয়া আছে। জেমি পোশাক না ছেড়েই শুয়ে পড়ল বিছানায় এবং ঘুমিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সে টানা আঠারো ঘণ্টা ঘুমাল।

তিন

ঘুম ভাঙল জেমির। ব্যথায় আড়ষ্ট গা। তবে মনে বেজায় স্ফূর্তি। আমি এখানে আসতে পেরেছি। ক্ষিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট। হোটেলে ভোজের বন্দোবস্ত নেই। তবে রাস্তার ওপারে ছোট, জনাকীর্ণ একটি রেস্টুরেন্টে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। জেমি রেস্টুরেন্টে ঢুকে ভাজা মাছ, কার্বোনাটজি, কাঠের আগুনে ঝলসানো ফালি করা মাটন, বক এবং ডেজার্ট হিসেবে নিল *Koeksister,* সিরাপে ভেজানো ময়দার পিঠা গোগ্রাসে গিলল।

দীর্ঘদিন অভুক্ত থাকার পরে এতগুলো খাদ্য জেমির পেটে গিয়ে গোলমাল শুরু করে দিল। সে খাওয়ায় বিরতি দিয়ে মনোযোগ ফেরাল আশপাশের লোকজনের দিকে। তার কাছেপিঠে বা দূরের টেবিল ঘিরে যারা বসে আছে তাদের সকলেরই আলোচ্য বিষয় একটাই– হিরে।

হোপ টাউনে এখনও স্বল্প কিছু হিরে আছে তবে বেশিরভাগ মাল পড়ে আছে নিউ রাশে...

জোবার্গের চেয়ে কিম্বার্লির জনসংখ্যা বেশি...'

'...ডুয়েটস্পানের কথা বলছ? ওরা বলে ওখানে নাকি এত হিরে আছে যে একজন লোক বইতে পারবে না...'

'...ক্রিশ্চিয়ানায় নতুন হিরের খনির সন্ধান মিলেছে। আমি কাল ওখানে যাচ্ছি।'

তাহলে কথা সত্য। সব জায়গায় হিরের ছড়াছড়ি। এতই উত্তেজিত হয়ে উঠল জেমি যে প্রকাণ্ড পেয়ালা ভর্তি কফি আর শেষ করতে পারল না। তবে খাবারের বিল দেখে আত্মা শুকিয়ে গেল তার। দুই পাউন্ড তিন শিলিং!

খাবার খেতে হবে বুঝেশুনে! ব্যস্ত রাস্তার ভিড়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল সে।

পেছন থেকে কে যেন ডাক দিল ওকে। 'এখনও বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখছ, ম্যাক গ্রেগর?'

ঘুরল জেমি। পিডারসন। সেই সুইডিশ তরুণ সহযাত্রী যে ওর সঙ্গে এক সাথে এসেছিল।

'নিশ্চয়,' জবাব দিল জেমি।

'তাহলে যেখানে হিরে আছে সেখানে চলো যাই।' হাত তুলে দেখাল সে। 'ভ্যাল রিভারটা ওই দিকে।'

ওরা হাঁটা শুরু করল।

পাহাড় ঘেরা একটি বেসিনের মাঝখানে ক্লিপড্রিফট। যতদূর চোখ যায় উষর প্রান্তর, এক গুচ্ছ ঘাস কিংবা ঝোপ পর্যন্ত নেই। বাতাস ঘন হয়ে আছে লাল ধুলোয়, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ভ্যাল রিভার পৌনে এক মাইল দূরে। নদীর কাছাকাছি আসতে ঠাণ্ডা লাগল হাওয়া। নদীর দুই তীরে শত শত প্রসপেক্টর, কেউ হিরের জন্য মাটি খুঁড়ছে, কেউ বা ঝাঁঝরিতে ময়লা পাথর ধুচ্ছে। আবার কিছু লোক ভাঙাচোরা টেবিলে বসে বাছাই করছে পাথর। মাটি ধোয়ার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে পুরানো টাব বক্স এবং বালতি ব্যবহার সবই চলছে। পুরুষদের সকলের চেহারা রোদে পোড়া, গাল ভর্তি দাড়ি, পরনে ময়লা পোশাক, ফ্লানেল শার্টের রঙ জ্বলে গেছে কবে, সস্তা, মোটা কাপড়ের ট্রাউজার্স, পায়ে রাবার বুট, মাথায় চওড়া কিনারার ফেল্ট হ্যাট অথবা নলখাগড়ার হেলমেট। তাদের সবার কোমরে পকেটঅলা চামড়ার চওড়া বেল্ট। হিরে অথবা টাকা রাখার জন্য।

নদীর তীরে হেঁটে এল জেমি এবং পিডারসন। দেখল একটি কিশোর আর এক বৃদ্ধ একটি প্রকাণ্ড আয়রনস্টোন বোল্ডার ধরে টানাটানি করছে ওটার নিচের কাঁকর আর নুড়িগুলো নেয়ার জন্য। তাদের জামা ঘামে ভিজে সপসপে।

পাথর বোঝাই করছে একটি দোলনার চালনি বা ঝাঁঝরিতে রাখার জন্য। একজন খননকারী দোলনা ধরে ঝাঁকাচ্ছে, আরেকজন বালতি বোঝাই পানি ঢেলে পরিষ্কার করছে নুড়ি পাথরের কাদা। তারপর বড়বড় নুড়িগুলো খালি করা হচ্ছে একটি টেবিলে। ওখানে তারা উত্তেজিত ভঙ্গিতে বাছাই করছে পাথর।

'দেখে তো মনে হচ্ছে খুব সহজ কাজ,' হাসল জেমি।

'অত সহজ কাজ নয়, ম্যাকগ্রেগর। আমি কয়েকজন খননকারীর সঙ্গে কথা বলেছি। আমরা হয়তো বেহুদাই সোনার হরিণের পেছনে ছুটছি।

'মানে?'

'তুমি কি জানো ধনী হবার আশায় এ অঞ্চলে কত মানুষ এসেছে? কুড়ি হাজার! আর এত হিরেও এখানে নেই। আর থাকলেও সে সব হিরের দাম এ লোকগুলোর শ্রমের মূল্যের সমান হবে কিনা আমার সন্দেহ আছে। এখানে তুমি প্রচণ্ড শীতে কুঁকড়ে যাবে, গরমে পুড়ে যাবে গায়ের চামড়া, ডন্ডারস্টর্মের ধাক্কায় কাবু হবে, লড়াই করতে হবে ধুলো, মাছি আর বদবু'র সঙ্গে। গোসল করার সুযোগ পাবে না, ভালো বিছানা মিলবে না ঘুমাবার জন্য, এ বিশ্রী শহরে কোনো স্যানিটারি ব্যবস্থাও নেই। প্রতি সপ্তাহেই ভ্যাল নদীতে কেউ না কেউ ডুবে মরছে। এর মধ্যে কিছু দুর্ঘটনাজনিত তবে অনেকেই এ নারকীয় গর্ত থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে ঝাঁপ দেয় নদীতে। জানি না তারপরও এ মানুষগুলো কিসের আশায় এখানে পড়ে আছে।'

'আমি জানি,' ঘামে ভেজা শার্ট পরা ছেলেটির দিকে তাকাল জেমি। 'আরেক বেলচা কাদামাটি তোলার জন্য।'

ওরা শহরে ফেরার পথে জেমি মনে মনে স্বীকার করল একটুও বাড়িয়ে বলেনি পিডারসন। তাঁবুর বাইরে পড়ে আছে জবাই করা গাভী, ভেড়া এবং ছাগল। ওগুলো পচে গন্ধ ছড়াচ্ছে, সেদিকে কারও ভ্রুক্ষেপ নেই। পচনধরা জানোয়ারগুলোর শরীরের পাশেই সারি সারি খোলা গর্ত। এগুলো ব্যবহার করা হয় পায়খানা হিসেবে। বিকট গন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস। পিডারসন লক্ষ করছিল ওকে।

'এখন তুমি কী করবে?'

'মাটি খোঁড়ার কিছু যন্ত্রপাতি জোগাড় করব।'

শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি মুদি দোকান আছে। তাতে মরিচা ধরা একটি সাইনবোর্ড ঝুলছে SALOMON VAN DER MERWE, GENERAL STORE। জেমির বয়সী একটি লম্বা, কালো যুবক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে একটি ওয়াগনের মালপত্র নামাচ্ছে। লোকটি বৃষ স্কন্ধ, গা ভর্তি কিলবিলে পেশী, দারুণ সুদর্শন। কয়লা-কালো চোখ, ঈগলের ঠোঁটের মতো বাঁকানো নাক, দৃঢ় চিবুক। সে রাইফেল বোঝাই ভারী একটি কাঠের বাক্স অবলীলায় তুলে নিল নিজের কাঁধে, ঘুরে দাঁড়িয়েছে, বাঁধাকপির বাক্স থেকে খসে পড়া একটি পাতায় পিছলে গেল তার পা। ঝট করে একটা হাত বাড়িয়ে যুবককে ধরে ফেলল জেমি। কৃষ্ণাঙ্গ কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত জানাল না জেমিকে। ঘুরল সে, ঢুকে গেল দোকানে। এক বোয়ের প্রসপেক্টর একটি খচ্চর টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তেতো গলায় বলল, 'ও হলো বান্ডা, বারোলং প্রজাতির মানুষ। মি. ভ্যান ডার মার্ভির দোকানে কাজ করে। ওই হামবড়া কালুয়াটাকে তিনি যে কেন রাখছেন বুঝি না। হারামজাদা বান্টুগুলো এমন ভাব দেখায় যেন দুনিয়াটা তাদের বাপের তালুক।'

দোকানের ভেতরটা শীতল এবং অন্ধকার, তীব্র গরম এবং খর রোদের রাস্তা থেকে এখানে ঢুকে মনে হলো যেন স্বর্গে এসেছি। একটা সুন্দর গন্ধও লেপ্টে আছে দোকানের গায়ে। দোকানের প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা মালপত্রে ঠাসা। দোকান ঘুরে ঘুরে দেখল জেমি।

এখানে কী নেই? কৃষি যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে বিয়ার, দুধ, মাখন, সিমেন্ট, বৈদ্যুতিক ফিউজ, ডিনামাইট, বেকড, শুকনো ফল, ঘোড়ার জিন, হার্নেস, সাবান, স্পিরিট, স্টেশনারি, কাগজ, চিনি, চা, তামাক, সিগার... সব আছে। ডজন খানেক তাক ভর্তি ফ্লানেল শার্ট, কম্বল, জুতা, বনেট ইত্যাদি রয়েছে। *এতকিছু জিনিসের মালিক,* মনে মনে বলল জেমি, সে নিশ্চয় অনেক বড়লোক।

একটি নরম কণ্ঠ বলে উঠল পেছন থেকে, 'আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারি?'

ঘুরল জেমি। দেখল ও একটি কিশোরীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির বয়স পনেরো হবে। মুখখানা ভারী সুন্দর, উঁচু চোয়াল, হার্ট আকারের চেহারা। ছোট্ট খাড়া নাক, গভীর সবুজ চোখ। তার চুল অন্ধকারের মতো কালো এবং কোঁকড়ানো, শরীরে চোখ বুলিয়ে জেমি অনুমান করল এর বয়স ষোলও হতে পারে।

'আমি একজন প্রসপেক্টর,' ঘোষণার সুরে বলল জেমি। 'আমি কিছু জিনসপত্র

কিনতে এসেছি।'

'কী কী লাগবে আপনার?'

মেয়েটির সঙ্গে একটু তরল হবার ইচ্ছে করল জেমির।

'আ– ইয়ে তুমি তো জানো– এমনিই জিনিসপত্র।'

হাসল কিশোরী, তার চোখের তারায় দুষ্টুমি। 'এমনি জিনিসপত্র কী, স্যার?'

'ধরো...' ইতস্তত গলায় বলল জেমি। 'একটা বেলচা।'

'শুধু ওতেই হবে?'

জেমি বুঝতে পারল মেয়েটি ওর সঙ্গে ফাজলামি করছে। ও হেসে ফেলে স্বীকার করল, 'সত্যি বলতে কী আমি নিজেও জানি না ঠিক কী কী জিনিস কিনতে হবে।'

মেয়েটি হাসল ওর দিকে তাকিয়ে, নারীসুলভ হাসি। 'সেটা নির্ভর করবে আপনি কোথায় প্রসপেক্ট করতে যাবেন, মি–?'

'ম্যাক গ্রেগর। জেমি ম্যাক গ্রেগর।'

'আমি মার্গারেট ভ্যান ডার মার্ভি। দোকানের পেছন দিকে চকিত চোখে একবার দেখল সে।

'তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মিস ভ্যান ডার মার্ভি।'

'আপনি কি মাত্রই এসেছেন?'

'হুঁ। গতকাল। মেলবাহী গাড়িতে।'

'কারও উচিত ছিল আপনাকে সাবধান করে দেয়া। ওই গাড়িতে উঠে অনেক যাত্রীই মারা গেছে।' মেয়েটির চোখে রাগ।

হাসল জেমি। 'এজন্য তাদেরকে দোষ দেয়া যায় না। তবে আমি বেঁচে গেছি। ধন্যবাদ।'

'এবং আপনি মুই ক্লিপ্পির সন্ধানে যাচ্ছেন?

'মুই ক্লিপ্পি?'

'ডাচ ভাষায় আমরা হিরেকে তা-ই বলি।'

'তুমি ডাচ নাকি?'

'আমার পরিবার হল্যান্ড থেকে এসেছে।'

'আমার বাড়ি স্কটল্যান্ড।'

'সে আমি দেখেই বুঝতে পেরেছি।' আরেকবার দোকানের পেছন দিকে ভীত চোখ বুলাল মেয়েটি। 'এখানে সবজায়গায় হিরে ছড়িয়ে রয়েছে, মি. ম্যাক গ্রেগর। তবে কোথায় হিরে খুঁজবেন সে ব্যাপারে আপনাকে আগে ঠিক করতে হবে। বেশিরভাগ খননকারী নির্দিষ্ট এলাকায় খোঁজাখুঁজি করে। কেউ একজন হিরে পেলেই হলো, বাকিরা ওখানে গিয়ে হামলে পড়ে। ধনী হতে চাইলে একা একা আপনাকে হিরের সন্ধান করতে হবে।'

'কিন্তু তা কী করে সম্ভব?'

'এ ব্যাপারে আমার বাবা আপনাকে হয়তো সাহায্য করতে পারবেন। তিনি সব জানেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তিনি ফ্রি হবেন।'

'তাহলে আমি একঘণ্টা পরে আবার আসছি,' বলল জেমি।

'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, মিস ভ্যান ডার মার্ভি।'

রাস্তায় বেরুল জেমি ফুরফুরে মেজাজে, ভুলে গেছে শরীরের সমস্ত ব্যথা-বেদনা। সলোমন ভ্যান ডার মার্ভি যদি তাকে বলে দেয় কোথায় গেলে পাওয়া যাবে হিরে, জেমির তাহলে ব্যর্থ হবার কোনো প্রশ্নই নেই। সে অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে। আনন্দে আর খুশিতে হো হো করে হাসতে লাগল জেমি।

মূল রাস্তা ধরে হাঁটছে জেমি, পাশ কাটাল একটি কামারের দোকান, বিলিয়ার্ড হল এবং ডজনখানেক সেলুন। জরাগ্রস্ত চেহারার একটি হোটেলের সামনের সাইনবোর্ড ওর নজর কাড়ল। দাঁড়িয়ে পড়ল জেমি। সাইনবোর্ডে লেখা :

আর ডি মিলার। এখানে গরম ও ঠাণ্ডা গোসলের সুব্যবস্থা আছে। সকাল ছয়টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত খোলা। ড্রেসিং রুমের সুবিধাও রহিয়াছে।

জেমি ভাবছিল আমি শেষ কবে গোসল করেছি? সে তো জাহাজে বসে। বালতির পানি দিয়ে কাক স্নান। গায়ের দুর্গন্ধ সম্পর্কে অকস্মাৎ সচেতন হয়ে উঠল সে। ঘুরল জেমি। প্রবেশ করল গোসলখানায়। ভেতরে দুটো দরজা। একটি মহিলাদের জন্য, অপরটি পুরুষদের। পুরুষদের সেকশনে ঢুকল জেমি। গেল বয়সী অ্যাটেনডেন্টের কাছে। 'গোসল করতে কত লাগবে?'

'ঠাণ্ডা গোসলের জন্য দশ শিলিং, গরম পানিতে গোসল পনের শিলিং।'

ইতস্তত করল জেমি। দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে গরম পানিতে গোসলের জন্য আকুলি বিকুলি করছে মন। 'ঠাণ্ডা,' বলল সে। বিলাসীতার পেছনে টাকা খরচ করতে পারবে না জেমি। খনির জন্য যন্ত্রপাতি কিনতে হবে।

অ্যাটেনডেন্ট ওর হাতে হলুদ একখণ্ড সাবান আর সুতির তোয়ালে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'ওই দিকে।'

ছোট একটি ঘরে ঢুকল জেমি। ঘরের মাঝখানে লোহার বড় একটি বাথটাব আর দেয়ালে কয়েকটা পেরেক ছাড়া কিছু নেই। অ্যাটেনডেন্ট কাঠের বড় একটি বালতি থেকে পানি তুলে বাথটাব ভরতে লাগল।

'সব রেডি, মিস্টার। তোমার জামাকাপড়গুলো ওই পেরেকে ঝুলিয়ে রাখো।'

অ্যাটেনডেন্ট চলে গেলে জামাকাপড় খুলে ফেলল জেমি। ঘামে ভেজা ময়লা শরীরের দিকে তাকাল একবার। তারপর বাথটাবে একটি পা রাখল। বিজ্ঞাপনে যেমন বলা হয়েছিল– খুব ঠাণ্ডা পানি। দাঁতে দাঁত চেপে সারা গায়ে সাবান মাখতে শুরু করল

জেমি। যখন নেমে এল টাব থেকে, ওটার পানি কালো হয়ে গেছে। ছেঁড়া লিলেন তোয়ালে দিয়ে খুব ভালোভাবে মুছে নিল শরীর। তারপর পরতে লাগল কাপড়। ময়লা লেগে শক্ত হয়ে গেছে জামা আর প্যান্ট। ওগুলো আবার গায়ে চড়াতে ঘেন্নাই লাগছিল জেমির। ওর একপ্রস্থ জামাকাপড় না কিনলেই নয়। আবার মনে পড়ল ওর কাছে কত অল্প টাকা-পয়সা আছে। আবার খিদে পেয়ে গেল জেমির।

গোসলখানা থেকে বেরিয়ে এল সে। জনাকীর্ণ রাস্তা দিয়ে হেঁটে এসে সানডোনার নামে একটি সেলুনে ঢুকল। একটি বিয়ার এবং লাঞ্চের অর্ডার দিল। টমেটোসহ ভেড়ার কাটলেট, সসেজ, আলুর সালাদ এবং আচার। সে খাওয়া শেষ করে বিল চুকিয়ে দ্রুত চলে এল সলোমন ভ্যানডারের দোকানে।

সলোমনকে কাউন্টারের পেছনে পাওয়া গেল। কাঠের একটি বাক্স থেকে রাইফেল বের করছে। মানুষটা ছোটখাটো গড়নের, পাতলা মুখ, ঠোঁটের ওপর গোঁফ আছে। বালুরঙা চুল, কুচকুচে কালো চোখ, কন্দ আকৃতির নাক এবং কুঞ্চিত ঠোঁট। *মেয়েটি নিশ্চয় তার মায়ের মতো দেখতে হয়েছে,* ভাবছিল জেমি। 'এক্সকিউজ মি, স্যার...'

মুখ তুলে তাকাল ভ্যান ডার মার্ভি। *'জা?'*

'মি. ভ্যান ডার মার্ভি? আমি জেমি ম্যাক গ্রেগর, স্যার। স্কটল্যান্ড থেকে এসেছি। হিরের খোঁজে।

'জা?' তো?'

'শুনলাম আপনি নাকি প্রসপেক্টরদেরকে সাহায্য করেন?'

ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল ভ্যান ডার। *'Myn Magtig?* এসব গুজব কে ছড়ায়? আমি অল্প কয়েকজন ডিলারকে সাহায্য করেছি আর তাতেই লোকে আমাকে সান্তাক্লজ ঠাউরে বসেছে।'

'আমার কাছে একশো কুড়ি পাউন্ড আছে,' বলল জেমি। 'তবে আপনার এখানে জিনিসপত্রের যা দাম তা দিয়ে খুব বেশি কিছু মাল আমি কিনতে পারব না। প্রয়োজনে শুধু একটা বেলচা নিয়েও বনে যেতে রাজি তবে সঙ্গে যদি একটা খচ্চর আর প্রয়োজনীয় কিছু যন্ত্রপাতি থাকে তো আমার হিরে পাবার সম্ভাবনাটা একটু বেশিই থাকবে।'

ভ্যান ডার মার্ভি ওকে ছোট ছোট কালো চোখ দিয়ে পরখ করছিল।

'Wat denkye? তুমি কী করে ভাবলে তুমি হিরে খুঁজে পাবে?

'আমি অর্ধেকটা পৃথিবী ঘুরে এসেছি, মি. ভ্যান ডার মার্ভি এবং বড়লোক না হওয়া পর্যন্ত আমি এখান থেকে এক পাও নড়ছি না। যদি হিরে থাকে তো আমি খুঁজে পাবোই। আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন, আমরা দু'জনেই বড়লোক হয়ে যাব।'

ভ্যান ডার মার্ভি ঘোঁত ঘোঁত করে জেমির পেছন ফিরল, আবার রাইফেল নামানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। জেমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল জায়গায়। কী করবে বুঝতে পারছে না। ভ্যান ডার আবার যখন কথা বলে উঠল, চমকে গেল জেমি। 'তুমি এখানে বুলক ওয়াগনে চেপে এসেছ?'

'না। ডাকগাড়ি।'

বুড়ো পেছন ফিরল আবার ছেলেটিকে তীক্ষ্ণ নজরে দেখতে। অবশেষে বলল, 'আমরা বিষয়টি নিয়ে কথা বলব।'

সেদিন সন্ধ্যায় দোকানের পেছন দিকের একটি ঘরে বসে ডিনার খেতে খেতে বিষয়টি নিয়ে কথা বলল ভ্যান ডার। ক্ষুদ্রকায় কক্ষটি একই সঙ্গে রান্নাঘর, ডাইনিং রুম এবং শোবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। একটি পর্দা দিয়ে দুই পাশে দুটি খাটিয়া ফেলা হয়েছে। দেয়ালের নিচের অংশ মাটি আর পাথরে তৈরি, ওপরের অর্ধেক কার্ডবোর্ডের দেয়ালে চৌকোনা একটা গর্ত, ওটা আসলে জানালা। বর্ষাকালে বন্ধ করে রাখা হয় জানালার সামনে একটা তক্তা দিয়ে। ডাইনিং টেবিল বলতে দুটো কাঠের বাক্সের ওপর লম্বা একখণ্ড তক্তা ফেলে রাখা হয়েছে। জেমি বুঝতে পারছে ভ্যান ডার লোকটা খুব কিপ্টে স্বভাবের।

ভ্যানডারের মেয়েটির চলাফেরা নিঃশব্দ। সে ডিনার রেডি করছে। মাঝেমধ্যে চট করে একবার দেখে নিচ্ছে তার বাপকে তবে ভুলেও তাকাচ্ছে না জেমির দিকে। *বাপকে তার এত ভয় কীসের?* অবাক জেমি।

টেবিলে বসে ভ্যান ডার মার্ভি ঝাড়া পাঁচ মিনিট প্রার্থনা করল। প্রার্থনা শেষে মেয়েকে হুকুম দিল 'মাংস নিয়ে এসো।'

ডিনারের মেনু সামান্যই ছোট একটি রোস্ট পর্ক, তিনটা সেদ্ধ আলু, এক বাটি সালগম। ভ্যান ডার অল্পই খেতে দিল জেমিকে। খাওয়ার সময় দু'জনের খুব কম কথা হলো। তবে মার্গারেট একদমই কথা বলল না।

খাওয়া শেষ করে ভ্যান ডার বলল, 'রান্না ভালো হয়েছে, মাগো।' তার কণ্ঠে গর্বের সুর। জেমির দিকে ফিরল।

'আমরা তাহলে কাজের কথায় আসি, কেমন?'

'জ্বী, স্যার।'

ভ্যান ডার মার্ভি কাঠের কেবিনেট থেকে মাটির তৈরি লম্বা একটি পাইপ তুলে নিল। ছোট একটি পাউচ থেকে সুগন্ধী তামাক ভরে পাইপ জ্বালাল। তারপর ধূমপান করতে করতে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জেমির দিকে।

'ক্লিপড্রিফটে যারা খনন করতে আসে তারা সব গাধার দল। হিরে কম, খননকারীর সংখ্যা বেশি। এখানে একজন মানুষ সারা বছর হিরের সন্ধানে মেরুদণ্ড বাঁকা করে ফেললেও কিছুই পায় না। কিন্তু উত্তরে এক আফ্রিকান উপজাতি আছে। ওরা হিরে খুঁজে পায়– বড় বড় হিরে– মাঝে মাঝে আমার জন্য নিয়ে আসে। আমি জিনিসপত্রের বিনিময়ে ওই হিরে কিনে নিই।' গলার স্বর নেমে গেল তার, ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে ফিসফিস করল। 'আমি জানি হিরে কোথায় পাওয়া যাবে।'

'কিন্তু আপনি নিজে কেন হিরে সংগ্রহ করতে যাচ্ছেন না, মি. ভ্যান ডার মার্ভি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভ্যান ডার। 'না, দোকান ছেড়ে কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। লোকে সব লুটেপুটে নেবে। আমার এমন বিশ্বাসী কাউকে দরকার যে ওখানে গিয়ে আমার জন্য হিরে নিয়ে আসবে। যেদিন সঠিক মানুষটির দেখা পাবো, তাকে প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্তর দিয়ে হিরে আনতে পাঠিয়ে দেব।' দীর্ঘ বিরতি দিয়ে পাইপ টেনে চলল সে। 'তাকে বলব কোথায় পাওয়া যাবে হিরে।'

লাফ মেরে খাড়া হলো জেমি, ধড়াস ধড়াস লাফাচ্ছে কলজে। 'মি. ভ্যান ডার মার্ভি, আমিই সেই লোক যাকে আপনি খুঁজছেন। বিশ্বাস করুন স্যার, আমি রাতদিন গাধার খাটুনি খাটব।' উত্তেজনায় গমগম করছে জেমির কণ্ঠ। 'আপনাকে আমি এত বেশি হিরে এনে দেব যে গুনে শেষ করতে পারবেন না।'

জেমিকে যেন অনন্তকাল ধরে পরখ করল ভ্যান ডার। শেষে শুধু একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করল, *'জা।'*

পরদিন সকালেই চুক্তিপত্রে সই করল জেমি। আফ্রিকান ভাষায় লেখা হয়েছে চুক্তিপত্র।

'এতে কী লেখা হয়েছে বলছি তোমাকে,' বলল ভ্যান ডার।

'এখানে বলা হচ্ছে আমরা দু'জনে ফুল পার্টনার। আমি পুঁজি যোগাব– তুমি দেবে শ্রম। সবকিছু সমান ভাগ হবে দু'জনের মধ্যে। ভ্যান ডারের হাতের চুক্তিপত্রে তাকাল জেমি। দুর্বোধ্য বিদেশী ভাষায় লেখা চুক্তিপত্রটির মধ্যে শুধু একটি দুর্বোধ্য অঙ্ক ও বুঝতে পারছে দুই পাউন্ড।

জেমি আঙুল তুলে ইঙ্গিত করল। 'এটা কী, মি. ভ্যান ডার?'

'এর মানে হলো তোমার ভাগের অর্ধেক হিরে ছাড়াও প্রতি সপ্তাহে তোমাকে মজুরী হিসেবে দুই পাউন্ড করে দেয়া হবে। যদিও জানি ওখানে হিরে আছে কিন্তু তুমি তার খোঁজ না-ও পেতে পার, খোকা। তাহলে অন্ততঃ তোমার পরিশ্রমটা যেন বৃথা না যায় সেজন্য তোমাকে আমি পারিশ্রমিক হিসেবে এ টাকাটা দেব।'

বাহ্, লোকটার কলিজা দেখছি বেশ বড়, ভাবল জেমি। 'ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ, স্যার।' জেমির খুব ইচ্ছে করল বুড়োকে আলিঙ্গন করে।

ভ্যান ডার বলল, 'এখন তোমার জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নাও।'

জঙ্গলে যেতে যেসব জিনিসপত্র সঙ্গে নেবে জেমি তা বাছাই করতে ঘণ্টা দুই সময় লাগল। ছোট একটি তাঁবু, বিছানাপত্র, রান্নার সরঞ্জাম, একজোড়া চালুনি এবং ওয়াশিং ক্রেডল, একটি গাইতি, দুটো বেলচা, তিনটে বালতি, ধারালো কুড়াল, প্যারাফিন তেল, দেশলাই এবং আর্সেনিকাল সাবানও নিল। নিল টিনজাত খাবার, বিলট্ (লম্বা করে কাটা রোদে শুকানো লবণাক্ত মাংস), ফল, চিনি, কফি এবং লবণ। অবশেষে সবকিছু রেডি হলো। কৃষ্ণাঙ্গ চাকরটি, বান্ডা, জেমির ব্যাকপ্যাকে সব গুছিয়ে দিতে সাহায্য করল। তবে বিশালদেহী মানুষটি একবারও ফিরে চাইল না জেমির দিকে কিংবা বাতচিতও

করল না। *এ বোধহয় ইংরেজি জানে না,* অনুমান করল জেমি। মার্গারেট দোকানে থাকল খদ্দেরের জন্য, জেমির উপস্থিতি সে টের পেলেও আচরণে বুঝতে দিল না।

ভ্যান ডার জেমিকে বলল, 'তোমার খচ্চরটা সামনেই আছে। জিনিসপত্র বাঁধাছাদায় বান্ডা তোমাকে সাহায্য করবে।'

'ধন্যবাদ, মি. ভ্যান ডার মার্ভি,' বলল জেমি। 'আমি–'

ভ্যান ডার হিসেব লেখা একটি কাগজে চোখ বুলিয়ে বলল, 'তোমাকে মোট একশো কুড়ি পাউন্ড দিতে হবে।'

ফাঁকা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল জেমি। 'ক-কী? এসব জিনিস তো আমাদের চুক্তির অংশ। আমরা–'

'Wat beduidi?' রাগে কালো হয়ে গেল ভ্যানডারের চেহারা।' তোমাকে এত কিছু জিনিস, এমন চমৎকার একটা খচ্চর, তোমাকে পার্টনার করা, সাপ্তাহিক মজুরী দুই পাউন্ড সবকিছু এমনিই দিয়ে দেব? যদি ভেবে থাকো সবকিছু মাগনা পাবে, ভুল ভেবেছ খোকা।'

সে জেমির ব্যাকপ্যাক খুলতে শুরু করল।

জেমি দ্রুত বলল, 'না! প্লীজ, মি. ভ্যান ডার মার্ভি। আ- আমি ঠিক বুঝতে পারি-নি। ঠিক আছে। আপনার জিনিসের দাম দিয়ে দিচ্ছি।' সে পাউচ খুলে নিজের পাই পয়সাটি পর্যন্ত রাখল কাউন্টারে।

ভ্যান ডার একটু ইতস্তত করে বলল, 'আচ্ছা।' তারপর ঘোঁত ঘোঁত করে যোগ করল, 'একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যাচ্ছিল, না? এ শহর ভর্তি প্রতারক। যার সঙ্গেই ব্যবসা করি না কেন আমাকে একটু সাবধানে থাকতে হয়।'

'তা তো বটেই, স্যার।' সায় দিল জেমি। সে-ও তো উত্তেজনার বশে একটা ভুল করে ফেলছিল। *আমি ভাগ্যবান বলেই আরেকটা সুযোগ পেলাম,* ভাবল ও।

ভ্যান ডার মার্ভি পকেট হাতড়ে ছোট, অসংখ্য ভাঁজ খাওয়া, হাতে আঁকা একটি ম্যাপ বের করল। 'এখানে তুমি mooi klippe-র খোঁজ পাবে। উত্তরের এখানে মাগেরডাম, ভ্যাল নদীর উত্তর তীরে।'

ম্যাপটির দিকে তাকিয়ে জেমির হৃদস্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠল। 'এখান থেকে কতদূর?'

'আমরা সময় দিয়ে নিরুপণ করি দূরত্ব। খচ্চরের পিঠে চেপে গন্তব্যে পৌঁছাতে তোমার চার/পাঁচদিন লাগবে। ফিরতে আরও দেরি হবে। কারণ তখন তো খচ্চরের পিঠে থাকবে হিরের বস্তা।'

হাসল জেমি 'জা।'

ক্লিপড্রিফটের রাস্তায় যখন কদম ফেলল জেমি ম্যাক গ্রেগর, সে আর ট্যুরিস্ট নয়। সে এখন একজন প্রসপেক্টর, সে একজন খননকারী, চলেছে ভাগ্যান্বেষণে। বান্ডা ওর ভ্রমণের সমস্ত উপকরণ বেঁধে দিয়েছে হাড় জিরজিরে এক খচ্চরের পিঠে। খচ্চরটা

দোকানের সামনেই বাঁধা ছিল।

'ধন্যবাদ,' বান্ডার দিকে তাকিয়ে হাসল জেমি।

ঘুরল বান্ডা, জেমির চোখে চোখ রাখল, তারপর নিঃশব্দে চলে গেল। জেমি খচ্চরের রশি খুলে নিয়ে বলল, 'চলরে পার্টনার। এখন mooi klippe-র সময়।'

রাতের বেলা একটি নদীর ধারে ক্যাম্প করল জেমি। খচ্চরের পিঠ থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে ওটাকে পানি আর খাবার খাওয়ালো। নিজে খেল গরুর শুকনো মাংস, শুকনো বকুনি আর কফি। অদ্ভুত সব শব্দে পূর্ণ আফ্রিকার রাত। জেমি শুনতে পেল নদীর ধারে বুনো জন্তুরা পানি খেতে এসেছে। তাদের কোলাহল আর পদশব্দে মুখরিত হয়ে উঠল বিভাবরী। জেমি অরক্ষিত, ওর চারপাশে হেঁটে বেড়াচ্ছে বিশ্বের ভয়াল ভয়ংকর সব জীবজন্তু। ও প্রতিটি শব্দে লাফিয়ে উঠল। কী জানি কখন থাবা বাড়িয়ে এগিয়ে আসে কোন ভয়ানক জন্তু, অথবা ফণা তোলে বিষধর সাপ– অজানা আশংকায় ধড়ফড় করছে বুক। ওর মনে পড়তে লাগল বাড়ির কথা। সে রাতে ওর ভালো ঘুম হলো না। দুঃস্বপ্ন দেখল সিংহ আর হাতির পাল ওকে তাড়া করেছে; দাড়িঅলা, বিরাট একটা লোক ওর কাছ থেকে প্রকাণ্ড একটুকরো হিরে কেড়ে নিতে চাইছে।

পরদিন ভোরে জেমি ঘুম ভেঙ্গে জেগে দেখে মরে গেছে খচ্চর।

চার

নিজের চোখকে বিশ্বাস হতে চাইল না জেমির। খচ্চরের গায়ে ক্ষত খুঁজল সে। রাতে নিশ্চয় কোনো বুনো জন্তুর হামলায় প্রাণ হারিয়েছে ওটা। কিন্তু সে রকম কোনো আলামত চোখে পড়ল না। ঘুমের মধ্যে মারা গেছে বুড়ো খচ্চর। *এজন্য নিশ্চয় আমাকেই দায়ী করবেন মি. ভ্যান ডার?* ভাবছে জেমি। *তবে তার জন্য যখন হিরে নিয়ে যাব, বিষয়টি নিয়ে হয়তো তিনি তেমন উচ্চবাচ্য করবেন না।*

ফেরার উপায় নেই। খচ্চর ছাড়াই ওকে মাগেরডাম যেতে হবে। বাতাসে কীসের শব্দ হতে মুখ তুলে তাকাল জেমি। প্রকাণ্ড আকারের শকুনের দল মাথার ওপরে চক্কর দিচ্ছে। শিউরে উঠল ও। দ্রুত জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল। যেগুলো খুব বেশি দরকারি নয় সেগুলো নিল না। একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো ব্যাকপ্যাকে ভরে যাত্রা শুরু করল জেমি। কয়েক মিনিট পরে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে বিরাটকায় শকুনগুলো মরা জানোয়ারটাকে ঘিরে ধরেছে। শুধু ওটার লম্বা একটা কান ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। কদম দ্রুততর হলো জেমির।

ডিসেম্বর মাস, দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রীষ্মকাল, বিশাল কমলা রঙের সূর্যের নিচে প্রকাণ্ড এ প্রান্তর যেন এক আতংকবিশেষ। ক্লিপড্রিফট থেকে দুলকিচালে যাত্রা শুরু করেছিল জেমি, মনে ছিল ফূর্তি, কিন্তু এখানে মিনিটগুলো পরিণত হলো ঘণ্টায়, ঘণ্টা গড়িয়ে গেল দিনে, তার গতি ক্রমে মন্থর হয়ে এল, বুক ভারী হয়ে আসছে ক্রমশ। যতদূর দৃষ্টি চলে, বৈচিত্র্যহীন প্রান্তর ঝকঝক করছে তপ্ত সূর্যের খররোদে, ধূসর, পাথুরে নির্জন মালভূমির যেন কোনো শেষ নেই।

একটা জলের গর্তের ধারে ক্যাম্প করল জেমি, তাকে ঘিরে থাকা নিশাচর প্রাণীদের ভৌতিক শব্দগুলো সঙ্গী করে ঘুমিয়ে পড়ল। এসব শব্দ, ধ্বনি বা আওয়াজ তাকে আর ভীত করে না। বরং এ শব্দগুলো তাকে জানিয়ে দেয় খাঁ খাঁ এ নরকেও জীবন আছে। আওয়াজগুলো সামান্য হলেও জেমির একাকীত্বের যাতনা লাঘব করে। একদিন সকালে জেমি একপাল সিংহের মুখোমুখি হয়ে গেল। দূর থেকে দেখল সিংহী তার সিংহ আর বাচ্চাদের দিকে হেঁটে যাচ্ছে, মুখে সদ্য শিকার করা একটি বাচ্চা ইমপালা। জানোয়ারটাকে সিংহের সামনে ফেলে দিয়ে সরে এল সিংহী তার সঙ্গীকে খাওয়ার সুযোগ করে দিতে। এক অস্থির সিংহ-শিশু লাফ মেরে সামনে এসে মৃত ইমপালার শরীরে বসিয়ে দিল দাঁত। ভোজনে ব্যাঘাত ঘটায় বেজায় বিরক্ত হলো পশুরাজ। প্রচণ্ড এক থাবড়া বসিয়ে দিল সে সিংহশাবকের মুখে। এক থাপ্পড়েই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল বেচারির। আবার খাওয়ায় মন দিল সিংহ। তার ভোজন শেষ হলে উচ্ছিষ্ট খাদ্য গ্রহণের

অনুমতি পেল পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। জেমি ধীরপায়ে সরে গেল দৃশ্যপট থেকে। হাঁটা ধরল।

কারু পার হতে পুরো দুই সপ্তাহ লাগল ওর। বেশ কয়েকবারই রণেভঙ্গ দেয়ার ইচ্ছে জেগেছিল জেমির। এ যাত্রা আদৌ শেষ হবে কিনা ভেবে সন্দেহ হচ্ছিল।

আমি একটা বোকা। আমার উচিত ছিল ক্লিপড্রিফটে ফিরে গিয়ে মি. ভ্যান ডার মার্ভির কাছে আরেকটি খচ্চর ধার চাওয়া। কিন্তু ভ্যান ডার যদি দিতে রাজি না হন? বাতিল করে দেন চুক্তি? নাহ্, আমি ঠিক কাজটাই করছি।

তাই জেমি তার পদযাত্রা অব্যাহত রাখল। একদিন সে দেখতে পেল দূরে চারজন লোক, আসছে এদিকেই। আমি নিশ্চয় মরিচিকা দেখছি চোখে, ভাবল ও। তবে লোকগুলো কাছিয়ে এলে জেমির হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল। *মানুষ! ওরা সত্যি মানুষ!* কীভাবে কথা বলতে হয় তা-ই বুঝি ভুলে গেছে ও। লোকগুলোকে ডাকল সে। মনে হলো মরা মানুষের গলা দিয়ে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরিয়ে এল। লোকগুলো ওর সামনে এল। এরা প্রসপেক্টর, ফিরছে ক্লিপড্রিফটে। ক্লান্ত এবং পরাজিত।

'হ্যালো,' বলল জেমি।

প্রত্যুত্তরে তারা মাথা ঝাঁকাল। একজন বলল, 'সামনে গেলেও কিছুই পাবে না, খোকা। আমরা খুঁজেছিলাম। তুমি খামোকা সময় নষ্ট করছ। ফিরে যাও।'

চলে গেল তারা।

কোনোকিছু আর ভাবতে চাইছে না জেমি। কিন্তু সামনের প্রাণহীন প্রান্তর চাইলেই অস্বীকার করতে পারছে না। তীব্র সূর্য আর কালো মাছির অসহ্য অত্যাচার থেকে লুকোবার কোনো পথ নেই। আছে কাঁটা গাছ, কিন্তু ওগুলোর ডালপালা ভেঙে ফেলেছে হাতির পাল। ভয়ংকর রোদ প্রায় অন্ধ করে দিয়েছে জেমিকে। ফর্সা চামড়া রোদে পুড়ে কালো, সারাক্ষণ মাথা ঘোরে। যতবার বাতাস গ্রহণ করে বুক, ফুসফুসটা জ্বালা করে ওঠে ভীষণ, যেন বিস্ফোরিত হবে। ও আর হাঁটছে না, খোঁড়াচ্ছে, টলতে টলতে কোথায় যাচ্ছে নিজেও জানে না। একদিন বিকেলে মধ্য দুপুরের সূর্যের হল্কায় পুড়ে যাচ্ছে পিঠ, ব্যাকপ্যাকটা খুলে দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ল জেমি। পা আর টানতে চাইছে না শরীর। বুজে এল চোখ। স্বপ্ন দেখল সে একটা প্রকাণ্ড ধাতু-গলানোর পাতের মধ্যে রয়েছে আর সূর্যটা বিরাট এবং উজ্জ্বল একখণ্ড হিরায় পরিণত হয়ে তার গায়ে তাপ ঢালছে, তাকে গলিয়ে ফেলছে। মাঝরাতে প্রবল শীতে কাঁপতে কাঁপতে জেগে গেল জেমি। কয়েক কামড় বিলটং খেয়ে এক ঢোক তেতো জল পান করল। ও জানে সূর্য ওঠার আগেই ওকে রওনা হতে হবে। তখন বাতাস এবং মাটি থাকবে ঠাণ্ডা। চেষ্টা করল খাড়া হতে, কুলালো না শরীরে। আবার ধপ করে পড়ে গেল। ইচ্ছে করল এখানেই শুয়ে থাকে, আরেকটু ঘুমিয়ে নেবে। কিন্তু ভেতর থেকে কে যেন ওকে সাবধান করে দিল আবার ঘুমিয়ে পড়লে সে নিদ্রার আর জাগরণ ঘটবে না। সেই শকুনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। *না, আমি ওদের খোরাক হব না।* বহু কষ্টে, দাঁতে দাঁত চেপে সিধে হলো

জেমি। ব্যাকপ্যাকটা এমন ভারী ঠেকল, তুলতেই পারল না। ওটাকে টেনে নিয়ে চলল জেমি। কতবার যে বালুতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, আবার খাড়া হয়ে হাঁটা দিয়েছে, মনে করতে পারল না। এক ভোর রাতে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, 'আমি জেমি ম্যাকগ্রেগর। আমি পারবই। আমি বেঁচে রইব। আমার কথা তুমি শুনতে পাচ্ছ, ঈশ্বর? আমি বেঁচে থাকব।'

তোমার কাছে দুটো বিকল্প আছে, মনে মনে নিজেকে বলল জেমি। তুমি এগোতে পার অথবা এখানেই মরতে পারো... মরতে পারো... মরতে পারো...।

শব্দগুলো প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল ওর মস্তিষ্কে। *আরেকটু,* ভাবছে জেমি। *কাম অন, জেমি বয়। আরেক পা ফেলো। তারপর আরেক পা...*

দিন দুই পরে জেমি ম্যাকগ্রেগর পৌঁছে গেল মাগেরডাম গ্রামে। রোদের তাপে সারা গায়ে ফোস্কা পড়ে ঘা হয়ে গেছে, রক্ত গড়াচ্ছে। চোখ এমন ফুলেছে যে ও প্রায় তাকাতেই পারছে না। রাস্তার মাঝখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল জেমি। পরনে শতচ্ছিন্ন কাপড়। ওকে লাগছে একটা ভিখিরির মত। দয়ালু কয়েকজন খননকারী ব্যাকপ্যাক খুলে ওকে একটু আরাম দিতে চাইছিল, জেমি শরীরে অবশিষ্ট যৎসামান্য শক্তি দিয়ে তাদেরকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল, জ্বরের ঘোরে বলতে লাগল, 'না! খবরদার কেউ আমার হিরে ছোঁবে না। চলে যাও সবাই...'

তিনদিন পরে ছোট একটি কক্ষে জ্ঞান ফিরল জেমির। সারা গায়ে ব্যান্ডেজ। চোখ খুলতেই মধ্যবয়সী, বিশাল বক্ষের এক মহিলাকে দেখতে পেল তার খাটিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

'ক-?' গলা দিয়ে ব্যাঙের আওয়াজ বেরিয়ে এল জেমির। কথাটা শেষ করতে পারল না।

'ইজি, ডিয়ার। তুমি অসুস্থ।' মহিলা সযত্নে ওর মাথাটা তুলে ধরে একটা টিনের কাপে জল ভরে খেতে দিল।

কনুইতে ভর দিয়ে কোনোমতে নিজেকে টেনে তুলল জেমি।

'কোথায়-?' ঢোক গিলল ও, আবার চেষ্টা করল। 'আমি কোথায়?'

'তুমি মাগেরডামে। আমি অ্যালিস জারডিন। এটা আমার বোর্ডিং হাউস। তুমি ঠিক হয়ে যাবে। শুধু একটু বিশ্রামের দরকার। এখন শুয়ে পড়ো।'

সেই লোকগুলোর কথা মনে পড়ল জেমির যারা ওর ব্যাকপ্যাক কেড়ে নেয়ার পাঁয়তারা করেছিল। আতংকিত হয়ে উঠল জেমি। 'আমার জিনিসপত্র কোথায়-?' খাটিয়া থেকে উঠে পড়তে যাচ্ছিল সে, মহিলার কথা শুনে বিরত হলো।

'তোমার জিনিসপত্র ঠিক আছে। চিন্তা কোরো না, বেটা।' ঘরের এক কোনে রাখা জেমির ব্যাকপ্যাক হাত তুলে দেখাল সে।

পরিষ্কার সাদা চাদরে আবার শুয়ে পড়ল জেমি। *আমি এখানে পৌঁছেছি। আমি পেরেছি। এখন থেকে সবকিছু ঠিকঠাক মতো চলবে।*

পাঁচ

অ্যালিস জারডিন একটি আশীর্বাদ, শুধু জেমি ম্যাকগ্রেগরের জন্য নয়, মাগেরডামের অর্ধেক মানুষের জন্য। খনির এ শহরে সবার একটাই স্বপ্ন আর অ্যালিস তাদেরকে ভরণপোষণ করে, সেবা করে, সাহস যোগায়। সে ইংরেজ। স্বামীর সঙ্গে এসেছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। লিডসে শিক্ষকতা করত তার স্বামী। হিরে অভিযানে অংশ নিতে ছেড়ে দেয় চাকরি। এ দেশে পৌঁছাবার তিন সপ্তাহ পরে জ্বরে ভুগে মারা যায় অ্যালিসের স্বামী। কিন্তু অ্যালিস সিদ্ধান্ত নেয় সে এখানেই থেকে যাবে। অ্যালিসের নিজের কোনো ছেলেপুলে নেই তবে মাইনাররাই হয়ে ওঠে তার সন্তান।

আরও চারদিন জেমিকে বিছানা ছেড়ে উঠতে দিল না অ্যালিস। তাকে খাবার মুখে তুলে খাওয়াল, বদলে দিল ব্যান্ডেজ, হারানো শক্তি ফিরে পেতে সাহায্য করল। পঞ্চম দিনে শয্যা ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হলো জেমি।

'আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই, মিসেস জারডিন। আপনাকে পয়সাকড়ি কিছুই দিতে পারব না আমি। অন্তত: এ মুহূর্তে নয়। তবে একদিন আপনাকে বড়সড় একখণ্ড হিরে আমি দেব। জেমি ম্যাকগ্রেগর আপনাকে কথা দিচ্ছে।'

সুদর্শন তরুণ ছেলেটির কথা শুনে হাসল অ্যালিস। ছেলেটা কুড়ি পাউন্ড ওজন খুইয়েছে, তার ধূসর চোখে ভোগান্তির দিনগুলোর আতংকের ছাপ এখনও লেগে রয়েছে। তবু তার মধ্যে কী রকম একটা শক্তির স্ফূরণ রয়েছে, আছে প্রতিজ্ঞা পালনের সংকল্প যা সত্যি অতুলনীয়। *এ ছেলে আর সবার থেকে আলাদা,* মনে মনে বলল মিসেস জারডিন।

ধোয়া জামাকাপড় পরে শহর ঘুরতে বেরুল জেমি। এ যেন ক্লিপড্রিফটেরই আরেকটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। একইরকম তাঁবু, ওয়াগন এবং ধুলো ধূসরিত রাস্তাঘাট, জরাজীর্ণ দোকানপাট এবং প্রসপেক্টরদের ভিড়। একটি সেলুনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল জেমি, ভেতরে হট্টগোল শুনে ঢুকল। লাল জামা পরা এক আইরিশকে ঘিরে হৈহল্লা করছে লোকজন।

'ঘটনা কী?' জিজ্ঞেস করল জেমি।

'ও তার টাকা ভেজাবে।'

'কী করবে?'

'ওই লোক আজ বড়লোক বনে গেছে তাই সে সেলুনের সবাইকে মাগনা মদ

খাওয়াবে। যে যত ইচ্ছে মদ খাবে। সব পয়সা আইরিশের।'

একটা গোল টেবিলে বসা কয়েকজন খননকারীর সঙ্গে কথা বলে তাদের মুখে শুধু হতাশার বাণীই উচ্চারিত হতে শুনল জেমি। সকল খননকারীর গল্পই একরকম– মাসের পর মাস হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে, পাথর সরিয়ে, শক্ত মাটি খুঁড়ে প্রতিদিনই সামান্য যে পরিমাণ হিরে পাওয়া যায় তাতে ধনী হওয়া সম্ভব নয়, তবে একজনের স্বপ্নকে তা জিইয়ে রাখে। আশা-নিরাশার দোলাচলে দুলছে এ শহরের অধিবাসীরা। আশাবাদীরা শহরে আসছে, নিরাশাবাদীরা শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

জেমি জানে সে কোন্ দলের সঙ্গে রয়েছে।

লালজামা পরা আইরিশের দিকে এগিয়ে গেল সে। মদ খেয়ে সজল লোকটার চোখ। তাকে ভ্যানডারের ম্যাপ দেখাল জেমি।

লোকটা ম্যাপে একবার চোখ বুলিয়েই ওটা ফিরিয়ে দিল জেমিকে। 'এর কানাকড়িও মূল্য নেই। গোটা এলাকা খোঁড়া হয়েছে। তোমার জায়গায় আমি হলে ব্যাড হোপে একবার চেষ্টা করে দেখতাম।'

কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করল না জেমির। ভ্যান ডার মার্ভির ম্যাপের কারণেই এত কষ্ট করে এতদূরে এসেছে সে বড়লোক হবার আশায়।

আরেকজন ডিগার বলল, 'কোলেসবার্গে চেষ্টা করে দেখতে পারো। ওরা ওখানে হিরে পেয়েছে, খোকা।'

'গিলফিলানস কপ– ওই জায়গাটাও মন্দ নয়।'

'আমার মত চাইলে বলব মুনলাইট রাশে একবার যাও।'

সে রাতে, সাপারের সময় অ্যালিস মারভিন বলল, 'জেমি, একটি জায়গা আরেকটির চেয়ে বড় জুয়োর ক্ষেত্র। তুমি বরং নিজের মতো একটা জায়গা খুঁজে নাও, সেখানে খোঁড়াখুড়ি শুরু করো এবং প্রার্থনা করো। অন্যান্য এক্সপার্টরা তা-ই করেন।'

কী করবে, নিজের সঙ্গে এ বিতর্কে নিদ্রাহীন একটি রাত কাটল জেমির। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিল ভ্যান ডারের ম্যাপের কথা ভুলে যাবে। পুবে যাবে ও, মডার নদীর ধারে। পরদিন সকালে মিসেস জারডিনকে বিদায় জানিয়ে যাত্রা শুরু করল জেমি।

সে টানা তিনদিন দুই রাত হেঁটে গন্তব্যে পৌছাল। খাটাল ছোট তাঁবুখানা। নদীর দুই ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর। গাছের মোটা ডাল লিভারের মতো ব্যবহার করে বোল্ডারগুলোতে চাড় দিয়ে সরিয়ে ফেলল জেমি। বোল্ডারের নিচ থেকে বেরিয়ে পড়ল নুড়ি পাথর।

সে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাটি খুঁড়ে চলল। খুঁজছে হলুদ কাদা অথবা নীলচে মাটি। এগুলোর সন্ধান পেলেই বোঝা যাবে এখানে হিরে আছে। কিন্তু পতিত জমিতে এরকম মাটি মিলল না। এক সপ্তাহ ধরে খুঁড়েও প্রত্যাশিত একটি পাথর পেল না জেমি। সপ্তাহ শেষে সে

আরেক জায়গায় চলে গেল।

জেমি উত্তরমুখো হয়ে চলতে লাগল। নদীর তীর ঘেঁসে চলেছে সে যেখানে হিরে পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। যতক্ষণ না হাতদুটো অসার হয়ে গেল মাটি খুঁড়ে চলল সে। সন্ধ্যার পরে মাতালের মতো ঘুমিয়ে পড়ল।

দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ দিকে নদীর মোহনা ধরে আবার হাঁটা দিল জেমি। পারডসপান নামে একটি ছোট সেটলমেন্টের কাছে এসে থামল। একটা নদীর বাঁকের ধারে বসে কার্বোনাটজি, আর গরম চা খেল। তারপর তাঁবুর সামনে বসে তারকাখচিত বিরাট আকাশের দিকে তাকাল। গত দুই সপ্তাহে একটি মানুষও তার চোখে পড়েনি। ভীষণ একাকীত্ব গ্রাস করেছে তাকে।

এখানে বসে বসে কী করছি আমি? ভাবছে জেমি। বুনো একটা এলাকার মাঝখানে নির্বোধের মতো বসে আছি, পাথর ভেঙে আর ময়লা খুঁড়ে হত্যা করছি নিজেকে। এরচেয়ে নিজেদের খামার বাড়িতে তো অনেক ভালো ছিলাম। আমি বরং বাড়িতেই চলে যাব। যদি কোনো হিরের খোঁজ না পাই আগামী শনিবার আমি ঠিক বাড়ি রওনা হব। ওর দিকে ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে থাকা নক্ষত্ররাজির দিকে তাকিয়ে চিৎকার দিল জেমি, 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তোমরা?' ওহ্ যিশাস, ভাবছে জেমি। আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাচ্ছি।

জেমি ওখানে বসে অলসভাবে বালু খুঁড়ছিল নখ দিয়ে। একটা বড় পাথর দেখে ওটাকে তুলে ছুড়ে ফেলল। গত কয়েক সপ্তাহে এরকম ফালতু পাথর হাজার হাজার দেখেছে সে। ভ্যান ডার মার্ভি যেন পাথরগুলোকে কী বলে? *Schlentess.* তবে এ পাথরটার মধ্যে কী যেন একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার রয়েছে। জেমি উঠে দাঁড়াল। পাথরটির কাছে গিয়ে তুলে নিল। অন্যান্য পাথরের চেয়ে এটি আকারে বড় এবং আকৃতিও কেমন অদ্ভুত। ওটার গায়ে লেগে থাকা ধুলো ময়লা ট্রাউজারে ঘষে পরিষ্কার করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল জেমি। হিরের মতো লাগছে যেন। তবে সন্দেহ জাগছে এর আকারের জন্য। মুরগির ডিমের মতোই বড় পাথরটা। ওহ্, গড! এতো সত্যি হিরে। হঠাৎ নি:শ্বাস বন্ধ হয়ে এল জেমির। সে লণ্ঠন নিয়ে আশপাশের জমির পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। পনেরো মিনিটের মধ্যে এরকম আরও চারটে পাথর পেয়ে গেল। তবে প্রথমটির মতো অতো বড় নয় বাকিগুলো। তবে দেখে তীব্র আনন্দিত হবার মতো আকার সবক'টার।

ভোর হওয়ার আগ আগে কাজে নেমে পড়ল জেমি, দুপুর নাগাদ আরও আধ ডজন হিরে পেয়ে গেল। পরবর্তী এক সপ্তাহ সে হিরের জন্য অনবরত মাটি খুঁড়ে চলল। রাতের বেলা নিরাপদ একটি জায়গায় কবর দিয়ে রাখল হিরেগুলো যাতে কারও নজরে না পড়ে। প্রতিদিনই নতুন নতুন হিরের সন্ধান পাচ্ছে জেমি, তার সম্পদের স্তূপ ক্রমে উঁচু হয়ে উঠছে। ওদিকে তাকালে দারুণ আনন্দে লাফাতে ইচ্ছে করে ওর। এ সম্পদের

মাত্র অর্ধেকের মালিক যদিও সে, তবে ওই হিরে বিক্রি করে যে পরিমাণ টাকা পাবে জেমি, রীতিমতো বড়লোক হয়ে যাবে। এত বড়লোক হবার স্বপ্নও সে দেখেনি।

সপ্তাহ শেষে জেমি ম্যাপে জায়গাটি চিহ্নিত করে রাখল এবং গাঁইতি দিয়ে চারপাশে সীমানা রেখা টেনে দিল। এখন থেকে এ জায়গার মালিক সে। মাটির নিচে লুকিয়ে রাখা ধনসম্পদ বের করে ব্যাকপ্যাকে সাবধানে ভরল জেমি। তারপর রওনা হলো মাগেরডামের উদ্দেশে।

ছোটখাট ভবনটির সামনে সাইনবোর্ডে লেখা DIAMONT Kooper.

জেমি অফিসে ঢুকল। ছোট্ট গুমোট একটি ঘর। ঘরটিতে ঢুকতেই অনিশ্চিত একটা অনুভূতি আচ্ছন্ন করল ওকে। ও বহু প্রসপেক্টরের গল্প শুনেছে যারা হিরে ভেবে যেসব স্টোন নিয়ে এসেছে পরে দেখা গেছে তা স্রেফ নুড়িপাথর। *আমার ধারণাও যদি ভুল হয়ে থাকে? যদি আমি–?*

যে লোকটি হিরে পরীক্ষা করে দেখে সে ক্ষুদ্র অফিস কক্ষটিতে একটি জীর্ণ ডেস্কে বসে আছে। 'তোমার জন্য কিছু করতে পারি?'

বুক ভরে দম নিল জেমি। 'জী, স্যার। আমি এ হিরেগুলো একটু পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

হিরে পরীক্ষকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে জেমি পাথরগুলো রাখল টেবিলে। মোট সাতাশটি পাথর। হিরে পরীক্ষক বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পাথরগুলোর দিকে।

'কোথায়– এগুলো তুমি পেলে কোথায়?'

'আগে বলুন এগুলো সত্যি হিরে কিনা।'

সবচেয়ে বড় পাথরটি তুলে নিয়ে জুয়েলারের আতশ কাচ দিয়ে পরীক্ষা করল লোকটি। 'মাই গড!' বলল সে। 'এতবড় হিরে আমি জন্মে দেখি নাই!' জেমি বুঝতে পারল সে নিঃশ্বাস আটকে রেখেছে। নইলে নির্ঘাত চিৎকার করে উঠত আনন্দে।

'কোথায়–' কাতর গলায় বলল হিরে পরীক্ষক। 'কোত্থেকে এগুলো এনেছ তুমি?'

'পনেরো মিনিট পরে আমার সঙ্গে ক্যান্টিনে দেখা করুন,' হেসে বলল জেমি। 'তখন বলব।'

হিরেগুলো গুছিয়ে নিয়ে পকেটে ভরল ও, বেরিয়ে এল। দুই কদম পরেই রেজিস্ট্রেশন অফিস। 'আমি আমার একটি দাবি রেজিস্ট্রি করতে চাই,' বলল সে। 'সলোমন ভ্যান ডার মার্ভি এবং জেমি ম্যাকগ্রেগরের নামে।'

সে ওই দরজা দিয়ে ঢুকেছিল কপর্দকহীন অবস্থায়, আর বেরুল কোটিপতি হয়ে।

জেমি ম্যাকগ্রেগর ক্যান্টিনে ঢুকে দেখল হিরে নিরীক্ষক অপেক্ষা করছে তার জন্য। সে নির্ঘাৎ খবরটা ছড়িয়েছে কারণ জেমি ঘরে ঢুকতেই সম্ভ্রমপূর্ণ গুঞ্জনে ভরে গেল ঘর। সবার মনে না বলা একটি প্রশ্ন। জেমি বার-এ গিয়ে বারটেন্ডারকে বলল, 'আমি এখানে আমার টাকা ভেজাতে এসেছি।' ঘুরল সে, জনতার উদ্দেশে বলল, 'পারডসপান।'

অ্যালিস জারডিন চা পান করছিল, এমন সময় জেমি ঢুকল রান্নাঘরে। ওকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মহিলার চেহারা। 'জেমি! ওহ্, থ্যাংক গড, তুমি ঠিকঠাক বাড়ি ফিরেছ!' রোদে পোড়া চেহারাটা লক্ষ করে একটু যেন দমে গেল সে। 'খুব ভালো যায়নি বোধহয় সময়, না? ও নিয়ে মন খারাপ কোরো না। এসো, আমার সঙ্গে চা খাবে। শরীর-মন দুটোই চাঙ্গা লাগবে।'

কোনো কথা না বলে পকেট থেকে একটি বৃহদাকারের হিরে বের করল জেমি। মিসেস জারডিনের হাতে দিল।

'আমি আমার কথা রাখলাম,' বলল ও।

অনেকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে মহামূল্যবান রত্নখণ্ডটির দিকে তাকিয়ে রইল মিসেস জারডিন, ভিজে উঠল তার নীল চোখ। 'না, জেমি, না।' তার গলার স্বর ভীষণ নরম। 'আমার এটার দরকার নেই।' তুমি বুঝতে পারছ না, খোকা? এ সবকিছু নষ্ট করে দেবে...

বেশ জাঁকজমক করে ক্লিপড্রিফটে ফিরল জেমি ম্যাকগ্রেগর। একটি ছোট হিরে বিক্রি করে একটি ঘোড়া এবং ক্যারিজ কিনল, কোথায় কত টাকা খরচ করছে তা লিখে রাখল একটি কাগজে যাতে তার পার্টনার না ভাবে যে তাকে ঠকানো হয়েছে। ক্লিপড্রিফটে ফিরতি ভ্রমণ হলো সহজ এবং আরামদায়ক। জেমি ভাবছিল এই একই যাত্রায় তাকে কত না নরক যন্ত্রণা সইতে হয়েছে। সে ভাবছিল ধনী আর গরীবের মধ্যে এটাই পার্থক্য। গরীবরা হেঁটে যায় আর ধনীরা ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে যায়।

ঘোড়ার পিঠে হালকা চাবুক বসাল জেমি, সন্তুষ্টচিত্তে চলল আঁধারে ঢাকা প্রান্তর ধরে।

ছয়

ক্লিপড্রিফট বদলায়নি কিন্তু বদলে গেছে জেমি ম্যাকগ্রেগর। শহরের রাস্তা দিয়ে সে যখন ঘোড়ার গাড়ি ছুটিয়ে আসছিল সবাই তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। সে এসে থামল ভ্যান ডার মার্ভির মুদি দোকানের সামনে। দামী ঘোড়া আর গাড়ি নয়, পথচারীদের নজর কেড়েছে তরুণ ছেলেটির হর্ষোৎফুল্লতা। যেসব প্রসপেক্টর ধনী হয়েছে তাদের মাঝেও এরকম আনন্দছটা আগেও লক্ষ্য করেছে তারা। আর এ উল্লাস বাকিদের মাঝে তৈরি করে আশা। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামছে জেমি।

সেই বিশালদেহী কালো মানুষটিকে আবার চোখে পড়ল ওর। ও হেসে বলল, 'হ্যালো! আমি ফিরে এসেছি।'

বান্ডা কিছু না বলে ঘোড়ার লাগাম হিচিং পয়েন্টে বেঁধে নিয়ে দোকানের ভেতরে চলে গেল। তার পিছু নিল জেমি।

সলোমন ভ্যান ডার মার্ভি একজন খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলছিল। বেঁটে ডাচ ম্যানটি জেমিকে দেখে হাসল। জেমি বুঝতে পারছে যেভাবেই হোক ওর আগমন সংবাদ ভ্যান ডার জেনে ফেলেছে আগেই। ব্যাখ্যাটা কী জানে না কেউ, তবে হিরে পাবার খবর গোটা মহাদেশে ছড়িয়ে যায় আলোর গতিতে।

খদ্দেরকে বিদায় করে দিয়ে ভ্যান ডার দোকানের পেছনের দিকে ইঙ্গিত করল। 'এসো মি. ম্যাকগ্রেগর।'

জেমি লোকটির পেছন পেছন গেল। ভ্যান ডারের মেয়েকে দেখল চুল্লির সামনে লাঞ্চ তৈরি করছে। 'হ্যালো, মার্গারেট।'

লজ্জা পেয়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল মেয়েটি।

'তো! শুনলাম তুমি সুসংবাদ নিয়ে এসেছ,' হাসিমুখে বলল ভ্যান ডার মার্ভি। টেবিলে বসে প্লেট আর তৈজসপত্র ঠেলে সরিয়ে জেমির জন্য বসবার জায়গা করে দিল।

'ঠিকই শুনেছেন, স্যার,' গর্বিত স্বরে জবাব দিল জেমি। জ্যাকেটের পকেট থেকে চামড়ার একটি বটুয়া বের করে কিচেন টেবিলের ওপর ঢেলে দিল হিরে। সম্মোহিতের মতো ওদিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল ভ্যান ডার মার্ভি। তারপর একটা একটা করে ধীরগতিতে তুলে নিল হিরে। গন্ধ শুঁকল। সবশেষে তুলল সবচেয়ে বড় হিরকখণ্ডটি। তারপর সবগুলো হিরে জড়ো করে ছাগলের চামড়ার একটি থলেতে পুরে ঘরের কিনারের

বড় একটি লোহার সিন্দুকে ওগুলো রেখে দিয়ে তালা মারল।

যখন কথা বলল সে, গলার স্বরে গভীর তৃপ্তি। 'তুমি খুব ভালো কাজ দেখিয়েছ, মি. ম্যাকগ্রেগর। 'খুবই ভালো।'

'ধন্যবাদ, স্যার। এতো মাত্র শুরু। ওখানে আরও শত শত আছে। সবমিলে কত দাম হবে কল্পনাও করতে পারছি না।'

'তুমি ঠিকঠাক মতো ক্লেইম করেছ তো?'

'জ্বী, স্যার।' পকেট থেকে রেজিস্ট্রেশনের রশিদটা বের করল জেমি।

'আমাদের দু'জনের নামে রেজিস্ট্রি করেছি।'

রশিদে চোখ বুলিয়ে নিজের পকেটে রেখে দিল ভ্যান ডার।

'তোমার একটা বোনাস পাওনা হয়েছে। একটু দাঁড়াও।' সে দোকান সংলগ্ন দরজায় পা বাড়াল। 'আমার সঙ্গে এসো, মার্গারেট।'

ভীত ভঙ্গিতে বাপকে অনুসরণ করল মেয়ে। জেমি ভাবল *মেয়েটি দেখছি মুরগি ছানার মতো ভয়ে আধমরা হয়ে আছে।*

একটু পরেই ফিরে এল ভ্যান ডার মার্ভি। একা। 'এই নাও তোমার টাকা।' সে পার্স খুলে পঞ্চাশ পাউন্ড বের করে গুনল।

জেমি বিস্মিত গলায় জানতে চাইল, 'এটা কী, স্যার?'

'তোমার টাকা।'

'ঠি-ঠিক বুঝলাম না।'

'তুমি চব্বিশ সপ্তাহ কাজ করেছ। প্রতি সপ্তাহে দুই পাউন্ড করে তোমার পারিশ্রমিক হিসেবে পাওনা হয়েছে মোট আটচল্লিশ পাউন্ড। তবে বোনাস হিসেবে তোমাকে অতিরিক্ত দুই পাউন্ড দিচ্ছি।'

হেসে উঠল জেমি। 'আমার বোনাসের দরকার নেই। আমার তো হিরের ভাগ আছেই।'

'তোমার হিরের ভাগ?'

'জ্বী, স্যার। আমার ফিফটি পার্সেন্ট। আমরা তো পার্টনার।'

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে ভ্যান ডার। 'পার্টনার? তোমাকে কে বলল আমরা পার্টনার?'

হতভম্ব হয়ে গেল জেমি। 'কেন, আমাদের মধ্যে তো চুক্তি হয়েছে।'

'তা হয়েছে বটে। কিন্তু তুমি কি চুক্তিপত্রটি পড়েছ?'

'জ্বী, না, স্যার। ওটা তো আফ্রিকান ভাষায় লেখা। আপনি বলেছিলেন আমরা ফিফটি-ফিফটি পার্টনার।'

মাথা নাড়ল বুড়ো। 'তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ, মি. ম্যাকগ্রেগর। আমি কোন পার্টনার নিয়ে কাজ করি না। আমার কোনো পার্টনারের প্রয়োজন হয় না। তুমি আমার জন্য কাজ করছিলে। আমি তোমাকে জিনিসপত্র দিয়ে আমার জন্য হিরে খুঁজতে

পাঠিয়েছিলাম।'

জেমি টের পেল প্রচণ্ড একটা ক্রোধ ওকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে। 'আপনি আমাকে মাগনা কিছু দেন নি। ওই জিনিসপত্রের জন্য আমি আপনাকে একশো কুড়ি পাউন্ড দিয়েছি।'

কাঁধ ঝাঁকাল বৃদ্ধ। 'তর্ক করে আমি আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চাই না। আমি তোমাকে আরও পাঁচ পাউন্ড দিচ্ছি। টাকাটা নিয়ে কেটে পড়ো।'

বিস্ফোরিত হলো জেমি। 'আমি কোথাও কেটে পড়ছি না। আমি আমার ভাগের অর্ধেক হিরে চাই। এবং আমি তা আদায় করে ছাড়ব। আমি আমাদের দু'জনের নামে দাবি রেজিস্ট্রি করেছি।'

হাসল ভ্যান ডার মার্ভি। 'তাহলে তো তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করতে চেয়েছ। এজন্য তোমাকে আমি পুলিশে দিতে পারি।'

সে জেমির হাতে গুঁজে দিল টাকাগুলো। 'তোমার মজুরী নাও এবং ভাগো।'

'আমি আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করব।'

'আইনজীবী ভাড়া করার সামর্থ আছে তোমার? এ শহরের সমস্ত আইনজীবী আমার পকেটে থাকে, খোকা।'

এসব আমার জীবনে ঘটছে না, ভাবছে জেমি। *আমি আসলে দুঃস্বপ্ন দেখছি।* যে ভয়ানক কষ্ট ওকে করতে হয়েছে, উত্তপ্ত মরুভূমিতে কাটানো সেই সপ্তাহ আর মাসগুলো, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ভয়াবহ পরিশ্রমের সমস্ত স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে। প্রায় মারা যেতে বসেছিল ও আর এখন এ লোকটা কিনা ওর ন্যায্য হিস্যা থেকে ওকে বঞ্চিত করতে চায়।

সে ভ্যান ডার মার্ভির চোখে চোখ রাখল। 'আমি আপনাকে ছাড়ব না। আমি ক্লিপড্রিফট ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না। আপনি আমার সঙ্গে কী আচরণ করেছেন তা বলে দেব সবাইকে। আমি আমার হিরের ভাগ চাই।'

ধূসর চোখের অগ্নিদৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে মুখ ঘুরিয়ে নিল ভ্যান ডার মার্ভি। 'তুমি বরং একজন ডাক্তার দেখাও, খোকা।' বিড়বিড় করল সে। 'রোদের তাপে তোমার মাথায় গোলমাল হয়ে গেছে।'

লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জেমি। এক ঝটকায় তাকে তুলে ফেলল শূন্যে। 'আমার সঙ্গে প্রতারণা করার জন্য আপনাকে চরমভাবে ভুগতে হবে।' সে ছেড়ে দিল বুড়োকে। মেঝেতে পড়ে গেল ভ্যান ডার। জেমি টেবিলের ওপর টাকাগুলো ছুড়ে ফেলে দিয়ে ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল।

সানডোনার সেলুনে ঢুকে জেমি দেখল বার প্রায় ফাঁকা। বেশিরভাগ লোকজন চলে গেছে পারডসপানে, হিরের খোঁজে। রাগ এবং হতাশায় অস্থির জেমি। *এ অবিশ্বাস্য,* ভাবছিল সে। *এক মিনিট আগেও আমি ছিলাম ক্রোসিয়াসের মতো ধনী আর পরের*

মিনিটেই বনে গেলাম পথের ভিখিরী। ভ্যান ডার মার্ভি একটা চোর। ওকে শাস্তি দিতেই হবে। কিন্তু কীভাবে? ভ্যান ডার ঠিক কথাই বলেছে। উকিল ভাড়া করার ক্ষমতা জেমি ম্যাকগ্রেগরের নেই। এ লোক শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি। জেমির অস্ত্র বলতে রয়েছে শুধু সত্যকহন। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিটি মানুষকে সে জানিয়ে দেবে ভ্যান ডার একটা প্রতারক।

ওকে দেখে স্বাগত জানাল বারটেন্ডার স্মিট। 'ওয়েলকাম ব্যাক। ঘরে সবকিছুই আছে, মি. ম্যাকগ্রেগর। কী চাই আপনার বলুন?'

'হুইস্কি।'

স্মিট একটা ডাবল ঢালল গ্লাসে, রাখল জেমির সামনে। জেমি এক ঢোকে খালি করে ফেলল গ্লাস। মদ খেতে অভ্যস্ত নয় সে। কড়া পানীয়টা তার গলা এবং পেট জ্বালিয়ে দিল।

'আরেকটা দাও।'

'দিচ্ছি। আমি সবসময় বলি মদ খেতে পারে বটে স্কটরা। অন্য সবাই তাদের কাছে ফেল।'

দ্বিতীয় ড্রিংকটা গিলতে তেমন কসরত করতে হলো না। জেমির মনে পড়ল এই বারটেন্ডার এক ডিগারকে বলেছিল সাহায্যের প্রয়োজন হলে ভ্যান ডার মার্ভির কাছে যেতে।

'তুমি কি জানো বুড়ো ভ্যান ডার মার্ভি একটা প্রতারক? সে প্রতারণা করে আমাকে আমার হিরের ভাগ দিতে চাইছে না।'

সহানুভূতি দেখাল স্মিট। 'সেকী! এতো খুবই খারাপ কথা। শুনে খুব কষ্ট পেলাম।'

'তবে আমার কবল থেকে সে রক্ষা পাবে না,' ঈষৎ জড়িয়ে গেছে জেমির কণ্ঠ। 'ওই হিরের অর্ধেকের মালিক আমি। ও একটি চোর। আমি সবাইকে ওর অপকর্মের কথা বলে দেব।'

'সাবধান! ভ্যান ডার মার্ভি কিন্তু এ শহরের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি।' ওকে সতর্ক করে দিল বারটেন্ডার। ওই লোকের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে আপনার সাহায্যের দরকার হবে। তবে আপনাকে সাহায্য করতে পারবে এরকম একজনকে অবশ্য আমি চিনি। সে ভ্যান ডার মার্ভিকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না।' এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল বারটেন্ডার যে কেউ তাদের কথা শুনছে না। 'রাস্তার মাথায় একটা পুরানো গোলাঘর আছে। আমি সব ব্যবস্থা করে রাখবো। আপনি আজ রাত দশটার সময় ওখানে চলে আসুন।'

'ধন্যবাদ,' কৃতজ্ঞচিত্তে বলল জেমি। 'তোমার এ উপকারের কথা আমি ভুলব না।'

'রাত দশটা। পুরানো গোলাবাড়ি।'

শহরের শেষ প্রান্তে, মূল রাস্তা থেকে দূরে পুরানো গোলাবাড়িটি। ঢেউ খেলানো

টিনের তৈরি একটা ঘর। রাত দশটার সময় ওখানে এসে হাজির হলো জেমি। ভেতরটা অন্ধকার। সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। কাউকে দেখতে পাচ্ছে না জেমি। ঘরে ঢুকল ও। 'হ্যালো...'

কোনো সাড়া নেই। মন্থর গতিতে আগে বাড়ল জেমি। আস্তাবলে কয়েকটা ঘোড়ার আবছা আকৃতি চোখে পড়ছে। একটা শব্দ হলো ওর পেছনে, ঘুরতে যাচ্ছে, ওর শোল্ডার ব্লেডে ধাঁই করে বাড়ি মারল লোহার ডান্ডা, মাটিতে ছিটকে পড়ে গেল। মাথার ওপর আছড়ে পড়ল একটা মুগুর, দানবীয় একটা হাত ওকে খাড়া করল, ধরে থাকল, সেই ফাঁকে দমাদম লাথি আর ঘুসি ওকে ভর্তা করে দিতে লাগল। এ মারের যেন শেষ নেই। ব্যথা সইতে না পেরে জ্ঞান হারাল জেমি। মুখে ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে ফিরিয়ে আনা হলো ওর চেতনা। পিটপিট করে চোখ মেলল জেমি। মনে হলো এক ঝলক সে দেখতে পেয়েছে ভ্যান ডার মার্ভির ভৃত্য বান্ডাকে। আবার শুরু হলো মার। সেকী মার! ঘুষির চোটে পাঁজরের হাড় ভেঙে গেল জেমির, পায়ের হাড় ভাঙার পরিষ্কার শব্দ শুনতে পেল সে। তারপর আবার অচেতন হয়ে পড়ল জেমি।

জেমির শরীরে যেন আগুন জ্বলছে। কেউ শিরিষ কাগজ ঘসছে মুখে, হাত তুলে বাধা দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করল ও। চোখ মেলে তাকানোর চেষ্টা করল। পারল না। চোখ ফুলে ঢোল। মাটিতে পড়ে রইল জেমি, শরীরের প্রতিটি কোষ আর্তনাদ ছাড়ছে ব্যথায়। মনে করার চেষ্টা করল কোথায় আছে সে। পাশ ফিরে শুলো জেমি। আবার শিরিষ কাগজের ঘষা খেল মুখে। আগের মতো হাত বাড়াতে বালুর স্পর্শ পেল। ক্ষতবিক্ষত মুখখানা উত্তপ্ত বালুতে ঠেকে রয়েছে। ধীরে, ধীরে প্রতিটি নড়াচড়ায় ভয়াবহ ব্যথা অগ্রাহ্য করে সে হাঁটু গেড়ে বসল। ফোলা চোখের ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু সবকিছুই ঝাপসা। কারুর কোথাও ওকে ফেলে রাখা হয়েছে। নগ্ন। ভোর হচ্ছে তবে এখনই তপ্ত সূর্যের আগুন রশ্মি শরীরে টের পাচ্ছে জেমি। অন্ধের মতো খাবার কিংবা জলের ক্যান খুঁজল ও। হাতে ঠেকল না কিছুই। ওরা ওকে এখানে মরবার জন্য ফেলে রেখে গেছে। সলোমন ভ্যান ডার মার্ভি এবং অবশ্যই সেই বারটেন্ডার স্মিট। ভ্যান ডারকে হুমকি দিয়েছিল জেমি আর ভ্যান ডার তাকে ছোট শিশুর মতো শাস্তি দিয়েছে। *তবে আমি যে ছোট শিশু নই তা ও টের পাবে,* মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল জেমি। *যথেষ্ট হয়েছে। এবারে আমার প্রতিশোধ নেয়ার পালা। ওদেরকে কর্মফল ভোগ করতে হবে। করতেই হবে।*

তীব্র ঘৃণা শক্তি জোগাল জেমিকে। উঠে বসল। শ্বাস করাটা নির্যাতনের সামিল মনে হচ্ছে। ওরা কয়টা পাঁজর ভেঙেছে কে জানে? ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত না হলেই হলো। সিধে হবার চেষ্টা করল জেমি কিন্তু চিৎকার করে পড়ে গেল। ওর ডান পাখানা ভেঙে ফেলেছে, কেমন বাঁকা হয়ে আছে। আর হাঁটতে পারবে না জেমি।

কিন্তু হামাগুড়ি তো দিতে পারবে।

ঠিক কোথায় আছে কোনো ধারণাই নেই জেমি ম্যাকগ্রেগরের। লোকে যেসব ট্রাকে চলাফেরা করে সেসব জায়গা থেকে নিশ্চয় দূরে কোথাও ওকে ফেলে রাখা হয়েছে যাতে হায়েনা আর শকুন ছাড়া আর কেউ ওর খোঁজ না পায়।

মরুভূমি যেন গরম, প্রকাণ্ড একটি চুল্লি। সে মরুভূমিতে মানুষের কংকাল দেখেছে। সেসব কংকালের গায়ে একফোঁটা মাংস ছিল না। সব খেয়ে শেষ করেছে স্ক্যাভেঞ্জারের দল। জেমি এসব কথা ভাবছে, মাথার ওপর ডানা ঝটপটানোর শব্দ ভেসে এল, সে সঙ্গে শকুনের তীক্ষ্ণ চিৎকার। প্রবল আতংক গ্রাস করল ওকে। ও অন্ধ হয়ে গেছে। শকুনগুলোকে দেখতে পাচ্ছে না। তবে ওদের উপস্থিতি এবং গায়ের গন্ধ টের পাচ্ছে।

হামাগুড়ি দিতে শুরু করল জেমি।

ব্যথায় আগুন ধরে গেছে গায়ে। প্রতিটি নড়াচড়ায় তীব্র ব্যথার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে গোটা অঙ্গজুড়ে। হাঁটতে পারছে না ভাঙা পায়ের জন্য, এক পায়ের ভার অন্য পায়ে চাপাতে গেলে ভাঙা পাঁজরে ঠোকাঠুকি হচ্ছে। শুয়ে থাকলেও ব্যথা কমছে না; আবার ব্যথার ভয়ে দাঁড়াতেও পারছে না।

ও হামাগুড়ি দিয়ে চলল।

জেমি শুনতে পাচ্ছে মাথার ওপরে চক্কর দিচ্ছে শকুনের পাল, বিপুল ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করছে। জেমি কল্পনায় দেখল অ্যাবারডিনের বাড়িতে এসেছে, পরনে পরিচ্ছন্ন সানডে সুট। বসে আছে তার দুই ভাইয়ের মাঝখানে। আর বোন মেরী এবং অ্যানি কর্ড সাদা সামার ড্রেসে সেজেছে। অ্যানি তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। জেমি আসন ছেড়ে তার কাছে যেতে চাইল কিন্তু ওর দুই ভাই ওকে জাপটে ধরে থাকল, চিমটি দিতে লাগল। চিমটির খুব ব্যথা পাচ্ছে জেমি। ওর চমক ভাঙল। সেই মরুভূমিতে নিজেকে আবার আবিষ্কার করল। নগ্ন, ভগ্ন দেহ। শকুনদের চিৎকার চেঁচামেচি আগের চেয়ে জোরালো। তারা ক্রমে অধৈর্য হয়ে উঠছে।

জেমি জোর করে চোখ মেলল। দেখবে পাখিগুলো কোথায়। কিন্তু ঝাপসা, ঝিকিমিকি ছাড়া কিছু দেখতে পেল না। ভেবে ভয় পেল জেমি ওগুলো হয়তো হায়েনা আর শেয়াল। বাতাস বয়ে আনল তাদের বিকট গায়ের গন্ধ। গরম হল্কা ঝাপটা মারল মুখে।

হামাগুড়ি দিয়েই চলেছে জেমি। জানে যে মুহূর্তে থামবে, ওর ওপর হামলে পড়বে শকুনের দল। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গা, তপ্ত বালুতে ভাজাভাজা হয়ে যাচ্ছে শরীর। তবু হাল ছাড়বে না জেমি, অন্ততঃ ভ্যান ডার মার্ভিকে শাস্তি না দেয়া পর্যন্ত– যতদিন বেঁচে আছে ওই লোকটা, জেমিকেও টিকে থাকতে হবে।

সময়ের হিসেব গুলিয়ে ফেলেছে জেমি। মনে হচ্ছে মাইলখানেক রাস্তা হামাগুড়ি দিয়ে পার হয়েছে। আসলে দশ গজও এগোতে পারেনি সে। ঘুরপাক খাচ্ছে একই জায়গায়। ও কোথায় আছে কিংবা যাচ্ছে কোথায় কিছুই মালুম করতে পারছে না। তার

সমস্ত মন একজনের ওপর কেন্দ্রীভূত– সলোমান ভ্যান ডার মার্ভি।

অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল জেমি, জেগে উঠল তীব্র ব্যথা নিয়ে। কেউ ওর পায়ে ছুরি মারছে। এক সেকেন্ড সময় লাগল জেমির বুঝতে ও কোথায় আছে এবং কী ঘটছে। একটা ফোলা চোখ বহু কষ্টে মেলল জেমি। প্রকাণ্ড একটা শকুন হামলা চালিয়েছে ওর পায়ে, ধারালো ঠোঁটে ছিড়ে খাচ্ছে মাংস। ওটার কুতকুতে চোখ আর ঘাড়ের নোংরা পালকের বেষ্টনি দেখতে পাচ্ছে জেমি। পাখিটা ওর গায়ে বসেছে। ওটার শরীর থেকে বিশ্রী বোটকা গন্ধ আসছে। চিৎকার দিতে চাইল জেমি। গলা দিয়ে স্বরই বেরুল না। উন্মাদের মতো সামনে টেনে নিয়ে চলল। টের পাচ্ছে পা দিয়ে গরম রক্ত ঝরছে। তাকে ঘিরে থাকা দানব পাখিগুলোর ছায়া দেখছে জেমি। এগিয়ে আসছে ওরা ওকে হত্যা করার জন্য। জেমি জানে আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেললে সেটাই হবে ওর জীবনের শেষ। যে-ই মুহূর্তে ও চলার বিরতি দেবে, মাংসখেকো পাখিগুলো ওর মাংসে মুখ বাড়াবে। ও হামাগুড়ি দিয়ে চলতে থাকল। জ্বরের ঘোরে চিত্ত-বৈকল্য ঘটছে ওর। শুনছে পাখিগুলো ডানা ঝাপটে চলে আসছে ওর কাছে, বৃত্তাকারে ঘিরে ধরেছে। ওদেরকে বাধা দেয়ার শক্তিও নেই জেমির, লড়াই করার শক্তি নিঃশেষ। চলায় বিরতি দিল সে, উত্তপ্ত বালুর ওপর স্থির হয়ে শুয়ে থাকল।

দানব পাখির দল এগিয়ে গেল তাদের ভোজ খেতে।

সাত

শনিবারে বাজারহাট বসে কেপটাউন শহরে। বিক্রেতাদের হাঁকডাকে সরগরম থাকে রাস্তাঘাট। দোকানীরা বসে, লোকজন কেনাকাটা করতে আসে, আসে বন্ধু কিংবা প্রণয়ীদের সঙ্গে মিলিত হতে। ব্রামিগুনস্টাইন, পার্কটাউন এবং বার্জারসড্রপের বিশাল এলাকা নিয়ে যে বাজার জমে ওঠে তাতে গিজগিজ করে বোয়েরের আর ফরাসীদের ভিড়, ফোলানো স্কার্ট আর কুঁচি দেয়া ব্লাউজ পরে আসে ইংরেজ রমণীর দল। এখানে কতরকম পণ্য যে বিক্রি হয়। আসবাব, ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ি থেকে শুরু করে ফলমূল সবই। কেউ ড্রেস কিনছে, কেউবা দাবা, কিংবা কেউ মাংস অথবা বই। উঁজনখানেক ভাষার কলকাকলীতে মুখর বাজার প্রাঙ্গণ। শনিবার দিন কেপটাউন রূপান্তর ঘটে ব্যস্ত এক মেলায়।

ভিড়ের মধ্যে পথ ধরে ধীরেসুস্থে হেঁটে যাচ্ছে বান্ডা, সতর্ক নজর থাকছে কোনো শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে যেন চোখাচোখি হয়ে না যায়। তাহলে ব্যাপারটা খুবই খারাপ হবে। রাস্তার বেশিরভাগ পথচারী কৃষ্ণাঙ্গ। ইন্ডিয়ান এবং কালোরা সংখ্যায় বেশি হলেও সংখ্যালঘু সাদারাই এ দেশের হর্তাকর্তা। বান্ডা এদেরকে ঘৃণা করে। এ দেশ তার, সাদারা এখানে uitlonder বা বহিরাগত। দক্ষিণ আফ্রিকায় নানান উপজাতি রয়েছে। জুলু, বেচুয়ানা, ম্যাটাবেল– এরা সবাই বান্টু সম্প্রদায়ের। বান্টু শব্দটি এসেছে আবান্টু থেকে। এর অর্থ জনগণ। তবে বান্ডার গোষ্ঠী বারোলংরা অভিজাত সম্প্রদায়ের। বান্ডার মনে আছে তার দাদীমা একদিন বলেছিল কালোরাই একদা শাসন করত দক্ষিণ আফ্রিকা। এ তাদের রাজ্য, তাদের দেশ। অথচ সেই তারাই কিনা এখন একদল সাদা শেয়ালের ক্রীতদাস। সাদারা তাদেরকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অঞ্চলগুলোতে ঠেলাধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তাদের স্বাধীনতা বলে কিছুই নেই। কালোরা শুধু ভৃত্য হিসেবে বেঁচে থাকছে।

বান্ডা জানে না তার বয়স কত কারণ কোনো নেটিভেরই বার্থ সার্টিফিকেট নেই। তাদের বয়স নিরূপণ করা হয় উপজাতীয় লোক-বিদ্যা থেকে; যুদ্ধ এবং লড়াই, প্রধান সর্দারদের জন্ম এবং মৃত্যুর বছর, ধূমকেতু বা উল্কাপতন কিংবা ভূমিকম্প কোন বছর হয়েছিল এরকম হিসেব থেকে বলা হয় অমুক বছর অমুক ঘটনার সময় অমুকের জন্ম।

বান্ডা এক সর্দারের পুত্র। কাজেই নিজের লোকজনের জন্য তাকে কিছু করতেই হবে। বান্টুরা আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে, শাসন করবে, শুধু তার জন্য। এ চিন্তাটা

মাথায় আসতেই গর্বে বুক ফুলে গেল বান্ডার, নিচু করে রাখা মাথা উঁচু হলো, টানটান হলো শিরদাঁড়া। কিন্তু একজন সাদা মানুষ তাকে লক্ষ করছে বুঝতে পেরেই উঁচু মাথা নিচু করে ফেলল বান্ডা।

পুব দিকে দ্রুত কদম ফেলে এগোল সে। ওদিকে, শহরের শেষপ্রান্তের জায়গাটা কালো মানুষদের জন্য নির্ধারিত। ওখানেই তাদের নিবাস, বাড়িঘর। বড়বড় বাড়ি আর আকর্ষণীয় দোকানপাট এদিকে নেই, আছে টিনের ঘর আর খড়ে ছাওয়া কুটির। ধুলোবালি মাখা একটি রাস্তায় মোড় নিল বান্ডা, একবার ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনটা দেখে নিল কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা। সে কাঠের কুটিরের সামনে এসে পৌছাল। শেষবারের মতো পেছনে চোখ বুলিয়ে দরজায় দু'বার টোকা মেরে ভেতরে ঢুকল। ঘরের কিনারে, চেয়ারে বসে রোগা-পাতলা এক মহিলা সেলাই করছিল। বান্ডা তার দিকে একবার মাথা ঝাঁকিয়ে বেডরুমে ঢুকে গেল।

খাটিয়ায় শুয়ে থাকা শরীরটির দিকে তাকাল সে।

মাস দেড়েক বাদে জ্ঞান ফিরে পেয়ে একটি বাড়ির খাটিয়ায় নিজেকে আবিষ্কার করেছিল জেমি ম্যাকগ্রেগর। চটজলদি সবকিছু মনে পড়ে যায় তার। সেই মরুভূমিতে সে, নির্যাতনে ক্ষতবিক্ষত শরীর। অসহায়। শকুনের পাল...

এমন সময় বান্ডা ঢোকে ছোট্ট শয়ন কক্ষটিতে। জেমি নিশ্চিত লোকটা তাকে হত্যা করতে এসেছে। ভ্যান ডার মার্ভি যেভাবেই হোক জেনে গেছে বেঁচে আছে জেমি এবং তাকে হত্যা করতে তার ভৃত্যকে পাঠিয়েছে।

'তোমার প্রভু নিজে এল না কেন?' কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল জেমি।

'আমার কোনো প্রভু নাই।'

'ভ্যান ডার মার্ভি। সে তোমাকে পাঠায়নি?'

'না। সে যদি জানতে পারে আমাদের দু'জনকেই মেরে ফেলবে।'

বান্ডার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না জেমি।

'আমি কোথায়? আমি জানতে চাই আমি কোথায় আছি?'

'কেপটাউন।'

'অসম্ভব। আমি এখানে কী করে এলাম?'

'আমি আপনাকে নিয়ে এসেছি।'

বান্ডার কালো চোখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল জেমি। অবশেষে রা ফুটল তার মুখে। 'কেন?'

'আপনাকে আমার প্রয়োজন। আমি প্রতিশোধ নিতে চাই।'

'তুমি কী চাও–?'

কাছে এগিয়ে এল বান্ডা। 'আমার জন্য নয়। নিজেকে নিয়ে ভাবি না আমি। ভ্যান ডার মার্ভি আমার বোনকে ধর্ষণ করেছিল। সে ওই লোকের সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে

মারা যায়। আমার বোনের বয়স তখন মাত্র এগারো।'

স্তম্ভিত হয়ে গেল জেমি। 'মাই গড!'

'আমার বোন মারা যাবার পর থেকে আমি একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষকে খুঁজছিলাম আমাকে সাহায্য করার জন্য। আপনাকে গোলাঘরে মারপিট করার সময় সেই মানুষটিকে আপনার মধ্যে আমি খুঁজে পাই, মি. ম্যাক গ্রেগর। আপনাকে আমরা মরুভূমিতে ফেলে এসেছিলাম। আমার ওপর হুকুম ছিল আপনাকে হত্যা করার। আমি ওদেরকে বলি আপনি মারা গেছেন। তারপর ফাঁক পেতেই আপনার কাছে ছুটে যাই। কিন্তু পৌঁছাতে আমার দেরি হয়ে গিয়েছিল।'

দৃশ্যটা মনে পড়তে শিউরে উঠল জেমি। সে যেন আবার অনুভব করল গলিত শব ভক্ষণকারী পাখিটা তার পায়ের মাংস ছিড়ে ছিড়ে খাচ্ছে।

'পাখিগুলো আপনার শরীরের মাংস খুবলে খেতে শুরু করেছিল। আপনাকে আমি কোলে নিয়ে ওয়াগনে তুলি এবং আমার লোকজনের বাড়িতে লুকিয়ে রাখি। আমাদের একজন ডাক্তার আপনার ভাঙা পাঁজরে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়, ভাঙা পায়ের হাড় জোড়া লাগিয়ে দেয় এবং আপনার ক্ষতগুলোর শুশ্রূষা করে।'

'তারপর?'

'আমার কিছু আত্মীয়স্বজন ওয়াগনে চেপে কেপটাউন যাচ্ছিল। আমরা তাদের সঙ্গে আপনাকে তুলে নিই। আপনি বেশিরভাগ সময় অজ্ঞান ছিলেন। যতবার আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, ভেবেছি ওই ঘুম বুঝি আর ভাঙবে না।'

যে লোকটি ওকে প্রায় মেরে ফেলার জোগাড় করেছিল তার চোখে চোখ রাখল জেমি। তাকে ভাবতে হবে। এ লোকটিকে সে বিশ্বাস করে না– যদিও এ-ই তার জীবন বাঁচিয়েছে। বান্ডা তার মাধ্যমে ভ্যান ডার মার্ভির ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়। প্রতিহিংসার আগুনে তো জেমিও জ্বলছে দাউদাউ করে। ভ্যান ডার মার্ভির ওপরে সে শোধ নেবেই।

'ঠিক আছে,' জেমি বলল বান্ডাকে। 'আমি ভ্যান ডার মার্ভির ওপর শোধ নেয়ার কোনো একটা উপায় অবশ্যই বের করে ফেলব।'

এই প্রথম পাতলা এক টুকরো হাসি ফুটল বান্ডার মুখে। 'সে কি মারা যাবে?'

'না,' বলল জেমি। 'সে বেঁচে থাকবে।'

সেদিন বিকেলে প্রথমবারের মতো বিছানা ছেড়ে নামল জেমি। মাথা ঘুরছে। শরীরটা দুর্বল। তার পায়ের ক্ষত এখনও পুরোপুরি শুকোয়নি। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। বান্ডা তাকে সাহায্য করতে চাইল।

'লাগবে না। আমি নিজেই হাঁটতে পারব।'

বান্ডা দেখছে ঘরের একোণ থেকে ও কোণে সাবধানে হাঁটাহাঁটি করছে জেমি।

'একটা আয়না দাও আমাকে,' বলল জেমি। *'আমাকে দেখতে নিশ্চয় বিশ্রী লাগছে,*

ভাবল সে। *কতদিন যে দাড়ি কামাই না।*

বান্ডা একটা আয়না নিয়ে এল। জেমি আয়নাটি নিজের মুখের সামনে তুলে ধরল। সম্পূর্ণ অচেনা একজন মানুষের দিকে তাকিয়ে আছে সে। তার চুল বরফ-সাদা। লম্বা সাদা দাড়ি। মারের চোটে নাকটা ভেঙে গেছে, একদিক ঠেলে বেরিয়ে আছে একটা হাড়। তার বয়স বেড়ে গেছে বিশ বছর। গালে বলিরেখার ছাপ সুস্পষ্ট, থুতনিতে গভীর একটি কাটা দাগ। তবে সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটা ঘটেছে চোখে। ওই চোখে অনেক ব্যথা-যন্ত্রণা এবং ঘৃণা। ধীরে ধীরে আয়নাটি নামিয়ে রাখল জেমি।

'আমি একটু হাঁটতে যাব,' বলল জেমি।

'দুঃখিত, মি. ম্যাকগ্রেগর। তা সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'সাদা মানুষরা শহরের এদিকে কখনও আসে না। আবার কালো মানুষদের শ্বেতাঙ্গদের এলাকায় প্রবেশ নিষেধ। আমার পড়শীরা জানে না যে আপনি এখানে আছেন। আপনাকে আমরা রাতের বেলা নিয়ে এসেছি।'

'আমি তাহলে এখান থেকে বেরুব কীভাবে?'

'রাতের বেলা আপনাকে নিয়ে যাব।'

এই প্রথম উপলব্ধি করল জেমি তার জন্য কী ঝুঁকিটাই না নিয়েছে বান্ডা। বিব্রত গলায় সে বলল, 'কিন্তু আমার কাছে কোনো টাকা পয়সা নেই। আমার একটা চাকরি দরকার।'

'জাহাজঘাটায় আমি কাজ করি। ওখানে সবসময়ই কাজের সুযোগ থাকে।' পকেট থেকে কিছু টাকা বের করল সে।

'এগুলো রাখুন।'

টাকাটা নিল জেমি। 'আমি তোমার দেনা শোধ করে দেব।'

'আপনি আমার বোনের দেনা শোধ করবেন,' বলল বান্ডা।

মধ্যরাতে বান্ডা ঝুপড়ি থেকে বের করে নিয়ে এল জেমিকে। চারপাশে চোখ বুলাল জেমি। সে শহরের বস্তি এলাকার মধ্যে আছে। চারদিকে ঝুপড়ি আর কুঁড়ে ঘর। কিছুক্ষণ আগের বৃষ্টিতে মাটি থেকে বিশ্রী একটা গন্ধ আসছে। এরকম এলাকায় বান্ডার মতো আত্মসচেতন মানুষজন কী করে বাস করে? সে কথা বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিল বান্ডা।

'কোনো কথা নয়,' ফিসফিস করল সে। 'আমার পড়শীরা কিন্তু খুব কৌতূহলী।' সে জেমিকে কম্পাউন্ডের বাইরে নিয়ে এসে আঙুল তুলে দেখাল, 'শহরের প্রাণকেন্দ্র ওই যে ওটা। আপনার সঙ্গে জাহাজঘাটায় দেখা হবে।'

ইংল্যান্ড থেকে এসে যে বোর্ডিং হাউজে উঠেছিল জেমি ওখানেই আবার গেল সে।

মিসেস ভেনস্টারকে দেখতে পেল ডেস্কের পেছনে বসে আছে।

'একটা ঘর চাই আমার,' বলল জেমি।

'নিশ্চয় স্যার।' হাসল মহিলা, সোনায় বাঁধা দাঁত ঝিক করে উঠল। 'আমি মিসেস ভেনস্টার।'

'চিনি আমি আপনাকে।'

'কী করে চিনলেন?' হাসি হাসি মুখ মহিলার। 'আপনার বন্ধুরা বুঝি আপনাকে আমার গল্প বলেছে?'

'মিসেস ভেনস্টার, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি গত বছর তো আপনার এখানেই ছিলাম।'

জেমির ক্ষত-বিক্ষত মুখ, ভাঙা নাক, সাদা দাড়ি খুঁটিয়ে দেখল মহিলা। কিন্তু ওকে চিনতে পেরেছে বলে মনে হলো না। 'আমি কখনো মানুষের মুখ ভুলে যাই না, সুজন। আমি আপনাকে এর আগে কোনোদিন দেখিনি। তার মানে এ নয় যে আমরা ভালো বন্ধু হতে পারব না। আমাকে আমার বন্ধুরা 'ডি-ডি' বলে ডাকে। আপনার কী নাম, বন্ধু?'

জেমি বলল, 'ট্রাভিস। ইয়ান ট্রাভিস।'

পরদিন সকালে জাহাজঘাটায় গেল জেমি কাজের সন্ধানে। ব্যস্ত ফোরম্যান বলল, 'আমাদের জোয়ান মর্দ লোক দরকার। সমস্যা হলো আমাদের কাজটার জন্য আপনার বয়সটা একটু বেশি।'

'আমার বয়স মাত্র উনিশ–' বলতে যাচ্ছিল জেমি। থেমে গেল আয়নায় দেখা নিজের চেহারাটা মনে করে। 'আমাকে একটা কাজ দিয়েই দেখুন না পারি কিনা।'

জাহাজে মাল খালাস এবং বোঝাইয়ের কাজ পেয়ে গেল জেমি। বেতন দিনপ্রতি নয় শিলিং। জেটিতে যেসব জাহাজ আসবে তাদের মাল তোলা এবং নামানোর কাজ করতে হবে ওকে। একইরকম পরিশ্রম করে এ কাজের জন্য বান্ডা এবং অন্যান্য কৃষ্ণাঙ্গরা মজুরী পায় ছয় শিলিং।

প্রথম সুযোগেই জেমি বান্ডাকে একপাশে টেনে নিয়ে এসে বলল, 'আমাদের কথা বলা দরকার।'

'এখানে নয়, মি. ম্যাকগ্রেগর। জাহাজঘাটার শেষ মাথায় একটা পরিত্যক্ত গুদামঘর আছে। কাজ শেষে ওখানে আপনার সঙ্গে দেখা করব আমি।'

জেমি তার কাজ শেষে জনমানবশূন্য গুদামঘরে গিয়ে দেখল তার জন্য অপেক্ষা করছে বান্ডা।

'সলোমন ভ্যান ডার মার্ভি সম্পর্কে আমাকে বলো,' বলল জেমি।

'কী জানতে চান বলুন।'

'সবকিছু।'

থুতু ফেলল বান্ডা। 'সে হল্যান্ড থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা এসেছে। শুনেছি তার স্ত্রী

দেখতে ছিল কুৎসিত তবে ধনবতী। কী এক অসুখে মহিলা মারা গেলে ভ্যান ডার মার্ভি তার টাকা-পয়সা নিয়ে ক্লিপড্রিফটে চলে আসে এবং মুদি দোকান খুলে বসে। ডিগারদের সঙ্গে প্রতারণা করে সে বড়লোক হয়ে ওঠে।'

'যেভাবে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছিল?'

'ওটাতো তার প্রতারণার অনেকগুলো কৌশলের একটি মাত্র। যেসব ডিগার তার কাছে সাহায্যের জন্য যায়, তাদেরকে সে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করে। কিন্তু ওই লোকগুলো কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখে তাদের পাওয়া হিরে বা হিরের খনির মালিক হয়ে গেছে ভ্যান ডার মার্ভি।'

'কেউ কখনও প্রতিবাদ করেনি?'

'কীভাবে করবে? শহরের ক্লার্ক মার্ভির কাছ থেকে নিয়মিত ঘুষ পায়। আইন বলে কোনো ক্লেইম ছাড়া পঁয়তাল্লিশ দিন চলে গেলে ওটা সবার জন্য উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। আরও একটা উপায়ে মার্ভি প্রতারণা করে। যে জায়গায় ক্লেইম করা হবে সেখানে প্রতিটি বাউন্ডারি লাইনে কাঠের গোঁজ পুঁতে রাখতে হবে আকাশের দিকে মুখ করে। গোঁজ মাটিতে পড়ে গেলে একজন জাম্পার ওই সম্পত্তি নিজের বলে দাবি করতে পারে। ভ্যান ডার মার্ভির যখন কোনো জায়গা পছন্দ হয়ে যায় ক্লেইম করার জন্য, সে রাতের বেলা ওখানে কাউকে পাঠিয়ে দেয়। সকালে দেখা যায় ক্লেইম করা জায়গার গোঁজ মাটিতে পড়ে আছে।'

'ঈশ্বর!'

'বারটেন্ডার স্মিটের সঙ্গে তার একটা চুক্তি আছে। স্মিট প্রসপেক্টরদের পাঠায় ভ্যান ডার মার্ভির কাছে। তারা পার্টনারশিপের চুক্তিপত্রে সই করে এবং প্রসপেক্টররা হিরের খোঁজ পেলে পুরোটাই কেড়ে রেখে দেয় মার্ভি। কেউ সমস্যা করলে তাকে শায়েস্তা করার জন্য ভাড়াটে গুণ্ডা রেখেছে ভ্যান ডার।'

'সে আমি জানি,' থমথমে গলায় বলল জেমি। আর কিছু।

'সে একটা ধর্মোম্মাদ। সবসময়ই পাপীদের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করে চলেছে।'

'আর তার মেয়ে? মেয়েটাও নিশ্চয় এর মধ্যে জড়িত?

'মিস মার্গারেট? সে তার বাপকে যমের মতো ডরায়। সে কোনো পুরুষের দিকে তাকালে ভ্যান ডার তাদের দু'জনকেই মেরে ফেলবে।'

জেমি হেঁটে গেল দরজায়। জেটির দিকে তাকাল। অনেক কিছু চিন্তা করতে হবে ওকে। 'কাল আবার আমরা কথা বলব।'

আট

শ্বেতাঙ্গ আর কৃষ্ণাঙ্গদের মাঝে বিপুল বিভেদ টের পেল জেমি কেপটাউনে কাজ করতে গিয়ে। ক্ষমতাসীনদের অনুগ্রহে প্রাপ্ত কিছু অধিকার ছাড়া আর কিছু ভোগ করতে পারে না কালো মানুষরা। গেটো বা বস্তিতে অচ্ছ্যুতের মতো থাকতে হয় তাদেরকে। শ্বেতাঙ্গদের জন্য কাজ করার সময়টুকু ছাড়া ওখান থেকে বেরুবার অনুমতি নেই কালোদের।

'তোমরা এত অবহেলা এবং নির্যাতন সহ্য কর কী করে?' একদিন বান্ডাকে জিজ্ঞেস করল জেমি।

'ক্ষুধার্ত সিংহ তাদের খাবা লুকিয়ে রাখে। একদিন এ সবকিছু আমরা বদলে ফেলব। সাদারা কালোদেরকে মেনে নিয়েছে কারণ কালো মানুষদের তাগদ এবং শক্তি তাদের দরকার। কিন্তু কালোদের যে মস্তিষ্ক বলে একটি জিনিস আছে তা একদিন তারা বুঝতে পারবে। সাদারা আমাদেরকে *ঠেলতে ঠেলতে* খাদের কিনারে নিয়ে যাচ্ছে আসলে তারা আমাদেরকে ভয় পায় বলেই। কারণ তারা জানে আজ তারা আমাদের সঙ্গে যে রকম বৈষম্যমূলক আচরণ করছে একদিন তারা এর ফল পাবে। আমরা ইসিকোর জন্য টিকে থাকব।'

'কে ইসিকো?'

মাথা নাড়ল বান্ডা। 'কে নয়। কী। বিষয়টি ব্যাখ্যা করা একটু কঠিন, মি. ম্যাক গ্রেগর। ইসিকো আমাদের শিকড়। এ হলো একটি জাতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার অনুভূতি। এ জাতি জাম্বোজি নদীর নামকরণ করেছে। শত শত বছর আগে আমার পূর্ব পুরুষরা উদোম গায়ে প্রবেশ করেছিলেন জাম্বোজিতে, পশুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে এসেছিলেন তারা। তাদের দুর্বল সদস্যরা হারিয়ে গিয়েছিল, ডুবে মরেছিল নদীর ঘূর্ণিতে কিংবা ক্ষুধার্ত কুমিরের শিকার হয়েছিল। নদীতে টিকে থাকা মানুষের দল হয়ে উঠেছিল আরও শক্তিশালী এবং পৌরুষদীপ্ত। একজন বান্টু যখন মারা যায়, *ইসিকো* দাবি করে মৃতের পরিবারের সদস্যরা জঙ্গলে গিয়ে থাকবে যাতে গোষ্ঠীর অন্যদেরকে তাদের দুঃখের ভাগীদার হতে না হয়। যে ক্রীতদাস ভয়ে আধমরা হয়ে যায় তাকে ইসিকো ভর্ৎসনা করে। *ইসিকো* মনে করে সে পুরুষই নয় যে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে না। আপনি কি জন টেঙ্গো জাবাভু'র নাম শুনেছেন?' শ্রদ্ধার সঙ্গে নামটি উচ্চারণ করল বান্ডা।

'না।'

'শুনবেন, মি. ম্যাকগ্রেগর,' বলল বান্ডা। 'আপনি তার নাম শুনবেন।' সে এরপর অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল।

জেমি টের পাচ্ছিল সে বান্ডাকে পছন্দ করতে শুরু করেছে। শুরুতে দু'জনের মাঝে একটা দূরত্ব ছিল, একে অপরকে সর্তকভাবে লক্ষ্য করত। যে লোক তাকে প্রায় মেরে ফেলার জোগাড় করেছিল সে লোককেই বিশ্বাস করতে হচ্ছিল জেমির। আর বান্ডার বিশ্বাস করতে হচ্ছিল তার চিরশত্রু একজন সাদা মানুষকে। জেমি এ পর্যন্ত যত কালো মানুষ দেখেছে সবাই অশিক্ষিত, বান্ডা ছাড়া।

'তুমি কোন্ স্কুলে পড়ালেখা করেছ?' জানতে চাইল জেমি।

'কোনো স্কুলে আমি পড়িনি। ছোটবেলা থেকে গতর খেটে খাই। আমার দাদী আমাকে পড়াশোনা করিয়েছিলেন। তিনি একটি বোয়েরের স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন আমাকে পড়ালেখা করাতে। আমার সবকিছুর জন্য আমি তার কাছে ঋণী।

এক শনিবার বিকেলে কাজ শেষে জেমি গল্প করছিল বান্ডার সঙ্গে। তার মুখেই প্রথম শুনতে পেল গ্রেট নামাকুয়াল্যান্ডের নামিব মরুভূমির কথা। জাহাজঘাটার সেই পরিত্যক্ত গুদামঘরে বসে বান্ডার মায়ের রান্না করা ইমপালার স্টিউ খাচ্ছিল দু'জনে। স্বাদটা ভালোই– জেমির একটু ঝাল লাগছিল তবে দ্রুত শেষ হয়ে গেল তার বাটি। বস্তায় পিঠ দিয়ে বসে বান্ডাকে প্রশ্ন করল সে।

'ভ্যান ডার মার্ভির সঙ্গে তোমার প্রথম পরিচয় কবে?'

'আমি তখন নামিব মরুভূমিতে ডারবন্ড বিচে কাজ করি। সে দু'জনে পার্টনারসহ ওই সৈকতের মালিক ছিল। কোনো হতভাগ্য প্রসপেক্টরের শেয়ার বঞ্চিত করে ওখানে সে ঘুরতে এসেছিল।'

'ভ্যান ডার মার্ভির যদি এতই টাকা, তাহলে মুদি দোকান চালায় কেন সে?'

'মুদি দোকানটা তার টোপ। ওটার টোপ ফেলে সে নতুন প্রসপেক্টরদের আকর্ষণ করে। আর বড়লোক হয়।'

জেমি ভাবছিল তাকে কত সহজেই না ঠকিয়েছে এই ভ্যান ডার মার্ভি। কত বোকা আর সরল ছিল সে! পান পাতার মত অবয়বের মার্গারেটের মুখখানা ভেসে উঠল মনে। *আমার বাবা হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন।* ওকে তো প্রথমে একটা বাচ্চা মেয়েই ভেবেছিল জেমি ওর বুকের দিকে নজর পড়ার আগ পর্যন্ত– জেমি হঠাৎ লাফ মেরে খাড়া হলো, তার মুখে ফুটে উঠেছে হাসি, ঠোঁট কুঁচকে যাওয়ায় থুতনির কাটা দাগটা পরিষ্কার হয়ে উঠল।

'ভ্যান ডার মার্ভির সঙ্গে কাজ করার সুযোগ কী করে পেলে সেটা বলো শুনি।'

'একদিন সে তার মেয়েকে নিয়ে সৈকতে এসেছিল– তখন তার মেয়ের বয়স এগারো– মেয়েটি বোধহয় ঘরে বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছিল। সে পানিতে নেমে পড়ে। স্রোত তাকে টেনে নিয়ে যায়। আমি সাগরে লাফিয়ে পড়ে মেয়েটিকে উদ্ধার করি। আমার তখন কিশোর বয়স। তবে আমার ভয় হচ্ছিল ভেবে ভ্যান ডার মার্ভি বোধহয় আমাকে মেরে ফেলবে।'

অবাক হলো জেমি। 'কেন?'

'কারণ মেয়েটিকে আমার জড়িয়ে ধরতে হয়েছিল। আমি কালো বলে নয়, আমার দোষ আমি একজন পুরুষ মানুষ। কোনো পুরুষ তার মেয়েকে স্পর্শ করবে এটা ভ্যান ডার মার্ভি সহ্য করতে পারত না। একজন বহু কষ্টে তাকে শান্ত করে এই বলে যে, আমি তার মেয়ের জীবন রক্ষা করেছি। সে আমাকে ক্লিপড্রিফটে নিয়ে যায় তার ভৃত্য হিসেবে।' একটু থেমে আবার শুরু করল বান্ডা, 'দুই মাস পরে আমার বোন এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে।' বান্ডার কণ্ঠ খুব শান্ত শোনাল। 'সে আর ভ্যান ডার মার্ভির মেয়ে সমবয়েসী ছিল।'

জেমি কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ করে রইল।

অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করল বান্ডা। 'আমার নামিব মরুভূমিতে থাকাই উচিত ছিল। কাজটা ছিল সহজ। আমরা সৈকতে হিরে খুঁজে বেড়াতাম। হিরে পেলে জ্যামের টিনের পাত্রে রেখে দিতাম।'

'এক মিনিট। তুমি কি বলতে চাইছ ওখানে বালুর ওপর হিরে পড়ে থাকে?'

'আমি তা-ই বলতে চাইছি, মি. ম্যাকগ্রেগর। তবে আপনি যা ভাবছেন তা ভুলে যান। ওই ফিল্ডের ধারেকাছেও কেউ ঘেঁষতে পারবে না। ওটা সাগরে, আর সাগরে ত্রিশ ফুট উঁচু ঢেউ। ওরা সৈকত পাহারা দেয়ার প্রয়োজনও বোধ করে না। অনেকেই সাগর পাড়ি দিয়ে দ্বীপে পৌঁছার চেষ্টা করেছিল। পারে নি। হয় ঢেউয়ের কবলে পড়ে ডুবে মরেছে নতুবা ডুবো পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে হাড়গোড় ভেঙে পটল তুলেছে।'

'ওখানে পৌঁছাবার নিশ্চয় অন্য কোনো রাস্তা আছে।'

'নেই। নামিব মরুভূমির শুরুই হয়েছে সাগরের তীর ঘেঁষে।'

'ডায়মন্ড ফিল্ডের প্রবেশদ্বারের কী অবস্থা?'

'প্রবেশদ্বারে রয়েছে একটি গার্ড টাওয়ার এবং কাঁটাতারের বেড়া। বেড়ার ভেতরে বন্দুক আর কুকুর নিয়ে পাহারা দেয় প্রহরীর দল। কুকুরগুলো ভয়ানক হিংস্র। চোখের পলকে একজন মানুষকে টুকরো টুকরো করে ফেলে। এছাড়া ওরা নতুন এক ধরনের বিস্ফোরক ফিট করেছে মাটির নিচে। নাম ল্যান্ড মাইন। গোটা ফিল্ড জুড়ে ছড়িয়ে আছে এ জিনিস। আপনার কাছে ল্যান্ড মাইনের ম্যাপ না থাকলে, বিস্ফোরিত হয়ে উড়ে যাবেন।'

'ডায়মন্ড ফিল্ডের আয়তন কত?'

'পঁয়ত্রিশ মাইল।'

পঁয়ত্রি মাইল জুড়ে বালুকাবেলায় পড়ে রয়েছে শত শত হিরে.... 'মাই গড!'

'নামিবের ডায়মন্ড ফিল্ডের কথা শুনে আপনিই প্রথম উত্তেজিত হননি, আরও অনেকে হয়েছে। এবং ভবিষ্যতেও হবে। নৌকায় চড়ে যারা সৈকতে আসার চেষ্টা করেছিল, শৈলশিরার গায়ে বাড়ি খেয়ে টুকরো হয়ে গেছে। তাদের খণ্ড-বিখণ্ড লাশ সৈকতে ভেসে আসত। এরকম লাশ বহু দেখেছি আমি। দেখেছি ল্যান্ড মাইনে ভুল করে পা দেয়ার পরে কী ঘটেছে। দেখেছি ওই কুকুরগুলো কীভাবে মানুষের টুঁটি ছিড়ে ফেলত। ভুলে যান, মি. ম্যাকগ্রেগর। আমি ওখানে ছিলাম। ওখানে ঢুকবার বা বেরুবার কোনো রাস্তা নেই– অন্তত জীবিত অবস্থায় তা সম্ভব নয়, ব্যাস।'

সে রাতে ঘুমাতে পারল না জেমি। চোখের সামনে যেন ভেসে উঠেছিল ভ্যান ডার মার্ভির পঁয়ত্রিশ মাইল লম্বা সমুদ্র সৈকতের ছবি যেখানে ঝিলমিল করছে হিরকখণ্ড। সাগর আর ধারালো রিফ বা শৈলশিরার কথা ভাবছিল ও, ভাবছিল খুনি কুকুরগুলোর কথা, সশস্ত্র প্রহরী আর ল্যান্ড মাইনের কথা। বিপদে সে ভয় পায় না; মরণেও নেই তার ভয়। শুধু ভীত সলোমন ভ্যান ডার মার্ভির বেঈমানীর শাস্তি তাকে মিটিয়ে দেয়ার আগেই না আবার সে মরে যায় ভেবে।

সোমবার এক মানচিত্রকরের দোকান থেকে গ্রেট নামাকুয়াল্যান্ডের একটি ম্যাপ কিনে আনল জেমি। ম্যাপে সৈকতের ছবি আছে, উত্তরে লুডেরিজ আর দক্ষিণে অরেঞ্জ রিভার অটুয়ারির মাঝখানে, দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে জায়গাটা। লাল কালিতে ওখানে লেখা **SPERGEBIET-নিষিদ্ধ।**

মানচিত্রে আঁকা জায়গাটির প্রতিটি ডিটেল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করল জেমি, বারবার চোখ বুলাল। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত, সাড়ে তিন হাজার মাইল জুড়ে বিস্তৃত মহাসাগর। বিশাল এ সাগরকে কোনো কিছু বাধা দিচ্ছে না বলে পূর্ণ শক্তিতে সে আছড়ে পড়ছে দক্ষিণ আটলান্টিকের তীরবর্তী ভয়ংকর রিফগুলোর গায়ে। উপকূল রেখা বরাবর দক্ষিণে চল্লিশ মাইল এলাকা খোলা একটি সৈকত। *ওখানেই নিশ্চয় হতভাগ্য লোকগুলো তাদের নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ত নিষিদ্ধ এলাকাটিতে পৌঁছানোর জন্য।* ভাবল জেমি। ম্যাপে চোখ বুলিয়েই সে দিব্যি বুঝতে পারছিল কেন সৈকতে পাহারার ব্যবস্থা নেই। রিফগুলোর কারণে সৈকতে পা রাখা এক কথায় অসম্ভব।

ডায়মন্ড ফিল্ডের ল্যান্ড এন্ট্রান্সে মনোযোগ দিল জেমি। বান্ডা বলেছে এলাকাটি তারকাটা দিয়ে ঘেরা এবং চব্বিশ ঘণ্টা সশস্ত্র প্রহরীরা ওখানে পাহারা দেয়। প্রবেশমুখে একটি ওয়াচ টাওয়ারও রয়েছে। কেউ ওয়াচ টাওয়ার ফাঁকি দিয়ে হিরের এলাকায় যদি ঢুকতেও পারে, তার জন্য মূর্তিমান আতংক হয়ে অপেক্ষা করছে ল্যান্ড মাইন, প্রহরী এবং কুকুর।

পরদিন জেমি গেল বান্ডার সঙ্গে দেখা করতে। 'তুমি না বলেছ ফিল্ডের ল্যান্ড-মাইন ম্যাপ আছে?'

'নামিব মরুভূমির? সুপারভাইজারদের কাছে ওই ম্যাপ থাকে, তারা ডিগারদেরকে নির্দেশ দেয় কীভাবে কাজ করতে হবে। সবাই এক লাইনে সার বেঁধে কাজ করে যাতে কেউ ল্যান্ড মাইনে পা দিয়ে না ফেলে।' 'তার চাউনি স্মৃতিময় হয়ে উঠল।' একবার আমার এক চাচা আমার সামনেই হাঁটছিল। একটা পাথরে পা বেঁধে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে একটা ল্যান্ড মাইনে। তার পরিবারের কাছে নিয়ে যাওয়ার মতো শারীরিক কিছুই তার অবশিষ্ট ছিল না।'

শিউরে উঠল জেমি।

'তাছাড়া আছে সাগর *মিস*, মি. ম্যাকগ্রেগর। নামিবে না গেলে ওই জিনিস কোনোদিন দেখতে পাবেন না। সাগর গর্ভ থেকে উঠে আসে ওটা গড়াতে গড়াতে, মরুভূমি থেকে পাহাড়, সামনে যা পায় সব কিছু গ্রাস করে ফেলে। একবার ওর কবলে পড়লে আপনি নড়াচড়া করারও সাহস হারিয়ে ফেলবেন। ল্যান্ড মাইনের ম্যাপ থাকলেও তা তখন কাজে আসবে না কারণ আপনি তো ঠাহরই করতে পারবেন না কোথায় যাচ্ছেন। *মিস* চলে না যাওয়া পর্যন্ত সবাই চুপচাপ বসে থাকবে।'

'এটার স্থায়িত্বকাল কতক্ষণ?'

কাঁধ ঝাঁকাল বান্ডা। 'কখনও কয়েক ঘণ্টা থাকে, কখনও কয়েক দিন।'

'বান্ডা, তুমি ওই ল্যান্ড মাইনগুলোর কোনো ম্যাপ কখনও দেখেছ?'

'ম্যাপগুলো সাবধানে পাহারা দিয়ে রাখা হয়,' চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটল বান্ডার। 'আপনাকে আবারও বলছি, আপনি যা চিন্তা করছেন তা করতে পারবেন না। কেউ পারেনি। মাঝে মাঝে মজুররা দু'একটা হিরে চুরির চেষ্টা করে। তাদেরকে ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্য ওখানে একটি বিশেষ গাছ আছে। সে গাছে হিরে চোরদের ঝুলিয়ে দেয়া হয় যাতে কেউ আর কোম্পানির হিরে চুরি করার সাহস না পায়।'

পুরো ব্যাপারটাই মনে হচ্ছে অসম্ভব একটি বিষয়। জেমি যদি ভ্যান ডার মার্ভির ডায়মন্ড ফিল্ডে ঢুকতে পারেও, বেরুবার কোনো রাস্তা নেই। ঠিকই বলেছে বান্ডা। ওর আসলে বিষয়টি ভুলে যাওয়াই উচিত।

পরদিন সে বান্ডাকে জিজ্ঞেস করল, 'কাজ শেষে শ্রমিকরা যখন ফিল্ড থেকে বেরিয়ে আসে, তারা যাতে হিরে চুরি করতে না পারে সেজন্য কী করে ভ্যান ডার মার্ভি?'

'তাদের আগপাশতলা সার্চ করা হয়। পুরো ন্যাংটা করে শরীরের প্রতিটি ফুটো এবং গর্ত পরীক্ষা করে দেখা হয়। আমি দেখেছি শ্রমিকরা পায়ের মাংস কেটে শরীরের ভেতরে হিরে লুকিয়ে পাচারের চেষ্টা করেছে। কেউ ড্রিল দিয়ে দাঁত ফুটো করে সেখানে হিরে লুকিয়ে রাখে। যত উপায় আছে, সবরকমভাবেই তারা হিরে চুরির চেষ্টা করে।' জেমির দিকে তাকাল বান্ডা। 'যদি বেঁচে থাকতে চান, মন থেকে ডায়মন্ড ফিল্ডের কথা ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিন।'

চেষ্টা করল জেমি। কিন্তু প্রতিটি ক্ষণ ডায়মন্ড ফিল্ডের চিন্তা তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খেল।

কল্পনায় দেখল ভ্যান ডার মার্ভির হিরে বালুর ওপর অপেক্ষা করছে তার জন্য। *তার জন্য অপেক্ষা করছে।*

ওই রাতেই সমাধানের রাস্তা পেয়ে গেল জেমি। পরদিন সকাল হতেই সোজা গেল বান্ডার কাছে। কোনো ভূমিকা না করে বলল, 'যেসব নৌকা সৈকতে পৌঁছার চেষ্টা করেছিল সেগুলো সম্পর্কে বলো।'

'সেগুলো সম্পর্কে কী বলব?'

'ওগুলো কী ধরনের নৌকা ছিল?'

'সব ধরনের। স্কুনার থেকে শুরু করে টাগবোট, মোটরবোট, সেইল বোট। চারজন লোক এমনকী রোবোট নিয়েও চেষ্টা করেছিল। আমি ফিল্ডে থাকাকালীন এরকম আধডজন অভিযানের কথা জানতাম। কিন্তু রিফ সবগুলো বোট চিবিয়ে খেয়েছে। সবাই ডুবে মরেছে।'

গভীর দম নিল জেমি। 'কিন্তু কেউ কি ভেলায় চড়ে সাগর পাড়ি দেয়ার চেষ্টা করেছিল?'

বান্ডার চক্ষু গোল হয়ে গেল। 'ভেলা?'

'হ্যাঁ।' উত্তেজিত গলায় বলতে লাগল জেমি। 'বিষয়টি নিয়ে ভাবো একবার। কেউ তীরে পৌঁছাতে পারেনি, কারণ তাদের নৌকার তলা রিফের বাড়িতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল কিংবা ফেটে গিয়েছিল। কিন্তু একটা ভেলা সহজেই ডুবো পাহাড় কিংবা রিফকে ফাঁকি দিয়ে তীরে পৌঁছাতে পারে। আবার একই উপায়ে ওখান থেকে ফিরে আসাও সম্ভব।'

জেমির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল বান্ডা। কথা বলার সময় তার গলার স্বর অন্যরকম শোনাল। 'মি. ম্যাকগ্রেগর, আমার মনে হচ্ছে আপনার আইডিয়াটি কাজে লাগতে পারে...।'

নয়

শুরুটা হলো খেলার মতো, একটি অমীমাংসিত ধাঁধার সম্ভাব্য সমাধান। তবে জেমি আর বান্ডা বিষয়টি নিয়ে যত বেশি আলোচনা করল ততই তারা উত্তেজিত হয়ে উঠল। যার শুরু হয়েছিল অলস আলোচনার মাঝ দিয়ে, ক্রমে সেটা প্ল্যান অব অ্যাকশনের নিরেট একটি আকার পেতে শুরু করল। বালুর ওপর শুয়ে আছে হিরেগুলো, ওগুলো নিয়ে আসতে কোনো যন্ত্রপাতির প্রয়োজন নেই। ওরা ভেলা বানাতে পারবে, পাল খাটিয়ে রাতের বেলা Sperrgebiet এর চল্লিশ মাইল দক্ষিণের মুক্ত সৈকত থেকে রওনা হতে পারবে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করেই। অরক্ষিত সৈকতের ধারে কোনো ল্যান্ড মাইন নেই আর গার্ডরা পাহারা দেয় কেবল ভেতরের দিকে, ইনল্যান্ডে। ওরা দু'জন সৈকতে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতে পারবে, যতটা সম্ভব নিতে পারবে হিরে।

'ভোর হবার আগেই ওখান থেকে কেটে পড়তে পারব আমরা,' বলল জেমি। 'তখন আমাদের পকেটভর্তি থাকবে ভ্যান ডার মার্ভির হিরে।'

'কিন্তু আমরা বেরুব কী করে?'

'যেভাবে ঢুকব সেভাবে বেরিয়েও আসব। ভেলা বেয়ে রিফগুলোর পাশ কাটিয়ে চলে আসব খোলা সমুদ্রে। তারপর পাল খাটিয়ে সোজা বাড়ি।'

জেমির প্ররোচনায় বান্ডার মনে যে সব সন্দেহ ছিল তা আস্তে আস্তে গলতে শুরু করল। সে পরিকল্পনায় একটা করে ছিদ্র অন্বেষণ করল এবং আপত্তি তুলল আর প্রতিবারই এ ফুটো বন্ধ করে দিতে উপযুক্ত জবাবও দিল জেমি। সে বারবারই বলল তার পরিকল্পনায় কাজ হবেই। এ পরিকল্পনার সবচেয়ে নান্দনিক দিক হলো এতে কোনো জটিলতা নেই, কোনো টাকা-পয়সা লাগছে না। শুধু দরকার প্রচুর সাহস।

'আমাদের শুধু বড় একটা ব্যাগ লাগবে হিরে বয়ে নিয়ে আসতে,' বলল জেমি। তার উৎসাহ এবং উল্লাস সংক্রামক। বান্ডা হেসে বলল, 'দুটো বড় ব্যাগ আমরা বানাব।'

পরদিন ওরা ওদের চাকরি ছেড়ে দিল এবং মোষের গাড়িতে পোর্ট নলোথে চলল। ওরা যে নিষিদ্ধ এলাকায় চলেছে সেখান থেকে চল্লিশ মাইল দক্ষিণে ওই উপকূলীয় গ্রামটি।

পোর্ট নলোথে ওরা পৌঁছে গেল। গাড়ি থেকে নেমে চারদিকে চোখ বুলাতে লাগল।

গ্রামটি ছোট, দেখলে মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক আমলের। যেনতেনভাবে তৈরি করা ঝুপড়ি আর টিনের ঘর, খানকয়েক দোকান আছে, ধবধবে সাদা আদিম চেহারার সাগর-সৈকত, যার বিস্তৃতির বোধকরি শেষ নেই। এদিকে কোনো রিফ নেই, তীরের গায়ে মৃদু ঢেউ। ভেলা ভাসানোর উপযুক্ত স্থান।

গাঁয়ে কোনো হোটেল নেই তবে ছোট্ট বাজারটির পেছনে একখানা ঘর ভাড়া পাওয়া গেল। বান্ডা গ্রামের কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে থাকার বন্দোবস্ত করে নিল।

'গোপনে ভেলা বানানোর জায়গা খুঁজে বের করতে হবে,' জেমি বলল বান্ডাকে। 'চাই না কেউ দেখে ফেলে আবার গাঁয়ের মোড়লের কাছে নালিশ করুক।'

সেদিন বিকেলে ওরা একটি পুরানো এবং পরিত্যক্ত গুদামঘরের খোঁজ পেয়ে গেল।

'এতেই চলবে,' সিদ্ধান্ত নিল জেমি। 'চলো কাজে নেমে পড়ি।' একটু বিরতি দিয়ে যোগ করল, 'বান্ডা, তুমি কখনও ভেলা বানিয়েছ?'

'সত্যি বলতে কী, মি. ম্যাকগ্রেগর, জবাবটা হলো না।'

'আমিও বানাইনি।'

ওরা একে অন্যের দিকে বেকুবের মতো তাকিয়ে রইল। 'কাজটা কি খুব কঠিন?'

বাজারের পেছন থেকে পঞ্চাশ গ্যালনের চারটা খালি কাঠের তেলের ব্যারেল চুরি করল ওরা, নিয়ে এল গুদামঘরে। সবগুলো একত্রে চৌকোনা করে বাঁধল। তারপর চারটা খালি বাক্স জোগাড় করে প্রতিটি তেলের ব্যারেলের ওপর ওগুলো চাপিয়ে দিল।

বান্ডার চেহারায় সন্দেহের ছাপ। 'এটাকে দেখে তো ঠিক ভেলার মতো লাগছে না।'

'কাজ এখনও শেষ হয়নি,' ওকে আশ্বস্ত করল জেমি।

কাঠের তক্তাফক্তা না পেয়ে গাছের ডাল কেটে নিয়ে তক্তার অভাব পূরণ করল ওরা। মোটা শনের দড়ি দিয়ে খুব শক্ত করে বাঁধল।

কাজ শেষ হওয়ার পরে বান্ডা মন্তব্য করল, 'এটাকে এখনও ভেলা মনে হচ্ছে না আমার।'

'যখন পাল খাটাবো তখন এটাকে দেখতে ভেলার মতোই মনে হবে,' বলল জেমি।'

মাটিতে ধরাশায়ী হয়ে থাকা ইয়েলোউড গাছ কেটে ওরা মাস্তুল বানালো। দুটো চ্যাপ্টা ডাল দিয়ে তৈরি করল বৈঠা।

'এখন শুধু একটা পাল দরকার। জলদি দরকার। আজ রাতেই আমি এখান থেকে কেটে পড়তে চাই।'

পালের ব্যবস্থা করল বান্ডা। রাতের বেলা নীল রঙের মস্ত এক টুকরো কাপড় নিয়ে এল। 'এতে চলবে, মি. ম্যাকগ্রেগর?'

'দারুণ চলবে। কোথায় পেলে?'

হাসল বান্ডা। 'জানতে চাইবেন না। এমনিতেই আমরা অনেক ঝামেলার মধ্যে আছি।'

ওরা কাপড়ের টুকরোটা দিয়ে চৌকোনা একটা পাল বানিয়ে ফেলল। জেমি বলল, 'আজ রাত দুটোর সময় আমরা রওনা হব। তখন সারা গাঁ ঘুমিয়ে থাকবে। যাও, ততক্ষণ ঘুমিয়ে নাও গে।'

কিন্তু দু'জনের কেউই ঘুমাতে পারল না। সামনের অভিযানের কথা ভেবে দুই যুবকই উত্তেজনায় বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে থাকল।

রাত দুটোর দিকে গুদামঘরে মিলিত হলো ওরা। দু'জনের মধ্যেই প্রবল উৎসাহ, একই সঙ্গে অকথিত একটা ভয়ও কাজ করছে। এমন এক অনিশ্চিত অভিযানে ওরা চলেছে, হয় এতে বড়লোক বনে যাবে কিংবা ওদের মৃত্যু হবে। এর মাঝখানে অন্য কিছু নেই।

'সময় হয়েছে,' ঘোষণা দিল জেমি।

গুদামঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। কোথাও কোনো কিছুর সাড়াশব্দ নেই। রাত স্থির এবং শান্তিময়। মাথার ওপরে নীল আকাশের বিরাট চাঁদোয়া। রূপোলি চাঁদ উঠেছে। তবে জোছনার আলো তেমন উজ্জ্বল নয়।

এতে বরং ভালোই হলো, ভাবছে জেমি। আমাদেরকে *কেউ ঠাহর করতে পারবে না।* ওরা গভীর রাতে রওনা হচ্ছে এজন্যই যে কেউ যেন ওদেরকে দেখে না ফেলে।

ডায়মন্ড ফিল্ডে পৌঁছাবে পরের দিন রাতে। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ফিল্ডে ঢুকে পড়বে এবং ভোর হওয়ার আগেই সহিসালামতে ফিরে আসবে গাঁয়ে।

'বেনগুয়েলা স্রোতের টানে শেষ বিকেল নাগাদ আমাদের ডায়মন্ড ফিল্ডে পৌঁছে যাওয়ার কথা,' বলল জেমি। 'তবে দিনের বেলা ওখানে ঢোকা যাবে না। আঁধার ঘনিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল বান্ডা। 'উপকূলবর্তী ছোট যে কোনো একটা দ্বীপে আমরা লুকিয়ে থাকব।'

'কোন্ দ্বীপ?'

'ছোট ছোট অনেক দ্বীপ আছে– মার্কারি, ইচাবড, প্লুম পুডিং,' ওকে থামিয়ে দিল বিস্মিত জেমি। 'প্লুম পুডিং?'

'রোস্ট বিফ আইল্যান্ডও আছে।'

জেমি ভাঁজ খাওয়া ম্যাপটি বের করে চোখ বুলাল। 'কিন্তু এতে তো কোনো দ্বীপের নাম লেখা নেই।'

'ওগুলো বিষ্ঠা দ্বীপ। ওখানে পাখিরা বিষ্ঠা ত্যাগ করে। ব্রিটিশরা ওই বিষ্ঠা ফসলি জমিতে সার হিসেবে ব্যবহার করে।'

'এসব দ্বীপে মানুষজন থাকে?'

'থাকার উপায় নেই। বিকট মলের গন্ধ। কোথাও কোথাও একশো ফুট উঁচু হয়ে থাকে পাখির বিষ্ঠা। সরকার ডেজার্টার আর কয়েদীদের দিয়ে ওই বিষ্ঠা নিয়ে আসে।'

'ওখানেই আমরা লুকিয়ে থাকতে পারব,' একমত হলো জেমি।

ওরা নিঃশব্দে খুলে ফেলল গুদামঘরের দরজা। ভেলাটি তুলবার চেষ্টা করল। ভীষণ ভারী। নড়ানো যাচ্ছে না। ঘেমে গেল দু'জনেই। কিন্তু একচুল নড়ল না ভেলা।

'একটু দাঁড়াও,' বলল বান্ডা।

সে দ্রুত বেরিয়ে গেল। আধঘণ্টা পরে ফিরে এল বড়, গোল একটা কাঠের গুঁড়ি নিয়ে। 'এটা ব্যবহার করব আমরা। আমি ভেলার একটা পাশ উঁচু করে ধরলেই আপনি চট করে গুঁড়িটা ভেলার নিচে ঠেলে দেবেন।'

বান্ডার শক্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল জেমি। সে ভেলার একটা পাশ উঁচু করে ধরেছে। দ্রুত কাঠের গুঁড়িটা ভেলার নিচে ঠেলে দিল জেমি। তারপর দু'জনে মিলে ভেলার পেছনের অংশটা তুলে ধরল। এবার সহজেই গুঁড়ির ওপরে তুলে ফেলা গেল ভেলা। ভেলাটিকে ওরা কাঠের গুঁড়ির ওপর দিয়ে গড়িয়ে নিল। তারপর আবার আগের মতো প্রথমে ভেলার সামনের অংশটা উঁচু করে ধরল বান্ডা, জেমি নিচে ঠেলে দিল গুঁড়ি এবং তারপর পেছনের অংশ উঁচু করে ধরে সহজেই গুঁড়ির গায়ে গড়িয়ে দিতে পারল। কাজটা খুবই কঠিন এবং ভীষণ পরিশ্রমের। গোল কাঠের গুঁড়ির ওপর দিয়ে ভেলা গড়িয়ে গড়িয়ে সৈকতের ধারে যখন নিয়ে আসতে পারল ওরা ততক্ষণে দু'জনেই ঘেমে গোসল হয়ে গেছে। জেমির ধারণার চেয়ে অনেক বেশি সময় লেগেছে কাজটা করতে। প্রায় ভোর হয়ে আসছে। গ্রামবাসী ঘুম থেকে জেগে ওঠার আগেই ওদেরকে কেটে পড়তে হবে। কারও চোখে পড়ে গেলে সব বরবাদ হয়ে যাবে। ভেলায় দ্রুত পাল খাটিয়ে ফেলল জেমি, পরখ করে দেখে নিল সব ঠিকঠাক আছে কিনা। ওর বারবারই মনে হচ্ছিল কী যেন ভুল করে সঙ্গে নেয়া হয়নি। মনের ভেতরটা কেন খচখচ করছে হঠাৎই ব্যাপারটা বুঝতে পারল জেমি। হেসে উঠল হো হো করে।

বিস্মিত বান্ডা জানতে চাইল, 'কী হলো?'

'আগেরবার হিরের খোঁজে যাবার সময় আমার কাছে মন কে মন বোঝা ছিল। আর আজ শুধু একটি কম্পাস নিয়ে যাচ্ছি সঙ্গে করে।'

শান্ত গলায় বলল বান্ডা, 'তাতে কোনো সমস্যা হবে না, মি. ম্যাকগ্রেগর।'

'আমাকে তুমি নাম ধরে ডাকতে পারো।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল বান্ডা। তারপর জোর গলায় ডাকল, 'জেমি।'

'চলো, হিরে খুঁজে আনি।'

বালুর ওপর দিয়ে ঠেলে অগভীর পানিতে ভেলা ভাসিয়ে দিয়ে চটপট দু'জনে উঠে পড়ল ভেলায়। বৈঠা বাইতে লাগল। অদ্ভুত জলযানটিকে বাগে আনতে কিছুক্ষণ সময় লাগল ওদের। এ যেন লম্ফমান এক ছিপির ওপরে চড়েছে তারা। তবে ভেলাটি যে ঠিকঠাকমতো চলছে সেটাই আসল কথা। দ্রুত স্রোতের টানে উত্তরে এগিয়ে যাচ্ছে। ভেলার পাল তুলে দিল জেমি। গাঁয়ের লোকের যখন ঘুম ভাঙল ততক্ষণে দূর দিগন্তে

মিলিয়ে গেছে ওরা।

'আমরা পেরেছি!' উল্লাস প্রকাশ করল জেমি।

ডানেবামে মাথা নাড়ল বান্ডা। 'এখনও কিছুই পারিনি।' শীতল বেনগুয়েলা স্রোতের দিকে হাত তুলল। 'মাত্র শুরু হলো।'

পাল তুলে ওরা উত্তরে পার হলো আলেকজান্ডার বে, অরেঞ্জ রিভারের মোহনা, কেপ করমোরান্টদের বাড়ি ফেরা আর কতগুলো রঙিন ফ্ল্যামিংগো ছাড়া জীবনের অন্য কোনো চিহ্ন চোখে পড়ল না। টিন ভর্তি গরুর মাংস, ঠাণ্ডা ভাত, ফল আর দুই ক্যান্টিন পানি আছে সঙ্গে, তবু ওদের খেতে ইচ্ছে করছে না। সামনের বিপদ নিয়ে ভাবতে চাইছে না জেমি। কিন্তু এ বিষয়ে পূর্ণ সচেতন বান্ডা। সে ওখানে ছিল। তার মনে পড়ছে অস্ত্রধারী নির্দয় গার্ড আর কুকুরদের কথা, মনে পড়ছে দেহ শতখণ্ডে বিভক্ত করে ফেলা ল্যান্ড মাইনের স্মৃতি। ভাবছে এরকম একটা পাগলামীতে সে কেন সায় দিতে গেল? জেমির দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, ছেলেটা আসলে মস্ত বোকা। আমি যদি মারা যাই, মরব আমার বোনের জন্য। কিন্তু ও মরবে কীসের জন্য?

দুপুরবেলা এল হাঙরের দল। সংখ্যায় গোটা ছয়। পানির ওপর ডানা ভাসিয়ে তরতর করে ছুটে এল ভেলা লক্ষ্য করে।

'ব্ল্যাক-ফিন হাঙর,' বলল বান্ডা। 'ওরা মানুষখেকো।'

জেমি দেখছে ক্রমে কাছিয়ে আসছে হাঙরের ডানা। 'আমরা এখন কী করব?'

ঢোক গিলল বান্ডা। 'সত্যি বলতে কী জেমি, এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি আগে কখনও হইনি আমি।'

একটা হাঙর পিঠ দিয়ে ঢুঁ মারল ভেলায়, ধাক্কার চোটে প্রায় উল্টে যাচ্ছিল ওটা। তাল সামলাতে মাস্তুল চেপে ধরল দু'জনে। জেমি একটা বৈঠা নিয়ে হাঙরটাকে গুঁতো দিল। পরক্ষণে এক কামড়ে বৈঠা দু'টুকরো করে ফেলল হাঙর। হাঙরগুলো এখন ঘিরে ফেলেছে ভেলা, অলস বৃত্ত করে ঘুরছে, প্রকাণ্ড শরীরগুলো ঘষা খাচ্ছে ছোট জলযানটির গায়ে। প্রতিটি ধাক্কায় বিপজ্জনক ভঙ্গিতে কাত হয়ে যাচ্ছে ভেলা। যে কোনো মুহূর্তে উল্টে যাবে।

'ডুবে যাবার আগেই ওগুলোকে হঠাতে হবে।'

'কী করে হঠাবে?' জিজ্ঞেস করল বান্ডা।'

'আমাকে গরুর মাংসের টিনটা দাও।'

'ঠাট্টা করছ? একটিন গরুর মাংসে ওদের ক্ষিদে মিটবে না। ওরা আমাদেরকে চায়।'

আবার ধাক্কা, ভেলা আবারও কাত হয়ে গেল।

'মাংসের টিন!' চেঁচাল জেমি। 'জলদি!'

বান্ডা একটা টিন দিল জেমির হাতে। ভয়ানক ধাক্কায় দারুণ কেঁপে উঠল ভেলা।

'টিনের মুখ আধাআধি কেটে ফেলো। তাড়াতাড়ি।'

বান্ডা পকেট নাইফ দিয়ে ক্যানের মুখের অর্ধেকটা কেটে ফেলল। জেমি ওটা ওর হাত থেকে নিল। কাটা টুকরোটা ভীষণ ধারালো এবং চোখা।

'আমাকে শক্ত করে ধরো।' হুকুম দিল জেমি।

ভেলার কিনারে উবু হয়ে শুয়ে পড়ল ও। অপেক্ষা করছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভেলার পাশে হাঁ করা মুখ তুলল একটা হাঙর, চোয়ালে ঝকঝক করছে বিকট দর্শন ক্ষুরধার দাঁতের সারি। জেমি শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে চোখা টিনের ভাঙা টুকরোটা বসিয়ে দিল হাঙরের চোখে। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত। প্রবল আক্ষেপে মোচড় খেল হাঙরের বিরাট দেহ। প্রচণ্ড বাড়ি দিল ভেলার গায়ে। ভেলাটা উল্টে যেতে গিয়েও গেল না। ভেলার চারপাশের সাগরের পানি অকস্মাৎ লাল হয়ে গেল। পানিতে উঠল তীব্র আলোড়ন। দলের বাকি হাঙরগুলো ছুটে এল তাদের আহত সঙ্গীকে লক্ষ্য করে। ভেলার কথা ভুলে গেল তারা। বুভুক্ষের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল আহত সঙ্গীর ওপর। জ্যান্ত সঙ্গীর গা থেকে দাঁত দিয়ে কামড়ে কামড়ে ছিড়ে নিতে লাগল চাক চাক মাংস। এ ভয়ংকর দৃশ্য নির্বাক হয়ে দেখছে জেমি এবং বান্ডা। স্রোত ওদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে সঙ্গীকে গলাধকরণে ব্যস্ত হিংস্র হাঙরের পাল থেকে দূরে।

বুক ভরে দম নিল বান্ডা। মৃদু গলায় বলল, 'একদিন এই গল্প বলব আমি আমার নাতি-নাতনীদেরকে। ওরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?'

হাসতে হাসতে ওদের চোখে পানি চলে এল।

সেদিন বিকেলে জেমি তার পকেট ঘড়ি দেখে বলল, 'মাঝরাত নাগাদ আমরা ডায়মন্ড বিচে নামব। সূর্যোদয় হবে ভোর ছয়টা ষোল মিনিটে। তার মানে হিরে তুলে নিতে আমরা সময় পাব চার ঘণ্টা আর সাগরে ফিরে আসতে দুই ঘণ্টা। চারঘণ্টার মধ্যে কি কাজ সারা যাবে, বান্ডা?'

'তুমি চার ঘণ্টায় সৈকত থেকে যে পরিমাণ হিরে জোগাড় করতে পারবে শত শত মানুষ সারা জীবনভর অত টাকা খরচ করতে পারবে না।' *হিরে নেয়ার জন্য ধড়ে প্রাণটা থাকলে হয়...।*

বাকি দিনটা বাতাস আর স্রোতের টানে সোজা উত্তরমুখো ভেসে চলল ওরা। সন্ধ্যা নাগাদ ছোট একটি দ্বীপ উদ্ভাসিত হলো ওদের চোখের সামনে। সাকুল্যে দুশো গজের বেশি হবে না লম্বা-চওড়ায়। দ্বীপের যতই কাছাকাছি হলো ওরা, অ্যামোনিয়ার তীব্র কটু গন্ধ ওদের চোখে পানি এনে দিল। এখানে কেন কেউ বাস করে না ভালোই বুঝতে পারছে জেমি। ভয়ানক দুর্গন্ধ। তবে রাত পর্যন্ত লুকিয়ে থাকার জন্য চমৎকার একটি জায়গা। জেমি পাল নামিয়ে নিল। নিচুভূমির ছোট দ্বীপটির পাথুরে তীরে বাড়ি খেল ওদের ভেলা। ভেলা দ্রুত বেঁধে নিয়ে ওরা লাফিয়ে নামল তীরে। দ্বীপভর্তি লাখ লাখ পাখি করমোর‍্যান্ট, পেলিক্যান, গ্যানেট, পেঙ্গুইন এবং ফ্ল্যামিঙ্গো। তাদের চিৎকার

চেঁচামেচিতে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার যোগাড়। আর বিষ্ঠার গন্ধে বন্ধ হয়ে এল নিঃশ্বাস। ওরা মাত্র কয়েক কদম এগিয়েছে, উরু পর্যন্ত ডুবে গেল নরম বিষ্ঠায়।

'তাড়াতাড়ি ভেলায় চলো,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল জেমি।

বিনা বাক্যব্যয়ে তাকে অনুসরণ করল বান্ডা।

ওরা দ্বীপ ছেড়ে ভাগছে, একঝাঁক পেলিক্যান আকাশে উড়ল জমিনের একটা অংশ ফাঁকা করে। ওখানে পড়ে আছে তিনটে লোক। কতদিন আগে মারা গেছে কে জানে। তবে অ্যামোনিয়ার কারণে অবিকৃত হয়ে আছে লাশ। তবে সবার চুল হয়ে গেছে টকটকে লাল।

এক মিনিট পরে ভেলায় ফিরে এল বান্ডা এবং জেমি, চলল সাগরে।

পাল নামিয়ে উপকূলের কাছাকাছি ভেসে রইল ওরা। অপেক্ষা করছে।

'মাঝরাত পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে। তারপর রওনা হব।'

চুপচাপ বসে রইল দু'জনে। সামনে কী আছে সে ভাবনায় অন্যমনস্ক। পশ্চিম দিগন্তে ডুব দেয়ার তোড়জোড় করছে সূর্য, কোনো উন্মাদ চিত্রকর যেন ইচ্ছে মতো নানান রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে আকাশ। হঠাৎ ঝপ করে নেমে এল আঁধার।

আরও ঘণ্টা দুই অপেক্ষা করল ওরা তারপর পাল তুলল। পুবে অদৃশ্য সৈকত অভিমুখে চলল ভেলা। মাথার ওপর মেঘ সরে গিয়ে এক ফালি ম্লান জোসনার আবির্ভাব ঘটল। স্রোত ও বাতাসের টানে গতি পেল ভেলা। দূর থেকে উপকূলের হালকা রেখা চোখে পড়ল ওদের। বাতাসের বেগ বাড়ছে, থাবা বসাচ্ছে পালে, ঠেলে দ্রুত নিয়ে যাচ্ছে উপকূলে। একটু পরে জমিনের তটরেখা পরিষ্কার ভেসে উঠল চোখে, পাথরের দানবীয় একটা পাঁচিল। এতদূর থেকেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এবং শোনা যাচ্ছে মাথায় সাদা ফেনার মুকুট নিয়ে রিফের গায়ে আছড়ে পড়ছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ। দৃশ্যটা ভয়ংকর। জেমি ভাবছিল কাছাকাছি হবার পরে ওদের কপালে না জানি কী আছে।

সে ফিসফিস করে বান্ডাকে প্রশ্ন করল, 'তুমি ঠিক জানো সৈকতে পাহারা বসানো নেই?'

জবাব দিল না বান্ডা। আঙুল তুলে সামনের রিফ দেখাল। ওর ইঙ্গিতে বুঝতে পারল জেমি। ওই রিফগুলোর মতো ভয়ংকর ফাঁদ আর হয় না। ওই ফাঁদ এড়ানো কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ওগুলো হলো সাগর-প্রহরী, ওরা কখনও বিশ্রাম নেয় না, কদাপি নিদ্রা যায় না। ওরা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, ধৈর্য ধরে শিকারের অপেক্ষা করছে। *বেশ,* মনে মনে বলল জেমি, *আমরা তোমাদেরকে ফাঁকি দেব। তোমাদেরকে টপকে দ্বীপে উঠব।*

তীর এখন দ্রুত ছুটে আসছে ওদের দিকে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ আছড়ে পড়ছে ভেলার গায়ে। বান্ডা শক্ত করে চেপে ধরে থাকল মাস্তুল।

'আমরা বড্ড বেশি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি।'

'চিন্তা কোরো না,' তাকে আশ্বস্ত করল জেমি। 'তীরের কাছাকাছি হওয়ার সময় নামিয়ে দেব পাল। তখন কমে আসবে গতি। খুব সহজেই রিফ পার হয়ে যেতে পারব আমরা।'

বাতাসের হুংকার এবং ঢেউয়ের গর্জন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ভয়াল রিফের দিকে শাঁ শাঁ করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ভেলা। দূরত্বটা দ্রুত পরিমাপ করে নিল জেমি। পাল ছাড়াই ঢেউয়ের ধাক্কায় তীরে পৌঁছে যেতে পারবে ভেলা। দ্রুত পাল নামিয়ে ফেলল সে। তবে ভেলার চলার গতি বিন্দুমাত্র মন্থর হলো না। ভেলা এখন পুরোপুরি বিরাট ঢেউগুলোর কব্জায়, নিয়ন্ত্রণের বাইরে, একটার পর একটা পাহাড়সমান ঢেউয়ের মাথায় উঠে যাচ্ছে আবার নেমে পড়ছে। এমন জোরে ঝাঁকি খাচ্ছে ভেলা, দু'হাত দিয়ে ভেলা চেপে ধরে রাখতে হচ্ছে ওদেরকে। নইলে যে কোনো মুহূর্তে ছিটকে পড়ে যাবে। রিফে প্রবেশ কঠিন হবে ধারণা করেছিল জেমি কিন্তু এমন বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝার মাঝে পড়তে হবে কল্পনাও করেনি। আশ্চর্যরকম পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা রিফগুলো। ধারালো পাথরখণ্ডে বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ঢেউ, বিস্ফোরিত হচ্ছে বিরাট ক্রুদ্ধ প্রস্রবণের আকার নিয়ে। ওদের পুরো পরিকল্পনা এখন নির্ভর করছে রিফের ওপর দিয়ে অখণ্ড ভেলা ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার ওপরে। তাহলেই কেবল ফিরতি পথে এ ভেলা নিয়ে পালানো যাবে। কোনো কারণে ভেলা ভেঙে গেলে মৃত্যু ওদের সুনিশ্চিত।

ঢেউয়ের প্রচণ্ড টানে রিফের ধারে চলে এল ওরা। বাতাসের হুংকারে কানে তালা লাগার দশা। হঠাৎ পাহাড় সমান একটা ঢেউ ভেলাটিকে আকাশে তুলে ফেলল, যেন উড়িয়ে নিয়ে চলল পাহাড়ের দিকে।

'সাবধান বান্ডা!' চিৎকার দিল জেমি। 'বাড়ি খাবো আমরা!'

দানব তরঙ্গ ভেলাটিকে দেশলাই কাঠির মতো তীরের দিকে টেনে নিয়ে চলল, রিফের ওপর দিয়ে। ওরা দু'জন ভেলা আঁকড়ে ঝুলে থাকল, স্রোতের টানে যাতে ভেসে না যায়। নিচে তাকাল জেমি। এক ঝলক দেখতে পেল ক্ষুরধার রিফ। আর এক মুহূর্ত বাদেই তীরে আছড়ে পড়বে ওদের ভেলা।

ঠিক সে মুহূর্তে ভেলার নিচের কাঠের ব্যারেল ভেঙে যাওয়ার শব্দ হলো। ভেলাটি হঠাৎ একপাশে কাত হয়ে গেল। আরেকটি ব্যারেল গেছে, তারপর আরেকটি। পাগল হাওয়া, উন্মাতাল তরঙ্গ আর ক্ষুধার্ত শৈলশীলা ভেলাটিকে নিয়ে যেন মেতে উঠেছে ধ্বংসযজ্ঞের খেলায়। ওটাকে সামনে পেছনে ছুড়ে মারছে, শূন্যে লাট্টুর মতো ঘোরাচ্ছে বনবন করে। জেমি এবং বান্ডা টের পেল তাদের পায়ের তলা থেকে পাতলা তক্তাগুলো খুলে যেতে শুরু করেছে।

'লাফাও!' চিৎকার দিল জেমি।

ভেলার একপাশ দিয়ে ডাইভ দিল সে, তাকে খপ করে ধরে ফেলল দানব একটি ঢেউ, গুলতি ছোঁড়ার গতিতে টেনে নিয়ে চলল সৈকত পানে। এ এক প্রাকৃতিক শক্তির কবলে পড়েছে জেমি যার পরাক্রমের বুঝি তুলনা নেই। যা ঘটছে তার ওপর কোনো

নিয়ন্ত্রণ নেই ওর। সে এখন ঢেউয়ের একটা অংশ হয়ে গেছে। ঢেউ ওর গায়ের ওপর, শরীরের পাশে, শরীরের নিচে। তাকে নিয়ে দলামোচড়া করছে ঢেউ, বাতাসের অভাবে ওষ্ঠাগত প্রাণ। জেমির মাথার মধ্যে আলোর ফুলঝুরি। আমি ডুবে মারা যাচ্ছি, ভাবছে ও। আর ঠিক তখন ওর শরীরটা উৎক্ষিপ্ত হলো বালুকাবেলায়। সৈকতের ওপর শুয়ে থাকল জেমি। মুখ হাঁ করে টানছে বাতাস। ফুসফুসে ঢুকে যাচ্ছে তাজা, শীতল হাওয়া। ওর বুকে আর পায়ে বালু, পরনের জামা-কাপড় ছিড়ে গেছে। ধীরে ধীরে উঠে বসল জেমি। চারপাশে তাকাল বান্ডার খোঁজে। ওর থেকে দশ গজ দূরে হামাগুড়ি দিয়ে আছে বান্ডা। সাগরের নোনাজল বমি করছে। সিধে হলো জেমি। টলতে টলতে এগোল বান্ডার দিকে।

'তুমি ঠিক আছো তো?'

মাথা ঝাঁকাল বান্ডা। বুক ভরে কম্পমান শ্বাস নিল, তাকাল জেমির দিকে। 'আমি সাঁতার জানি না।'

জেমি ওকে খাড়া হতে সাহায্য করল। দু'জনে মিলে তাকাল রিফের দিকে। ওদের ভেলার চিহ্নমাত্র নেই। বুনো সাগর ভেলাটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। ওরা ডায়মন্ড ফিল্ডে প্রবেশ করেছে।

তবে এখান থেকে বেরুবার কোনো রাস্তা নেই।

দশ

ওদের পেছনে গজরাচ্ছে মহাসমুদ্র। সামনে সাগর থেকে উঠে আসা সমতল মরুভূমি গিয়ে মিশেছে দূরের রিখটারভেল্ড পর্বতমালার পাদদেশে। ওখানে ম্লান চাঁদের আলোয় ভিজছে গিরিখাদ আর ক্রমে ওপরের দিকে পাকিয়ে ওঠা পাহাড়চুড়ো। পাহাড়ের পায়ের কাছে হেজেনকেসেল ভ্যালি বা 'ডাইনির কড়াই'– শীতল বায়ুর একটা ফাঁদ। ওই আদি ও হতশ্রী ল্যান্ডস্কেপ যেন সময়ের শুরু থেকেই রয়েছে। এ জায়গায় যে মানুষের পা পড়েছে কখনও তার প্রমাণ দিতেই যেন বালুতে পুঁতে রাখা হয়েছে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা একটা সাইনবোর্ড। চাঁদের আলোয় সাইনবোর্ডটি পড়ল ওরা

VERBODE GEBIED
SPERRGFBIET

নিষিদ্ধ।

সাগর পথে পালাবার কোনো রাস্তা নেই। শুধু একটা পথই খোলা আছে ওদের সামনে– নামিব মরুভূমি। 'মরুভূমি পার হবার ঝুঁকিটা নিতেই হবে,' বলল জেমি।

মাথা নাড়ল বান্ডা। 'আমাদেরকে দেখা মাত্র গুলি করবে গার্ডরা কিংবা ঝুলিয়ে দেবে ফাঁসিতে। গার্ড এবং কুকুরগুলোকে কোনোভাবে ফাঁকি দিতে পারলেও ল্যান্ড মাইনের ফাঁদ এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। আমরা মরা মানুষ।'

তার চেহারায় ভয়ের ছিটেফোঁটাও নেই, কেবল নিয়তির কাছে নিজেকে সমর্পণের অসহায়ত্বটুকু ছাড়া।

বান্ডার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অনুশোচনায় ভরে গেল জেমির মন। কালো মানুষটাকে সেই তো জোর করে এর মধ্যে টেনে এনেছে। কিন্তু বান্ডা একবারের জন্যেও কোনো অভিযোগ করেনি। এমনকী এখন, পালাবার পথ নেই জেনেও সে জেমিকে কিছুই বলেনি।

তীরে আছড়ে পড়া ক্রুদ্ধ ঢেউগুলোর প্রাচীরের দিকে মুখ ফেরাল জেমি। এতদূর যে আসতে পেরেছে সেটাকে স্রেফ অলৌকিক একটা ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে তার। এখন রাত দুটো, ভোর হতে ঘণ্টাচারেক বাকি। এ সময়ের মধ্যে কাজ উদ্ধার করাও সম্ভব। তাছাড়া ওরা তো অক্ষতই রয়েছে। *এখন হাল ছেড়ে দেয়া খুবই বোকামী হবে,* ভাবছে

জেমি।

'চলো, কাজে নেমে পড়ি, বান্ডা।'

চোখ পিটপিট করল বান্ডা, 'কী করব?'

'আমরা এখানে হিরে নিতে এসেছি, তাই না? চলো, হিরে সংগ্রহ করি।'

ছেড়া ট্রাউজার্স পরা, সাদা চুলের, বুনো দৃষ্টির মানুষটার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল বান্ডা। 'কী বলছ তুমি?'

'তুমি না বললে ওরা আমাদেরকে দেখা মাত্র গুলি করবে? ওরা আমাদেরকে বড়লোক হিসেবে অথবা গরীব হিসেবে দু'ভাবেই হত্যা করতে পারে। মিরাকলের কারণে এখানে এসে পৌঁছাতে পেরেছি আমরা। হয়তো আরেকটা মিরাকলের দরুণ এখান থেকে বেরিয়েও যেতে পারব। আর বেরুতে পারলে খালি হাতে নিশ্চয় যাব না।'

'তুমি একটা পাগল,' মৃদু গলায় বলল বান্ডা।'

'না হলে কী আর এখানে আসি,' সায় দিল জেমি।

কাঁধ ঝাঁকাল বান্ডা। 'ভাগ্যে যা আছে তা-ই ঘটবে। ওদের কাছে ধরা পড়ার আগ পর্যন্ত তো আর কিছু করার নেই।'

পরনের ছেঁড়া জামাটা খুলে ফেলল জেমি। ওর দেখাদেখি একই কাজ করল বান্ডাও।

'এখন বলো সেই বড়বড় হিরেগুলো কোথায়?'

'ওগুলো ছড়িয়ে আছে সর্বত্র।' বলল বান্ডা। 'গার্ড আর কুকুরদের মতোই।'

'ওদেরকে নিয়ে পরে চিন্তা করলেও হবে। সৈকতে ওরা কখন আসে?'

'ভোরের আলো ফোটার সময়।'

জেমি একটু চিন্তা করল। 'সৈকতে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে ওরা যায় না? যেখানে আমরা লুকিয়ে থাকতে পারি?'

'সৈকতের এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে ওরা যায় না। আর মাছি লুকাবার মতো ফাঁকও নেই।'

বান্ডার কাঁধে চাপড় দিল জেমি। 'বেশ। তাহলে চলো এগোই।'

জেমি দেখল হাত আর হাঁটুর ওপর ভর করে উপুড় হলো বান্ডা তারপর মন্থর গতিতে সৈকত ধরে হামাগুড়ি দিয়ে চলল। চলার পথে আঙুল দিয়ে বালু খুঁড়ছে। দুই মিনিট পার হবার আগেই সে থেমে গিয়ে একটা পাথর তুলে দেখাল। 'একটা পেয়েছি!'

নিচু হলো জেমি। বালুতে হামাগুড়ি দিয়ে চলল। প্রথম যে দুটো পাথর ও পেল সেগুলো আকারে ছোট। তৃতীয়টির ওজন কমপক্ষে পনেরো ক্যারেট হবে। ওখানে বসে দীর্ঘক্ষণ হিরকখণ্ডটির দিকে তাকিয়ে রইল জেমি। এত সহজে হিরে পাবার ব্যাপারটি ওর কাছে অস্বাভাবিক এক ভাগ্য বলে মনে হচ্ছে। আর এ হিরের মালিক সলোমন ভ্যান ডার মার্ভি এবং তার পার্টনাররা। জেমি হিরে কুড়িয়ে চলল।

পরবর্তী তিন ঘণ্টায় ওরা দু'জনে মিলে দুই থেকে ত্রিশ ক্যারেট ওজনের চল্লিশটির

বেশি হিরে পেয়ে গেল। পুবের আকাশ ফিকে হতে শুরু করেছে। এ সময়টাতেই জেমি চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। ভেবেছিল ভেলায় উঠে, পাল খাটিয়ে পগারপার হবে। কিন্তু সে আশায় গুড়েবালি।

'একটু পরেই সকাল হবে,' বলল জেমি। 'তার আগে আরও যে ক'টা হিরে পাও জোগাড় করে ফেলো।'

'তুমি খুব বড়লোক হিসেবে মরতে চাও, না?'

'আমি একদমই মরতে চাই না।'

ওরা সন্ধান চালিয়ে গেল। একটার পর একটা হিরে পেয়ে যাচ্ছে। যেন পাগলামিতে পেয়ে বসেছে দু'জনকে। হিরের স্তূপ ক্রমে বড় হচ্ছে, কমপক্ষে ষাটটি হিরে পেল ওরা। হিরেগুলো রেখেছে ছেঁড়া শার্টের ঝুলির মধ্যে। শার্টটা একটা গিট্টু দিয়ে বেঁধে ফেলল জেমি। আকাশের দিকে তাকাল জেমি। হালকা ধূসর পূর্বাকাশ, উদীয়মান সূর্যের রঙ ছড়িয়ে পড়বে এখনই।

প্রশ্ন হলো এরপরে কী? ওরা এখানে দাঁড়িয়ে থেকে খুন হয়ে যেতে পারে অথবা মরুভূমির ভেতরে ঢুকেও মৃত্যুর কবলে পড়তে পারে।

'চলো, এগোই।'

জেমি এবং বান্ডা পাশাপাশি ধীর পায়ে হাঁটা দিল সামনে।

'ল্যান্ড মাইনের শুরু কোনখান থেকে?'

'আর একশোগজ পরেই,' দূর থেকে ভেসে এল কুকুরের ডাক। 'ল্যান্ড মাইন নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে। কারণ কুকুরগুলো এদিকেই আসছে। মর্নিং শিফটের গার্ডদের কাজ শুরু হয়ে গেল।'

'এখানে পৌঁছাতে ওদের কতক্ষণ লাগবে?'

'পনেরো মিনিট। দশ মিনিটেও চলে আসতে পারে।'

এখন প্রায় পূর্ণ সকাল। অস্পষ্ট আকৃতিগুলো এখন ছোট ছোট বালুর ঢিবি আর দূরের পাহাড় হিসেবে দিব্যি চেনা যাচ্ছে। লুকাবার কোনো জায়গাই নেই।

'একেক শিফটে কতজন গার্ড থাকে?'

বান্ডা একটু ভেবে জবাব দিল, 'প্রায় দশজন।'

'এতবড় সৈকতের জন্য দশজন গার্ড যথেষ্ট নয়।'

'একজন গার্ডই যথেষ্ট। ওদের কাছে অস্ত্র এবং কুকুর আছে। গার্ডগুলো অন্ধ নয় আর আমরাও অদৃশ্য মানব নই।'

কুকুরের ঘেউ ঘেউ ক্রমে কাছিয়ে আসছে। জেমি বলল, 'আমি দুঃখিত, বান্ডা। তোমাকে এর মধ্যে নিয়ে আসা মোটেই উচিত হয়নি।'

'তুমি আমাকে তো আর জোর করে নিয়ে আসনি।'

দূর থেকে মনুষ্যকণ্ঠ শোনা গেল।

জেমি এবং বান্ডা বালুর ছোট একটা ঢিবির কাছে চলে এসেছে। 'আমরা যদি বালু

খুঁড়ে গর্তে লুকিয়ে থাকি?

'ওরকম চেষ্টা আগেও করা হয়েছে। কুকুরগুলো আমাদের ঠিকই খুঁজে পাবে এবং কামড়ে ছিড়ে নেবে গলার টুটি। আমি দ্রুত মৃত্যু চাই। আমার উপস্থিতির কথা ওদেরকে জানিয়ে দেব তারপর দৌড় দেব। তখন ওরা আমাকে গুলি করবে– আ-আমি কুকুরের হাতে মরতে চাই না।'

জেমি বান্ডার হাত খামচে ধরল। 'আমরা মরলে মরব। তবে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে মরতে চাই না।'

দূর থেকে মানুষজনের গলা ভেসে এল। 'এগো হারামজাদার দল' খেঁকিয়ে উঠল একটা কণ্ঠ। 'আমার পেছন পেছন এসো... সবাই এক সারিতে... রাতে তো নাক ডেকে ঘুমিয়েছ... এখন একটু গতর খাটাও...।

বাইরে সাহস দেখালেও ভেতরে ভেতরে ভয়ে চুপসে গেছে জেমি। সাগরের দিকে মুখ ফেরাল। *ডুবে মরা কি সহজ কাজ?* দানব ঢেউগুলো প্রবল আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ছে রিফের গায়ে। ঢেউ ছাড়িয়ে হঠাৎ কী একটায় যেন ওর নজর আটকে গেল। বুঝতে পারল না জিনিসটা কী। 'বান্ডা, দ্যাখো...'

দূরের সাগর গর্ভ থেকে উঠে আসছে দুর্লভ এক ধূসর প্রাচীর, শক্তিশালী পশ্চিমা বাতাস ছুটিয়ে নিয়ে আসছে ওটাকে এদিকেই।

'এ সেই সাগর *মিস!*' উত্তেজিত গলায় বলল বান্ডা। 'সপ্তাহে দুই একবার দেখা যায় ওই কুয়াশা।'

ওরা কথা বলছে, কাছিয়ে আসতে লাগল *মিস* বা সাগরকুয়াশা, যেন দানব ধূসর এক পর্দা দিগন্তের আকাশটাকে লেপেপুছে একাকার করে ফেলেছে।

মানবকণ্ঠগুলো এবারে আরও কাছ থেকে শোনা গেল। *Den douount!* শালার মিস! আবার কাজে ঢিলে গতি। কর্তারা ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করবেন না...।'

'আমরা একটা সুযোগ পেয়ে গেছি।' ফিসফিস করল জেমি।

'কী সুযোগ?'

'ওই মিস! ওরা এখন আর আমাদেরকে দেখতে পাবে না।'

'ও কুয়াশা আমাদের খুব একটা সাহায্যে আসবে না। কিছুক্ষণ পরেই কেটে যাবে কুয়াশা। কিন্তু তখনও আমরা এখানেই থাকব। গার্ডরা ল্যান্ড মাইন ফাঁকি দিয়ে হাঁটতে না পারলে আমরাও পারব না। কুয়াশার মধ্য দিয়ে তুমি মরুভূমিতে দশ গজও যেতে পারবে না তার আগেই মাইনের আঘাতে উড়ে যাবে। একমাত্র কোনো মিরাকল ঘটনাই তোমাকে বাঁচাতে পারবে।'

'আমি সেরকম একটা মিরাকলই এখন আশা করছি,' বলল জেমি।

এগারো

মাথার ওপরের আকাশ কালো হয়ে আসছে। কাছিয়ে আসছে *মিস*, সাগর গ্রাস করে এবার গিলে খাবে সৈকত। গড়াতে গড়াতে এগিয়ে আসছে ভীতিকর চেহারার কুয়াশার ঘন পর্দা। দেখলে ছমছম করে গা। কিন্তু মোটেই ভয় লাগছে না জেমির। বরং উল্লসিত হয়ে ভাবছে *ওটা আমাদের জীবন বাঁচাতে আসছে।'*

হঠাৎ শোনা গেল উচ্চকিত একটি কণ্ঠ। 'অ্যাই! তোমরা দু'জন! কী করছ ওখানে?'

ঘুরল জেমি এবং বান্ডা। একশো গজ দূরে একটি বালিয়াড়ির ওপর রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে এক গার্ড। তীরের দিকে চোখ ফেরাল জেমি। দ্রুত এগিয়ে আসছে মিস।

'অ্যাই, তোমরা এদিকে এসো!' হাঁক ছাড়ল গার্ড। তুলল রাইফেল।

মাথার ওপর হাত তুলল জেমি। 'আমার পা মচকে গেছে।' জোরে বলল ও। 'হাঁটতে পারছি না।'

'যেখানে আছো সেখানেই থাকো।' হুকুম দিল গার্ড। 'আমি আসছি তোমাদের কাছে।' রাইফেল নামিয়ে সে বালুর ঢিবি বেয়ে নেমে আসতে লাগল। দ্রুত একবার পেছন দিকটা দেখে নিল জেমি। তীরের একদম কাছে পৌঁছে গেছে কুয়াশা, হাঁ হাঁ করে ছুটে আসছে।

'ভাগো!' ফিসফিস করল জেমি। ঘুরেই সৈকতের দিকে দৌড় দিল। পরক্ষণে ওকে অনুসরণ করল বান্ডা।

'থামো!'

এক সেকেন্ড পরেই গুলির আওয়াজ হলো। ওদের সামনের বালু ছিটকে উঠল। ওরা ছুটতে থাকল, ঘন কুয়াশার দেয়ালের মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে জানবাজি রেখে দৌড়াচ্ছে। আরেকবার গর্জে উঠল বন্দুক। এবারে আরও কাছে এসে বিঁধল বুলেট তারপর আরেকটা। পরের মুহূর্তে ওরা দু'জন ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ওদেরকে গিলে নিল সাগর কুয়াশা। ওরা যেন তুলোর মধ্যে কবর হয়ে গেছে। এমনই লাগল কুয়াশার পরশ। একদমই কিছু দেখা যাচ্ছে না।

প্রহরীদের কণ্ঠ এখন ভোঁতা এবং দূরাগত, কুয়াশার দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যাচ্ছে, আবার শোনা যাচ্ছে সকল দিক থেকে। ওরা শুনতে পেল গার্ডের দল একে অন্যের নাম ধরে ডাকাডাকি করছে।

'ক্রুগার.. ব্রেন্ট বলছি... আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

'শুনতে পাচ্ছি, ক্রুগার...

'ওরা মোট দু'জন,' প্রথম কণ্ঠটি চিৎকার করে জানান দিল।

'একজন সাদা, আরেকজন কালো। সৈকতের দিকে গেছে ওরা। তোমার লোকজনকে গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে বলো। Skiet nom! দেখামাত্র গুলি করবে।'

'আমার সঙ্গে থাকো,' ফিসফিসিয়ে বলল জেমি।

বান্ডা ওর হাত চেপে ধরল। 'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'এখান থেকে বেরিয়ে পড়ার ধান্ধা করছি।'

জেমি পকেট থেকে কম্পাস বের করে মুখের সামনে নিয়ে এল। প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পুবদিকটা কোথায় নির্দেশ করছে কম্পাস বহুকষ্টে দেখে নিয়ে ও বলল, 'এই পথে...

'দাঁড়াও! আমরা হেঁটে যেতে পারব না। গার্ড কিংবা কুকুরের গায়ে যদি ধাক্কা না-ও খাই, ল্যান্ড মাইনের ওপর নির্ঘাৎ পা দিয়ে ফেলব।'

'তুমি বলেছিলে একশো গজ যাওয়ার পরে মাইন এলাকার শুরু। চলো, সৈকত থেকে বেরিয়ে পড়ি।'

মন্থর এবং স্খলিত পদক্ষেপে অচেনা মরুভূমিতে এগোল ওরা অন্ধের মতো। গুনে গুনে পা ফেলছে জেমি। পথে নরম বালুতে হোঁচট খেলে দাঁড়িয়ে পড়ছে, তারপর আবার এগোচ্ছে। কয়েক কদম এগিয়ে থেমে গিয়ে কম্পাসে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে জেমি। যখন বুঝতে পারল একশো গজ রাস্তা পার হয়ে এসেছে, থেমে গেল ও।

'এখান থেকেই ল্যান্ড মাইন শুরু হওয়ার কথা। ওরা কোন প্যাটার্ন বা নকশা অনুযায়ী কি মাইন পুঁতেছে? এমন কিছু বলো যাতে আমাদের সাহায্য হয়।'

'প্রার্থনা,' জবাব দিল বান্ডা। 'একমাত্র প্রার্থনা করা ছাড়া আর কিছু তোমাকে বলার নেই আমার, জেমি। সারা মাঠ জুড়ে যত্রতত্র ওরা পুঁতে রেখেছে মাইন। ছয় ইঞ্চি মাটির নিচে। কুয়াশা কেটে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমরা তারপর ধরা দেব ওদের কাছে।'

জেমি শুনতে পেল তুলোয় মোড়ানো কণ্ঠগুলো প্রতিধ্বনি তুলছে ওদের চারপাশে।

'ক্রুগার! আমার গলা শুনতে পেলে সাড়া দিও...

'আচ্ছা, ব্রেন্ট..

'ক্রুগার...

'ব্রেন্ট...

চোখ অন্ধ করা কুয়াশায় ভাঙা ভাঙা কণ্ঠগুলো একে অন্যকে ডাকাডাকি করতে লাগল। ঝড়ের বেগে চলছে জেমির মস্তিষ্ক। মরিয়া হয়ে ভাবছে কীভাবে পালানো যায়। ওরা যেখানে আছে, সেখানেই যদি থাকে, কুয়াশা কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুলি খেয়ে মারা যাবে। আর মাইন ভর্তি মাঠ দিয়ে এগোবার চেষ্টা করলে যে কোনো মুহূর্তে বোমার

আঘাতে উড়ে যাবে।

'তুমি কি কখনও ল্যান্ড মাইন দেখেছ?' নিচু গলায় জানতে চাইল জেমি।

'কয়েকটা মাইন নিজের হাতে মাটিতে পুঁতেছি আমি।'

'ওগুলো বিস্ফোরিত হয় কীভাবে?'

'মানুষের শরীরের ভারে। আশি পাউন্ড ওজনের ওপরে কোনো কিছুর চাপ খেলেই ওগুলো ফেটে যায়। এ কারণেই কুকুরগুলো বেঁচে যায়। ওগুলোর ওজন আশি পাউন্ডের কম।'

বুক ভরে দম নিল জেমি। 'বান্ডা, এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার একটা রাস্তা বোধকরি পেয়ে গেছি আমি। তবে এতে কাজ না-ও হতে পারে। তুমি কি আমার সঙ্গে জুয়াটা খেলবে?'

'তোমার মতলব কী বলোতো?'

'আমরা হামাগুড়ি দিয়ে পার হব মাইন ফিল্ড। আমাদের সমস্ত ওজন থাকবে পেটের ওপর। এভাবেই আমরা শুধু এগোতে পারব।'

'ওহ্, যীশাস!'

'কী ভাবছ তুমি?'

'ভাবছি কেপটাউন থেকে আসাটাই পাগলামো হয়ে গেছে।'

'তুমি যাবে কিনা বলো?' বান্ডা যদিও পাশে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু ওর চেহারা প্রায় দেখতেই পাচ্ছে না জেমি।

'তুমি আসলে কাউকে ভাবার তেমন সময় দিতে চাও না, তাই না?'

'তাহলে এসো।'

সাবধানে বালুর ওপর শুয়ে পড়ল জেমি। বান্ডা ওর দিকে একবার তাকাল তারপর গভীর একটা দম নিয়ে যোগ দিল ওর সঙ্গে। ওরা দু'জন ধীর গতিতে হামাগুড়ি দিয়ে চলল বালুর ওপরে, মাইন ফিল্ডের দিকে। 'এগোবার সময়,' ফিসফিস করল জেমি, 'হাত অথবা পা দিয়ে মাটিতে চাপ দেবে না। পুরো শরীরটা ব্যবহার করবে।'

কোন জবাব এল না। বান্ডা তখন বেঁচে থাকার সংগ্রামে মনোযোগ দিতে ব্যস্ত।

গোটা সৈকত ঢেকে ফেলেছে ধূসর কুয়াশা। কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। যে কোনো মুহূর্তে ওরা গার্ড কিংবা কুকুরের গায়ের সঙ্গে ধাক্কা খেতে পারে, হাত পা পড়তে পারে ল্যান্ড মাইনের ওপর। এসব দুশ্চিন্তা জোর করে মন থেকে সরিয়ে রাখল জেমি। অসহ্য ধীরগতিতে এগোচ্ছে ওরা। দু'জনের কারো গায়েই জামা নেই, ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোচ্ছে, পেটে ঘষা খাচ্ছে বালু। জেমি খুব ভালোকরেই জানে সামনে ওঁৎ পেতে আছে ভয়ংকর সব বিপদ। ভাগ্যগুণে গুলি কিংবা মাইনের কবল থেকে রক্ষা পেলেও প্রবেশপথে ওয়াচটাওয়ারের সশস্ত্র রক্ষী আর কাঁটাতারের বাধা পেরোবে কী করে? আর *মিস* কতক্ষণ স্থায়ী হবে কেউ জানে না। যে কোনো মুহূর্তে কুয়াশা কেটে গিয়ে ওদের

উপস্থিতি ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

ওরা একটানা হামাগুড়ি দিয়ে চলল, এক সময় সময়ের হিসেব তালগোল পাকিয়ে ফেলল। ইঞ্চিগুলো পরিণত হলো ফুটে, ফুটগুলোর রূপান্তর ঘটল গজে আর গজগুলো আকার নিল মাইলে। জানে না কতক্ষণ ধরে ওরা এগিয়ে চলেছে। মাটির ওপর মাথা রেখে চলতে বাধ্য হচ্ছে বলে ওদের নাক-মুখ-চোখে ঢুকে গেছে বালু। শ্বাস করতে খুব কষ্ট হচ্ছে।

দূর থেকে গার্ডদের অবিরাম হাঁক চিৎকার ভেসেই আসছে।

'ক্রুগার.. ব্রেন্ট... ক্রুগার... ব্রেন্ট...'

ওরা দু'জন কিছুক্ষণ পরে থামল একটু বিশ্রাম নিতে। চোখ বুলাল কম্পাসে। তারপর আবার শুরু হলো বিরতিহীন হামাগুড়ি। দ্রুত এগোবার জন্য ভীষণ তাড়া দিচ্ছে মন কিন্তু তাতে হাত-পায়ে চাপ পড়বে বেশি। আর তাহলেই সর্বনাশ! কল্পনায় জেমি দেখতে পেল তার শরীরের নিচে ধাতব ফ্রাগমেন্ট বিস্ফোরিত হয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে পেট। সে মন্থর গতিই অব্যাহত রাখল। মাঝে মাঝে ভিন্ন গলার মানুষজনের আওয়াজও শুনতে পাচ্ছে। তবে কুয়াশার ঘন পর্দার আড়াল ভেদ করে কাঁপা শোনায় শব্দগুলো, বোঝা মুশকিল এসব আওয়াজ এবং শব্দের উৎস ঠিক কোনদিকে।

অকস্মাৎ মাটি ফুঁড়ে রোমশ একটা শরীর লাফ দিল জেমিকে লক্ষ্য করে। এতই দ্রুত ঘটেছে ঘটনা যে প্রস্তুত হওয়ার বিন্দুমাত্র সময় পায়নি ও। টের পেল প্রকাণ্ড আকারের অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা ওর হাতে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে। হাত থেকে হিরের থলেটা ছেড়ে দিল জেমি, কুকুরটার চোয়াল ধরে টানাটানি করতে লাগল। কিন্তু এক হাত দিয়ে ওটার কামড় একটুও আলগা করতে পারল না। কুকুরটার দাঁত মাংসের আরও গভীরে বসে যাচ্ছে। নিঃশব্দ এবং ভয়ংকর তার কামড়। জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে, বুঝতে পারছে জেমি। হঠাৎ থপ করে মৃদু, ভোঁতা একটি শব্দ হলো, আলগা হয়ে এল কুকুরের চোয়াল, স্থির হয়ে গেল ওটার চকচকে চোখের চাউনি। ব্যথায় ধোঁয়াশা চাদরের মধ্যেও জেমি দেখল হাতের হিরের ঝোলাটা দিয়ে কুকুরটার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলছে বান্ডা। একবার মৃদু গলায় কেউ কেউ করে উঠে মাটিতে এলিয়ে পড়ল কুকুর।

'তুমি ঠিক আছ তো?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল বান্ডা।

কথা বলতে পারল না জেমি। শুয়ে রইল সে, ব্যথার ঢেউটা কমে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। বান্ডা পরনের প্যান্ট ছিঁড়ে ফালি কাপড়টা দিয়ে শক্ত করে জেমির হাত বেঁধে দিল যাতে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

'আমাদের থামলে চলবে না,' সতর্ক করে দিল বান্ডা। 'কে জানে আশপাশে আরও কুকুর আছে কিনা।'

মাথা ঝাঁকাল জেমি। হাতের দপদপে ব্যথা অগ্রাহ্য করে ধীরে ধীরে আগে বাড়তে লাগল সে।

বাকি পথটুকু কীভাবে এগিয়েছে কিছুই মনে নেই জেমির। ওর প্রায় অর্ধসচেতন

দশা, যন্ত্রচালিতের মতো চলছিল। ওর বাইরের কে যেন ওকে চালিত করছিল। হাত সামনে বাড়ো, শরীরটা এবারে টানো... হাত সামনে বাড়ো, শরীরটা এবারে টানো। এ এক সীমাহীন যন্ত্রণার যাত্রা। বান্ডার হাতে এখন কম্পাস। জেমি হামাগুড়ি দিয়ে একবার ভুল পথে রওনা হচ্ছিল, বান্ডা ওকে বাধা দিয়েছে। ওদেরকে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে গার্ড, কুকুর আর ল্যান্ড মাইন, শুধু সাগর-কুয়াশা ওদেরকে সুরক্ষা দিচ্ছে। ওরা এগিয়ে চলল, জীবন বাঁচাতে ক্রল করে এগোচ্ছে, একসময় দুজনের কারোরই আর এক ইঞ্চিও আগে বাড়বার শক্তি রইল না।

ওরা ঘুমিয়ে পড়ল।

জেমির চোখ খুলে মনে হলো কী যেন একটা পরিবর্তন ঘটেছে। সে বালুর ওপর শুয়ে রইল, ব্যথায় শরীর বিষ, মনে করার চেষ্টা করল কোথায় আছে। বান্ডা হাত ছয় দূরে শুয়ে ঘুমাচ্ছে, হঠাৎ সব কথা মনে পড়ে গেল জেমির। রিফের গায়ে বাড়ি খেয়ে ভেঙে গিয়েছিল ওদের ভেলা... এগিয়ে আসছিল সাগর কুয়াশা... কিন্তু কোথায় যেন একটা ব্যাপার ঠিক মেলাতে পারছে না। বুঝতে পারছে না জেমি। সে ধড়মড় করে উঠে বসল। বোঝার চেষ্টা করল ঘটনা কী। এমন সময় শিরশিরিয়ে উঠল পেটের ভেতরটা। সে দেখতে পাচ্ছে বান্ডাকে। কী মিলছিল না এখন বুঝতে পারছে। কেটে যাচ্ছে সাগর-কুয়াশা। কাছেই লোকজনের সাড়া পেল জেমি। ক্রমে অদৃশ্য হতে থাকা কুয়াশার পাতলা পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল। ওরা হামাগুড়ি দিয়ে ডায়মন্ডফিল্ডের প্রবেশ পথের কাছে চলে এসেছে। ওইতো দেখা যাচ্ছে বান্ডার বর্ণিত উঁচু গার্ড টাওয়ার আর কাঁটাতারের বেড়া। কমপক্ষে ষাটজন কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক ডায়মন্ড ফিল্ড থেকে এগোচ্ছে ফটকের দিকে। ওদের বদলি কাজের সময় শেষ, এখন নতুন শিফটের কামলারা আসছে। হাঁটু মুড়ল জেমি, হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল বান্ডার কাছে। ওকে ধরে নাড়া দিল। ঝাঁকি খেয়ে জেগে গেল বান্ডা। উঠে বসল। তার চোখ চলে গেল ওয়াচ টাওয়ার এবং গেটের দিকে।

'অবিশ্বাস্য!' অবিশ্বাসভরা কণ্ঠে বলল সে। 'আমরা এতদূর এসে গেছি!'

'আমরা পেরেছি। হিরেগুলো দাও আমাকে!'

বান্ডা তার জামা একটা পুটলির মতো করে তার মধ্যে হিরে রেখেছিল। ঝোলাটা জেমিকে দিয়ে বলল, 'তুমি কী–?'

'আমার পেছন পেছন এসো।'

'গেটের বন্দুকধারী রক্ষীরা কিন্তু বুঝতে পারবে আমরা স্থানীয় কেউ নই,' গলা নামাল বান্ডা।'

'আমি তো তা-ই চাই,' বলল জেমি।

শিফট শেষ করা শ্রমিক আর নতুন শিফটের কাজ করতে আসা হৈ-হল্লারত লোকজনের মাঝ দিয়ে পথ করে ওরা দু'জন চলল ফটক অভিমুখে।

গেটের ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন সশস্ত্র রক্ষী। যাদের শিফটের কাজ শেষ,

তাদের টিনের ছোট একটা কুটিরে আলাদা করে পাঠিয়ে দিচ্ছে আগাপাশতলা সার্চ করার জন্য। জেমি হাতের হিরে ভরা ছেড়া জামাটা শক্ত করে চেপে ধরে একজন রক্ষীর দিকে এগিয়ে গেল।

'মাফ করবেন, স্যার। এখানে কি কোনো কর্ম খালি আছে?'

বান্ডা আতংকিত বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইল জেমির দিকে।

গার্ড ফিরল জেমির দিকে। 'তুমি বেড়ার ভেতরে কী করছ?'

'আমরা কাজের খোঁজে এসেছি। শুনলাম এখানে নাকি গার্ডের একটা পদ খালি আছে। আর আমার ভৃত্যটি খোড়াখুঁড়ির কাজটা ভালোই পারে। তাই ভাবলাম–

শতচ্ছিন্ন কাপড় পরা দুই যুবকের দিকে কটমট করে তাকাল গার্ড। 'ভাগো হিয়াসে!'

'আমরা ভাগতে চাই না,' আপত্তির সুরে বলল জেমি। 'আমাদের কাজ দরকার এবং শুনেছি–'

'এটি সংরক্ষিত এলাকা, মিস্টার। সাইনবোর্ডে লেখা আছে দেখতে পাচ্ছ না? এখন চলে যাও। দু'জনেই।' বেড়ার বাইরে দাঁড়া করানো মোষের একটি গাড়ির দিকে হাত তুলে দেখাল গার্ড। কাজ শেষ করা শ্রমিকরা গাড়িটিতে উঠছে। 'ওই গাড়ি পোর্ট নলোথে যাবে। চাকরির দরকার হলে ওখানকার কোম্পানি অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করো।'

'ওহ্, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, স্যার।' বলল জেমি। সে ইশারা করল বান্ডাকে। দু'জনে ফটক পেরিয়ে চলে এল বাইরে।

গার্ড তাদের দিকে গনগনে চোখে তাকিয়ে দাঁত কিড়মিড় করল, 'গর্দভ কাহিকা!'

দশ মিনিট পরে জেমি এবং বান্ডা চলল পোর্ট নলোথে। সঙ্গে পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের হিরে।

বারো

শক্তিশালী এবং সুদর্শন জোড়া ঘোড়ায় টানা একটি দামি ক্যারিজ টগবগিয়ে চলেছে ক্লিপড্রিফটের ধূলি ধূসরিত রাস্তা দিয়ে। ঘোড়ার লাগাম ধরে রেখেছে অ্যাথলেটিক গড়নের হালকা-পাতলা একটি লোক, তার চুলগুলো বরফ সাদা, মুখের দাড়ি এবং গোঁফের রংও সাদা। নিখুঁত ছাঁটাইয়ের গ্রে সুট আর কুঁচি দেয়া শার্ট পরনে তার, গলবন্ধে শোভা পাচ্ছে হিরের স্টিকপিন। তার মাথায় ধূসর টপ হ্যাট, কড়ে আঙুলে ঝলকাচ্ছে বড়সড় একটি হিরের আংটি। দেখে মনে হয় শহরে নতুন আগন্তুক, আসলে সে তা নয়।

বছর খানেক আগে যে ক্লিপড্রিফটকে দেখে গিয়েছিল জেমি ম্যাকগ্রেগর তার সঙ্গে বর্তমান শহরের মেলা ফারাক। সালটা ১৮৮৪ এবং শহরটি এখন টাউনশিপে পরিণত হয়েছে। কেপটাউন থেকে হোপ টাউন পর্যন্ত চলে গেছে রেলপথ, এরই একটা শাখা ছুঁয়েছে ক্লিপড্রিফটে, ফলে অভিবাসীদের নতুন একটা ঢেউ তৈরি হয়েছিল এখানে। শহরের জনসংখ্যা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকগুণ এবং মানুষজনও চেহারা, পেশা ও আকারে ভিন্নতার দাবি করছে। এখনও প্রসপেক্টরদের অভাব নেই বটে তবে বিজনেস সুট এবং রুচিসম্পন্ন পোশাক পরা নারী-পুরুষদের ভিড় লক্ষণীয়। ক্লিপড্রিফটের চেহারায় চকচকে একটা ভাব চলে এসেছে।

তিনটে নতুন ডান্স হল এবং আধ ডজন নতুন সেলুনের পাশ কাটাল জেমি। সদ্য তৈরি হওয়া একটি গির্জা একটি নাপিতের দোকান এবং গ্রান্ড নামে বৃহদায়তনের একটি হোটেলও চোখে পড়ল। একটি ব্যাংকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল জেমি, নেমে এল ঘোড়ার গাড়ি থেকে, ঘোড়ার লাগাম ধরিয়ে দিল স্থানীয় একটি ছেলের হাতে।

'ওদেরকে পানি খাওয়াও।'

জেমি ব্যাংকে ঢুকল। ম্যানেজারকে উদ্দেশ্য করে উচ্চকিত গলায় ঘোষণা করল, 'আমি আপনার ব্যাংকে একশো হাজার পাউন্ড জমা রাখতে চাই।'

খবরটা ছড়িয়ে পড়ল দ্রুত, যেমনটা আশা করেছিল জেমি, সে ব্যাংক থেকে বেরিয়ে সানডোনার সেলুনে প্রবেশ করেছে, মুহূর্তে সকলের চোখ চলে গেল তার দিকে। সেলুনের ভিড়ে ভারাক্রান্ত জেমি বার-এ হেঁটে যাচ্ছে, অনেকগুলো কৌতূহলী চোখ তাকে অনুসরণ করল। স্মিট শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল। 'আপনাকে কী দেব, স্যার?' জেমিকে সে একদমই চিনতে পারে নি।

'হুইস্কি। সবচেয়ে সেরাটা।'

'জ্বী, স্যার।' মদ ঢালল স্মিট। 'আপনি শহরে নতুন এলেন?'

'হুঁ।'

'ঘুরতে এসেছেন তাই না?'

'না। শুনলাম বিনিয়োগ করার জন্য শহরটি নাকি উত্তম।'

জ্বলে উঠল বার টেন্ডারের চক্ষু। 'এরচেয়ে উত্তম শহর আর হয় না! একশো হাজার– যার অত টাকা আছে সে অনেক কিছুই করতে পারে। আর সত্যি বলতে কী, স্যার, আমি হয়তো এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারব।'

'আচ্ছা? কীভাবে শুনি?'

সামনে ঝুঁকে এল স্মিট, ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে ফিসফিসিয়ে বলল, 'এ শহর যে লোকটা নিয়ন্ত্রণ করে তিনি আমার খুব চেনা। তিনি বরো কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং সিটিজেন'স কমিটির প্রধান। দেশের এ অঞ্চলের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ তিনি। তাঁর নাম সলোমন ভ্যান ডার মার্ভি।

মদের গ্লাসে চুমুক দিল জেমি। 'কখনও নাম শুনি নি।'

'রাস্তার ওপাশের বড় মুদি দোকানটার মালিক তিনি। তিনি আপনাকে কিছু ভালো ব্যবসা-বাণিজ্যের খোঁজ দিতে পারবেন। তাঁর সঙ্গে কথা বললে আখেরে আপনার লাভই হবে।'

আরেক ঢোক মদ গিলল জেমি। 'তাঁকে এখানে আসতে বলো।'

বার টেন্ডার আড়চোখে একবার দেখে নিল জেমির হাতের বড় হিরে বসানো আংটিটা। 'জ্বী, স্যার। তাঁকে আপনার কী নাম বলব?"

'ট্রাভিস। ইয়ান ট্রাভিস।'

'আচ্ছা, মি. ট্রাভিস। আমি নিশ্চিত মি. ভ্যান ডার মার্ভি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইবেন।' আরেকটা ড্রিংক ঢালল সে। 'আপনি এটা পান করতে থাকুন। আমি ওনাকে খবর দিচ্ছি।'

জেমি বার-এ বসে পান করতে লাগল হুইস্কি, সবাই যে ওকে লক্ষ্য করছে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন। ক্লিপড্রিফট থেকে বড়লোক হয়ে অনেকে শহর ত্যাগ করেছে কিন্তু এত টাকা নিয়ে এর আগে কেউ কোনোদিন এখানে আসেনি। এ অভিজ্ঞতা তাদের কাছে একেবারেই নতুন।

মিনিট পনেরো বাদে ফিরে এল বার টেন্ডার সঙ্গে সলোমন ভ্যান ডার মার্ভিকে নিয়ে।

দাড়িঅলা, সফেদ কেশের লোকটির দিকে এগিয়ে গেল ভ্যান ডার মার্ভি, হেসে হাত বাড়িয়ে দিল। 'মি. ট্রাভিস, আমি সলোমন ভ্যান ডার মার্ভি।'

'ইয়ান ট্রাভিস।'

জেমি অপেক্ষা করছিল দেখতে ভ্যান ডার ওকে চিনতে পারে কিনা। কিন্তু চেহারা

দেখে মনে হলো না তাকে আদৌ চিনতে পেরেছে এ লোক। অবশ্য চেনার কথাও নয়। জেমির চেহারায় সেই আঠারো বছরের তরুণের সারল্য একেবারেই অনুপস্থিত। বশংবদ কর্মচারীর মতো ওদেরকে কিনারের দিকের একটি টেবিলে নিয়ে এল স্মিট।

ওরা বসার পরে ভ্যান ডার মার্ভি বলল, 'শুনলাম আপনি ক্লিপড্রিফটে নাকি ব্যবসা করতে চাইছেন, মি. ট্রাভিস?'

'সেরকমই ইচ্ছে আছে।'

'সেক্ষেত্রে আমি হয়তো আপনাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারব। এখানে একটু সাবধানে কাজ করতে হবে আপনাকে। অসৎ লোকের অভাব নেই তো!'

জেমি তার দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল, 'তাতো বটেই।'

যে লোকটি তার সাথে প্রতারণা করেছে, তাকে হত্যা করতে চেয়েছে সে লোকের সঙ্গে একই টেবিলে বসে মধুর আলাপন অবিশ্বাস্য ঠেকছে জেমির কাছে। গত এক বছর ধরে প্রতিটি মুহূর্তে ভ্যান ডার মার্ভিকে ঘৃণা করে এসেছে ও, লোকটার প্রতি শিরায় শিরায় তীব্র ঘৃণাই বাঁচিয়ে রেখেছে ওকে। ভ্যান ডার মার্ভি এবারে টের পাবে প্রতিশোধ কাহাকে বলে।

'যদি কিছু মনে না করেন, মি. ট্রাভিস, আপনি ঠিক কত টাকা বিনেয়াগ করতে চাইছেন?'

'শুরু করব একশো হাজার পাউন্ড দিয়ে,' উদাস গলায় বলল জেমি। লক্ষ্য করল জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে ভ্যান ডার মার্ভি।

'তারপরে আরও তিন চারশো হাজার।'

'আ-এত টাকা দিয়ে আপনি খুব ভালোভাবেই ব্যবসা করতে পারবেন। সঙ্গে যদি সঠিক গাইডেন্স থাকে, অবশ্যই।'

দ্রুত যোগ করল সে। 'কীসে টাকাটা খাটাবার ইচ্ছা আপনার?'

'একটু ঘুরে ফিরে দেখি তারপরে না হয় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।'

'তাতো বটেই! তাতো বটেই!' বিগলিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ভ্যান ডার মার্ভি। 'আসুন না আজ আমার বাড়িতে একসঙ্গে ডিনার করতে করতে বিষয়টি নিয়ে কথা বলি? আমার মেয়ে খুব ভালো রান্না করে। আপনি আমার বাড়িতে এলে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করব।'

হাসল জেমি। 'আমি বিষয়টি উপভোগ করব, মি. ভ্যান ডার মার্ভি। *তোমার কোনো ধারণাই নেই বিষয়টি কতটা উপভোগ করব আমি,* মনে মনে বলল ও।

তারপর ঘটতে শুরু করল ঘটনা।

নামিব থেকে কেপটাউনে প্রত্যাবর্তনের সময়ে উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটেনি। জেমি এবং বান্ডা ছোট একটা গাঁয়ে প্রবেশ করে। ওখানকার এক ডাক্তার জেমির হাতের ক্ষতস্থান বেঁধে দিয়েছিল। তারপর ওরা একটি ওয়াগনে চেপে চলে এসেছিল কেপ

টাউনে। যাত্রাটা দীর্ঘ এবং কষ্টের হলেও তা গায়ে মাখেনি ওরা। কেপটাউনে পৌঁছে গ্রেন স্ট্রিটের নামী হোটেল রয়েল হোটেলে উঠেছে জেমি। রয়েল সুট ভাড়া নিয়েছে। সেখানে কয়েকদিন আরাম আয়েশ করেছে। বান্ডাকে তার সঙ্গে থাকার জন্য অনুরোধ করেছিল জেমি। কিন্তু বান্ডা ফিরে গেছে নিজের গাঁয়ে। বলেছে ওখানে সে একটি খামার বাড়ি কিনবে তারপর বিয়েশাদি করে সন্তানের বাবা হবে। সে এমনকী হিরের সমান ভাগও নেয়নি। শুধু গোটা তিনেক হিরে নিয়েছে খামার, গরু-গাভী ইত্যাদি কেনার জন্য। তার যুক্তি ছিল সে হঠাৎ করে বড়লোক বনে গেলে সবার চোখ টাটাবে। তাই সে সাধারণ জীবন যাপন করতেই চায়। যাবার সময় জেমিকে নিজের ভাগের হিরেগুলো দিয়ে বলেছিল, 'আমি তোমাকে আমার ভাগটা দিয়ে গেলাম কারণ তুমি আমাকে কথা দিয়েছ সলোমন ভ্যান ডার মার্ভির ওপর শোধ নেবে।' জেমি অনেকক্ষণ বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছে, 'অবশ্যই শোধ নেব। কথা দিলাম।'

বান্ডা নিজের দেশে চলে যাওয়ার পরে জেমি তার বাবা-মাকে কুড়ি হাজার পাউন্ডের একটা ব্যাংক ড্রাফট পাঠিয়ে দিয়েছে। তারপর সবচেয়ে দামী ঘোড়ার গাড়িটি কিনে ফিরে এসেছে ক্লিপড্রিফটে।

এবারে সে প্রতিশোধ নেবে।

তেরো

সেদিন সন্ধ্যায় জেমি ম্যাকগ্রেগর প্রবেশ করল ভ্যান ডার মার্ভির দোকানে। প্রচণ্ড ঘৃণা এবং বিতৃষ্ণা যেন তীব্র তাপ ছড়াচ্ছিল তার শরীর থেকে। বহু কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল জেমি।

ওর সাড়া পেয়ে দোকানের পেছন থেকে দ্রুত বেরিয়ে এল ভ্যান ডার মার্ভি। জেমিকে দেখে দেঁতো হাসি হাসল।

'মি. ট্রাভিস! আসুন আসুন!'

'ধন্যবাদ, মিস্টার- ইয়ে- দুঃখিত, আপনার নামটা ভুলে গেছি...'

'ভ্যান ডার মার্ভি। সলোমন ভ্যান ডার মার্ভি। এ জন্য দুঃখিত হতে হবে না। ডাচ নামগুলোর উচ্চারণ বড্ড খটোমটো। মনে রাখা কষ্ট। ডিনার রেডি আছে। মার্গারেট!'

হাঁক ছেড়ে জেমিকে নিয়ে সে পেছনের ঘরে ঢুকল। এখানকার কোনো কিছুরই পরিবর্তন হয়নি। চুল্লির সামনে দাঁড়িয়ে আছে মার্গারেট ওদের দিকে পেছন ফিরে। কী যেন রান্না করছে।

'মার্গারেট, ইনি আমাদের সেই অতিথি যার কথা তোমাকে আমি বলেছিলাম- মি. ট্রাভিস।'

ঘুরল মার্গারেট। 'কেমন আছেন?'

'আমি আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' বলল জেমি।

কাস্টমার বেল বেজে ওঠার শব্দ শুনে ভ্যান ডার মার্ভি বলল, 'মাফ করবেন। আমি আসছি এখুনি। আপনি আরাম করুন, মি. ট্রাভিস।' সে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

সবজি এবং মাংসের ধোঁয়া ওঠা একটি বাটি এনে টেবিলে রাখল মার্গারেট, ওভেন থেকে দ্রুত রুটি বের করছে, জেমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওকে লক্ষ্য করছিল। গত এক বছরে মেয়েটি আরও সুন্দরী এবং স্বাস্থ্যবতী হয়েছে। যৌনতায় মাখোমাখো পূর্ণ একটি নারী শরীর পেয়েছে সে, যা আগে অনুপস্থিত ছিল মার্গারেটের দেহে।

'আপনার বাবা বলেছেন আপনি নাকি খুব ভালো রান্না করেন।'

লজ্জায় লাল হলো মার্গারেট। 'একটু-আধটু রান্না করতে পারি আর কি, স্যার?'

'অনেকদিন হলো বাড়ির রান্নার স্বাদ থেকে বঞ্চিত আমি। খেতে খুব আগ্রহ হচ্ছে।' মার্গারেটের হাত থেকে মাখনের বড় একটি পাত্র নিয়ে টেবিলের ওপর রাখল জেমি। মার্গারেট এমন অবাক হয়ে গেল, আরেকটু হলেই তার হাত থেকে প্লেটটি পড়ে যেত। পুরুষরা নারীদের কাজে সাহায্য করে জীবনেও শোনেনি সে। বিস্মিত চোখে তাকাল সে জেমির দিকে। ভাঙা নাক আর গালে কাটা দাগ এ লোকটির চেহারার সৌন্দর্য অনেকটাই

নষ্ট করেছে। তবু তাকে যথেষ্ট হ্যান্ডসাম বলা যায়। লোকটির চোখের রঙ হালকা ধূসর, বুদ্ধিদীপ্ত এবং প্রখর। সাদা চুল দেখে বোঝা যায় এ বয়সে তরুণ নয় তবে অবয়ব ফুটে বিচ্ছুরিত হচ্ছে তারুণ্যের আভা। লোকটি বেশ লম্বা এবং শক্তিশালী এবং– ঘুরল মার্গারেট জেমির নিষ্পলক চাউনিতে বিব্রত হয়ে।

হাত ঘষতে ঘষতে ব্যাক রুমে দ্রুত পদক্ষেপে ফিরে এল ভ্যান ডার মার্ভি।

'দোকান বন্ধ করে দিয়ে এলাম,' বলল সে।

'বসুন। একসঙ্গে ডিনার করি?'

টেবিলে বসল জেমি। খাওয়ার আগে যথারীতি প্রার্থনায় বসল ভ্যান ডার মার্ভি। তারপর সে খাবার পরিবেশন শুরু করল। এবারে সে জেমির প্লেটে যথেষ্ট পরিমাণে খাবার তুলে দিল। খেতে খেতে কথা বলল ওরা। 'এবারই প্রথম এদিকে এলেন নাকি, মি. ট্রাভিস?'

'জ্বী,' জবাব দিল জেমি। 'এবারই প্রথম।'

'মিসেস ট্রাভিসকে সঙ্গে নিয়ে এলে পারতেন।'

'আমার জীবনে কোনো মিসেস ট্রাভিস নেই। কেউ আমার জীবনসঙ্গিনী হতে চায়নি বলেই হয়তো।'

এরকম একজন মানুষকে প্রত্যাখ্যান করতে চাইবে কোন বোকা নারী? মনে মনে বলল মার্গারেট। জেমির দিকে তাকিয়েছিল, চট করে চোখ নামিয়ে নিল সে; যদি আগন্তুক তার মনের কথাটা পড়ে ফেলে!

'ক্লিপড্রিফটে সুযোগ-সুবিধার কোনো অভাব নেই, মি. ট্রাভিস। প্রচুর সুযোগ-সুবিধা।'

'আমি সুযোগ-সুবিধাগুলো দেখতে চাইছি,' মার্গারেটের দিকে তাকাল জেমি। আবার লাল হলো মার্গারেটের গাল।

'যদি খুব বেশি ব্যক্তিগত হয়ে না যায় একটা কথা জানতে পারি, মি. ট্রাভিস? আপনি এত টাকা-পয়সা পেলেন কীভাবে?'

বাবার এই নির্লজ্জ প্রশ্নে খুবই বিব্রত বোধ করল মার্গারেট। কিন্তু ওদের অতিথি এতে কিছু মনে করেছে বলে মনে হলো না।

'পৈতৃক-সূত্রে,' জবাব দিল সে।

'ও আচ্ছা। আমার ধারণা আপনার নিশ্চয় প্রচুর ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা রয়েছে।'

'খুবই কম। আমার আসলে এ ব্যাপারে গাইডেন্স দরকার।'

উজ্জ্বল দেখাল ভ্যান ডার মার্ভির চেহারা। 'নিয়তিই আমাদেরকে মিলিয়ে দিয়েছে, মি. ট্রাভিস। আমার কিছু লাভজনক কানেকশন রয়েছে। খুবই লাভজনক। গ্যারান্টি দিতে পারি এ ব্যবসায়ে টাকা খাটালে কয়েক মাসের মধ্যে আপনার টাকা দ্বিগুণ হয়ে যাবে।' সামনে ঝুঁকে জেমির কাঁধ চাপড়ে দিল। 'মনে হচ্ছে আজকের দিনটি আমাদের দু'জনের জন্যেই বিশেষ সৌভাগ্যের দিন।'

জবাবে হাসল শুধু জেমি।

'আপনি বোধহয় গ্রান্ড হোটেলে উঠেছেন, না?'

'হ্যাঁ।'

'ওখানে অন্যায়ভাবে সবকিছুর দাম বেশি রাখে। তবে আপনার মতো মানুষ...' সে হাসল জেমির দিকে তাকিয়ে। জেমি বলল, 'শুনেছি এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য নাকি খুব সুন্দর। কাল যদি আমাকে শহরটা ঘুরিয়ে দেখার জন্য আপনার মেয়েকে অনুরোধ করি খুব কি বেশি চাওয়া হয়ে যাবে?'

এক সেকেন্ডের জন্য যেন থেমে গেল মার্গারেটের হৃৎস্পন্দন।

কপালে ভাঁজ পড়ল ভ্যান ডার মার্ভির। 'আমি ঠিক জানি না। ও–'

সলোমন ভ্যান ডারের বাড়িতে লৌহ কঠিন আইন রয়েছে কোনো পুরুষের সঙ্গে তার মেয়ে বাইরে যেতে পারবে না। তবে, ভাবল ভ্যান ডার, মি. ট্রাভিসের ক্ষেত্রে এ আইন কিছুটা শিথিল করা যেতে পারে। 'আমি মার্গারেটকে কিছুক্ষণের জন্য ছেড়ে দিতে পারি। তুমি আমাদের অতিথিকে শহরটা একটু ঘুরিয়ে দেখাতে পারবে, মার্গারেট?

'আপনি যা বলেন, বাবা,' মৃদু গলায় বলল মার্গারেট।

'তাহলে ওই কথাই রইল।' হাসল জেমি। 'কাল সকাল দশটায় আমরা বেরুব, কেমন?'

দীর্ঘদেহী, দামী পরিচ্ছদে ভূষিত অতিথিটি চলে যাওয়ার পরে টেবিল পরিষ্কার করল মার্গারেট, থালাবাসন ধুয়ে নিল। সমস্ত কাজই করল কেমন একটা ঘোরের মধ্যে। লোকটা নিশ্চয় ভেবেছে আমি একটা বোকা। খাবার টেবিলে বসে কথোপকথনের দৃশ্যগুলো বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে মার্গারেটের। নাহ্, সে তো বোকার মতো কোনো কাজ করেনি। প্রায় সারাটা সময়ই নিশ্চুপ ছিল মার্গারেট। মনে পড়ল বাবার কথা। *পুরুষদের মধ্যে শয়তান বাস করে, মার্গারেট। তোমার কৌমার্য আমি ওদের হাতে নষ্ট হতে দেব না।* সত্যি কি তাই? সব পুরুষের মধ্যে শয়তান বাস করে? লোকটি যখন তার দিকে তাকিয়েছিল তখন কেমন দুর্বল লাগছিল মার্গারেটের শরীর, ভেতরে ভেতরে কাঁপছিল সে। লোকটি কি তার কৌমার্য হরণ করছিল? দূষিত করে তুলছিল তার সারল্য? ভাবতেই অন্যরকম একটা রোমাঞ্চ জাগল মার্গারেটের দেহে। বসে পড়ল টেবিলে।

ইস, ওর মা যদি এখন বেঁচে থাকত। মা তাহলে সব বুঝতে পারত। মার্গারেট তার বাপকে ভালোবাসে। কিন্তু মাঝে মাঝেই বিদ্রোহ করে ওঠে মন। মনে হয় বাপের হাতে বন্দী সে। বাপ কোনোদিন কোনো পুরুষের কাছে ঘেঁষতে দেবে না এ চিন্তা ওকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। *আমার হয়তো কোনোদিন বিয়ে হবে না,* ভাবছে মার্গারেট। *বাবা মারা না যাওয়া পর্যন্ত।* এই ভাবনা তাকে লজ্জিত করল, অপরাধবোধে আচ্ছন্ন করল। সে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে দোকানে ঢুকল। তার বাবা টেবিলে বসে মাল কেনা-বেচার হিসেব মেলাচ্ছে।

'শুভ রাত্রি, বাবা।'

ভ্যান ডার মার্ভি সোনালি ফ্রেমের চশমাটি খুলে চোখ ঘষল। তারপর সে মেয়েকে

আলিঙ্গন করার জন্য হাত বাড়াল। কিন্তু মার্গারেট আলিঙ্গনে সাড়া দিল না। সরে গেল। কেন সাড়া দিল না নিজেও জানে না।

পর্দা ফেলা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, যেটিকে মার্গারেট নিজের বেডরুম হিসেবে ব্যবহার করে, সেখানে দেয়ালে ঝোলানো ছোট, গোল একটি আয়নায় নিজের মুখ দেখল সে। নিজের চেহারা সম্পর্কে কোনো বিভ্রান্তি নেই মার্গারেটের। জানে সে সুন্দরী নয়। তবে কুশ্রীও নয়। তার চোখ সুন্দর, গালের হনু দুটো উঁচু। ফিগারটা চমৎকার। আয়নার আরও সামনে এসে দাঁড়াল মার্গারেট। ইয়ান ট্রাভিস তার মধ্যে কী দেখেছিল? সে কাপড় খুলতে লাগল। মনে হলো ইয়ান ট্রাভিস তার সঙ্গেই আছে, এ ঘরেই। তাকে দেখছে। কাপড় খুলে তার সামনে নগ্ন হয়ে দাঁড়াল মার্গারেট। ট্রাভিস তার সুডৌল বুকে হাত বুলাল, স্পর্শ করল দৃঢ় স্তনযুগল। মার্গারেট ওর সমতল পেটে হাত রাখল, ট্রাভিসের হাত মিশে গেল তার হাতের সঙ্গে, তলপেট বেয়ে নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। হাতজোড়া এখন মার্গারেটের দুই পায়ের ফাঁকে, উরুসন্ধিতে, স্পর্শ করছে, আঙুল বুলাচ্ছে, ঘষছে, ক্রমে দ্রুততর হয়ে উঠল হস্ত চালনা, শক্ত আঙুলগুলো ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে, আরও দ্রুত হলো গতি। শেষে তীব্র সুখের একটা বিস্ফোরণ ঘটল মার্গারেটের শরীরে, সে শীৎকার দিয়ে উঠল, ট্রাভিসের নামটা একবার উচ্চারণ করে এলিয়ে পড়ল বিছানায়।

জেমির ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে ওরা ঘুরতে বেরুল। শহরের বহুল পরিবর্তন আবারও বিস্মিত করল ওকে। যেখানে এর আগে শুধু তাঁবুর সাগর ছিল এখন সেখানে প্রচুর মজবুত বাড়িঘর উঠে গেছে। বাড়িগুলো কাঠের তৈরি, করোগেটেড টিনের ছাদ।

'ক্লিপড্রিফটকে দেখে মনে হচ্ছে বেশ সমৃদ্ধ শহর,' মূল রাস্তা ধরে এগোতে এগোতে মন্তব্য করল জেমি।

'নবাগতদের জন্য এ শহরটি খুব আকর্ষণীয়,' বলল মার্গারেট।

শহর ছাড়িয়ে ওরা চলল ভ্যাল নদীর তীরে খনির ক্যাম্পে। মৌসুমী বৃষ্টি সবুজ-শ্যামল করে তুলছে মাঠ-ঘাট-প্রান্তর। সুন্দর সুন্দর বাগান, কারুর সুদৃশ্য ঝোপ-জঙ্গল, গাছপালা সব মিলে ভারী দৃষ্টিনন্দন। একদল প্রসপেক্টরের পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়ার সময় জেমি জিজ্ঞেস কলল, 'এখনও কি লোকে হিরের সন্ধান করে?'

'জ্বী। অল্প কিছু হিরের খনি এখনও আছে। কেউ হিরে পেয়েছে খবরটা ছড়ালেই হলো, শতশত নতুন ডিগার এসে হামলে পড়ে ওই খনিতে। তবে বেশিরভাগ ফিরে যায় রিক্ত হস্তে, ভাঙা মন নিয়ে। মার্গারেট ভাবল এখানকার বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্পর্কে এ লোকটিকে তার সাবধান করে দেয়া উচিত। 'বাবা চান না এসব কথা আমি কাউকে বলি তবে ব্যবসাটা খুব ভয়ংকর, মি. ট্রাভিস।'

'কারও কারও জন্য তো বটেই,' সায় দিল জেমি।

'আপনি কি এখানে কয়েকদিন থাকবেন?'

'হু।'

মার্গারেটের মন নেচে উঠল আনন্দে। 'বেশ।' তারপর দ্রুত যোগ করল, 'বাবা

শুনলে খুব খুশি হবেন।'

ওরা সারা সকাল ঘুরে বেড়াল। মাঝে মাঝেই গাড়ি থামিয়ে প্রসপেক্টরদের সঙ্গে কথা বলল জেমি। দেখা গেল এদের অনেকেই মার্গারেটকে চেনে এবং তার সঙ্গে সম্ভ্রমের সাথে কথা বলল। মেয়েটির মধ্যে উষ্ণতা আছে, রয়েছে আন্তরিকতা, সহজ বন্ধুত্বের পরশ যে গুণগুলোর কখনও প্রকাশ ঘটেনা তার বাবার সঙ্গে থাকলে।

গাড়ি চলতে শুরু করলে জেমি বলল, 'এখানকার সবাই দেখছি আপনাকে চেনে।'

লাল হলো মার্গারেটের গাল। 'এর কারণ ওরা সবাই আমার বাবার সঙ্গে ব্যবসা করেন। তিনি বেশিরভাগ ডিলারের কাছে মাল বেচেন।'

কোনো মন্তব্য করল না জেমি। সে চারপাশের পরিবর্তনের হাওয়া অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছিল। রেল রোডটি ব্যাপক বদলে দিয়েছে শহর। ডি বিয়ার্স নামে একটি হিরের কোম্পানির শতাধিক ছোট ছোট ক্লেইমকে একত্রিত করে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ডি বিয়ার্স নামে এক কৃষক আফ্রিকায় প্রথম হিরের খনি খুঁজে পায়। তার নামে রাখা হয়েছে কোম্পানির নাম। সম্প্রতি কিছু সোনার খনিরও সন্ধান মিলেছে, কিম্বার্লি থেকে বেশি দূরে নয়, সে সঙ্গে খোঁজ মিলেছে ম্যাঙ্গানিজ এবং জিংকেরও। জেমি জানে এ মাত্র শুরু, দক্ষিণ আফ্রিকা হলো খনিজ সম্পদের ভান্ডার। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের জন্য এখানে রয়েছে অপরিসীম সম্ভাবনার হাতছানি।

জেমি এবং মার্গারেটের ফিরতে ফিরতে বিকেল গড়িয়ে গেল। ভ্যান ডার মার্ভির দোকানের সামনে গাড়ি থামিয়ে জেমি বলল, 'আজ রাতে আপনি আর আপনার বাবা যদি ডিনারে আমার আতিথ্য গ্রহণ করেন নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করব আমি।'

আলো ছড়াল মার্গারেটের চোখে মুখে। 'আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করব। আশা করি উনি আপত্তি করবেন না। চমৎকার একটি দিনের জন্য অনেক ধন্যবাদ, মি. ট্রাভিস।'

সে প্রায় ছুটে পালাল।

নতুন গ্রান্ড হোটেলের বৃহদায়তনের আয়তাকার ডাইনিং রুমে বসে ডিনার করছিল ওরা তিনজন।

ডাইনিং রুমে অনেক লোককে খেতে দেখে অসন্তোষের সুরে বিড়বিড় করল ভ্যান ডার মার্ভি, 'আমি বুঝি না এ লোকগুলো এত টাকা খরচ করে কেন এখানে খেতে আসে।'

জেমি একটি মেনু তুলে নিয়ে ওতে চোখ বুলাল। একটি স্টেকের দাম এক পাউন্ড চার শিলিং, আলুর দাম চার শিলিং এবং আপেল পাইয়ের মূল্য ধরা হয়েছে দশ শিলিং।

'এরা ডাকাত!' নালিশের গলায় বলল ভ্যান ডার মার্ভি।

ওরা খাবারের অর্ডার দিল। জেমি লক্ষ করল ভ্যান ডার মার্ভি মেনুর সবচেয়ে দামী খাবারগুলোর অর্ডার দিয়েছে। মার্গারেট শুধু সুপ আনতে বলল। এমন উত্তেজিত হয়ে আছে সে খেতেই পারছে না। নিজের হাতের দিকে তাকাল সে। মনে পড়ল কাল রাতে

এ হাত দিয়ে কী করেছে। লজ্জা পেল ও। ইয়ান ট্রাভিস যেন জাদু করেছে ওকে। লোকটির সমস্ত কথা এবং অঙ্গভঙ্গির গোপন অর্থগুলো যেন পড়তে পারছে মার্গারেট। ট্রাভিস হাসলে বুঝতে হবে সে মার্গারেটকে পছন্দ করে; তবে ভুরু কোঁচকালে ধরে নিতে হবে মার্গারেটকে তার পছন্দ হয়নি।

'আজ চিত্তাকর্ষক কিছু চোখে পড়ল?' জেমিকে জিজ্ঞেস করল ভ্যান ডার মার্ভি।

'না, তেমন কিছু না,' নিরাসক্ত গলায় জবাব দিল জেমি।

সামনে ঝুঁকে এল ভ্যান ডার মার্ভি। 'আমার কথাগুলো স্মরণে রাখবেন, স্যার। এ এলাকাটি একদিন দুনিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী অঞ্চল হিসেবে গড়ে উঠবে। নতুন রেলপথ একে দ্বিতীয় কেপটাউনে রূপান্তর ঘটাবে।'

'কী জানি!' ঠোঁট ওল্টাল জেমি। 'আমি এরকম আরও অনেক বুম টাউনের কথা শুনেছি। শেষে ওগুলো ভূতুড়ে শহরে পরিণত হয়েছে। আমি কোনো ভূতুড়ে শহরে আমার টাকা খাটাতে রাজি নই।'

'ক্লিপড্রিফট সেরকম শহর হবে না,' ওকে যেন নিশ্চিন্ত করতে চাইল ভ্যান ডার মার্ভি। 'লোকজন সবসময়ই হিরে খুঁজে পাচ্ছে। এবং সোনা।'

কাঁধ ঝাঁকাল জেমি। 'কিন্তু কতদিন হিরে আর সোনার মজুত থাকবে?'

'তা অবশ্য কেউ বলতে পারবে না। তবে–'

'হ্যাঁ, সেটাই কথা।'

'চটজলদি কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে বসবেন না যেন,' অনুনয় করল ভ্যান ডার মার্ভি। 'এতবড় একটা সুযোগ আপনাকে হারাতে দিতে চাই না আমি।'

জেমি একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'আমার একটু তাড়া আছে বটে। মার্গারেট, কাল কি তুমি আমাকে আবার একটু শহর ঘুরিয়ে দেখাতে পারবে?'

আপত্তি জানাতে মুখ খুলতে গিয়েও নিজেকে নিবৃত্ত করল ভ্যান ডার মার্ভি। ব্যাংকার মি. থোরেনসেনের কথাগুলো মনে পড়ে গেছে; *উনি ব্যাংকে ঢুকেই একশো হাজার পাউন্ড জমা রাখলেন।* বললেন আরও টাকা রাখবেন।

লোভ জেগে উঠল ভ্যান ডার মার্ভির মনে। 'ও নিশ্চয় পারবে, মি. ট্রাভিস।'

পরদিন সকালে মার্গারেট ওর রোববারের ড্রেসটি পরল জেমির সঙ্গে সাক্ষাত করতে যাবার জন্য। তার বাপ তাকে ও পোশাকে দেখে রেগে আগুন। 'তুমি কি লোকটাকে পটানোর জন্য এরকম ড্রেস পরেছ? আমি স্রেফ ব্যবসার স্বার্থে ওর সঙ্গে তোমাকে ঘুরতে যেতে দিচ্ছি। যাও, এ পোশাক ছেড়ে ঘরের কাপড় পরে এসো।'

'কিন্তু, বাবা–'

'যা, বললাম করো!'

বাপের সঙ্গে তর্ক করা যায় না। মার্গারেট শুধু মাথা ঝাঁকাল। 'আচ্ছা, বাবা।'

কুড়ি মিনিট বাদে মার্গারেট এবং জেমিকে একসঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে যেতে দেখে ভ্যান ডার মার্ভির মনটা খচখচ করতে লাগল। সে কোনো ভুল করে ফেলল নাতো?

চোদ্দ

এবারে বিপরীত দিকে ঘোড়ার গাড়ি ছোটাল জেমি। নব উন্নয়ন আর নতুন নতুন ভবনের চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। যদি খনিজ সম্পদ আবিষ্কারের গতি অব্যাহত থাকে, ভাবছে জেমি– এবং গতি অব্যাহত না থাকার কোনো কারণই নেই– তাহলে এখানে হিরে কিংবা সোনার চেয়েও বেশি বাণিজ্য করা যাবে রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা করে। ক্লিপড্রিফটে দরকার হবে আরও ব্যাংক, হোটেল, সেলুন, দোকানপাট, পতিতালয়... এ তালিকার শেষ নেই। আর সুযোগ-সুবিধারও অভাব নেই কোনো।

মার্গারেট তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে, টের পেল জেমি।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল সে।

'না, কিছু না,' বলে দ্রুত অন্যদিকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল মার্গারেট।

জেমি লক্ষ্য করছে মার্গারেটকে, দেখছে ওর গোটা অবয়ব থেকে যেন একটা দীপ্তি ছড়াচ্ছে। গা ঘেঁষাঘেষি করে বসেছে দু'জনে। জেমির পেশীবহুল শরীরের স্পর্শ শিহরণ তুলছে মার্গারেটের গায়ে। জেমি ওর মনের অবস্থা বুঝতে পারছে। মার্গারেট হলো অনাঘ্রাতা ফুল। তাকে এখনও কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি।

দুপুরের দিকে জেমি মূল রাস্তা ছেড়ে একটি ঝর্ণার ধারের বন-জঙ্গলে ভরা একটি রাস্তায় ঢুকে পড়ল। থামল বিরাট একটি বাওবাব গাছের নিচে। সে হোটেল থেকে পিকনিক লাঞ্চ নিয়ে এসেছে। গাছের নিচে একটি টেবিল ক্লথ বিছাল মার্গারেট, খুলল ঝুড়ি এবং খাবারগুলো এক এক করে নামাল। খাবারের মেনুতে রয়েছে ভেড়ার রোস্ট, মুরগি ভাজা, হলুদ জাফরান ভাত, নাশপাতির আচার, ছোট কমলালেবু, পিচফল এবং মসলাদার বিস্কিট।

'এ যে রীতিমত রাজকীয় ভোজ!' চেঁচিয়ে উঠল মার্গারেট। 'সত্যি এসবের জন্য আমি যোগ্য নই, মি. ট্রাভিস।'

'তুমি এরচেয়েও অনেক কিছু বেশি পাবার যোগ্য,' তাকে গাঢ় গলায় বলল জেমি।

মার্গারেট অন্যদিকে ফিরল, ব্যস্ত হয়ে পড়ল খাবার সাজাতে।

তার মুখখানা দু'হাতের চেটোতে বন্দী করল জেমি।

'মার্গারেট... আমার দিকে তাকাও।'

'ওহ্, প্লীজ। আমি–' শরীরে কাঁপুনি উঠে গেছে মার্গারেটের।

'চাও আমার দিকে।'

ধীরে ধীরে মুখ ঘোরাল মার্গারেট। তাকাল জেমির চোখে। ওকে বুকে টেনে নিল জেমি, নিষ্ঠুর ওষ্ঠজোড়া খুঁজে নিল রমণীর নরম লোভনীয় অধর, শক্ত করে ধরে থাকল মার্গারেটকে, চাপ বাড়ছে ওর শরীরে।

কিছুক্ষণ পরে ধস্তাধস্তি করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল মার্গারেট। ডানে-বামে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'ওহ, মাই গড। এটা উচিত হচ্ছে না। এটা করা আমাদের উচিত হচ্ছে না। আমরা নির্ঘাত নরকে যাব।'

'স্বর্গে যাব।'

'আমার ভয় লাগছে।'

'এতে ভয়ের কিছু নেই। আমার চোখ দ্যাখো। আমার চোখ তোমার ভেতরটা পুরো দেখতে পাচ্ছে। এবং আমি কী দেখতে পাচ্ছি জানো? তুমি আমার সঙ্গে প্রেম করতে চাইছ। আমি তা-ই করব এখন। আর এতে ভয় বা সংকোচের কিছু নেই, কারণ তুমি আমার। শুধুই আমার। সে কথা তুমি জানো, না? তুমি আমার, মার্গারেট। বলো আমি ইয়ানের। বলো আমি ইয়ানের।'

'আমি– ইয়ানের।'

আবার ওকে চুম্বন করল জেমি। চুমু খেতে খেতে মার্গারেটের বডিসের হুক খুলে ফেলল। এক মুহূর্ত পরে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গেল মার্গারেট। ওকে ধীরে ধীরে জমিনের ওপর শুইয়ে দিল জেমি। বালিকা থেকে রমণীতে রূপান্তরের ঢেউয়ের মতো কম্পমান পথটুকু দারুণ উত্তেজিত করে তুলল মার্গারেটকে, নিজেকে দারুণ জীবন্ত মনে হলো। এরকম অনুভূতির সঙ্গে আগে কখনও পরিচয় ঘটেনি ওর। *এ মুহূর্তটি সারাজীবন মনে রাখব আমি,* মনে মনে বলল সে। পাতার বিছানায় শুয়ে আছে সে, নগ্ন ত্বকে শিরশিরে আদর বুলিয়ে দিচ্ছে ফুরফুরে হাওয়া, বাওবাব গাছের ছায়া ঢেকে রেখেছে ওদেরকে। আবার প্রেম করল ওরা। এবারের মিলনপর্ব আরও বেশি সুখকর লাগল মার্গারেটের। *এই লোকটিকে আমি এতোটাই ভালোবাসি, এরকম ভালোবাসা কোনো নারীর পক্ষে বাসা সম্ভব নয়,* সুখের সাগরে ভাসতে ভাসতে মনে মনে বলছিল ও।

প্রেম করার পরে জেমি শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রইল মার্গারেটকে। মার্গারেটের খুব মন চাইছে সারাটা জীবন এভাবেই শুয়ে থাকতে। আহা, এ মুহূর্তটির যেন অবসান না ঘটে!

জেমির দিকে তাকাল সে, ফিসফিসিয়ে বলল, 'কী ভাবছ তুমি?'

হাসল জেমি, 'ভাবছি দারুণ খিদে পেয়েছে।'

হেসে উঠল মার্গারেট। উঠে বসল দু'জন। গাছের নিচে বসে খেয়ে নিল লাঞ্চ। তারপর ওরা নদীতে সাঁতার কাটল। উত্তপ্ত সূর্যের কড়া রোদের কাছে সমর্পণ করল নিজেদেরকে শরীর শুকিয়ে নিতে। জেমি আবার নিল মার্গারেটকে। মার্গারেট ভাবল, ইস, এ দিনটির যেন শেষ না হয়!

সেদিন রাতে জেমি এবং ভ্যান ডার মার্ভি সানডোনার বার-এর একটি টেবিল দখল করে গল্প করছিল। জেমি বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছিলেন এখানে সম্ভাবনার অনেক খাতই রয়েছে।'

খুশিতে বাগবাগ মার্ভি। 'জানতাম এ সম্ভাবনাগুলো নজরে পড়ার তো চোখ আপনার রয়েছে, মি. ট্রাভিস।'

'ঠিক কীসে বিনিয়োগ করা যায় বলুন তো?' জানতে চাইল জেমি।

ভ্যান ডার মার্ভি একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিয়ে অনুচ্চ স্বরে বলল, 'আজকেই খবর পেলাম পিনিশের উত্তরে বড়সড় একটি হিরের খনির সন্ধান মিলেছে। গোটা দশেক ক্লেইম করার সুযোগ এখনও আছে। ক্লেইমগুলো আপনি আর আমি ভাগাভাগি করে নিতে পারি। আমি পাঁচটি ক্লেইমের জন্য দেব পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড আর বাকি পাঁচটির জন্য আপনি বিনিয়োগ করবেন আরও পঞ্চাশ হাজার। ওখানে বস্তা বস্তা হিরে আছে। রাতারাতি আমরা কোটিপতি বনে যাব। আপনি কী বলেন?'

জেমি জানে ভ্যান ডার মার্ভি লাভজনক ক্লেইমগুলো নিজের জন্য রেখে দেবে এবং ওর ভাগ্যে জুটবে ফক্কা। আর লোকটা যে একটা পয়সাও দেবে না সে ব্যাপারেও ও নিশ্চিত।

'ভালোই তো মনে হচ্ছে,' বলল জেমি। 'এর সঙ্গে ক'জন প্রসপেক্টর জড়িত?'

'শুধু দু'জন।'

'তাহলে এত টাকা লাগছে কেন?'

'বুদ্ধিমানের প্রশ্ন,' সামনে ঝুঁকে এল ভ্যান ডার। 'তারা নিজেদের ক্লেইমের মূল্য জানে কিন্তু ওখানে কাজ চালানোর মতো আর্থিক সামর্থ্য ওদের নেই। আমরা ওদেরকে একশো হাজার পাউন্ড দেব এবং ডায়মন্ড ফিল্ডের কুড়ি পার্সেন্টের মালিকানা ওদের থাকবে।'

এবং এই কুড়ি পার্সেন্টও আলগোছে নিজের জন্য সরিয়ে নেবে ভ্যান ডার মার্ভি। জেমি নিশ্চিত প্রসপেক্টররা শেষতক হিরে কিংবা টাকা কিছুই পাবে না। সবই ভ্যান ডারের পকেটে ঢুকবে।'

'দ্রুত কাজ শুরু করতে হবে,' চোখের মনি ঘুরিয়ে বলল সে। 'যদি ব্যাপারটা কোনোভাবে ফাঁস হয়ে যায় তো–

'তাহলে দ্রুত কাজ শুরু করে দিন,' বলল জেমি।

হাসল ভ্যান ডার মার্ভি। 'ও নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। আমি এখুনি চুক্তিপত্র তৈরি করে ফেলছি।'

আফ্রিকান ভাষায় নিশ্চয়, মনে মনে বলল জেমি।

'আসুন, আরও কিছু চিত্তাকর্ষক ব্যবসা নিয়ে কথা বলি, ইয়ান।'

নয়া পার্টনারকে খুশি রাখতে মেয়েকে আর জেমির সঙ্গে বেরুতে যেতে মানা করল

না ভ্যান ডার মার্ভি। আর জেমির প্রতি মার্গারেটের প্রেম প্রতিদিন গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে লাগল। রাতে জেমির কথা ভেবে ঘুমাতে যায় সে, সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে একটাই নাম মনে পড়ে তার– জেমি। জেমি তার ভেতরকার এমন সংবেদনশীল একটি দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছে যার অস্তিত্বের কথাই জানা ছিল না মার্গারেটের। ও যেন এই প্রথম আবিষ্কার করল ওর দেহ কীসের জন্য তৈরি হয়েছে। যেসব বিষয় লজ্জার বলে তাকে শেখানো হয়েছিল সেগুলো জেমিকে আনন্দদানের জন্য দামী উপহার হয়ে উঠল। আবিষ্কার করার জন্য প্রেম যেন এক নতুন দেশ। গোপন উপত্যকার এ এক কামনাবিধুর ভূমি যেখানে রয়েছে উত্তেজক উপত্যকা আর মধুর নদী। এর স্বাদ আগে কখনও উপভোগ করতে পারেনি মার্গারেট।

বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে লুকিয়ে প্রেম করার জায়গার অভাব নেই। আর প্রতিটি মিলনই মার্গারেটের কাছে প্রথমবারের মতোই উত্তেজনা আর সুখের আকর।

তবে বাপের কথা ভেবে মনে মনে অপরাধবোধেও ভুগছিল মার্গারেট। তার বাবা ডাচ রিফর্মড চার্চের একজন সদস্য, মার্গারেটের কাণ্ড জানাজানি হয়ে গেলে বাবা কোনোদিনই ক্ষমা করবে না ওকে। সবার চোখে ও খারাপ হয়ে যাবে। পৃথিবীতে মাত্র দু'ধরনের নারী আছে– ভালো মেয়ে এবং বেশ্যা– আর কোনো ভালো মেয়ে বিয়ের আগে কোনো পুরুষের সঙ্গে বিছানায় যায় না। মার্গারেটকে সবাই বেশ্যা বলে উপহাস করবে। সে বিষয়টি নিয়ে এমনই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল যে সিদ্ধান্ত নিল এবারে বিয়ের কথাটা বলেই ফেলবে।

ভ্যাল নদীর তীরে ঘেঁষে ওরা আসছে, মার্গারেট বলল, 'ইয়ান, তুমি জানো আমি তোমাকে কত–' কথাটা কীভাবে তুলবে বুঝতে পারছে না ও। 'মানে তুমি আর আমি–' শেষে মরিয়া হয়ে উগরে দিল, 'বিয়ের কথা ভাবছ তুমি কিছু?'

হাসল জেমি। 'অবশ্যই, মার্গারেট। আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি।'

ওর সঙ্গে হাসিতে যোগ দিল মার্গারেটও। এমন সুখের মুহূর্ত ওর জীবনে আর আসেনি।

সেদিন সন্ধ্যার পরে স্মিটের সঙ্গে কথা বলতে সেলুনে ঢুকল জেমি। স্মিট বার-এর পেছনে দাঁড়িয়ে খদ্দেরদের ড্রিংক দিচ্ছে। জেমিকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখ।

'শুভ সন্ধ্যা, মি. ট্রাভিস। কী খাবেন, স্যার?'

'আজ কিছুই খাবো না, স্মিট। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে আমার। চলো ব্যাকরুমে যাই।'

'নিশ্চয়, স্যার।' টাকার গন্ধ পেল স্মিট। সহকারীকে বলল, 'তুমি এদিকটা একটু সামলাও।'

সানডোনার পেছনের ঘর বা ব্যাক রুম একটি ক্লজিটের চেয়ে আয়তনে বড় নয়। তবে এখানে বসে একান্তে কথা বলা যায়। ঘরে একটি গোল টেবিল ঘিরে খানকয়েক

চেয়ার। টেবিলের মাঝখানে একটি লণ্ঠন। লণ্ঠনটি জ্বেলে দিল স্মিট।

'বসো,' বলল জেমি।

একটা চেয়ার টেনে নিল স্মিট। 'জ্বি, স্যার, বলুন। কীভাবে আপনার খেদমত করতে পারি?'

'আমিই বরং তোমার খেদমত করতে এসেছি, স্মিট।'

হাসিতে উদ্ভাসিত হলো স্মিটের চেহারা। 'তাই নাকি, স্যার?'

'হুম।' জেমি লম্বা, সরু একটি সিগার বের করে আগুন ধরাল।

'আমি তোমাকে প্রাণে না মারার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

বিমূঢ় দেখাল স্মিটকে। 'আ-আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, মি. ট্রাভিস।'

'আমি ট্রাভিস নই। আমার নাম ম্যাকগ্রেগর। জেমি ম্যাকগ্রেগর। আমার কথা মনে আছে তোমার? এক বছর আগে আমাকে খুন করার পাঁয়তারা করেছিলে একটি গোলাঘরে বসে। ভ্যান ডার মার্ভির হাতে তুলে দিয়েছিলে আমাকে।'

স্মিটের কপাল কুঁচকে গেছে, চেহারায় ভীতি। 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি–'

'খামোশ! আমার কথা শোনো।' চাবুকের মতো ঝলসে উঠল জেমির কণ্ঠ।

স্মিট কী ভাবছে বুঝতে পারছে জেমি। এক বছর আগের তরুণের সঙ্গে তার সামনে বসা সাদা চুলের লোকটিকে মেলানোর চেষ্টা করছে সে।

'দেখতেই পাচ্ছ আমি বেঁচে আছি এবং এখন আমার অনেক টাকা– আমি এতোটাই বড়লোক যে, ভাড়াটে লোক দিয়ে এ জায়গাটি তোমাকে সুদ্ধ কবর দেয়ার ক্ষমতাও আমি রাখি। তুমি কি আমার সঙ্গে আছ, স্মিট?'

জেমির চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়েছে স্মিট। কী ভয়ানক বিপজ্জনক চাউনি! ঢোক গিলে বলল, 'জ্বী, স্যার।'

'ভ্যান ডার মার্ভি তোমাকে নিয়মিত মাসোহারা দেয় যাতে প্রসপেক্টদের তুমি তার কাছে পাঠিয়ে দাও এবং সে তাদেরকে নিঃস্ব করে দিতে পারে। বেশ ইন্টারেস্টিং পার্টনারশিপ। সে তোমাকে কত টাকা দেয়?'

চুপ করে রইল স্মিট।

'কত টাকা?'

'দুই পার্সেন্ট,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিল স্মিট।

'আমি তোমাকে পাঁচ পার্সেন্ট দেব। এখন থেকে কোনো প্রসপেক্টর এলে তাকে সোজা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। আমি তাকে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করব। সে তার ন্যায্য হিস্যা পাবে আর তুমি পাবে তোমারটা। ভ্যান ডার মার্ভি যা কামায় তার থেকে সত্যি সে তোমাকে দুই পার্সেন্ট দেয় বলে তুমি ভাবছ? বোকা কোথাকার!'

মাথা ঝাঁকাল স্মিট। 'আপনি ঠিকই বলেছেন, মি. ট্রাভ- মি. ম্যাকগ্রেগর। আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি।'

সিধে হলো জেমি। 'পুরোটা এখনও বুঝতে পারনি।' টেবিলে ঝুঁকে এল সে। 'তুমি নিশ্চয় ভাবছ ভ্যান ডার মার্ভির কাছে যাবে এবং আমাদের আজকের কথাগুলো তাকে বলে দেবে। এভাবে দু'জনের কাছ থেকেই টাকা কামাবে। তবে এতে একটা সমস্যা আছে, স্মিট।' তার কণ্ঠ ঝপ করে ফিসফিসানিতে পরিণত হলো। 'যদি সত্যি এমন কিছু করো তাহলে তোমার মরণ আমার হাতে।'

পনেরো

কাপড় পরছিল জেমি এমন সময় কে যেন দরজায় কড়া নাড়ল। কান পাতল ও। আবার শব্দ হলো কড়া নাড়ার। দরজায় হেঁটে গেল জেমি। খুলল। মার্গারেট।

'এসো, ম্যাগি,' ওকে আহ্বান জানাল জেমি। 'কোনো সমস্যা?' এই প্রথম মার্গারেট এসেছে জেমির হোটেল রুমে। ভেতরে ঢুকল সে। জেমির মুখোমুখি হওয়ার কারণেই হয়তো কথাগুলো বলতে কষ্ট হচ্ছিল ওর। কাল সারা রাত জেগে ছিল মার্গারেট। কীভাবে খবরটা দেবে তা-ই ভেবেছে। হয়তো খবরটা শোনার পরে জেমি আর তার মুখদর্শনও করতে চাইবে না।

সে জেমির চোখে চোখ রাখল। 'ইয়ান, আমি তোমার সন্তানের মা হতে চলেছি।'

পাথরমুখ হয়ে গেল জেমি। ভয় পেল মার্গারেট। প্রেমিককে বুঝি তার চিরতরে হারাতে হলো। কিন্তু পরমুহূর্তে জেমির মুখে আনন্দের আভা ফুটে উঠতে দেখে সমস্ত শংকা দূর হয়ে গেল মার্গারেটের মন থেকে। ওর হাত আঁকড়ে ধরল জেমি। 'দারুণ খবর, ম্যাগি! দারুণ! তোমার বাবাকে বলেছ?'

ভয় পেয়ে এক কদম পিছিয়ে গেল মার্গারেট। 'ওহ, না! উনি–' ভিক্টোরিয়ান সবুজ সোফায় ধপ করে বসে পড়ল।

'তুমি আমার বাবাকে চেনো না। তিনি– তিনি ব্যাপারটা মোটেই বুঝতে চাইবেন না।'

দ্রুত জামা গায়ে চড়াল জেমি। 'চলো, তোমার বাবাকে খবরটা এখনই দিয়ে আসি।'

'কোনো সমস্যা হবে না বলছ, ইয়ান?'

'আমি জানি কোনো সমস্যা হবে না।'

একজন প্রসপেক্টরকে বিলটং মেপে দিচ্ছিল সলোমন ভ্যান ডার মার্ভি এমন সময় জেমি আর মার্গারেট ঢুকল দোকানে।

'আরে, ইয়ান। একটু দাঁড়াও, ভাই। হাতের কাজটা সেরে আসছি এখুনি।' সে দ্রুত বিদায় করল খদ্দের, তারপর গেল জেমির কাছে। 'তারপর কী খবর বলো?'

'খবর খুব ভালো,' খুশিখুশি গলায় বলল জেমি। 'আপনার ম্যাগি মা হতে চলেছে।'

বাতাস হঠাৎ থম মেরে গেল। 'আ-আমি ঠিক বুঝলাম না।' তোতলাচ্ছে ভ্যান ডার

মার্ভি।

'না বোঝার কিছু নাই। আমি ওকে গর্ভবতী করেছি।'

ভ্যান ডার মার্ভির মুখ থেকে রক্ত সরে গেল। সে উন্মত্ত দৃষ্টিতে দু'জনকে দেখছে। তার কুমারী মেয়ে কৌমার্য হারিয়েছে... গর্ভবতী হয়ে পড়েছে... ভ্যান ডার মার্ভি শহরের সবার কাছে হাসির পাত্রে পরিণত হবে। তবে ইয়ান ট্রাভিস অত্যন্ত ধনবান মানুষ। ওরা যদি দ্রুত বিয়ে করে ফেলে...।

জেমির দিকে ফিরল সে। 'তোমাদেরকে এখুনি বিয়ে করতে হবে।'

বিস্মিত দেখাল জেমিকে। 'বিয়ে? আপনি কি ম্যাগিকে সেই হতভাগার কাছে বিয়ে দেবেন যাকে আপনি ঠকিয়ে ফতুর বানিয়ে দিয়েছিলেন?'

বোঁ বোঁ ঘুরছে ভ্যান ডার মার্ভির মাথা। 'তুমি কী বলছ, ইয়ান। আমি কখনও-'

'আমার নাম ইয়ান নয়,' কর্কশ গলায় বলল জেমি। 'আমি জেমি ম্যাকগ্রেগর। আমাকে চিনতে পারছেন না?'

ভ্যান ডার মার্ভির চেহারায় বিমূঢ় ভাব ফুটে উঠতে দেখল ও। 'না, আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি। ওই ছেলেটা তো মারা গেছে। আপনি তাকে হত্যা করেছেন। তবে আমি প্রতিহিংসা পুষে রাখি না, ভ্যান ডার মার্ভি। তাই আপনাকে একটা উপহার দিচ্ছি। আপনার মেয়ের পেটে আমার বীজ।'

ঘুরে চলে গেল জেমি। ওর গমনপথের দিকে হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে রইল ওরা দু'জন।

যা শুনেছে নিজের কানকে বিশ্বাস হতে চাইছে না মার্গারেটের। ও যা বলে গেল তা নিশ্চয় ওর মনের কথা নয়। *ও তো তাকে ভালোবাসে। ও-*

সলোমন ভ্যান ডার মার্ভি তার মেয়ের দিকে ফিরল। রাগে গনগন করছে। 'বেশ্যা।' চিৎকার করে উঠল সে। 'বেশ্যা মাগী! বেরিয়ে যা! আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যা!'

ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় মার্গারেট প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে রইল, তাকে নিয়ে যেসব ভয়ংকর ঘটনা ঘটছে তা যেন বুঝে উঠতে পারছে না সে। তার বাবার কৃতকর্মের দায় ইয়ান চাপিয়ে দিয়েছে তার ওপর। ইয়ান ভেবেছে সে তার বাবার মন্দ কাজের সঙ্গে জড়িত। *কিন্তু জেমি ম্যাকগ্রেগরটা কে? কে-*

'যাও।' মেয়ের গালে প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দিল ভ্যান ডার। 'আর কোনোদিন তোমার মুখ দেখতে চাই না আমি।'

দাঁড়িয়েই রইল মার্গারেট, যেন শিকড় গজিয়েছে পায়ে তা-ই নড়াচড়া করতে পারছে না। দম বন্ধ হয়ে আসছে ওর, বাতাসের জন্য আকুলি বিকুলি করছে ফুসফুস। তার বাপকে লাগছে একটা উন্মাদের মতো। অবশেষে ঘুরল মার্গারেট, এক ছুটে বেরিয়ে গেল দোকান থেকে। পেছনে আর তাকাল না।

তীব্র নৈরাশ্য নিয়ে মেয়েকে চলে যেতে দেখল ভ্যান ডার মার্ভি। বিয়ের আগেই মা

হওয়া অন্য মেয়েদের জীবনে কী দুর্দশা নেমে এসেছিল তা সে দেখেছে। ওই মেয়েদেরকে জোর করে গির্জায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, জনসমক্ষে তাদেরকে অপমান করে কম্যুনিটি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। তাদের কৃতকর্মের উপযুক্ত ফল তারা পেয়েছে। কিন্তু তার মেয়ে মার্গারেটকে তো সে খুব ভালো মেয়ে হিসেবে বড় করেছে। ধর্মভীরু, অত্যন্ত নিস্পাপ একটি মেয়ে। সে কী করে বাপের সঙ্গে এরকম বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারল? মানসচক্ষে মেয়ের নগ্ন শরীর দেখতে পেল ভ্যান ডার, ওই লোকটার সঙ্গে রতিক্রিয়া করছে, জানোয়ারের মতো উপগত হচ্ছে এবং কী আশ্চর্য এসব কথা ভাবতেই সে কামোত্তেজনা বোধ করল।

দোকানের সামনে *'দোকান বন্ধ'* সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিল ভ্যান ডার মার্ভি। তারপর শুয়ে পড়ল বিছানায়। সারাদিন শুয়েই থাকল। ওঠার শক্তি নেই কিংবা ইচ্ছে নেই। সে ভাবছিল খবরটা যখন ছড়িয়ে যাবে শহরময়, সবার তামাশার পাত্রে পরিণত হবে সে। হয় তাকে সকলের সামনে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা হবে নতুবা মেয়ের অপকর্মের জন্য সবাই তাকেই দায়ী করবে। এসব কী করে সহ্য করবে ভ্যান ডার? তাকে নিশ্চিত করতে হবে বিষয়টি যেন কেউ জানতে না পারে। বেশ্যাটাকে চিরদিনের জন্য দূর করে দিতে হবে চোখের সামনে থেকে। সে বিছানা থেকে নেমে হাঁটু মুড়ে বসে প্রার্থনা করল হে ঈশ্বর, তুমি তোমার বিশ্বস্ত ভৃত্যের সঙ্গে একী খেলা খেললে? কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করলে? আমার মেয়ে মরুক, হে প্রভু, ওরা দু'জনেই যেন মারা যায়...।

সানডোনার সেলুন দুপুর বেলা ভরভরান্ত থাকে ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকের ভিড়ে। জেমি বার-এ গিয়ে লোকজনের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। 'ইয়োর অ্যাটেনশন, প্লীজ!' মানুষজনের হৈ-হল্লা থেমে গিয়ে নেমে এল নীরবতা। 'এখানে সবার জন্য মদ দাও।'

'ব্যাপার কী?' জানতে চাইল স্মিট। 'নতুন কোনো হিরের খনির খোঁজ পেয়েছেন?'

হাসল জেমি। 'এক অর্থে তাই মাই ফ্রেন্ড। সলোমন ভ্যান ডার মার্ভির অবিবাহিত কন্যাটি গর্ভবতী। মি. ভ্যান ডার মার্ভি এ উপলক্ষে সেলিব্রেট করাতে চান।'

ফিসফিস করল স্মিট। 'ওহ, যীশাস!'

'যীশাসের এখানে কোনো ভূমিকা নেই। ভূমিকা আছে জেমি ম্যাকগ্রেগরের।'

একঘণ্টার মধ্যে ক্লিপড্রিফটের সবাই জেনে গেল খবরটা। জানল ইয়ান ট্রাভিস আসলে জেমি ম্যাকগ্রেগর এবং কীভাবে সে ভ্যান ডার মার্ভির মেয়েকে গর্ভবতী করেছে। এ কথা জেনে সবাই স্তম্ভিত।

'মেয়েটাকে দেখে তো ওরকম কখনোই মনে হয়নি, তাই না?'

'আরে মেয়েটা গভীর জলের মাছ।'

'ভাবছি, ওই গভীর জলে শহরের আর কতজন পুরুষকে নিয়ে সাঁতার কেটেছে মার্গারেট।'

'মালটা দারুণ। আমি যদি একবার চান্স পেতাম!'

'হা-হুতাশের কী আছে? ওর কাছে গেলেই চান্স দেবে।'

পুরুষরা সবাই হো হো করে হাসতে লাগল।

বিকেলবেলা দোকান থেকে বেরুল ভ্যান ডার মার্ভি। সিদ্ধান্ত নিয়েছে মার্গারেটকে সে কেপটাউনে পাঠিয়ে দেবে। জারজটাকে ওখানে গিয়ে জন্ম দিক সে, ক্লিপড্রিফটের কেউ যেন জানতে না পারে তার কলঙ্কের কথা। ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ঝুলিয়ে রাস্তায় নামল ভ্যান ডার মার্ভি।

'আফটারনুন, মি. ভ্যান ডার মার্ভি। শুনলাম আপনি নাকি শিশুদের কাপড় চোপড় কিনতে শুরু করেছেন?'

'গুড ডে, সলোমন। শুনলাম তোমার দোকানে নাকি শীঘ্রি খুদে এক সহকারী আসছে?'

ভ্যান ডার মার্ভি বুঝতে পারল তার মেয়ের কলঙ্কগাথা শহরময় রটে গেছে। সে টলতে টলতে ফিরে এল দোকানে। দোকানে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা।

সানডোনার সেলুনে বসে হুইস্কি পান করছে জেমি, শুনছে মার্গারেটকে নিয়ে লোকের নানান রসালো মন্তব্য। ক্লিপড্রিফটে এতবড় স্ক্যান্ডাল এর আগে কখনও ঘটেনি। সবাই এ ঘটনায় মজা পেয়েছে। *ইস, বান্ডা যদি এখন এখানে থাকত,* ভাবছে জেমি। *ও-ও খুব মজা পেত।* সলোমন ভ্যান ডার মার্ভি বান্ডার বোনকে যে অপমান করেছে তার শোধ হলো এটা। তবে প্রতিশোধের পালা তো মাত্র শুরু। ভ্যান ডার মার্ভিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়ার পরে জেমির মনের প্রতিহিংসার আগুন নিভবে। মার্গারেটের জন্য তার বিন্দুমাত্র মায়া নেই। সে-ও তো বাপের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রথম দিন মার্গারেট যেন কী বলেছিল? ও হ্যাঁ, মনে আছে জেমির। মার্গারেট বলেছিল *আমার বাবা এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন। উনি এসব বিষয় খুব ভালো জানেন।* মার্গারেটও কম শয়তানী না। ওদের দু'জনের শেষ দেখে ছাড়বে জেমি।

স্মিট হেঁটে এল জেমির কাছে। 'আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি, মি. ম্যাক গ্রেগর?'

'বলো।'

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল স্মিট। 'পুনিয়েলের কাছে ক'জন প্রসপেক্টর দশটি ক্লেইম করেছে। তারা ওখান থেকে হিরে তুলবে তবে ক্লেইমে কাজ করার জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি কেনার টাকা তাদের নেই। তারা একজন পার্টনার খুঁজছে। ভাবলাম আপনাকে ব্যাপারটা জানাই যদি আপনি আগ্রহ বোধ করেন।'

জেমি ওকে পরখ করল। 'এদের কথা তুমি ভ্যান ডার মার্ভিকে বলেছ, না?'

মাথা ঝাঁকাল স্মিট, বিস্মিত। 'জ্বী, স্যার। তবে আপনার প্রস্তাবটি নিয়েও ভাবছিলাম

আমি। আমি আসলে আপনার সঙ্গেই ব্যবসা করতে চাই।'

জেমি লম্বা, সরু একটি সিগার বের করল। ওতে আগুন ধরিয়ে দিল স্মিট। 'বলতে থাকো।'

বলতে লাগল স্মিট।

শুরুতে ক্লিপড্রিফটে যৌন ব্যবসায় কোনো শৃঙ্খলার বালাই ছিল না। বেশিরভাগ পতিতা ছিল কৃষ্ণাঙ্গী, রাস্তাঘাটের নোংরা পরিবেশে দেহ বিক্রি করে বেড়াত। শহরে প্রথম প্রথম সাদা চামড়ার যে পতিতাদের আবির্ভাব ঘটে তারা ছিল পার্ট-টাইম বার মেইড। তবে হিরের খোঁজে লোকজনের যাতায়াত বেড়ে গেলে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে শহর এবং শ্বেতাঙ্গ নিশি-কন্যাদের যাতায়াতও বাড়তে থাকে।

বর্তমানে ক্লিপড্রিফটের শহরতলীতে আধ ডজন পতিতালয় রয়েছে। এগুলো কাঠের তৈরি, টিনের ছাদ। তবে ব্যতিক্রমী একটি পতিতালয়ও রয়েছে। ওটির মালিক ম্যাডাম অ্যাগনেস। ব্রি স্ট্রিটে দোতলা একটি সুদৃশ্য ভবন নিয়ে মহিলা গড়ে তুলেছে তার দেহ-ব্যবসার কারবার। এখানকার যৌন কর্মীদের বেশিরভাগই বয়সে তরুণী এবং চড়ামূল্যে তারা শরীর বিক্রি করে। জমকালো ড্রইংরুমে খদ্দেরদের বসিয়ে পরিবেশন করা হয় ড্রিংক। ম্যাডাম আগনেসের বয়স মধ্য পঁয়ত্রিশ। হাসিখুশি মহিলা। লন্ডনে একটি ব্রথেলে সে আগে কাজ করত। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্লিপড্রিফট শহরে সহজে পয়সা কামাই করা যায় শুনে সে এখানে চলে এসেছে। নিজের নতুন ব্যবসা খুলবার মতো যথেষ্ট পয়সাকড়ি তার ছিল। আর শুরু থেকেই তার বাণিজ্য ভালো।

ম্যাডাম অ্যাগনেস গর্ব করে বলে, সে পুরষ মানুষ খুব ভালো চিনতে পারে। কিন্তু জেমি ম্যাকগ্রেগর তার কাছে একটি ধাঁধা বিশেষ। সে প্রায়ই এখানে আসে, মুক্ত হস্তে টাকা ওড়ায়, মহিলারা তাকে খুব পছন্দও করে কিন্তু সে কারও সঙ্গে বিছানায় যায় না। তার চোখ জোড়া দারুণভাবে আকর্ষণ করে অ্যাগনেসকে। বিষণ্ন, তলহীন একজোড়া পুকুর যেন। শীতল। সে কখনও নিজের সম্পর্কে কিছু বলে না। ম্যাডাম অ্যাগনেস শুনেছে সলোমন ভ্যান ডারের মেয়ের পেটে জেমির সন্তান কিন্তু সে মার্গারেটকে বিয়ে করতে চাইছে না। হারামী! জেমিকে মনে মনে গাল দিল অ্যাগনেস। তবে মনে মনে স্বীকারও করল হারামীটা যথেষ্ট আকর্ষণীয় বটে। সে দেখছে লাল কার্পেটে মোড়া সিড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল জেমি, মৃদুস্বরে তাকে শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

জেমি হোটেলে ফিরে এসে দেখে মার্গারেট তার ঘরে বসে আছে। শূন্য দৃষ্টি জানালার বাইরে। জেমিকে দেখে সে তাকাল।

'হ্যালো, জেমি,' তার গলা কেঁপে গেল।

'তুমি এখানে কী করছ?'

'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'তোমার সঙ্গে আমার কোনো কথা নাই।'

'আমি জানি তুমি কেন এসব করছ। তুমি আমার বাবাকে ঘৃণা করো।' মার্গারেট ওর পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল। 'কিন্তু তোমার জানা দরকার আমার বাবা তোমার সঙ্গে যা-ই করে থাকুক না কেন তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না। প্লিজ– আমি তোমাকে হাত জোড় করে মিনতি করছি– আমার কথা বিশ্বাস করো। আমাকে ঘৃণা করো না। তোমাকে আমি অনেক ভালোবাসি।'

শীতল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল জেমি। 'সেটা তোমার সমস্যা, নয় কি?'

'প্লিজ, ওভাবে আমার দিকে তাকিয়ো না। তুমিও তো আমাকে ভালোবাসো...'

মার্গারেটের কথা শুনছে না জেমি। পারডস্পানে সেই ভয়ংকর যাত্রার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে তার যেখানে প্রায় মরতে বসেছিল সে... সে প্রায় হাল ছেড়ে দিচ্ছিল... তারপর অলৌকিকভাবে হিরের খোঁজ পেয়ে যায়...। সেগুলো নিয়ে যায় ভ্যান ডার মার্ভির কাছে... ভ্যান ডার তাকে বলেছিল তুমি ভুল বুঝেছ, খোকা। আমার কোনো পার্টনারের দরকার নেই। তুমি আমার জন্য কাজ করছ... তোমাকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলাম শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য...। তারপর সেই ভয়ংকর মার... শকুনগুলোর গায়ের গন্ধ যেন আবার নাকে ভেসে এল জেমির, ধারালো ঠোঁট দিয়ে ওরা ঠুকরে খাচ্ছিল ওর গায়ের মাংস...।

বহুদূর থেকে যেন ভেসে এল মার্গারেটের কণ্ঠ। 'তোমার মনে নেই সে কথা? আমি যে তোমার... আই লাভ য়্যু।'

নিজেকে একটা ঝাঁকি দিয়ে বর্তমান সময়ে ফিরে এল জেমি। তাকাল মার্গারেটের দিকে। *প্রেম!* এ শব্দটির মানে কী সে জানে না। ভ্যান ডার মার্ভি তার ভেতর থেকে ঘৃণা ছাড়া আর সমস্ত অনুভূতি কেড়ে নিয়েছে। জেমি এখন শুধু ঘৃণা নিয়ে বাঁচছে। এ যেন তার অমৃত, তার রক্ত। এ ঘৃণাই তাকে হাঙরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহস যুগিয়েছিল, প্রবল ঘৃণাই তাকে নামিব মরুভূমির ডায়মন্ড ফিল্ডের মাইন ঘেরা ভূমিতে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কবিরা প্রেম ভালোবাসা নিয়ে কবিতা লেখেন। গায়করা প্রেমের গান গায়, হয়তো সত্যি ভালোবাসা বাস্তব, এর অস্তিত্ব রয়েছে। তবে প্রেম অন্য পুরুষদের জন্য। জেমি ম্যাকগ্রেগরকে ভালোবাসার ছলনায় ভুললে চলবে না।

'তুমি সলোমন ভ্যান ডার মার্ভির মেয়ে। তুমি তার নাতিকে পেটে বহন করছ। এখন বেরিয়ে যাও।'

ষোলো

মার্গারেটের যাবার কোনো জায়গা নেই। সে তার বাপকে ভালোবাসে, বাবার কাছে ক্ষমা চায় সে কিন্তু জানে তার বাবা কোনোদিনই তাকে ক্ষমা করবে না। বরং তার জীবন পরিণত করবে জীবন্ত নরকে। কিন্তু মার্গারেটের তো কোনো উপায় নেই। কারও না কারও কাছে তাকে যেতেই হবে।

মার্গারেট হোটেল থেকে বেরিয়ে চলল তার বাপের দোকানে। টের পেল রাস্তার সবাই তাকে ট্যারা চোখে দেখছে। কেউ কেউ ঠোঁট মুড়ে হাসল। মার্গারেট মাথা উঁচু করে হেঁটে চলল। দোকানের সামনে এসে সে একটু ইতস্তত করল। তারপর ঢুকল ভেতরে। দোকান খালি। তার বাপ বেরিয়ে এল দোকানের পেছনের ঘর থেকে।

'বাবা...

'তুমি!' বাপের কণ্ঠের তীব্র ঘৃণা চাবুকের মতো লাগল মার্গারেটের গায়ে। সামনে এগিয়ে এল সে। ভ্যান ডার মার্ভির মুখে মদের গন্ধ। 'তুমি এ শহর থেকে চলে যাও। এক্ষুনি আজ রাতেই। এখানে আর কোনোদিন আসবে না। আমার কথা শুনেছ? কোনোদিন না!' পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে মেঝেতে ছুঁড়ে মারল সে। 'টাকাগুলো নিয়ে বিদেয় হও।'

'আমি তোমার নাতির জন্ম দিতে চলেছি।'

'তুমি শয়তানের বাচ্চা জন্ম দিতে চলেছ।' মেয়ের দিকে এগিয়ে গেল সে, মুঠো পাকাল। 'তোমাকে লোকে যখনই রাস্তায় বেশ্যার মতো ঘুরঘুর করতে দেখবে, আমার অপমানের কথা তাদের মনে পড়বে। তুমি চলে গেলে ওরাও ব্যাপারটা ভুলে যাবে।'

মার্গারেট অনেকক্ষণ বাপের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ঘুরে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

'টাকা, বেশ্যা মাগী!' চেঁচাল ভ্যান ডার। 'তোর টাকা নিয়ে যা!'

শহরের শেষ মাথায় সস্তা একটি বোর্ডিং হাউজ আছে। মার্গারেট সেদিকে চলল। তার মস্তিষ্ক কাজ করছে না। সে ওখানে পৌঁছে বাড়ির মালকিন মিসেস ওয়েনসের খোঁজ করল। মিসেস ওয়েনস স্থূলকায়া, হাসিখুশি চেহারার বছর পঞ্চাশের এক মহিলা। তার স্বামী তাকে ক্লিপড্রিফটে নিয়ে এসেছিল। পরে তাকে ছেড়ে চলে যায়। অন্য কোনো নারী হলে ভেঙে পড়ত কিন্তু মিসেস ওয়েনস শক্ত ধাতুতে গড়া। তিনি এ শহরে অনেক ভালো

মানুষকে বিপদে পড়তে দেখেছেন কিন্তু তার সামনে সতেরো বছর বয়সের যে তরুণীটি দাঁড়িয়ে আছে তার মতো বিপদে পড়তে কাউকে দেখেন নি।

'আমাকে খুঁজছিলে তুমি?'

'জ্বী। ভাবছিলাম– ভাবছিলাম যদি আপনার এখানে কোনো কাজ-টাজ থাকে।'

'কী ধরনের কাজ?'

'যে কোনো ধরনের। আমি খুব ভালো রাঁধতে পারি। টেবিল সাজাতে জানি। বিছানা পরিষ্কার করতে পারি। আমি আমি!' মরিয়া শোনাল মার্গারেটের কণ্ঠ, 'আমাকে যে কাজ করতে বলবেন আমি তা-ই করব। যা খুশি!'

থরথর করে কাঁপতে থাকা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বড্ড মায়া হলো মিসেস ওয়েনসের। 'ঠিক আছে। তোমাকে আমি কাজে নিতে পারি। কবে থেকে শুরু করতে চাও?' মার্গারেটের মুখে স্বস্তি ফুটে উঠতে দেখলেন তিনি।

'এক্ষুনি।'

'আমি তোমাকে প্রতিমাসে এক পাউন্ড দুই শিলিং এগারো পেন্স বেতন দেব। সঙ্গে থাকা-খাওয়া ফ্রি। চলবে?'

'খুব চলবে।' কৃতজ্ঞচিত্তে বলল মার্গারেট।

সলোমন ভ্যান ডার মার্ভি এখন রাস্তাঘাটে বেরোয় না বললেই চলে। তার দোকান ইদানিং বেশিরভাগ সময় বন্ধ থাকে। লোকজন শেষে বিরক্ত হয়ে অন্য দোকানে সদয়পাতি কিনতে যেতে লাগল।

তবে প্রতি রোববার গির্জায় যাওয়া কিন্তু বন্ধ করেনি সলোমন, তবে প্রার্থনা করতে যায় না, ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি চায় সে, সৃষ্টিকর্তার অন্ধ সেবক হওয়া সত্ত্বেও তার কপালে কেন এমন দুর্ভোগ। ক্লিপড্রিফট শহরের সে একজন ধনী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি কিন্তু যারা আগে কোনোদিন তার চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহস পেত না এখন তারাও তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে, ফোড়ন কাটে। ক্রমে ঈশ্বরের প্রতি তার ভক্তি-ভালোবাসা উঠে গেল। গির্জায় যাওয়া বন্ধ করে দিল ভ্যান ডার মার্ভি।

সলোমন ভ্যান ডার মার্ভির ব্যবসার যত পতন হচ্ছিল, জেমি ম্যাক গ্রেগরের বাণিজ্য ততই ফুলেফেঁপে উঠছিল। হিরের খনির অংশীদার করলে জেমি প্রচুর অর্থ সাহায্য দিতে কার্পণ্য করে না একথা ছড়িয়ে পড়ার পরে দলে দলে প্রসপেক্টররা ভিড় করতে লাগল তার কাছে। জেমি রিয়েল এস্টেট এবং সোনার ব্যবসাতেও টাকা খাটাল। দেনা-পাওনার ব্যাপারে সে অত্যন্ত সৎ। তার খ্যাতি যত ছড়িয়ে পড়ল লোকে ততই তার সঙ্গে ব্যবসা করতে আগ্রহী হয়ে উঠল।

শহরে ব্যাংকের সংখ্যা সাকুল্যে দুটো। অদক্ষ ব্যবস্থাপনার কারণে একটি যখন লাটে ওঠার জোগাড়, ওই ব্যাংকটি কিনে নিল জেমি। নিজের লোকদের কাজে লাগিয়ে

দিল ব্যাংকে এবং অর্থ লেনদেনে তার নাম গোপন রাখল।

জেমি এখন যেখানে হাত দিচ্ছে সেখানেই সোনা ফলাচ্ছে। তার শৈশবের স্বপ্নকে ছাড়িয়ে গেছে সাফল্য ও অর্থ দিয়ে। তবে এটুকু জেমির কাছে অবশ্যই যথেষ্ট নয়। ভ্যান ডার মার্ভির ব্যর্থতার সঙ্গে তুলনা করে সে নিজের সাফল্যকে। তার প্রতিশোধের পালা সবে শুরু হলো।

মাঝে মাঝে রাস্তায় মার্গারেটের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় জেমির। তবে সে ফিরেও তাকায় না মার্গারেটের দিকে। জেমি জানে না শুধু তাকে এক নজর দেখার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে মার্গারেট। জেমিকে দেখলে তার কলজের ধুকধুকানি বেড়ে যায়, বন্ধ হয়ে আসে নিঃশ্বাস। সে এখনও জেমিকে ভালোবাসে এবং প্রচণ্ড ভালোবাসে। এ ভালোবাসার কোনোদিন অবসান হবে না। মার্গারেট জানে জেমি তার বাবাকে শাস্তি দেয়ার জন্য মার্গারেটের শরীর ব্যবহার করেছিল। তবে সে এ-ও বিশ্বাস করে সে যখন জেমির সন্তানের জন্ম দেবে এবং জেমি তার সন্তানের মুখ দেখবে তখন সে মার্গারেটকে বিয়ে করবে। মার্গারেট হয়ে উঠবে মিসেস জেমি ম্যাকগ্রেগর। জীবনের কাছে এটুকুই শুধু চাওয়া মার্গারেটের।

মার্গারেটের পেট যত স্ফীত হলো ততই তার ভেতরে দানা বাঁধল ভয়। কারও সঙ্গে কথা বলতে চায় সে। কিন্তু শহরের কোনো মেয়ে তার সঙ্গে কথা বলে না। তাকে এড়িয়ে চলে। তাদের ধর্ম শাস্তি দিতে শিখিয়েছে, ক্ষমা করতে নয়। সে এ শহরে বড্ড একা, তার চারপাশে শুধুই অচেনা মানুষ। রাতের বেলা কাঁদে মার্গারেট। নিজের জন্য। এবং তার অনাগত সন্তানের জন্য।

ক্লিপড্রিফটের কেন্দ্রবিন্দুতে একটি দোতলা ভবন কিনেছে জেমি ম্যাকগ্রেগর। তার ক্রমবর্ধমান ব্যবসার সদর দপ্তর হিসেবে ব্যবহার করে এটিকে। একদিন জেমির প্রধান হিসাব রক্ষক হ্যারি ম্যাকমিলান এসে বলল, 'আমাদের কোম্পানির একটা নাম দরকার। কোনো পরামর্শ?'

'আমি ভেবে বলব।'

জেমি বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করল। কী নাম রাখা যায় কোম্পানির? বহুদিন আগের নামিব মরুভূমির ডায়মন্ড ফিল্ডের সাগর-কুয়াশা ভেদ করা কয়েকটি শব্দ যেন প্রতিধ্বনি তুলল ওর কানে। সাথে সাথে প্রত্যাশিত নামটি পেয়ে গেল জেমি। হিসাব রক্ষককে ডেকে পাঠাল। 'আমরা আমাদের নতুন কোম্পানির নাম রাখব ক্রুগার ব্রেন্ট। ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেড।

জেমির ব্যাংক ম্যানেজার আলভিন কোরি এল ওর সঙ্গে কথা বলতে।

'মি. ভ্যান ডার মার্ভির লোন নিয়ে কথা বলতে এসেছি,' বলল সে। 'উনি অনেক পিছিয়ে আছেন। লোনের টাকা ঠিকমত শোধ করতে পারছেন না। ওনার ব্যবসা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে, মি. ম্যাকগ্রেগর। ওনাকে লোন দেয়া বন্ধ করে দিই?'

'না।'

অবাক হলো কোরি। 'আজ সকালেও উনি এসেছিলেন টাকা ধার নিতে–'

'টাকাটা দিয়ে দাও। যত টাকা চায় ওকে দেবে?'

চেয়ার ছাড়ল ম্যানেজার। 'আপনি যা বলেন, মি. ম্যাক গ্রেগর। আমি ওনাকে বলব আপনি–'

'তাকে কিছুই বলতে হবে না। শুধু টাকা দিয়ে দাও।'

প্রতিদিন ভোর পাঁচটার সময় ঘুম থেকে উঠে রুটি আর বিস্কিট বানায় মার্গারেট। বোর্ডাররা ডাইনিংরুমে নাশতা খেতে এলে সে তাদেরকে পরিজ, হ্যাম এবং ডিম পরিবেশন করে। সঙ্গে থাকে কেক, মিষ্টি রোল এবং ধূমায়িত কফি। বোর্ডিং হাউজের বেশিরভাগ সদস্য প্রসপেক্টর। কেউ যায় হিরের খনির ক্লেইম করতে, কেউবা ক্লেইম করে ফিরে আসে। তারা ক্লান্ত শরীর নিয়ে যাত্রাবিরতি করে ক্লিপড্রিফটে। গোসল করে, মদ খেয়ে মাতাল হয়, শহরের পতিতালয়গুলোতে যায়। এদের অধিকাংশই অশিক্ষিত।

ক্লিপড্রিফটে অলিখিত নিয়ম রয়েছে ভালো মেয়েদেরকে বিরক্ত করা যাবে না। কোনো পুরুষের সেক্সের প্রয়োজন হলে সে পতিতালয়ে যাবে, বেশ্যার কাছে। মার্গারেট ভ্যান ডার মার্ভি কোনো ক্যাটাগরিতেই পড়ে না। ভালো মেয়েরা কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হয় না, তবে মার্গারেট যেহেতু এ নিয়মটির ব্যাত্যয় ঘটিয়েছে তাই সবার ধারণা তাকে চাইলেই বুঝি বিছানায় পাওয়া যাবে। শুধু প্রস্তাব দেয়ার অপেক্ষা। এবং তারা প্রস্তাবও দেয়।

কিছু প্রসপেক্টর একেবারে খোলাখুলি মার্গারেটকে তাদের সঙ্গে বিছানায় যাওয়ার আহ্বান জানায়। অন্যরা গোপনে, চুপিচুপি নিজেদের বাসনার কথা বলে। দুটি দলকেই নিজের সম্মান বজায় রেখে প্রত্যাখ্যান করে মার্গারেট। তবে একরাতে মিসেস ওয়েনস ঘুমাতে যাওয়ার তোড়জোড় করছেন, বাড়ির পেছন দিকে মার্গারেটের ঘর থেকে একটি আর্তচিৎকার শুনতে পেলেন তিনি। ছুটে গিয়ে দেখলেন এক মাতাল প্রসপেক্টর মার্গারেটের নাইট গাউন ছিড়ে ফেলে তাকে বিছানায় ঠেসে ধরেছে।

বাঘিনীর মতো লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন মিসেস ওয়েনস। লোহার রড দিয়ে তাকে পেটাতে শুরু করলেন। প্রসপেক্টরের অর্ধেকও হবে না তিনি আয়তনে কিন্তু এমনই রেগে গেছেন যে, লোকটাকে পিটিয়ে অজ্ঞান করে ফেললেন এবং তাকে টানতে টানতে রাস্তায় ফেলে দিয়ে এলেন। তারপর দ্রুত ফিরে এলেন মার্গারেটের ঘরে। ঠোঁট থেকে রক্ত মুছছে মার্গারেট। লোকটা কামড়ে রক্ত বের করে দিয়েছে। তার হাত কাঁপছে।

'তুমি ঠিক আছ তো, ম্যাগি?'

'জ্বী। আ-ধন্যবাদ, মিসেস ওয়েনস।'

মার্গারেটের লুকানো কান্না চোখ ছাপিয়ে বেরিয়ে এল। এ শহরে যেখানে তার সঙ্গে প্রায় কেউ কথাই বলে না, সেখানে একজন মানুষ তার প্রতি এমন মায়া দেখিয়েছে, সে

কৃতজ্ঞতায় কাঁদছিল ও।

মিসেস ওয়েনস মার্গারেটের ফোলা পেটের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললেন *বেচারি! জেমি ম্যাকগ্রেগর কোনোদিনই ওকে বিয়ে করবে না।*

সন্তান জন্মদানের সময় এগিয়ে আসছিল। আজকাল একটুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে মার্গারেট। একবার বসলে আবার খাড়া হতে খুব কষ্ট হয়। তার আনন্দ লাগে শুধু তখন যখন বাচ্চাটা পেটের ভেতর নড়াচড়া করে। সে নিশ্চিত তার ছেলে হবে। এ পৃথিবীতে সে এবং তার ছেলে একদম একা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে তার ছেলের সঙ্গে কথা বলে। বলে ভবিষ্যত পৃথিবীতে তার সন্তানের জন্য কত সুন্দর সুন্দর জিনিস অপেক্ষা করছে।

একদিন রাতে, সাপারের খানিক পরে একটি কৃষ্ণাঙ্গ কিশোর এল বোর্ডিং হাউজে। মার্গারেটকে মুখ বন্ধ একটি খাম দিল।

'জবাবটি আমার এখুনি চাই,' বলল ছেলেটি।

খাম খুলে চিঠি পড়ল মার্গারেট। তারপর আবার পড়ল খুব ধীরে ধীরে।

'হ্যাঁ,' বলল সে। 'জবাব হলো হ্যাঁ।'

পরের শুক্রবার, দুপুরের পরে মার্গারেট হাজির হলো ম্যাডাম অ্যাগনেসের পতিতালয়ে। সদর দরজায় 'বন্ধ' লেখা সাইনবোর্ড ঝুলছে। দরজায় করাঘাত করল মার্গারেট। লোকে তার দিকে ঠারেঠোরে তাকাচ্ছে দেখেও পাত্তা দিল না। ভাবছিল এখানে এসে ভুলই করল কিনা। মনস্থির করতে বেশ দোটানায় ভুগছিল ও। তীব্র একাকিত্ববোধই শেষে ওকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে। চিঠিতে লেখা ছিল

প্রিয় মিস ভ্যান ডার মার্ভি

যদিও বিষয়টিতে আমার নাক গলানোর দরকার ছিল না তবে আমার মেয়েরা এবং আমি তোমার দুর্ভাগ্য এবং দুর্ভাগা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলাম। এ বড়ই পরিতাপের বিষয়। আমরা তোমাকে এবং তোমার সন্তানকে সাহায্য করতে চাই। যদি তুমি বিব্রত বোধ না কর তাহলে তোমার সম্মানে আমরা লাঞ্চের আয়োজন করব। তুমি কি আগামী শুক্রবার দুপুরে আসতে পারবে?

তোমারই ম্যাডাম অ্যাগনেস

পুনশ্চ   আমরা বিষয়টি গোপন রাখব।

চলে যাবে কিনা ভাবছিল মার্গারেট এমন সময় দরজা খুলে দিল ম্যাডাম অ্যাগনেস।

মার্গারেটের হাত ধরে সে বলল 'ভেতরে এসো, সোনা।'

মার্গারেটকে পার্লারে নিয়ে এল সে। ভিক্টোরিয়ান লাল কাউচ, চেয়ার এবং টেবিল দিয়ে সজ্জিত পার্লার। ঘর সাজানো হয়েছে রঙ বেরঙের রিবন আর বেলুন দিয়ে। কার্ডবোর্ডের একটি সাইনবোর্ড ঝুলছে শিলিং থেকে। তাতে আকাবাঁকা অক্ষরে লেখা

WELCOME BABY... IT'S GOING TO BE A BOY... HAPPY BIRTHDAY.

পার্লারে ম্যাডাম অ্যাগনেসের আটটি মেয়ে বসে বা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কেউ ফর্সা, কেউ কালো, কেউ লম্বা, কেউ খাটো। তরুণী, যুবতী সব বয়সের মেয়েই আছে। সান্ধ্য গাউন পরেছে সবাই এবং কেউ কোনো মেকআপ নেয়নি। *এরা শহরের সম্মানিত গৃহবধূদের চেয়ে কোনো অংশে কম সুন্দর দেখতে নয়, ভাবল মার্গারেট।*

ঘর ভর্তি নিশি-কন্যাদের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে। কী করবে বুঝতে পারছে না। কিছু কিছু মুখ চেনা চেনা লাগছে। বাবার দোকানে কাজ করার সময় এদেরকে দোকানে ফাইফরমাশ খাটতে দেখেছে মার্গারেট। কয়েকটি মেয়ের বয়স খুবই কম আর দেখতেও খুব সুন্দরী। কয়েক জনের বয়স একটু বেশি, মোটাসোটা গড়ন, চুলে রঙ করেছে। তবে সকলের মধ্যেই একটি গুণ রয়েছে– তারা সবাই খুব বন্ধুত্বপূর্ণ, উষ্ণ এবং দয়ালু। মার্গারেটকে খুশি করতে তাদের আন্তরিকতার অভাব থাকল না।

ওরা তাকে নিয়ে ডাইনিংরুমে গেল। টেবিলে মার্গারেটের জন্য শ্যাম্পেনের একটি বোতল রাখা হয়েছে। আর খানাপিনার ঢালাও আয়োজন। শুরু হলো সুস্বাদু কোল্ড সুপ আর সালাদ দিয়ে। তারপর এল তাজা পোনা মাছ। এরপরে খাসির মাংস, হাঁসের মাংস এবং সব্জি। রইল কেক, চিজ, ফল এবং কফি। মার্গারেট পেটপুরে খেল এবং মেয়েদের সঙ্গে মন ভরে গল্প করল। মার্গারেট বসেছে টেবিলের মাথায়। তার ডান দিকে ম্যাডাম অ্যাগনেস এবং বাম পাশে বসেছে ম্যাগি নামের সোনালি চুলের অপূর্ব সুন্দরী এক ষোড়শী। মেয়েগুলোর দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে মার্গারেট ভাবছিল জেমি এদের কাকে কাকে নিয়ে বিছানায় গেছে। হয়তো সবাইকে নিয়েই। ও ভাবছিল এই মেয়েগুলোর মাঝে এমনকী আছে যা ওর মধ্যে নেই।

মধ্যাহ্ন ভোজন শেষে মার্গারেটকে নিয়ে আরেকটি পার্লারে ঢুকল মেয়েরা। এখানে মার্গারেটের জন্য র‍্যাপিং পেপারে মোড়া অনেকগুলো উপহার রাখা হয়েছে। ম্যাডাম অ্যাগনেসের অনুরোধে উপহারগুলো খুলে দেখল সে। অসংখ্য চমৎকার সব উপহার। যেন ক্রিসমাসের উপহার। এতোটা ভালোবাসা আশা করেনি মার্গারেট। তার চোখ ছাপিয়ে জল এল। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

ম্যাডাম অ্যাগনেস ওকে জড়িয়ে ধরে মেয়েদেরকে বলল, 'তোমরা সবাই চলে যাও।'

মেয়েগুলো দ্রুত চলে গেল। ম্যাডাম অ্যাগনেস একটা কাউচে বসিয়ে দিল মার্গারেটকে। সেখানে বসে কিছুক্ষণ কাঁদল ও। তারপর আবেগের প্রশমন ঘটল।

'আ-আমি দুঃখিত,' বিড়বিড় করল মার্গারেট। 'জা-জানি না হঠাৎ কী হয়ে গিয়েছিল আমার।'

'ঠিক আছে, সোনা। এ কক্ষটি অনেক সমস্যা আসতে এবং যেতে দেখেছে। আমি এ থেকে কী শিখেছি জানো? শেষ পর্যন্ত সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যায়। তুমি এবং

তোমার বাচ্চা দু'জনেই ভালো থাকবে।'

'ধন্যবাদ,' ফিসফিস করল মার্গারেট। সে উপহারগুলোর দিকে হাত তুলে দেখাল। 'আমি কল্পনাও করিনি আপনি এবং আপনার বন্ধুরা−'

মার্গারেটের হাত চেপে ধরল ম্যাডাম অ্যাগনেস। 'এত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে না। তোমার উছিলায় আমরা কত মজা করলাম! এরকম আনন্দ করার সুযোগ খুব বেশি পাই না আমরা। আমাদের এখানে কেউ গর্ভবতী হয়ে পড়লে তার কপালে নেমে আসে দুর্ভোগ।' মুখে হাত চাপা দিল মহিলা। 'এই রে, কী বলে ফেললাম!'

হাসল মার্গারেট। 'আমার জীবনে এত সুন্দর দিন আর কখনও আসেনি।'

'তুমি এসেছ বলে আমরা সবাই সত্যি খুব খুশি হয়েছি। তোমার মতো ভালো মেয়ে হয় না। যারা তোমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায় আমি তাদেরকে ঘেন্না করি। আর একটা কথা বলি কিছু মনে কোরো না। জেমি ম্যাকগ্রেগর একটা মস্ত বোকা।' খাড়া হলো ম্যাডাম অ্যাগনেস।

'পুরুষ জাতটাই আসলে এরকম। ওই হারামজাদাগুলো না থাকলে আমাদের পৃথিবীটা আরও কত সুন্দর হতো। অথবা খারাপও হতে পারত। কে জানে?'

সুস্থির হয়েছে মার্গারেট। সে উঠে দাঁড়িয়ে ম্যাডাম অ্যাগনেসের হাত নিজের মুঠোয় চেপে ধরে বলল, 'যতদিন বেঁচে থাকব এই দিনটার কথা ভুলব না। একদিন আমার ছেলে বড় হবে, সেদিন ওকে এ দিনটির কথা বলব।'

ম্যাডাম অ্যাগনেস দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল মার্গারেটকে।

'আমি একটা ওয়াগন ভাড়া করেছি উপহারগুলো তোমার বোর্ডিংহাউজে পৌঁছে দিতে। গুড লাক টু ইউ।'

'ধন্যবাদ। অনেক অনেক ধন্যবাদ।'

চলে গেল ও।

মার্গারেটকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখছে ম্যাডাম অ্যাগনেস। ও চোখের আড়াল হওয়ার পরে সে ঘুরে দাঁড়াল। হাঁক ছেড়ে বলল, 'অলরাইট, লেডিস। এবারে যে যার কাজে লেগে যাও।'

এক ঘণ্টা পরে ম্যাডাম অ্যাগনেসের পতিতালয় খুলে দেয়া হলো খদ্দেরদের জন্যে।

সতেরো

এখন ফাঁদ পাতার সময় হয়েছে। গত ছয় মাস ধরে জেমি ম্যাকগ্রেগর নিঃশব্দে ভ্যান ডার মার্ভির পার্টনারদেরকে কিনে নিয়েছে। এখন সে-ই এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তবে তার একান্ত ইচ্ছা নামিবে মার্ভির ডায়মন্ড ফিল্ড হাতিয়ে নেয়া। ওই ফিল্ডের জন্য অনেক রক্ত ঝরিয়েছে জেমি, প্রাণ-সংশয়ও হয়েছিল। ওখান থেকে চুরি করে আনা হিরে দিয়ে সে এমন এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চায় যা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে সলোমন ভ্যান ডার মার্ভিকে। কাজটা এখনও শেষ হয়নি। এখন সে কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রস্তুত জেমি।

ভ্যান ডার মার্ভি এখন ঋণে জর্জরিত একজন মানুষ। শহরের কেউ তাকে টাকা ধার দেয় না, কেবল জেমির ব্যাংক ছাড়া। জেমি যে এ ব্যাংকের মালিক তা-ও জানে না মার্ভি। জেমি তার ম্যানেজারকে হুকুম দিয়ে রেখেছে, 'সলোমন ভ্যান ডার মার্ভি যখনই টাকা ধার চাইতে আসবে, দিয়ে দেবে।'

মার্ভির মুদি দোকান এখন খোলা থাকে না বললেই চলে। সকাল বেলা মদ্যপান শুরু করে ভ্যান ডার মার্ভি, সন্ধ্যার দিকে ম্যাডাম অ্যাগনেসের বেশ্যালয়ে যায়। মাঝে মাঝে ওখানে রাতও কাটায়।

একদিন সকালে মার্গারেট কসাইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মিসেস ওয়েনসের জন্য মুরগি কিনবে বলে, দেখতে পেল তার বাবা বেশ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসছে। রাস্তা দিয়ে কোনোমতে শরীর টেনে টেনে হেঁটে যেতে থাকা উস্কখুস্ক চুলের ওই বৃদ্ধ মানুষটি তার বাবা? *আমি তার অমন দশা করেছি? হা ঈশ্বর, আমাকে ক্ষমা করো!*

সলোমন ভ্যান ডার মার্ভি জানে না তার জীবনে কোন শনি আছর করেছে। শুধু জানে দোষটা যদিও তার নয় তবু তার জীবনটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তবে সে নিশ্চিত একদিন তার শত্রুদের পরাজয় ঘটবেই। সে জয়ী হবে। তবে এজন্য একটু সময় দরকার– সময় আর অর্থ। সে তার দোকান, ছোট ছোট ডায়মন্ড ফিল্ড, এমনকী নিজের ঘোড়া এবং ওয়াগন পর্যন্ত সিকিউরিটি হিসেবে গচ্ছিত রেখেছে। শুধু নামিবের ডায়মন্ড ফিল্ডটি ছাড়া তার আর কিছুই নেই। একদিন এটিও ব্যাংকের কাছে যখন সিকিউরিটি হিসেবে রাখা হলো, তার জীবনে হুড়মুড় করে নেমে এল মহা দুর্যোগ। থাবা বাড়িয়ে এগিয়ে এল জেমি।

সে ব্যাংক ম্যানেজারকে হুকুম দিল, 'ভ্যান ডার মার্ভিকে বলেন তাকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দেয়া হচ্ছে লোন শোধ করার জন্য নইলে তার সমস্ত সম্পত্তি আমরা দখল করে

নেব।'

'মি. ম্যাকগ্রেগর, উনি বোধহয় এতগুলো টাকা শোধ করতে পারবেন না। তিনি–'

'চব্বিশ ঘণ্টা।'

পরদিন ঠিক চারটার সময় ব্যাংকের সহকারী ম্যানেজার সলোমন ভ্যান ডার মার্ভির দোকানের সামনে হাজির হয়ে গেল একজন মার্শাল এবং একটি আদেশপত্র নিয়ে যাতে মার্ভির সমস্ত সম্পত্তি দখল করার অধিকার দিয়েছে আদালত। রাস্তার অপর পারে, নিজের অফিস থেকে জেমি দেখছিল ভ্যান ডার মার্ভিকে তার দোকান থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে। বুড়ো কড়া রোদে অসহায়ের মতো রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল। কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। তার সবকিছু কেড়ে নেয়া হয়েছে। জেমির প্রতিশোধ গ্রহণের পালা শেষ হলো। *কিন্তু আমি কেন কোনো বিজয় উল্লাস অনুভব করছি না?* ভাবছে জেমি। ভেতরে ভেতরে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করছে সে। যে লোকটিকে সে ধ্বংস করে দিয়েছে সে আসলে আগেই ধ্বংস করেছে ওকে।

সে রাতে ম্যাডাম অ্যাগনেসের ব্রথেলে গেছে জেমি, অ্যাগনেস বলল, 'খবরটা শুনেছ, জেমি? এক ঘণ্টা আগে গুলি করে নিজের খুলি উড়িয়ে দিয়েছে সলোমন ভ্যান ডার মার্ভি।'

শহরের বাইরে, ভাঙাচোরা, নিরানন্দ চেহারার গোরস্থানে অনুষ্ঠিত হলো ফিউনারেল। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় কফিন বহনকারীরা ছাড়া মাত্র দু'জন মানুষ হাজির থাকল। মার্গারেট এবং জেমি ম্যাকগ্রেগর। ফোলা পেট ঢেকে রাখতে ঢোলা একটা কালো ড্রেস পরে এসেছে মার্গারেট। তার চেহারা ম্লান এবং বিষণ্ন। জেমিকে বেশ লম্বা, অভিজাত এবং আনমনা লাগছিল। কবরের দুই পাশে দাঁড়িয়ে ওরা দেখছিল যেমন তেমনভাবে বানানো পাইন কাঠের কফিনটা মাটিতে নামানো হচ্ছে। কফিনের গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে মাটির ঢেলা। মার্গারেটের মনে হলো ঢেলাগুলো যেন সমস্বরে চিৎকার করে বলছে, বেশ্যা!... বেশ্যা!...

বাবার কবরের ওপাশ থেকে জেমির দিকে তাকাল সে। ওদের চোখাচোখি হয়ে গেল। জেমির চাউনি শীতল এবং নৈর্ব্যক্তিক যেন মার্গারেটকে সে চেনেই না। ঠিক তখন জেমির প্রতি ঘৃণা জেগে উঠল মার্গারেটের। *তুমি ওখানে পাষাণের মতো দাঁড়িয়ে আছ। তুমি আমারই মতো অপরাধী। আমরা ওকে হত্যা করেছি। তুমি এবং আমি। ঈশ্বরের চোখে আমি তোমার স্ত্রী। কিন্তু আসলে আমরা শয়তানের সাগরেদ।* খোলা কবরে চোখ নামাল মার্গারেট। বেলচা দিয়ে কফিনের গায়ে মাটি ফেলা প্রায় শেষ। 'বিশ্রাম নাও,' ফিসফিস করে বলল ও। 'বিশ্রাম করো।' চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে চলে গেছে জেমি।

ক্লিপড্রিফটে দুটো কাঠের ভবন আছে হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু ওগুলো এমন নোংরা এবং স্যানিটারি ব্যবস্থা এমন জঘন্য যে মানুষ ওখানে গেলে আর

বেঁচে ফিরে আসে না। সন্তানদের জন্ম হয় বাড়িতে। মার্গারেটের ডেলিভারির সময় এগিয়ে এলে মিসেস ওয়েনস তার জন্য হান্না নামে এক কৃষ্ণাঙ্গ দাইয়ের ব্যবস্থা করলেন।

একদিন সেই সময় উপস্থিত হলো এবং প্রচণ্ড প্রসব যন্ত্রণা সয়ে বোর্ডিং হাউজে বসে তার সন্তানের জন্ম দিল মার্গারেট। ছেলে হলো তার। মার্গারেট ছেলের নাম রাখল জেমি ম্যাকগ্রেগর।

মার্গারেট জানত তার সন্তান জন্মদানের খবর পৌঁছে যাবে জেমির কাছে। সে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কখন জেমি ওদেরকে দেখতে আসবে কিংবা ওকে ছেলেকে নিয়ে তার কাছে যেতে বলবে। কিন্তু অনেকগুলো দিন পার হবার পরেও জেমির তরফ থেকে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে তাকে একটি মেসেজ পাঠাল মার্গারেট। ত্রিশ মিনিট বাদে পত্রবাহক ফিরে এল।

ততক্ষণে চরম অধৈর্য হয়ে উঠেছে মার্গারেট। 'মি. ম্যাকগ্রেগরের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'জ্বী, ম্যাম।'

'তাকে আমার চিঠি দিয়েছিলে?'

'জ্বী, ম্যাম।'

'উনি কি বললেন?'

বিব্রত দেখাল ছেলেটিকে। 'বললেন তার– তার কোনো ছেলে নেই, মিস ভ্যান ডার মার্ভি।'

সারাদিন-রাত দরজা বন্ধ করে পড়ে রইল মার্গারেট। বেরুল না। ছেলের সঙ্গে আপনমনে কথা বলল, 'তোমার বাবা এখন খুব আপসেট হয়ে আছে, জেমি। তার ধারণা তোমার মা তার ক্ষতি করেছে। কিন্তু তুমি তার সন্তান। যখন সে তোমাকে দেখবে সে আমাদেরকে নিয়ে তার বাড়ি চলে যাবে এবং আমাদের দু'জনকেই খুব ভালোবাসবে। দেখে নিয়ো, সোনা। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।'

সকালে মিসেস ওয়েনস দরজায় নক করলে দরজা খুলে দিল মার্গারেট। তাকে আশ্চর্য রকম শান্ত লাগছে।

'তুমি ঠিক আছ তো, ম্যাগি?'

'আমি ভালো আছি। ধন্যবাদ। ছেলেকে সে নতুন পোশাক পরাচ্ছিল। 'জেমিকে নিয়ে আমি একটু বেরুব।'

ম্যাডাম অ্যাগনেস আর তার মেয়েরা মিলে মার্গারেটকে খুব সুন্দর একটি বেবি ক্যারিজ উপহার দিয়েছিল। এ ক্যারিজে জেমিকে শুইয়ে দিয়ে ওকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল মার্গারেট। ছোট্ট মিষ্টি বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে পথচারীরা অনেকেই হাসল তবে যেসব মহিলা মার্গারেটকে চেনে তারা তার দিকে ফিরেও তাকাল না এবং ওকে এড়িয়ে যেতে

রাস্তার অন্য পাশে তারা চলে গেল।

তবে এদেরকে লক্ষ্যই করল না মার্গারেট। সে একজনকে খুঁজতে বেরিয়েছে। প্রতিদিন, যেদিন ভালো থাকে আবহাওয়া, মার্গারেট ওর ছেলেকে খুব সুন্দর ড্রেস পরিয়ে বেবি ক্যারিজে নিয়ে ঘুরতে বেরোয়। এক সপ্তাহ পার হওয়ার পরেও যখন রাস্তায় জেমিকে দেখতে পেল না মার্গারেট, বুঝতে পারল ওকে ইচ্ছে করে এড়িয়ে যাচ্ছে সে। ঠিক আছে, ও যদি ওর ছেলেকে দেখতে না আসে, আমার ছেলে যাবে ওর কাছে। সিদ্ধান্ত নিল মার্গারেট।

পরদিন সকালে মিসেস ওয়েনসকে মার্গারেট বলল, 'আমি কয়েক দিনের জন্য একটু বাইরে যাচ্ছি, মিসেস ওয়েনস। সপ্তাহখানেক পরে ফিরব।'

'বাচ্চাটার বাইরে ভ্রমণের বয়স হয়নি এখনও।'

'বাচ্চা শহরেই থাকছে।'

ভুরু কোঁচকালেন মিসেস ওয়েনস। 'এখানে?'

'না, মিসেস ওয়েনস। এখানে নয়।'

কোপজেতে একটি বাড়ি করেছে জেমি ম্যাক গ্রেগর। পাহাড়ের ওপরে বাড়ি। ক্লিপড্রিফট শহরের দিকে মুখ করে তাকিয়ে আছে। ঢালু ছাদের বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি, মূল ভবনের সঙ্গে দুটো বৃহৎ উইং বা ডানা সংযুক্ত করা হয়েছে সুপরিসর বারান্দাসহ। বাড়ির চারপাশে সবুজ লন, গাছপালা ঘোড়ার গাড়ি রাখার ক্যারিজ হাউস এবং ভৃত্যদের জন্য আলাদা কোয়ার্টার্স। বাড়ির দেখাশোনার দায়িত্বে রয়েছে বাজখাঁই চেহারার মধ্যবয়সী এক বিধবা, ইউজেনিয়া টেলি।

এ বাড়িতে শিশু পুত্রকে কোলে নিয়ে সকাল দশটায় হাজির হলো মার্গারেট। জানে এ সময় জেমি অফিসে থাকে। মিসেস টেলি দরজা খুলে সপুত্রক মার্গারেটকে দেখে খুবই অবাক হলো। অন্য সবার মতো তারও মার্গারেটের পরিচয় অজানা নেই।

'দুঃখিত, মি. ম্যাকগ্রেগর বাড়িতে নেই,' বলল হাউসকিপার, দরজা বন্ধ করতে গেল। তাকে বাধা দিল মার্গারেট। 'আমি মি. ম্যাকগ্রেগরের সঙ্গে দেখা করতে আসিনি। আমি তার ছেলেকে নিয়ে এসেছি।'

'আমি তো এসব ব্যাপারে কিছুই জানি না। আপনি–'

'আমি এক সপ্তাহের জন্য শহরের বাইরে যাচ্ছি। তারপর এসে ওকে নিয়ে যাব।' ছেলেকে এগিয়ে দিল সে।

'ওর নাম জেমি।'

ভয় পেল মিসেস টেলি। 'ওকে আপনি এখানে রেখে যেতে পারবেন না। মি. ম্যাক গ্রেগর–'

'আপনি দুটো কাজ করতে পারেন,' বলল মার্গারেট। 'হয় ওকে নিয়ে ভেতরে যান নতুবা আমি ওকে আপনাদের বাড়ির দোরগোড়ায় রেখে চলে যাব। মি. ম্যাকগ্রেগর

নিশ্চয় এ কথা শুনলে খুশি হবেন না।'

আর কোনো বাক্য বিনিময় না করে হাউজ কিপারের কোলে বাচ্চাটাকে গুঁজে দিয়েই ওখান থেকে চলে গেল মার্গারেট।

'দাঁড়ান! আপনি– ফিরে আসুন! মিস–!'

ফিরল না মার্গারেট। তুলতুলে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে দোরগোড়ায় বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল মিসেস টেলি।

'ওহ্, মাই গড! মি. ম্যাকগ্রেগর নির্ঘাত রেগে আগুন হবেন!'

মিসেস টেলি তার মনিবকে এমনভাবে রাগতে কখনও দেখেনি। 'তুমি এত বোকা কেন?' হুংকার ছাড়ল জেমি। 'ওর মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে দিলেই পারতে।'

'আমাকে উনি কোনো সুযোগই দেননি, মি. ম্যাকগ্রেগর। তিনি–'

'আমি ওর বাচ্চা আমার বাড়িতে রাখতে পারব না!'

ক্রুদ্ধভাবে পায়চারি করতে লাগল জেমি। একটু পরপর এসে দাঁড়াল ভয়ে থরহরিকম্প হাউজকিপারের সামনে।

'এ অপরাধে তোমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা উচিত।'

'উনি বলেছেন সপ্তাহখানেক বাদে ফিরে এসে বাচ্চাটাকে নিয়ে যাবেন। আমি–'

'সে কখন আসবে তা নিয়ে আমার কিস্যু আসে যায় না।' খেঁকিয়ে উঠল জেমি। 'বাচ্চাটাকে এখান থেকে নিয়ে যাও। এখুনি! ওটাকে দূর করো!'

'আমাকে কী করতে বলেন, মি. ম্যাকগ্রেগর?' আড়ষ্ট গলায় জানতে চাইল মিসেস টেলি।

'শহরে ফেলে দিয়ে এসো। বাচ্চা রেখে আসার কোথাও না কোথাও নিশ্চয় জায়গা আছে।'

'কোথায়?'

'আরে, আমি কী তা জানি নাকি!'

বুকে জড়িয়ে রাখা মাংসের পুটুলিটার দিকে তাকাল মিসেস টেলি। চিৎকার চেঁচামেচির চোটে ভয় পেয়ে কান্না জুড়ে দিয়েছে বাচ্চা। ক্লিপড্রিফটে কোনো এতিমখানা নেই!

কোলে দোল দিতে শুরু করল সে বাচ্চাকে। কিন্তু ওটার কান্নার মাত্রা ক্রমে বাড়ছেই। 'কারও না কারও ওর দেখভাল করতেই হবে।'

রাগে আর হতাশায় মাথার চুল খামচে ধরল জেমি।

'তুমিই তো বাচ্চাটাকে নিয়েছ। তুমিই ওটার দেখভাল করোগে।'

'আচ্ছা, স্যার।'

'আর ওই অসহ্য কান্নাটা থামাও তো। একটা কথা তোমাকে পরিষ্কার বলে দিই, মিসেস টেলি– এই বাচ্চাকে কখনোই আমার সামনে নিয়ে আসবে না। ও বাড়িতে আছে

তা-ও যেন টের না পাই আমি। ওর মা আগামী সপ্তাহে আসার সঙ্গে সঙ্গে এ আপদ দূর করে দেবে। বোঝা গেছে?

বাচ্ছা আরও তারস্বরে কাঁদতে লাগল।

'জ্বী, মি. ম্যাকগ্রেগর,' দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হাউসকিপার।

জেমি তার ডেন-এ বসে একা একা ব্রান্ডি গিলল, ফাঁকে ফাঁকে ধূমপান করল সিগার। *ওই নির্বোধ মহিলা। ভেবেছে বাচ্চাটাকে দেখলেই আমার মন বরফের মতো গলে যাবে এবং আমি বলব, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি বাচ্চাটাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে বিয়ে করব।* সে তো বাচ্চার দিকে ফিরে তাকায়নি পর্যন্ত। সে মার্গারেটকে গর্ভবতী করেছিল প্রেম বা ভালোবাসা থেকে নয়, স্রেফ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে। তার প্রতিশোধ নেয়া শেষ। বান্ডাকে এখন সে খুঁজে বের করবে। বলবে তাদের মিশন সমাপ্ত।

আঠারো

কেমন একটা শূন্যতায় ভুগছে জেমি। *নতুন লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করতে হবে আমাকে, ভাবছিল* ও। এত টাকা-পয়সার মালিক হবে কল্পনাও করেনি সে। শত শত একর খনিজ ভূমির মালিক এখন জেমি। এ মাটির নিচে হিরে পাবার আশায় সে এগুলো কিনেছে। সোনা, প্লাটিনামসহ আরও আধ ডজন মিনারেল খনির মালিক সে। ক্লিপড্রিফট শহরের অর্ধেকটাই তার ব্যাংকের কাছে মর্টগেজ করা। তার জমির বিস্তৃতি নামিব থেকে কেপটাউন পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। সে এতসব পেয়ে খুশি তবে সন্তুষ্ট নয় বাবা মাকে এখানে এসে থাকতে বলেছিল জেমি। কিন্তু তারা স্কটল্যান্ড ত্যাগ করতে রাজি নয়। ওর ভাই-বোনদের বিয়ে হয়ে গেছে। জেমি প্রতি মাসে বাবা-মাকে মোটা অংকের টাকা পাঠায়। এ সবই তাকে আনন্দ দেয় তবে তার নিজের জীবনটাই বড় নিরানন্দময়। কয়েক বছর আগে উত্থান-পতনের মাঝে যখন কাটত দিনকাল, বেঁচে থাকাটা বড় উত্তেজক মনে হতো। কিন্তু এখন সবকিছু কেমন নীরস লাগে।

ব্রান্ডির বোতলে হাত বাড়িয়েছিল জেমি, দেখল ওটা খালি। হয় সে বেশি মদ্যপান করে ফেলেছে অথবা মিসেস টেলি খালি মদের বোতল খেয়াল করেনি। চেয়ার ছাড়ল জেমি, ব্রান্ডি গ্রিফটারটা নিয়ে বাটলারের প্যান্ট্রিতে গেল। ওখানে মদ রাখা হয়। বোতল খুলছে, কানে ভেসে এল বাচ্চার ককানি। বাচ্চাটাকে ওর বাড়িতে রাখার পরে দুইদিন ওটার কোনো সাড়াশব্দ পায়নি জেমি। সে শুনতে পেল মিসেস টেলি বাচ্চার সঙ্গে গানের সুরে কথা বলছে।

'তুমি দেখতে খুব সুন্দর, তাই না?' বলছে হাউজকিপার। 'তুমি একটা দেবশিশু। হ্যাঁ। তুমি একটা দেবশিশু।'

আবার কুকু করে উঠল বাচ্চা। জেমি মিসেস টেলির বেডরুমের সামনে চলে এল। বেডরুমের দরজা খোলা। সে উঁকি দিল ভেতরে। হাউজকীপার কোত্থেকে যেন একটা দোলনা জোগাড় করে এনে তাতে শুইয়ে দিয়েছে বাচ্চাটাকে। বাচ্চার ওপর ঝুঁকে আছে মিসেস টেলি। বাচ্চাটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রেখেছে মহিলার আঙুল।

'তুমি ছোট্ট একটা শক্তিশালী শয়তান, জেমি। তুমি বড় হয়ে–' মনিবকে দোরগোড়ায় দেখতে পেয়ে থেমে গেল।

'আ,' বলল মিসেস টেলি। 'আমাকে কিছু বলবেন, মি. ম্যাকগ্রেগর?'

'না।' দোলনার সামনে হেঁটে এল জেমি। 'এখানে শব্দ শুনে বিরক্ত হচ্ছিলাম।' এই

প্রথম নিজের ছেলের দিকে তাকাল সে। বেশ বড়সড় বাচ্চাটা এবং নাদুস-নুদুস। জেমিকে দেখে সে যেন হাসল।

'ওহ, আমি দুঃখিত, মি. ম্যাকগ্রেগর। বাচ্চাটা খুব ভালো। আপনার একটা আঙুল ওকে ধরতে দিন দেখবেন ওর গায়ে কত শক্তি।'

কোনো কথা না বলে ঘুরে দাঁড়াল জেমি। বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

জেমির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পঞ্চাশজনেরও বেশি কর্মচারী কাজ করে। মেইল বয় থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ নির্বাহী কর্মকর্তা পর্যন্ত জানে ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেডের নামকরণের ইতিহাস। জেমি ম্যাকগ্রেগরের সঙ্গে কাজ করতে তাই তারা অত্যন্ত গর্ববোধ করে। সে সম্প্রতি ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল নামে বছর ষোলোর এক তরুণকে তার প্রতিষ্ঠানে চাকরি দিয়েছে। ডেভিড জেমির প্রতিষ্ঠানের এক ফোরম্যানের ছেলে। ওরিগনে ওদের বাড়ি। দক্ষিণ আফ্রিকা এসেছিল হিরের সন্ধানে। ব্ল্যাকওয়েলদের টাকা পয়সা ফুরিয়ে গেলে জেমি তাকে তার এক খনিতে সুপারভাইজারের কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল। ডেভিডের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তার চাকরি পাকা করে দিয়েছে। তরুণ ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল বুদ্ধিমান, সুদর্শন এবং উদ্যমী। জেমি জানে ছেলেটি মুখ বন্ধ রাখতে পারে তাই সে এই বিশেষ খবরটি পাঠানোর জন্য ডেভিডকেই বেছে নিয়েছে।

'ডেভিড, তুমি মিসেস ওয়েনসের বোর্ডিং হাউসে যাবে। সেখানে মার্গারেট ভ্যান ডার মার্ভি নামে এক মহিলা থাকে।'

ডেভিড নামটির সঙ্গে যদি পরিচিত থেকেও থাকে আচরণে তা বুঝতে দিল না। 'জ্বী, স্যার।'

'তুমি শুধু তার সঙ্গেই কথা বলবে। সে তার বাচ্চাকে আমার হাউজকিপারের কাছে রেখে গেছে। তুমি তাকে বলবে আমি তাকে বলেছি সে যেন তার বাচ্চাকে আমার বাড়ি থেকে নিয়ে যায়।'

'জ্বী, মি. ম্যাকগ্রেগর।'

আধঘণ্টা পরে ফিরে এল ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল। জেমি ডেস্কের ওপর থেকে তার দিকে তাকাল।

'স্যার, আপনি আমাকে যা করতে বলেছিলেন তা আমি করতে পারিনি।'

লাফিয়ে উঠল জেমি। 'কেন পারনি?' গর্জন ছাড়ল সে। 'এত সহজ একটা কাজ।'

'মিস ভ্যান ডার মার্ভি ওখানে নেই, স্যার।'

'তাহলে ওকে খুঁজে বের করো।'

'তিনি দু'দিন আগে শহর ত্যাগ করেছেন। দিন পাঁচেক পরে নাকি ফিরবেন। আর কোনো খোঁজ খবর যদি থাকে–'

'না,' বলল জেমি। 'আর কিছু করতে হবে না, ডেভিড।'

'জ্বী, স্যার।' অফিস থেকে বেরিয়ে গেল ছেলেটি।

জাহান্নামে যাক মহিলা! ফিরে আসলেই একটা ধাক্কা খাবে! ওর বাচ্চাকে আমি ফিরিয়ে দেব।

সেদিন রাতে জেমি বাড়িতে বসে ডিনার সেরে স্টাডিরুমে ঢুকল ব্রান্ডির গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে। মিসেস টেলি এল ঘরোয়া একটি সমস্যা নিয়ে কথা বলতে। কথা বলা শেষ না করেই সে থেমে গেল। কান পাতল। তারপর বলল 'মাফ করবেন, স্যার, জেমি বোধহয় কাঁদছে।' সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

জেমি সরোষে ব্রান্ডির গ্লাস নামিয়ে রাখল টেবিলে। ঝাঁকি খেয়ে ছিটকে পড়ল মদ। *ওই ছিচকাঁদুনে বাচ্চাটা! আর মহিলারও কী সাহস তার নামে ছেলের নাম রেখেছে জেমি। ও জেমির মতো দেখতে নয়। ও কারও মতোই দেখতে নয়।*

দশ মিনিট পরে পড়ার ঘরে ফিরে এল মিসেস টেলি। টেবিলে ছলকে পড়া মদ দেখে বলল, 'আপনাকে আরেকটা ব্রান্ডি এনে দিই?'

'দরকার নেই,' শীতল গলায় বলল জেমি। 'শুধু দরকার এটা মনে রাখা যে তুমি কার চাকরি করছ। এই হারামজাদাটার জন্য আমার কাজের কোনো ব্যাঘাত হোক তা আমি বরদাশত করব না। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার, মিসেস টেলি?'

'জ্বী, স্যার।'

'ওই বাচ্চাটাকে যত তাড়াতাড়ি তাড়িয়ে দিতে পারবে ততই আমাদের জন্য মঙ্গল। আমার কথা বুঝতে পারছ?'

ঠোঁটে ঠোঁট চাপল মিসেস টেলি। 'জ্বী, স্যার। আর কিছু?'

'না।'

সে চলে যেতে কদম বাড়াল।

'মিসেস টেলি...

'বলুন, মি. ম্যাকগ্রেগর?'

'তুমি বলছিলে ওটা কাঁদছিল। ওটা নিশ্চয় অসুস্থ নয়?'

'না, স্যার। হিসু করে দিয়েছিল। ন্যাপি বদলে দিয়েছি।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি যেতে পার।'

জেমি যদি জানত তার গৃহভৃত্যরা তার অবর্তমানে তাকে এবং তার ছেলেকে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করে, রেগে আগুন হয়ে যেত সে। তারা এ ব্যাপারে সবাই একমত যে তাদের প্রভু বেহুদা এই মিষ্টি, সুন্দর বাচ্চাটার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছেন। তবে তারা এ-ও জানে বিষয়টি নিয়ে কথা তুললে সঙ্গে সঙ্গে তাদের চাকরি খতম হয়ে যাবে। জেমি ম্যাক গ্রেগর কারও কাছ থেকে পরামর্শ নিতে আগ্রহী নয়।

পরদিন সন্ধ্যায় ব্যবসায়িক একটি মিটিংয়ে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হলো জেমির। নতুন একটি রেলপথে বিনিয়োগ করেছিল সে। ছোট রেলরোড, নামিব মরুভূমি থেকে

ভি আর পর্যন্ত, কেপটাউন-কিম্বার্লি লাইনকে রেলপথটি সংযুক্ত করেছে। এর ফলে সে বন্দরে অনেক কম খরচে হিরে এবং সোনা পরিবহন করতে পারছে। ১৮৬০ সালে প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকায় রেলওয়ে চালু হয়, ডারবান থেকে পয়েন্ট পর্যন্ত, তারপর থেকে নতুন লাইন শুরু হয়ে গেছে কেপটাউন থেকে ওয়েলিংটন পর্যন্ত। রেলরোডগুলো হয়ে উঠছিল ইস্পাতের ধমনী যা মানুষ এবং পণ্য দক্ষিণ আফ্রিকার কেন্দ্রস্থলে নিয়ে যেতে সাহায্য করছিল। আর জেমির ইচ্ছে এর একটি অংশ হবে। তার পরিকল্পনার ওটা ছিল মাত্র শুরু। *এরপরে*, ভাবছিল জেমি। *জাহাজ। আমার নিজের জাহাজ সাগরে বহন করবে খনিজ।*

মাঝরাতের পরে বাসায় এল জেমি। জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। লন্ডনের এক ডেকোরেটর আনিয়ে তার বেডরুমের ডিজাইন করিয়েছে জেমি। প্রকাণ্ড একটি বেড। ঘরের এক কোনে রয়েছে পুরনো স্প্যানিশ সিন্দুক, দুটো বিশাল আকৃতির ওয়াড্রোব। তাতে পঞ্চাশটিরও বেশি স্যুট এবং ত্রিশ জোড়া জুতো আছে। কাপড়চোপড়ের প্রতি তেমন মোহ নেই জেমির তবে দামি পরিচ্ছদ কিনে রাখতে সে ভালোবাসে। বহুদিন সে ছেঁড়া জামাকাপড় পরে কাটিয়েছে দিন।

চোখটা সবে লেগে এসেছে এমন সময় একটা চিৎকার শুনতে পেল ও। বিছানায় উঠে বসল জেমি। উৎকীর্ণ হলো কান। নাহ্, কিছু শোনা যাচ্ছে না। বাচ্চাটা কেঁদে উঠল নাকি? হয়তো দোলনা থেকে পড়ে গেছে। জেমি জানে মিসেস টেলি একবার ঘুমিয়ে পড়লে কানের পাশে কামান দাগলেও ওঠে না। জেমির বাড়িতে বসে বাচ্চাটার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে খুবই খারাপ দেখাবে। তাকেই দোষ দেবে সবাই। *জাহান্নামে যাক মার্গারেট!*

গায়ে রোব চড়িয়ে, পায়ে চটি গলিয়ে মিসেস টেলির বেডরুমে চলে এল জেমি। বন্ধ দরজার সামনে খানিক দাঁড়িয়ে রইল। কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছে না। আস্তে করে ধাক্কা দিতেই খুলে গেল দরজা। চাদর মুড়ি দিয়ে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে মিসেস টেলি। জেমি দোলনার কাছে গেল। বাচ্চাটা শুয়ে আছে চিৎ হয়ে। বিস্ফারিত চক্ষু। বাচ্চাটাকে ঝুঁকে দেখল। মাই গড! ওর সঙ্গে দেখছি বাচ্চাটার চেহারার অদ্ভুত মিল আছে। জেমির মত মুখের গড়ন, চিবুক। চোখজোড়া নীল। অবশ্য সব বাচ্চাই নীল চোখ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। জেমি দেখেই বুঝতে পারছে বড় হয়ে এ বাচ্চার চোখ ওর মতোই ধূসর হবে। বাতাসে ছোট্ট হাত নাড়ল ওটা, মুখ দিয়ে কু কু শব্দ করল। হাসল জেমির দিকে তাকিয়ে। *বাহ্, বাচ্চাটা তো চমৎকার*, ভাবছে জেমি। কোনো শব্দ করছে না, চিল্লাফাল্লা নেই। অথচ অন্য বাচ্চারা চিৎকার করে কানের পর্দা ফাটিয়ে দেয়। আরও তীক্ষ্ণ চোখে দেখল সে। *হ্যাঁ, এ এক ম্যাকগ্রেগরই বটে।*

কী এক আবেগে বাচ্চাটির দিকে একটা আঙুল বাড়িয়ে দিল জেমি। বাচ্চা দু'হাতে শক্ত করে ওর আঙুল চেপে ধরল। *বাহ্, গায়ে শক্তিও আছে দেখছি!* বাচ্চাটার চেহারা হঠাৎ বিকৃত দেখাল। কটু একটা গন্ধ পেল জেমি।

'মিসেস টেলি!' হাঁক ছাড়ল জেমি।

ধড়মড় করে জেগে গেল হাউস-কিপার। লাফ মেরে নামল বিছানা থেকে। 'ক্ক-কী হয়েছে?'

'বাচ্চাটার দিকে একটু খেয়াল দাও। সবকিছুর ওপর আমার নজর রাখতে হবে?'

দুমদাম পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জেমি ম্যাক গ্রেগর।

'ডেভিড, শিশুদের সম্পর্কে তুমি কী জানো?'

'কোন বিষয়ে, স্যার?' জিজ্ঞেস করল ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল।

'যেমন ধরো ওরা কী নিয়ে খেলতে পছন্দ করে।'

তরুণ আমেরিকান জবাব দিল, 'খুব ছোট বাচ্চারা ঝুমঝুমি খুব পছন্দ করে।'

'ডজনখানেক ঝুমঝুমি কিনে নিয়ে এসো।'

'আচ্ছা, স্যার।'

কোনো অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন নয়। জেমি এ ব্যাপারটা খুব পছন্দ করে। ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল যাবে অনেক দূর।

বাদামী একটা প্যাকেট নিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরল জেমি। মিসেস টেলি বলল, 'গত রাতের ঘটনার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি, মি. ম্যাকগ্রেগর। জানি না কী করে অমন মরণ ঘুম ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। বাচ্চাটা নিশ্চয় ভীষণ কান্নাকাটি করে আপনাকে জাগিয়ে দিয়েছিল।'

'ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না,' মৃদু গলায় বলল জেমি। সে প্যাকেটটি তুলে দিল মহিলার হাতে। 'এটা ওকে দিও। এর মধ্যে ঝুমঝুমি আছে। খেলবে। সারাদিন দোলনায় বন্দীর মতো শুয়ে থাকতে নিশ্চয় ওর ভাল্লাগে না।'

'ওকে সারাদিন বন্দীর মতো শুয়ে থাকতে হয় না, স্যার। আমি ওকে বাইরে নিয়ে যাই তো!'

'কোথায় নিয়ে যাও?'

'বাগানে।'

ভুরু কোঁচকাল জেমি। 'কাল রাতে ওকে দেখে আমার ঠিক সুস্থ মনে হয়নি।'

'সুস্থ মনে হয়নি?'

'না। গায়ের রংটা কেমন ফ্যাকাসে লাগল। ওর মা আসার আগে ও আবার অসুস্থ হয়ে না পড়ে।'

'ওহ! না স্যার।'

'ওকে একবার দেখা দরকার।'

'জ্বী, স্যার। ওকে এখানে নিয়ে আসব?'

'নিয়ে এসো, মিসেস টেলি।'

'এক্ষুনি আনছি, মি ম্যাকগ্রেগর।'

ছোট্ট জেমিকে কোলে নিয়ে একটু পরেই ফিরে এল মিসেস টেলি। বাচ্চার হাতে নীল ঝুমঝুমি। 'ওর গায়ের রঙ আমার কাছে তো ঠিকই আছে মনে হলো।'

'তাহলে হয়তো আমিই ভুল দেখেছি চোখে। দাওতো, ওকে আমার কাছে দাও।'

সাবধানে বাচ্চাকে নিজের কোলে নিল জেমি ম্যাক গ্রেগর। একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো ওর। মনে হচ্ছিল এ মুহূর্তটির জন্যই যেন এতদিন অপেক্ষা করছিল সে। এ তারই রক্ত-মাংসে গড়া, একে সে জড়িয়ে রেখেছে দু'হাত দিয়ে– তার সন্তান, জেমি ম্যাক গ্রেগর জুনিয়র। কী লাভ সাম্রাজ্য গড়ার, হিরে, সোনার খনি আর রেল রোডের মালিক হয়ে যদি এগুলো উত্তরাধিকারীর হাতে তুলে দেয়া না গেল? *কী বোকামিটাই না করেছি আমি এতদিন*, ভাবল জেমি। এখন সে বুঝতে পারছে এতদিন সে কীসের অভাব, কীসের শূন্যতা অনুভব করছিল। প্রচণ্ড ঘৃণা তাকে অন্ধ করে দিয়েছিল। ছোট্ট মুখটির দিকে তাকিয়ে জেমির অন্তরের ভেতরে আসন গেড়ে বসা কঠিন অনুভূতিগুলো বরফ হয়ে গলে গেল।

'জেমির দোলনা আমার বেডরুমে পাঠিয়ে দাও, মিসেস টেলি।'

তিনদিন পরে মার্গারেট জেমির বাড়ি এসে হাজির হলো। মিসেস টেলি বলল, 'মি. ম্যাকগ্রেগর অফিসে গেছেন, মিস ভ্যান ডার মার্ভি। তবে আপনি বাচ্চা নিতে বাসায় এলে ওনাকে খবর দিতে বলেছেন। আপনার সঙ্গে উনি কথা বলতে চান।'

ছোট্ট জেমিকে বুকে চেপে লিভিংরুমে অপেক্ষা করতে লাগল মার্গারেট। বাচ্চাটাকে দারুণ মিস করছিল সে। বারবার দুশ্চিন্তা হচ্ছিল ভেবে বাচ্চার কোনো অসুখ হলো কিনা বা কোনো দুর্ঘটনায় পড়ল কিনা। প্রতিবারই ছুটে আসতে ইচ্ছে করেছে ক্লিপড্রিফটে। কিন্তু জোর করে সংযত রেখেছে নিজেকে এবং তার পরিকল্পনা সফল হয়েছে। জেমি তার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। ওরা তিনজন এখন থেকে একত্রে থাকবে।

জেমিকে লিভিংরুমে ঢুকতে দেখামাত্র পুরনো সেই আবেগ ভাসিয়ে নিল মার্গারেটকে। *ওহ গড*, ভাবল সে, *আমি ওকে এত ভালোবাসি।*

'হ্যালো, ম্যাগি।'

উষ্ণ, সুখী একটি হাসি উপহার দিল মার্গারেট।

'হ্যালো, জেমি?'

'আমি আমার ছেলেকে চাই।'

গেয়ে উঠল মার্গারেটের হৃদয়। 'অবশ্যই তুমি তোমার ছেলেকে চাইবে, জেমি।'

'আমি চাই ও ভালোভাবে, সুন্দরভাবে বেড়ে উঠুক। আমি ওকে সবরকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে বড় করে তুলব। তুমি যাতে সমস্যায় না থাকো সে ব্যাপারটাও আমি দেখব।

বিমূঢ় দেখাল মার্গারেটকে। 'ঠি-ঠিক বুঝলাম না।'

'বললামই তো আমি আমার ছেলেকে চাই।'

'আমি ভেবেছিলাম– মানে–তুমি এবং আমি–'

'না, আমি শুধু বাচ্চাটাকেই চাই।'

ভয়ানক রেগে গেল মার্গারেট। 'বেশ। আমি আমার ছেলেকে তোমাকে দেব না।'

জেমি ওকে এক মুহূর্ত পরখ করে বলল, 'এসো, একটা সমঝোতা করি। তুমি এখানে জেমির সঙ্গে থাকতে পারবে। তুমি হবে ওর–ওর গভর্নেস।' মার্গারেটের তীব্র চাউনি দেখে থেমে গেল জেমি। 'তুমি কী চাও?'

'আমি আমার ছেলের একটা নাম চাই,' ক্রুদ্ধ গলায় বলল মার্গারেট। 'ওর বাবার পদবী চাই।'

'ঠিক আছে। আমি ওকে দত্তক নেব।'

ঘৃণাভরে জেমির দিকে তাকাল মার্গারেট। 'আমার সন্তানকে দত্তক নেবে? তা হবে না। তুমি আমার ছেলেকে পাবে না। তোমার জন্য আমার করুণা হচ্ছে বিখ্যাত জেমি ম্যাকগ্রেগর। তোমার এত টাকা, এত ক্ষমতা তবু তোমার কিছু নেই। তুমি দয়ার পাত্র মাত্র।'

ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ঘর থেকে সদর্পে বেরিয়ে গেল মার্গারেট। আর চেয়ে চেয়ে তাই দেখল জেমি।

পরদিন সকালে মার্গারেট আমেরিকা যাওয়ার সব বন্দোবস্ত করে ফেলল।

'পালিয়ে গিয়ে কোনো কিছুর সমাধান হবে না,' তর্ক করলেন মিসেস ওয়েনস।

'আমি পালিয়ে যাচ্ছি না। আমি আমার বাচ্চাকে নিয়ে এমন কোথাও যাব যেখানে নতুন জীবন শুরু করতে পারব।'

'কবে যাবে?'

'যত দ্রুত সম্ভব। কোচে করে উরচেস্টার যাব, সেখান থেকে ট্রেনে কেপটাউন। নিউইয়র্কে থাকার মতো যথেষ্ট টাকা আমি জমিয়েছি।

'সে তো অনেক দূরের পথ।'

'তাতে সমস্যা নেই। লোকে তো বলে আমেরিকা হলো সুযোগ সুবিধার দেশ। একবার গিয়েই দেখি।'

জেমি গর্ব করত ভেবে প্রচণ্ড চাপের মুখেও সে শান্ত, সমাহিত থাকতে পারে। কিন্তু আজ সে যাকে সামনে পাচ্ছে তার সঙ্গেই চিৎকার-চেঁচামেচি করছে, ধমকাচ্ছে। কারও কাজই তার পছন্দ হচ্ছে না। সে হুংকার ছাড়ছে, সবার কাজের ত্রুটি খুঁজে বের করছে, অভিযোগ জানাচ্ছে এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রণও করতে পারছে না। গত তিন রাত সে ঘুমাতে পারেনি। মার্গারেটের সঙ্গে কথোপকথনের স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছিল বারবার।

জাহান্নামে যাক মহিলা! ওর বোঝা উচিত ছিল মহিলা ওকে বিয়ের প্যাঁচে ফেলতে চাইবে। সে মার্গারেটকে বলেছিল তার ব্যাপারটা দেখবে। কিন্তু কীভাবে দেখবে পরিষ্কার করে বলেনি। টাকা! ওর উচিত ছিল মার্গারেটকে টাকা সাধা। এক হাজার পাউন্ড– দশ হাজার পাউন্ড– কিংবা তারচেয়েও বেশি।

'তোমাকে একটা কাজ দিতে চাই,' ডেভিড ব্ল্যাকওয়েলকে বলল জেমি।

'জ্বী, স্যার বলুন।'

'তুমি মিস ভ্যান ডার মার্ভির সঙ্গে কথা বলবে। বলবে আমি তাকে কুড়ি হাজার পাউন্ড দেব। সে জানে বিনিময়ে তাকে কী দিতে হবে।' একটা চেক লিখে দিল জেমি। 'এটা ওকে দিও।'

'জ্বী, স্যার।' চলে গেল ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল।

পনের মিনিট বাদেই ফিরে এল সে। চেকখানা ফেরত দিল তার মনিবকে। মাঝখান থেকে ছেঁড়া। জেমির মুখ লাল হয়ে গেল। 'ধন্যবাদ, ডেভিড। তুমি এখন যেতে পার।'

মার্গারেটের টাকার খাই তাহলে আরও বেশি। বেশ। আরও টাকা দেবে সে মহিলাকে। টাকা দিয়ে সবকিছু কেনা যায়, বিশ্বাস করে জেমি। তবে এবারে সে নিজেই যাবে মার্গারেটের কাছে।

সন্ধ্যার আগে আগে মিসেস ওয়েনসের বোর্ডিং হাউজে গেল জেমি। 'মিস ভ্যান ডার মার্ভির সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

'দুঃখিত, তা সম্ভব হবে না,' বললেন মিসেস ওয়েনস। 'ও আমেরিকা চলে যাচ্ছে।'

পেটে প্রচণ্ড ঘুসি খেল জেমি। 'এ হতে পারে না। কখন গেছে ও?'

'ও ওর বাচ্চাকে নিয়ে দুপুরের কোচে উরচেস্টার চলে গেছে।'

উরচেস্টার স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনটির পেটভর্তি মানুষ আর মানুষ। যাত্রীরা সবাই কেপ্টাউন চলেছে।

যাত্রীদের মধ্যে রয়েছে সস্ত্রীক সওদাগর, ফেরিঅলা, প্রসপেক্টর, ফকির, সৈনিক, নাবিকসহ আরও নানান দেশের মানুষ। বেশিরভাগই জীবনে এই প্রথম ট্রেনে উঠেছে, যাত্রীদের মধ্যে উৎসব উৎসব ভাব। মার্গারেট জানালার কাছে একটা সিট পেয়েছে। এদিকে ভিড় কম। বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বসে আছে সে। পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ আনমনা ও উদাস, শুধু সামনের জীবন নিয়ে ভাবছে। নতুন জীবনটা ওর জন্য খুব একটা সহজ হবে না। যেখানেই যাক, ওর পরিচয় সকলে জানবে সন্তানসহ অবিবাহিতা এক নারী, সমাজের চোখে ও হবে অস্পৃশ্য। তবে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার কোনো না কোনো উপায় ও ঠিকই খুঁজে নেবে। কনডাকটরের হাঁক শুনতে পেল মার্গারেট, 'যারা এখনও বাইরে ঘোরাঘুরি করছেন সবাই ট্রেনে উঠে পড়ুন। ট্রেন এখুনি ছেড়ে দেবে!'

মুখ তুলে চাইল মার্গারেট। সামনে দাঁড়িয়ে আছে জেমি। 'তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে

নাও,' হুকুম দিল সে।

'ট্রেন থেকে নেমে এসো।'

ও এখনও ভাবছে আমাকে কিনতে পারবে! ভাবল মার্গারেট।

'এবারে কত টাকার প্রস্তাব নিয়ে এসেছ তুমি?'

ছেলের দিকে তাকাল জেমি। মায়ের কোলে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে। 'তোমাকে আমি বিয়ের প্রস্তাব দিতে এসেছি।'

উনিশ

তিনদিন পরে সম্পূর্ণ আড়ম্বরহীনভাবে গোপনে ওদের বিয়ে হয়ে গেল। সাক্ষী হিসেবে শুধু রইল ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল।

বিয়ের সময় মিশ্র অনুভূতি হচ্ছিল জেমি ম্যাকগ্রেগরের। সে এতদিন মানুষজনকে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে, তাদের ওপর ছড়ি ঘুড়িয়েছে। কিন্তু আজ তার ওপরই ছড়ি ঘোরানো হলো। মার্গারেটের দিকে আড়চোখে তাকাল সে। তার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটা। বিয়ের পোশাকে বেশ সুন্দর লাগছে দেখতে। তার প্রতি মার্গারেটের ভালোবাসা, মার্গারেটকে প্রত্যাখান সব কথাই মনে পড়ছিল জেমির। তবে তার রাগ বা অনুরাগ কিছুই কাজ করছিল না মনের ভেতর। মার্গারেটকে সে প্রতিশোধের একটি অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করেছিল। মার্গারেট তার উত্তরাধিকারকে জন্ম দিয়েছে।

জেমি ঝুঁকে আলতোভাবে ঠোঁট ছোঁয়াল মার্গারেটের গালে।

'বাড়ি চলো,' বলল জেমি। তার ছেলে তার জন্য অপেক্ষা করছে।

বাড়ি ফিরে একটি উইংয়ে মার্গারেটের শোবার ঘর দেখিয়ে দিল জেমি।

'এটি তোমার বেডরুম, ' বলল জেমি।

'ও আচ্ছা।'

'আমি আরেকজন হাউজ-কিপারের ব্যবস্থা করছি। মিসেস টেলি জেমির দেখাশোনা করবে। তোমার কোনো কিছুর দরকার হলে ডেভিড ব্ল্যাকওয়েলকে বোলো।'

মার্গারেটের মনে হলো জেমি যেন তাকে শারীরিকভাবে আঘাত করেছে। মার্গারেটের সঙ্গে তার আচরণ চাকরানির মতো। তবে তাতে কিছু আসে যায় না।

আমার ছেলে যে একটি নাম পেয়েছে, পদবী পেয়েছে তাতেই আমি খুশি।

ডিনার খেতে রাতে বাড়ি ফিরল না জেমি। মার্গারেট তার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরে শেষে একাই খেয়ে নিল। সেদিন রাতে জেগে রইল সে, বাড়ির প্রতিটি শব্দ শুনল। ভোর চারটার দিকে অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমাবার আগে সে ভাবছিল ম্যাডাম অ্যাগনেসের কোন মেয়েটির কাছে জেমি গিয়েছে।

বিয়ের পরে জেমির সঙ্গে মার্গারেটের সম্পর্কের পরিবর্তন না হলেও ক্লিপড্রিফটের অধিবাসীদের তার প্রতি আচরণ আমূল বদলে গেল। রাতারাতি অচ্ছুত নারী থেকে সমাজের এক সম্মানিত ভদ্র মহিলায় তার রূপান্তর ঘটল। শহরের বেশিরভাগ মানুষই

জেমি ম্যাকগ্রেগরের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ করে পেট চালায়। তারা ভাবল মার্গারেট ভ্যান ডার মার্ভি যেহেতু এখন জেমি ম্যাকগ্রেগরের স্ত্রী কাজেই তাকে একটু তোয়াজ করে চললে আখেরে তাদেরই লাভ। তাই মার্গারেট যখন রাস্তায় বেরুল ছোট্ট জেমিকে নিয়ে ঘুরতে, সবাই তার সঙ্গে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করল। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দাওয়াত পেতে শুরু করল মার্গারেট। সে যদি একটু ভিন্নরকমভাবে চুল বাঁধল তো শহরশুদ্ধ মেয়েরা তার চুলের ওই স্টাইল অনুকরণ করতে লাগল। সে একদিন একটি নতুন হলুদ ড্রেস পরে বেরিয়েছে। সেই হলুদ ড্রেসটি সাথে সাথে জনপ্রিয় হয়ে উঠল। তবে মার্গারেট এদের কারও সঙ্গেই মাখামাখি করতে গেল না। ওরা আগে যখন ওর সঙ্গে বৈরী আচরণ করত তখন এদের সাথে যেমন ব্যবহার ছিল মার্গারেটের, এখনও তেমন একটা দূরত্ব রেখে চলল সে।

জেমি বাড়ি ফেরে শুধুমাত্র তার সন্তানের সঙ্গে সময় কাটাতে। মার্গারেটের সঙ্গে তার সম্পর্ক দূরবর্তী এবং বিনম্র। প্রতিদিন সকালে নাশতার টেবিলে ভৃত্যদের দেখানোর জন্য সুখী স্ত্রীর ভূমিকা পালন করে যায় মার্গারেট, যদিও টেবিলের ওপাশে বসা মানুষটি সবসময়ই কঠোর মুখোশ পরে থাকে। জেমি চলে যাওয়ার পরে নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে মার্গারেট। ততক্ষণে ঘেমে নেয়ে গেছে সে। কোথায় তার সম্মান। তবু এখানে থাকছে কারণ এখনও সে জেমিকে ভালোবাসে। আমি সব সময়ই তাকে ভালোবাসব। ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করো।

তিনদিনের ব্যবসায়িক সফরে কেপটাউন এসেছে জেমি। রয়েল হোটেল থেকে সে বেরিয়েছে, এক কালো ড্রাইভার এসে বলল, 'গাড়ি লাগবে, স্যার?'

'না,' জবাব দিল জেমি। 'আমি একটু হাঁটাহাঁটি করব।'

'বান্ডা বলেছিল আপনি নাকি ঘোড়ার গাড়িতে চড়তে পছন্দ করবেন।'

দাঁড়িয়ে পড়ল জেমি। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল লোকটির দিকে।

'বান্ডা?'

'জ্বী, মি. ম্যাকগ্রেগর।'

ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বসল জেমি। চাবুক চালাল চালক। ছুটতে শুরু করল ঘোড়াগুলো। জেমি পেছনের আসনে বসে বান্ডার কথা ভাবছিল। ভাবছিল তার অদৃশ্য সাহস এবং গভীর বন্ধুত্বের কথা। গত দু'বছরে বহুবার চেষ্টা করেছে সে বান্ডার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। পারেনি। এখন সে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে চলেছে।

ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে দিল ওয়াটারফ্রন্টের দিকে। জেমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলল কোথায় যাচ্ছে তারা। পনের মিনিট পরে গাড়ি এসে থামল পরিত্যক্ত একটি গুদামঘরের সামনে, এখানে বসেই একদিন সে আর বান্ডা নামিব মরুভূমিতে অভিযানের পরিকল্পনা করেছিল।

সে গাড়ি থেকে নেমে গুদামঘরে পা বাড়াল। বান্ডা অপেক্ষা করছিল তার জন্য। আগের মতোই আছে সে, শুধু পার্থক্য পরনে পরিষ্কার ধবধবে সুট, শার্ট এবং গলায় টাই।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকল দুই বন্ধু, হাসছে দু'জনেই, তারপর তারা একে অন্যকে আলিঙ্গন করল।

'তোমাকে দেখলেই বোঝা যায় বেশ আছ,' মন্তব্য করল জেমি।

মাথা ঝাঁকাল বান্ডা। 'খারাপ নেই আমি। সেই খামার বাড়িটি কিনেছি আমি। আমার একটা বউ আছে, আছে দুটি ছেলে। আমি মাঠে গম ফলাই, পালন করি উটপাখি।'

'উটপাখি?'

'ওদের পালক বিক্রি করে ভালোই টাকা আসে।'

'বাহ্, চমৎকার। তোমার পরিবারের সঙ্গে আমি পরিচিত হতে চাই, বান্ডা।'

স্কটল্যান্ডে নিজের পরিবারের কথা মনে পড়ল জেমির। খুব মিস করছে সে ওদেরকে। চার বছর ধরে সে দেশের বাইরে।

'তোমাকে অনেক খুঁজেছি আমি।'

'আমি ব্যস্ত ছিলাম, জেমি।' কাছিয়ে এল বান্ডা। 'তোমাকে একটা ব্যাপারে সাবধান করে দিতে ডেকে এনেছি। তোমার সামনে বিপদ।'

জেমি ওকে লক্ষ করছে। 'কী ধরনের বিপদ?'

'নামিব ফিল্ডে হ্যান্স যিমারম্যান নামে যে লোকটাকে দায়িত্ব দিয়ে রেখেছ সে মানুষ ভালো নয়। শ্রমিকরা তাকে ঘৃণা করে। তারা কাজ ছেড়ে দেয়ার কথা বলছে। ওরা তা করতে গেলে গার্ডরা বাধা দেবে এবং একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেঁধে যাবে।'

জেমি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বান্ডার মুখের দিকে।

'তোমার মনে আছে জন টেঙ্গো জাভাবু নামে এক লোকের কথা, তোমাকে বলেছিলাম?'

'মনে আছে। উনি একজন রাজনৈতিক নেতা। আমি তাঁর সম্পর্কে খবরের কাগজে পড়েছি। তিনি একটা ডনডারস্টর্ম তৈরির চেষ্টা করেছেন।'

'আমি তাঁর একজন অনুসারী।'

মাথা দোলাল জেমি। 'ও আচ্ছা। ঠিক আছে, আমার যা করণীয় তা আমি করব।'

'গুড। তুমি এখন ক্ষমতাবান হয়ে উঠেছ, জেমি। আমি সত্যি খুশি হয়েছি।'

'ধন্যবাদ, বান্ডা।'

'তোমার খুব সুন্দর একটি ছেলেও আছে।'

বিস্ময় গোপন রাখতে পারল না জেমি। 'তুমি এত খবর জানো কী করে?'

'আমি আমার বন্ধুদের খোঁজ-খবর রাখি।' সিধে হলো বান্ডা। 'এখন একটা মিটিংয়ে যাব, জেমি। ওদেরকে বলব নামিবের শ্রমিক অসন্তোষের একটা সুরাহা হতে চলেছে।'

'হ্যাঁ, আমি সে ব্যবস্থা করব।' প্রকাণ্ডদেহী কালো মানুষটির সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এল

জেমি। 'আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে?'

হাসল বান্ডা। 'আমি আশপাশেই থাকব। তুমি সহজে আমার কবল থেকে মুক্তি পাবে না।'

চলে গেল বান্ডা।

ক্লিপড্রিফটে ফিরেই ডেভিড ব্ল্যাকওয়েলকে ডেকে পাঠাল জেমি। 'নামিব ফিল্ডে কোনো ঝামেলা হচ্ছে, ডেভিড?'

'না, মি. ম্যাক গ্রেগর।' ইতস্তত করল সে। 'তবে গুজব শুনেছি হতে পারে।'

'ওখানকার সুপারভাইজার হ্যান্স যিমারম্যান। খবর নাও সে শ্রমিকদের সঙ্গে বাজে ব্যবহার করছে কিনা। যদি করে থাকে, ওকে থামাও। তুমি নিজেই যাবে ওখানে।'

'আমি কাল সকালেই রওনা হব।'

নামিবের ডায়মন্ড ফিল্ডে পৌঁছে ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল প্রথমে ঘণ্টা দুই গার্ড এবং শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলল। যা শুনল তাতে শীতল ক্রোধ অনুভব করল সে। যা জানার জেনে নিয়ে সে গেল হ্যান্স যিমারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে।

হ্যান্স যিমারম্যান একটি দানব বিশেষ। ওজন তিনশো পাউন্ড, উচ্চতা ছয় ফুট ছয় ইঞ্চি। শূকরের মতো মুখখানা সবসময় ঘেমে আছে, লাল শিরাযুক্ত চক্ষু। এরকম বদখত চেহারার মানুষ জীবনে দেখেনি ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল। তবে যিমারম্যান ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেডের অন্যতম দক্ষ সুপারভাইজারও বটে। নিজের ছোট্ট অফিস কক্ষে পাহাড়সম দেহ নিয়ে বসেছিল সে, ঘরে ঢুকল ডেভিড।

চেয়ার ছাড়ল যিমারম্যান। ডেভিডের সঙ্গে করমর্দন করে বলল, 'আপনাকে দেখে আনন্দিত হলাম, মি. ব্ল্যাকওয়েল। আপনি আসছেন আগে জানালেই পারতেন।'

ডেভিড নিশ্চিত তার আগমন সংবাদ যিমারম্যান অনেক আগেই জেনে গেছে।

'হুইস্কি?'

'না, ধন্যবাদ।'

যিমারম্যান নিজের আসন গ্রহণ করে দাঁত কেলিয়ে হাসল। 'আপনার জন্য কী করতে পারি বলুন? বসকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা কি যথেষ্ট পরিমাণ হিরে তুলে দিচ্ছি না?'

দু'জনেই জানে নামিব থেকে হিরে উত্তোলন যথেষ্টই সন্তোষজনক। 'কোম্পানির অন্য যে কারও চাইতে আমি কাফ্রিদের দিয়ে বেশি কাজ করাই,' গর্বের সুরে বলল যিমারম্যান।

'এখানকার পরিবেশ নিয়ে অভিযোগ পেয়েছি আমরা,' বলল ডেভিড।

যিমারম্যানের মুখ থেকে মুছে গেল হাসি। 'কী অভিযোগ?'

'শুনলাম এখানকার শ্রমিকদের সঙ্গে নাকি অমানবিক আচরণ করা হয় এবং–'

অমন ভারী শরীর নিয়েও বিদ্যুতের মতো খাড়া হয়ে ডেভিডকে চমকে দিল যিমারম্যান। রাগে গনগনে মুখ। 'ওগুলো মানুষ নাকি। ওরা হলো কাফ্রি। আপনারা হেড কোয়ার্টারে বসে থাকেন আর–'

'আমার কথা শুনুন,' বলল ডেভিড।

'আপনি আমার কথা শোনেন! আমি কোম্পানির যে কারও চেয়ে বেশি হিরে তুলি এবং জানেন কীভাবে? কারণ আমি ওই হারামজাদাগুলোর মনে ঈশ্বর-ভীতি ঢুকিয়ে দিয়েছি।'

'আমাদের অন্যান্য খনিতে,' বলল ডেভিড, 'আমরা মাসে ঊনষাট শিলিং বেতন দিই। কিন্তু আপনার শ্রমিকরা বেতন পায় মাত্র পঞ্চাশ শিলিং।'

'আপনাদেরকে বেশি টাকা বানানোর সুযোগ করে দিচ্ছি বলে আপনারা অভিযোগ করছেন? আমি শুধু কোম্পানির লাভ কীসে হবে তা-ই দেখি।'

'জেমি ম্যাকগ্রেগর শুধু লাভ দেখতে চান না, শ্রমিকদের স্বার্থও তিনি বিবেচনা করেন,' বলল ডেভিড। 'এদের পারিশ্রমিক বাড়িয়ে দিন।'

মুখ গোমড়া করে ফেলল যিমারম্যান। 'ঠিক আছে। আমার কী, টাকা তো বসের।'

'শুনেছি আপনি নাকি শ্রমিকদের চাবুকও মারেন।'

নাক সিঁটকাল যিমারম্যান। 'ক্রাইস্ট, ওদেরকে মেরেও তো আপনি কিছু করতে পারবেন না, মিস্টার। ওগুলো হলো গন্ডারের চামড়া।' চাবুক মারলেও টের পায় না। শুধু ভয় পায়।'

'তাহলে তো আপনি তিনজন শ্রমিককে ভয় পাইয়ে মেরে ফেলেছেন, মি. যিমারম্যান।'

কাঁধ ঝাঁকাল যিমারম্যান। 'ওরকম তিন/চারটে মারা গেলে কিছু হয় না।'

এ দেখছি একটা নরপশু, মনে মনে বলল ডেভিড। *এবং ভয়ানক বিপজ্জনক।* দানবটার দিকে তাকাল। আর যদি কোনো শ্রমিক নির্যাতনের কথা শুনি আপনাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে।' সে সিধে হলো। 'ওদের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করুন। এখন থেকে শাস্তি দেয়া বন্ধ। আমি ওদের কোয়ার্টার্সে গিয়েছিলাম। ওগুলো মনুষ্য বসবাসের উপযোগী নয়। কোয়ার্টার্সগুলো পরিষ্কার করবেন।'

কটমট করে ডেভিডের দিকে তাকাল যিমারম্যান, ক্রোধ সংবরণের প্রাণপন চেষ্টা করছে। 'আর কিছু?'

'হ্যাঁ। আমি তিনমাস পরে আবার আসব। আমি যা করতে বললাম তা যদি না করেন তাহলে এখানকার পাট আপনাকে চুকিয়ে ফেলতে হবে। গুড ডে।' বেরিয়ে গেল ডেভিড।

নিজের জায়গায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল হ্যান্স যিমারম্যান। প্রচণ্ড রাগে ফুঁসছে। যিমারম্যান একজন বোয়ের। তার বাবাও ছিল তাই। এ দেশ তাদের, ঈশ্বর কালুয়াদের এখানে পাঠিয়েছেন তাদেরকে সেবা করতে। এরা যদি মানুষের মতোই আচরণ পাবার

যোগ্য হতো তাহলে ঈশ্বর তাদের গায়ের রঙ কৃষ্ণবর্ণ করতেন না। জেমি ম্যাক গ্রেগর ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না। তবে একজন *uitlander* নেটিভ প্রেমিকের কাছ থেকে কীইবা আশা করা যায়? হ্যান্স যিমারম্যান জানে তাকে আরেকটু সতর্ক হতে হবে। তবে সে দেখিয়ে দেবে নামিবের আসল বস কে।

কুড়ি

আয়তনে বৃদ্ধি পেয়ে চলছিল ক্রুগার-ব্রেন্ট এবং সময়ের সদ্ব্যবহার করে চলছিল জেমি ম্যাক গ্রেগর। সে কানাডায় একটি পেপার মিল কিনেছে, অস্ট্রেলিয়ায় একটি শিপ ইয়ার্ড। বাড়িতে যতটুকু সময় থাকে জেমি, ছেলের সঙ্গে কাটায়। ছেলের চেহারা দিন দিন বাপের ডুপ্লিকেট হয়ে উঠছে। ছেলেকে নিয়ে গোপনে গোপনে গর্ব অনুভব করে জেমি। সে তার লম্বা সফরগুলোতে ছেলেকে সঙ্গী করতে চায় কিন্তু মার্গারেটের আপত্তির কারণে পারে না।

'বাইরে ঘোরার মতো ওর এখনও বয়স হয়নি। আরেকটু বড় হোক তারপর তোমার সঙ্গে যাবে ও।' জেমি বুঝে ওঠার আগেই এক বছরে পা দিয়ে ফেলল তার ছেলে, তারপর দুই। জেমি অবাক হয়ে ভাবছিল কী দ্রুত চলে যায় সময়। সালটা তখন ১৮৮৭।

মার্গারেটের কাছে এই দুটো বছর ছিল বড্ড ক্লান্তিকর, যেন পা টেনে টেনে পার হয়েছে দিন আর মাসগুলো। সপ্তাহে একদিন জেমি তার অতিথিদেরকে ডিনারে দাওয়াত দেয়। মার্গারেট হোস্টের দায়িত্ব পালন করে। অতিথিরা মার্গারেটের বুদ্ধিমত্তা এবং বাকপটুতায় মুগ্ধ। মার্গারেট জানে অনেক পুরুষই তাকে মনে মনে পছন্দ করে তবে কেউ এগোবার সাহস পায় না। কারণ সে জেমি ম্যাকগ্রেগরের স্ত্রী।

অতিথিরা চলে যাবার পরে মার্গারেট জিজ্ঞেস করে, 'সব ঠিক ছিল তো?'

জেমি দায়সারা গোছের জবাব দেয়, 'হ্যাঁ, শুভরাত্রি।'

তারপর সে তার ছোট্ট জেমিকে দেখতে যায়। কিছুক্ষণ পরে সদর দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনে মার্গারেট। বাইরে গেছে জেমি।

রাতের পর রাত বিছানায় শুয়ে নিজের জীবন নিয়ে ভাবে মার্গারেট ম্যাকগ্রেগর। জানে শহরের প্রতিটি নারীর সে ঈর্ষার পাত্রী। আর এটা তাকে যন্ত্রণা দেয়। কারণ মার্গারেট তো জানে তাকে ঈর্ষা করার কিছু নেই। স্বামীকে সে কখনোই কাছে পায় না। স্বামী তার সঙ্গে অচেনা মানুষের চেয়েও খারাপ ব্যবহার করে। অন্তত একবার যদি সে মার্গারেটের দিকে ভালো করে তাকাত! মার্গারেট ভাবে একদিন সকাল বেলা নাশতা খাওয়ার সময়, স্কটল্যান্ড থেকে বিশেষভাবে আমদানী করা যবের গুঁড়ার পরিজের বাটিটা যদি জেমির মাথার ওপর সে ঢেলে দিতে পারত তাহলে কেমন হতো? জেমির তখনকার চেহারা মনে করে খুব হাসি পেল মার্গারেটের। সে খিকখিক করে হাসতে শুরু করল।

কিন্তু সে হাসি পরিণত হলো গভীর ফোঁপানিতে। *আমি আর ওকে ভালোবাসতে চাই না, আমি আর ওকে ভালোবাসব না। আমি এভাবে ভালোবেসে একদিন নিজেই শেষ হয়ে যাব...*

১৮৯০ সাল নাগাদ ক্লিপড্রিফট শহর জেমির প্রত্যাশার চেয়েও সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হলো। এটা এখন পূর্ণাঙ্গ বুমটাউন। পৃথিবীর সব জায়গা থেকে প্রসপেক্টররা আসছে এ শহরে। এদের খাদ্য, ইকুইপমেন্ট, থাকার জায়গা এবং খননকাজ চালানোর জন্য টাকা দরকার। সবকিছুর জোগান দিচ্ছে জেমি। বিনিময়ে হিরে এবং সোনার খনির শেয়ার পাচ্ছে সে, তার নাম এবং খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছে। একদিন সকালে ডি বিয়ার্স থেকে আসা একজন আইনজীবী জেমির সঙ্গে দেখা করল। দানব এ প্রতিষ্ঠান কিম্বার্লির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হিরের খনিগুলোর মালিক।

'আপনার জন্য কী করতে পারি?' জানতে চাইল জেমি।

'আপনার জন্য একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি, মি. ম্যাকগ্রেগর।

'ডি বিয়ার্স আপনার কোম্পানি কিনে নিতে আগ্রহী। আপনি দামটা বলুন।'

জেমি হেসে বলল, 'আপনাদের কোম্পানির দামটা বরং বলুন।'

দিন যায়, ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল ক্রমেই নির্ভরশীল মানুষ হয়ে উঠতে থাকে জেমির কাছে। তরুণ এই আমেরিকানের মাঝে নিজের তরুণ বেলার প্রতিচ্ছবি খুঁজে পায় জেমি। ছেলেটি সৎ, বুদ্ধিমান এবং বিশ্বস্ত। জেমি প্রথমে ডেভিডকে তার সেক্রেটারি বানাল, তারপর পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, সবশেষে পদোন্নতি পেয়ে মাত্র একুশ বছর বয়সে সে জেনারেল ম্যানেজার হয়ে গেল।

ডেভিড ব্ল্যাকওয়েলের কাছে জেমি ম্যাকগ্রেগর পিতার প্রতিভূ। ডেভিডের বাবার হার্ট অ্যাটাক হলে জেমিই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিল এবং নিজের পকেট থেকে চিকিৎসার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেছে। ডেভিডের বাবা মারা গেলে জেমিই এগিয়ে গেছে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করতে। ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেডে পাঁচ বছর ধরে কাজ করছে ডেভিড, তার চোখে জেমির মতো মানুষই হয় না। জেমি এবং মার্গারেটের মধ্যেকার সমস্যা সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অবগত, তার খুব কষ্টও হয়। কারণ দু'জনকেই সে খুব পছন্দ করে। *তবে ওদের ব্যাপারে আমি কখনও নাক গলাতে যাব না,* নিজেকে বলে ডেভিড। *আমার কাজ হচ্ছে সর্বতো উপায়ে জেমিকে সাহায্য করা। আমি তা-ই করব।*

জেমি প্রচুর সময় দেয় তার ছেলেকে। ছেলের বয়স এখন পাঁচ। জেমি তাকে একদিন খনি দেখাতে নিয়ে গেল। খনি দেখে মুগ্ধ বালক এক সপ্তাহ বাক্যরহিত হয়ে রইল! তারা ক্যাম্পিং-এ গেল, নক্ষত্রবীথির নিচে খোলা তাঁবুতে যাপন করল রাত। ওরা

শিকারে গেল। প্যাট্রিজ, গিনি ফাউল, রিডবাক এবং ওরিবি শিকার করল। ছেলেকে একটি টাট্টু ঘোড়া কিনে দিয়েছে জেমি। বাপ-ছেলে মিলে আফ্রিকার ভেল্ড বা তৃণ প্রান্তরে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াল। একবার ওই ভেল্ডে গিয়ে অভিবাসী স্প্রিংবকের (দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষুদ্রকায় হরিণ) পালের কবলে পড়ে জান খতরা হয়ে যাচ্ছিল ওদের। দূরে, দিগন্ত রেখায় প্রথমে ধুলোর মেঘ ফুটে উঠতে দেখল জেমি। খরগোশ, শেয়াল আর বেড়ালের দল প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছিল। বড় বড় সাপ ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে লুকিয়ে পড়ছিল পাথরখণ্ডের নিচে। জেমি আবার তাকাল দিগন্তে। ধুলোর মেঘটা ক্রমে কাছিয়ে আসছে।

'চলো ভাগি,' বলল সে পুত্রকে।

'কিন্তু আমাদের তাঁবু–'

'তাঁবু থাক!'

দু'জনে দ্রুত একটি উঁচু পাহাড়ের দিকে ছুটল। পেছনে শুনতে পেল অসংখ্য খুরের শব্দ। তাকিয়ে দেখল কমপক্ষে তিন মাইল দীর্ঘ একটা সারি নিয়ে ছুটে আসছে স্প্রিংবকের দল। সংখ্যায় ওরা পাঁচ লাখেরও বেশি হবে, ছোটার পথে সামনে যা পড়ছে সব পদদলিত করে ফেলছে। তাদের ভয়ংকর খুরের নিচে চাপা পড়ে শয়ে শয়ে প্রাণ হারাল খরগোশ, সাপ, শেয়াল আর গিনিফাউল। বাতাসে শুধু ধুলো আর খুরের দামামা। অবশেষে দলটা যখন চলে গেল, জেমি হিসেব করে দেখল পুরো তিনটা ঘণ্টা লেগেছে বিশাল দলটির প্রান্তর পাড়ি দিতে।

ছেলের ষষ্ঠ জন্মদিনে তার বাবা বলল, 'আগামী সপ্তাহে তোমাকে নিয়ে টাউনে যাব। সত্যিকারের শহর কী জিনিস দেখবে।'

'মা কি আমাদের সঙ্গে যাবে?' জিজ্ঞেস করল জেমি। 'মা শিকারে যেতে পছন্দ করে না কিন্তু শহর দেখতে ভালোবাসে।'

ছেলের মাথার চুলে হাত দিয়ে এলোমেলো করে দিতে দিতে বাপ বলল, 'তোমার মা'র এখানে অনেক কাজ, বেটা। শুধু তুমি আর আমি যাব, বুঝেছ?'

বাবা-মায়ের মাঝখানের দূরত্ব ছেলে ঠিকই টের পায়, তার কষ্টও লাগে কিন্তু দূরত্ব যে কেন তা সে ঠিক বুঝতে পারে না।

জেমির প্রাইভেট রেলওয়ে কার-এ ওরা ভ্রমণ করল। বছরটা ১৮৯১। দক্ষিণ আফ্রিকায় রেল ভ্রমণ তখন সবার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। কারণ রেলে ভ্রমণ করতে খরচ লাগে কম, আরামদায়ক এবং দ্রুত। জেমি নিজের ব্যবহারের জন্য যে রেলওয়েটি তৈরি করেছে সেটি একাত্তর ফুট লম্বা, তাতে রয়েছে চারটি প্যানেল বিশিষ্ট স্টেটরুম, সেখানে জনাবারো মানুষ অনায়াসে বসতে পারে, আছে একটি সেলুন যেটি অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়, একটি ডাইনিং কমপার্টমেন্ট, একটি বাররুম এবং একটি সুসজ্জিত রান্নাঘর। স্টেটরুমে রয়েছে পেতলের খাট, পিনশ গ্যাস ল্যাম্প এবং সুপ্রশস্ত পিকচার

উইন্ডো।

'অন্যান্য যাত্রীরা কোথায়?' জানতে চাইল বালক।

হাসল জেমি। 'যাত্রী শুধু আমরাই, বেটা এটা তোমার ট্রেন।'

বালক জেমি বেশিরভাগ সময় কাটিয়ে দিল জানালা দিয়ে বাইরের অপূর্ব নিসর্গ দেখে।

'এ হলো ঈশ্বরের ভূমি,' তার বাবা বলল তাকে। 'তিনি এ জমিনে আমাদের জন্য মূল্যবান অনেক খনিজ সম্পদ রেখেছেন। সবগুলো আছে মাটির নিচে, শুধু তুলে নিলেই হলো।'

কেপটাউনে পৌছে শহরের বিশালতা দেখে ছোট্ট জেমি রীতিমত মুগ্ধ। কী বিরাট বিরাট দালান আর কত্ত লোকজন! জেমি ছেলেকে নিয়ে গেল ম্যাকগ্রেগর শিপিং লাইনে। জেটিতে মাল খালাস এবং মাল বোঝাইতে ব্যস্ত আধ ডজন জাহাজের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'ওই যে জাহাজগুলো দেখতে পাচ্ছ ওগুলো সব আমাদের।'

ওরা ক্লিপড্রিফটে ফেরার পরে বালক জেমি তার মার কাছে উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগল, 'জানো মা, আমার বাবা পুরো শহরটার মালিক! শহরটা দেখলে তোমার খুব ভালো লাগবে, মা। পরেরবার তুমি যেতে পারবে।'

ছেলেকে আলিঙ্গন করল মার্গারেট। 'নিশ্চয়, বাবা।'

জেমি এখন বেশিরভাগ রাত বাইরে কাটায়। মার্গারেট জানে তার স্বামী ম্যাডাম অ্যাগনেসের কাছে যায়। শুনেছে সে ওই পতিতালয়ের একটি মেয়ের জন্য নাকি একটা বাড়িও কিনেছে যাতে গোপন অভিসারে যেতে পারে। ঘটনা সত্যি কিনা জানে না মার্গারেট। শুধু জানে ওই মেয়েটাকে হাতের কাছে পেলে সে খুন করে ফেলবে।

মন-মানসিকতা ভালো রাখার জন্য বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজে মনোযোগ দিল মার্গারেট। সে নতুন একটি গির্জা তৈরি করল এবং অভাবী প্রসপেক্টরদেরকে সাহায্য করতে লাগল। জেমিকে অনুরোধ করল যেসব প্রসপেক্টর প্রচণ্ড অর্থাভাবে ভুগছে জেমি যেন তাদেরকে বিনা ভাড়ায় তার রেলরোড কারগুলো ব্যবহার করতে দেয় যাতে তারা নির্বিঘ্নে কেপটাউন ফিরে যেতে পারে।

'আমি কেন ওদেরকে বিনাভাড়ায় আমার রেলরোড ব্যবহার করতে দেব,' ঘোঁত ঘোঁত করল জেমি। 'ওরা হেঁটে এসেছে, হেঁটে ফিরে যাক।'

'হাঁটাচলার অবস্থা ওদের নেই,' তর্ক করল মার্গারেট। 'আর ওরা যদি শহরে যাবে তাহলে ওদের কাপড় চোপড়, খাওয়া দাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা আমাদেরকেই করতে হবে।'

'ঠিক আছে,' শেষে গররাজি হলো জেমি।

'ধন্যবাদ, জেমি।'

মার্গারেট গটগট করে বেরিয়ে গেল অফিস থেকে। তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে

জেমি ভাবল, এ অন্য কারও বউ হলে সে খুব সুখী হতো।

যে রক্ষিতার জন্য বাড়ি কিনে দিয়েছে জেমি তার নাম ম্যাগি। এই সুন্দরী মেয়েটিই সেদিন লাঞ্চের সময় মার্গারেটের পাশে বসেছিল। ব্যাপারটা অদ্ভুতই বটে, তার স্ত্রীর মতো এরও নাম ম্যাগি। তবে দু'জনের চেহারার কোনো মিল নেই। ম্যাগির বয়স একুশ, স্বর্ণকেশী, সজীব মুখ, লোভনীয় শরীর– বিছানায় এক বাঘিনী। মেয়েটিকে রক্ষিতা হিসেবে রাখার জন্য ম্যাডাম অ্যাগনেসকে মোটা অংকের টাকা দিতে হয়েছে জেমিকে। জেমি গভীর রাতে, লুকিয়ে এ বাড়িতে আসে। তবে জানে, অনেকেই তার গোপন অভিসারের কথা জেনে ফেলেছে। এতে জেমির তেমন কিছু আসে যায় না। এটা তার শরীর এবং নিজের আনন্দের জন্য সে যা খুশি করতে পারে।

আজ রাতে অবশ্য কোনোরকম আনন্দ পাচ্ছিল না জেমি। সে মজা লুটতে এসেছিল ম্যাগির কাছে। কিন্তু ম্যাগির মুড খুব খারাপ। বিরাট বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে গোলাপ রঙা ড্রেসিংগাউন পরা ম্যাগি। 'এ বাড়িতে বন্দী থাকতে থাকতে আমি হাঁপিয়ে গেলাম,' বলল সে। 'মনে হচ্ছে আমি তোমার ক্রীতদাসী। ম্যাডাম অ্যাগনেসের ওখানে তবু গল্পগুজব করে সয় কাটানো যায়। তুমি ঘুরতে যাওয়ার সময় আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওনা কেন?

'সে ব্যাখা তোমাকে আগেই দিয়েছি, ম্যাগি। আমার পক্ষে সম্ভব নয়–'

বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নামল ম্যাগি, উদ্ধত ভঙ্গিতে এসে দাঁড়াল জেমির সামনে। 'বাজে কথা বলো না! তোমার ছেলেকে তো সব জায়গায় নিয়ে যাচ্ছ। আমাকে তোমার ছেলের মতো মনে ধরে না?'

'না!' বলল জেমি। তার কণ্ঠ বিপজ্জনকরকম শান্ত। 'তোমাকে আমার ভ্রমণসঙ্গী করতে পারব না।' বার-এ গিয়ে গ্লাসে ব্রান্ডি ঢেলে নিল। এ নিয়ে চতুর্থ রাউন্ড চলছে। এতটা মদ সে খায় না।

'আমি আসলে তোমার কাছে কিছুই না,' চিৎকার দিল ম্যাগি। 'স্রেফ এক টুকরো ভোগের মাংস।' মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে হেসে উঠল। 'বিগ, মোরাল স্কচম্যান।'

'স্কট– স্কচম্যান নয়।'

'যিশুর দোহাই, কথায় কথায় আমার ভুল ধরবে না। আমি যা-ই বলি তোমার গায়ে লাগে না। নিজেকে তুমি কী ভাবো, অ্যাঁ? আমার বাপ?'

যথেষ্ট সহ্য করেছে জেমি। 'তুমি কাল ম্যাডাম অ্যাগনেসের ওখানে চলে যেয়ো। আমি তাকে বলে দেব তুমি আসছ।' মাথায় হ্যাট চাপিয়ে দরজায় পা বাড়াল সে।

'আমাকে এভাবে তুমি তাড়িয়ে দিতে পার না,' ওর পেছন পেছন ছুটে এল ক্রোধোন্মত্ত ম্যাগি।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল জেমি। 'খুব পারি।' বলে সে অদৃশ্য হয়ে গেল রাতের আঁধারে।

মাথাটা ঝিমঝিম করছে জেমির। ম্যাগির কথা মনে করে রাগে জ্বলে যাচ্ছে গা। আজ ওর শরীর খুব চাইছিল ম্যাগিকে। কিন্তু মেয়েটা তার দেহ তো স্পর্শ করতে দেয়ই নি উল্টো মেজাজ খারাপ করে দিয়েছে জেমির। সে টলতে টলতে বাড়ি ফিরল। ফ্রন্ট হল হয়ে নিজের ঘরে যাচ্ছে, মার্গারেটের বেডরুমে চোখ চলে গেল। বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে আলো আসছে। এখনও জেগে আছে মার্গারেট! হঠাৎ মার্গারেটের বিছানায় শোয়া চেহারাটা ভেসে উঠল চোখে। হয়তো পাতলা, ফিনফিনে একটা নাইট গাউন পরে শুয়ে আছে সে। কিংবা কিছুই পরা নেই। মনে পড়ল মার্গারেটের রসালো, ভরাট শরীর কীভাবে তার দেহের নিচে সাপের মতো মোচড় খেত। অরেঞ্জ রিভারের গাছতলার সেই স্মৃতি তীব্র কামার্ত করে তুলল জেমিকে। সে মার্গারেটের বেডরুমের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল।

কেরোসিনের বাতি জ্বেলে বই পড়ছে মার্গারেট। জেমিকে দেখে খুবই অবাক হলো। 'জেমি... কী ব্যাপার?'

'আমি কি আমার স্ত্রীর ঘরে আসতে পারি না?' জড়ানো গলায় বলল মাতাল জেমি।

মার্গারেটের পরনে ফিনফিনে নাইট গাউন, বর্তুলকার স্তনের আভাস ফুটে আছে কাপড়ের ওপর। *গড, ওর ফিগারটা এখনও কী দারুণ!* জেমি কাপড় খুলতে লাগল।

লাফ মেরে বিছানা থেকে নামল মার্গারেট। বিস্ফারিত চোখ। 'তুমি করছ কী?'

জেমি লাথি মেরে বন্ধ করে দিল দরজা, হেঁটে গেল ওর কাছে। পরমুহূর্তে ওকে নিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। ক্ষিপ্র হস্তচালনায় বিবস্ত্র করে ফেলল ম্যাগিকে। 'তোমাকে আমি চাই, ম্যাগি।'

মাতাল জেমি কেন ম্যাগিকে যে চাইছে নিজেও জানে না। তবে তার শরীরের নিচের রমণীটি প্রথমে কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করে বাধা দিলেও পরে আত্মসমর্পণ করল। ওকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, 'ওহ মাই ডার্লিং, মাই ডার্লিং জেমি। আমি তোমাকে ভীষণ চাই।' আর মদের ঘোরে জেমি ভাবছিল, *তোমার সঙ্গে অমন খারাপ ব্যবহার করা মোটেই উচিত হয়নি আমার। কাল সকাল হলেই তোমাকে গিয়ে বলব তোমাকে ম্যাডাম অ্যাগনেসের কাছে যেতে হবে না...*

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে ম্যাগি দেখে সে একা শুয়ে আছে বিছানায়। জেমির পেশীবহুল শরীরের পরশ এখনও লেগে আছে ওর দেহে, ও যেন শুনতে পাচ্ছে জেমি বলছে, 'গড, তোমাকে আমি চাই, ম্যাগি।' ভাবতেই অদ্ভুত, বুনো এক আনন্দে ভরে গেল তনুমন। মার্গারেট ঠিক ধারণাই করেছিল। জেমি ওকে ভালোবাসে। সবুরে মেওয়া ফলে। এতদিনকার অপমান, অবমাননা আর যন্ত্রণাভোগের পুরস্কার অবশেষে লাভ করেছে ম্যাগি।

ম্যাগির সারাটা দিন কাটল অভূতপূর্ব আনন্দের এক ঘোরের মাঝে। সে গোসল করল, সাবান দিয়ে চুল ধুলো, অন্তত ডজনখানেকবার মত বদলাল কোন ড্রেসটিতে

জেমির ওকে ভালো লাগবে। রাঁধুনিকে ছুটি দিয়ে দিল সে জেমির প্রিয় ডিশ নিজ হাতে রান্না করে খাওয়াবে বলে। ডাইনিং-রুমের চেয়ার-টেবিলগুলো বার কয়েক এধার-ওধার করার পরে অবশেষে সন্তুষ্ট হলো; এখন সুন্দর দেখাচ্ছে ঘরটি। মোম এবং ফুল সাজিয়ে রাখল টেবিলে। চমৎকার একটি সন্ধ্যা কাটাবে সে আজ জেমির সাথে।

জেমি সে রাতে ডিনার খেতে বাড়িই ফিরল না। মার্গারেট রাত তিনটা পর্যন্ত তার জন্য লাইব্রেরি ঘরে অপেক্ষা করল। শেষে একা গেল বিছানায়।

পরদিন সকালে জেমি ঘরে ফিরল। মার্গারেটের উদ্দেশে মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে ছেলের ঘরে ঢুকল। বোকার মতো তার দিকে তাকিয়ে থাকল মার্গারেট। তারপর ধীর পায়ে নিজের ঘরে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়াল। আয়না বলল তাকে এত সুন্দর আর কোনোদিন লাগেনি কিন্তু যখন সে আরেকটু কাছে গেল, নিজের চোখজোড়া চিনতে পারল না মার্গারেট। আয়না দিয়ে সম্পূর্ণ অচেনা একজোড়া চোখ তাকিয়ে আছে তার দিকে।

একুশ

'আপনার জন্য সুখবর আছে, মিসেস ম্যাকগ্রেগর,' হাসিমুখে বললেন ডা. টিগার। 'আপনি মা হতে চলেছেন।'

শুনে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল মার্গারেট। হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারছে না। সুখবর? প্রেম ভালোবাসাহীন বৈবাহিক জীবনে আরেকটি সন্তান জন্মদানের কথা কল্পনাও করা যায় না। আর অপমান সইতে পারবে না মার্গারেট। একটা কোনো উপায় ওকে খুঁজে বের করতেই হবে। এসব নিয়ে ভাবতে গিয়েই অসুস্থবোধ করছিল ও, ঘাম বেরিয়ে গেছে গায়ে।

ডা. টিগার প্রশ্ন করলেন, 'মর্নিং সিকনেস?'

'অল্প।'

ওকে কিছু বড়ি দিলেন তিনি। 'এগুলো খাবেন। সুস্থবোধ করবেন। আপনার শারীরিক অবস্থা যথেষ্ট ভালো, মিসেস ম্যাকগ্রেগর। দুশ্চিন্তার কিছুই নেই। এক্ষুনি বাড়ি যান। স্বামীকে সুসংবাদটা দিন।'

'হ্যাঁ,' নিষ্প্রাণ গলায় বলল মার্গারেট। 'দেব।'

ডিনার টেবিলে বসে খবরটা দিল মার্গারেট। 'আজ ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। আমি আবার মা হতে চলেছি।'

কিছু না বলে ন্যাপকিনটা ছুঁড়ে ফেলে দিল জেমি, চেয়ার ছাড়ল, দুপদাপ পা ফেলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আর সে মুহূর্তে মার্গারেটের মনে হলো জেমি ম্যাকগ্রেগরকে সে যতটা ভালোবাসে, ততটা তাকে ঘৃণাও করতে পারবে।

এবারের প্রেগন্যান্সিটা একটু কঠিন ধরনের। বেশির ভাগ সময় বিছানায় শুয়ে থাকতে হলো মার্গারেটকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে শুয়ে থাকল আর কল্পনায় দেখল জেমি তার পায়ের কাছে বসে আছে, হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছে, ওর সঙ্গে আবার উন্মাদের মতো প্রেম করছে। কিন্তু এ সবই কল্পনা। বাস্তবতা হলো সে একটা ফাঁদে পড়েছে। তার যাওয়ার কোনো জায়গা নেই, থাকলেও ছেলেকে নিয়ে তাকে কোথাও যেতে দিত না জেমি।

ওর ছেলের বয়স এখন সাত, স্বাস্থ্যবান এবং অত্যন্ত সুদর্শন। সে বুদ্ধিমান এবং তার রসবোধ প্রখর। মাকে সে খুব ভালোবাসে। মা'র ভেতরে যে একটা কষ্ট আছে সেটা

সে দিব্যি বুঝতে পারে। স্কুলে বসে মা'র জন্য ছোট ছোট উপহার তৈরি করে ছোট্ট জেমি, নিয়ে আসে বাড়িতে। উপহারগুলো পেয়ে খুশি হয় মার্গারেট, হাসে, ধন্যবাদ দেয় ছেলেকে, চেহারা থেকে হতাশ ভাবটা দূর করার চেষ্টা করে। জেমি যখন জানতে চায় তার বাবা কেন রাতের বেলা বাইরে থাকে এবং মাকে কেন কখনও সঙ্গে নিয়ে যায় না, মার্গারেট জবাব দেয়, 'তোমার বাবা খুব নামীদামী মানুষ, জেমি। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে তাকে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয়। তাই আমাকে নিয়ে সে বাইরে যাওয়ার সময় পায় না।'

ওর বাবা আর আমার মধ্যে যা-ই হোক, সেটা আমাদের সমস্যা, ভাবে মার্গারেট, এজন্য আমি চাই না জেমি তার বাবাকে ঘৃণা করতে শিখুক।

মার্গারেটের মাতৃত্বের চিহ্ন দিনদিন প্রকট হয়ে উঠতে লাগল। রাস্তায় বেরুলে পরিচিত লোকজনের সঙ্গে দেখা হলে তারা ওকে থামিয়ে বলে, 'আর বোধহয় বেশি দেরি নেই তাই না, মিসেস ম্যাকগ্রেগর? বাজি ধরতে পারি-আবার আপনি জেমির মতো সুন্দর একটি ছেলে সন্তান জন্ম দেবেন। আপনার স্বামী নিশ্চয় খুশিতে আত্মহারা হবেন!'

আর পেছনে এরাই ফোঁড়ন কাটে, 'বেচারী! চেহারাটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে আছে নিশ্চয় জেনে ফেলেছে তার স্বামী এক বেশ্যাকে রক্ষিতা হিসেবে রেখেছে...'

আবার মা হওয়ার ব্যাপারে ছোট্ট জেমির মানসিক প্রস্তুতির জন্য একদিন মার্গারেট তাকে বলল, 'তোমার একটি ভাই অথবা বোন আসছে, সোনা। তাহলে সারাদিন তুমি তার সঙ্গে খেলা করতে পারবে। খুব মজা হবে, তাই না?'

জেমি তার মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তাহলে তোমার বেশি মজা হবে, মা। তুমি একজন সঙ্গী পাবে।'

ছেলের কথা শুনে মার্গারেটের চোখে জল এসে গেল।

সকাল চারটায় শুরু হলো মার্গারেটের প্রসব বেদনা। মিসেস টেলিকে পাঠানো হলো ধাত্রী হান্নাকে নিয়ে আসতে। দুপুরে জন্ম নিল বাচ্চা। বেশ স্বাস্থ্যবতী একটি কন্যা শিশু, মায়ের চেহারা পেয়েছে সে, চিবুকটা বাবার মতো, লাল টুকটুকে মুখখানা ঘিরে রেখেছে কুচকুচে কালো কোঁকড়ানো চুল। মার্গারেট তার নাম রাখল কেট।

দরজায় নক না করেই জেমি ম্যাকগ্রেগরের ঘরে ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়ল ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল। তার দিকে অবাক হয়ে তাকাল জেমি। 'কী ব্যাপার—?'

'নামিবে দাঙ্গা শুরু হয়েছে!'

দাঁড়িয়ে পড়ল জেমি। 'কী? কী হয়েছে?'

'কৃষ্ণাঙ্গ একটি ছেলে হিরে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। বগলের চামড়া কেটে তার মধ্যে হিরে পুরে পাচার করার চেষ্টা করেছিল সে। হ্যান্স যিমারম্যান তাকে অন্যান্য

শ্রমিকদের সামনে চাবকে মেরে ফেলে। ছেলেটির বয়স মাত্র বারো।'

রাগে থমথম করছে জেমির মুখ। 'সুইট যিশাস! আমি সমস্ত খনিতে চাবকানো মানা করে দিয়েছিলাম।'

'আমি যিমারম্যানকে সাবধানও করে দিয়েছি।'

'হারামজাদটাকে বরখাস্ত করো।'

'ওকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কেন?'

'কালোরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে।'

জেমি মাথার হ্যাট তুলে নিল। 'আমি যাচ্ছি। আমি না ফেরা পর্যন্ত তুমি এদিকটাতে খেয়াল রেখো।'

'আপনার ওখানে যাওয়া নিরাপদ হবে না, মি. ম্যাকগ্রেগর। যিমারম্যান যে ছেলেটিকে মেরে ফেলেছে সে বারোলং গোষ্ঠীর। আর বারোলংরা কাউকে ক্ষমা করে না, কিছু ভোলেও না। আমি বরং—'

জেমি চলে গেছে।

ডায়মন্ড ফিল্ড থেকে দশ মাইল দূরে থাকতেই ধোঁয়া দেখতে পেল জেমি ম্যাকগ্রেগর। নামিবের সবগুলো কুটির জ্বলছে দাউদাউ করে। *গর্দভের দল!* মনে মনে কৃষ্ণাঙ্গদের তিরস্কার করল জেমি। নিজেদের বাড়িঘর *নিজেরাই জ্বালিয়ে দিয়েছে।* ওর ঘোড়ার গাড়ি এগিয়ে চলেছে, গুলির আওয়াজ আর চিৎকার শুনতে পেল জেমি। উর্দিধারী সেপাইরা গণ-হাঙ্গামার মধ্যে পড়ে দিশে হারিয়ে পলায়নপর কালোদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছে। সাদারাও মারা পড়ছে কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে দাঙ্গায়। তবে সংখ্যায় অল্প। কারণ তাদের হাতে অস্ত্র আছে।

চিফ কনেস্টবল বার্নার্ড সোদি জেমিকে দেখে ছুটে এল। 'চিন্তা করবেন না, মি. ম্যাকগ্রেগর। সব ক'টা হারামজাদাকে আজ চিট করে ফেলব।'

'আপনার লোকদের গুলি বন্ধ করতে বলুন,' বলল জেমি।

'কী বললেন? যদি—'

'যা বললাম করুন!' এক ঝাঁক বুলেট এক কালো মহিলাকে মাটিতে শুইয়ে ফেলেছে দেখে রীতিমতো অসুস্থ বোধ করল ও। 'আপনার লোকদের গুলি করতে মানা করুন।'

'আপনি যা বলেন, স্যার' একজন এইডকে হুকুম দিল চিফ কনেস্টেবল। তিন মিনিট পরে গোলাগুলি বন্ধ হয়ে গেল।

সর্বত্র পড়ে আছে লাশ। 'আপনি যদি আমার পরামর্শ চান,' বলল সোদি, 'তাহলে—'

'আপনার কোনো পরামর্শ চাই না। ওদের নেতাকে নিয়ে আসুন।'

পুলিশের দু'জন লোক এক তরুণ কৃষ্ণাঙ্গকে নিয়ে এল জেমির কাছে। তার হাতে হাতকড়া পরানো, সারা গায়ে রক্ত, তবে অবয়বে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। গর্দান খাড়া করে

দাঁড়িয়ে রইল সে, চোখজোড়া ভাটার মতো জ্বলছে।

'আমি জেমি ম্যাক গ্রেগর।'

থুতু ফেলল যুবক।

'এখানে যা ঘটেছে সে জন্য আমি মোটেই দায়ী নই। আমি তোমার লোকদের ক্ষতিপূরণ দেব।'

'ওদের বিধবা স্ত্রীদের কাছে গিয়ে কথাগুলো বলুন।'

জেমি ফিরল সোদির দিকে। 'হ্যানস যিমারম্যান কোথায়?'

'তার এখনও কোনো হদিস আমরা পাইনি, স্যার।'

জেমি দেখল কালো যুবকের চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠল। ও বুঝতে পারল আর কোনোদিনই যিমারম্যানের হদিস মিলবে না। লোকটিকে ও বলল, 'আমি তিনদিনের জন্য ডায়মন্ড ফিল্ড বন্ধ ঘোষণা করলাম। তুমি তোমার লোকদের সঙ্গে কথা বলো। তোমাদের নালিশ আর অভিযোগের একটা তালিকা আমাকে দেবে। কথা দিচ্ছি তোমাদের সমস্ত দাবি দাওয়া আমি মেনে নেবো। তবে এখানকার সবকিছু বদলে ফেলব যদি ভেবে থাকো তাহলে ভুল ভেবেছ।'

লোকটি জেমিকে দেখছে। তার চেহারায় সন্দেহের দোলাচল।

'এখানে নতুন ফোরম্যান আসবে। কাজের সহনশীল পরিবেশ থাকবে। তবে তোমার লোকদের তিনদিনের মধ্যে কাজে যোগ দিতে হবে।'

চিফ কনেস্টেবল অবিশ্বাসের সুরে বলল, 'আপনি ওকে ছেড়ে দিচ্ছেন? ও আমার কয়েকজন লোক মেরে ফেলেছে।'

'এ নিয়ে পূর্ণ তদন্ত হবে এবং–'

ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল জেমি, পূর্ণগতিতে ছুটে আসছে তার দিকেই। ঘুরল জেমি। ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল। তার চেহারা দেখেই বুকটা ধক করে উঠল ওর।

ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নামল ডেভিড। 'মি. ম্যাকগ্রেগর আপনার ছেলেকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

জেমির দুনিয়া হঠাৎ আঁধার হয়ে এল।

বাইশ

ক্লিপড্রিফটের অর্ধেক মানুষ নেমে পড়ল নিখোঁজ জেমির খোঁজে। শহরের আশপাশ, গ্রামাঞ্চল, গলি, খাদ, জঙ্গল সব জায়গায় পাত্তা লাগানো হলো। কিন্তু ছেলেটির চিহ্নমাত্র নেই।

জেমি একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে। ওর বারবার মনে হচ্ছে ওর ছেলে কোথাও হয়তো ঘুরতে গেছে। ফিরে আসবে এক্ষুনি।

সে মার্গারেটের ঘরে গেল। মার্গারেট বিছানায় শুয়ে আদর করছে তার শিশু কন্যাকে।

'কোনো খবর পেলে?' কাতরে উঠল মার্গারেট।

'এখনও পাইনি। তবে খবর নিশ্চয় পাওয়া যাবে।' শিশুটির দিকে এক পলক তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জেমি।

মিসেস টেলি ঢুকল ঘরে অ্যাপনে হাত মুছতে মুছতে।

'চিন্তা করবেন না, মিসেস ম্যাকগ্রেগর, বেবি তো বড় হয়ে গেছে। ও জানে কীভাবে নিজের দেখভাল করতে হয়।'

মার্গারেটের চোখ অশ্রুতে পূর্ণ হলো। *কেউ নিশ্চয় জেমির কোনো ক্ষতি করবে না। করবে কি?*

মিসেস টেলি মার্গারেটের কোল থেকে তুলে নিল কেটকে।

'আপনি একটু ঘুমাবার চেষ্টা করুন।'

সে বাচ্চাকে নিয়ে নার্সারিতে গেল, শুইয়ে দিল দোলনায়। কেট তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

'তুমিও ঘুমাও, ছোট্ট মেয়ে।'

দরজা বন্ধ করে চলে গেল মিসেস টেলি।

মাঝরাতে বেডরুমের জানালা খুলে গেল নিঃশব্দে, একটি লোক ঢুকল ঘরে। হেঁটে এল দোলনার সামনে, কেটের মুখের ওপর একটি ব্ল্যাংকেট রেখে ওকে তুলে নিল কোলে।

যেমন দ্রুত এসেছিল, তেমনই দ্রুত চলে গেল বান্ডা।

মিসেস টেলিই প্রথম টের পেল কেট ঘরে নেই। প্রথমে ভাবল রাতে হয়তো মিসেস

ম্যাকগ্রেগর নিজের কাছে নিয়ে গেছে মেয়েকে। সে মার্গারেটের ঘরে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'বাচ্চাটা কই?'

মার্গারেটের মুখ দেখেই সে বুঝে ফেলল কী ঘটেছে।

আরেকটা দিন গেল। ছেলের এখনও কোনো খবর নেই। ভীষণ মুষড়ে পড়েছে জেমি। সে ডেভিড ব্ল্যাকওয়েলকে জিজ্ঞেস করল, 'ওর কিছু হয়নি তো?' তার গলা কেঁপে গেল। ডেভিড চেষ্টাকৃত জোর ফোটাল কণ্ঠে। 'নিশ্চয় ওর কিছু হয়নি, মি. ম্যাকগ্রেগর।'

কিন্তু ছোট্ট জেমির যে কিছু একটা হয়েছে সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত। সে জেমি ম্যাক গ্রেগরকে সাবধান করে দিয়েছিল বান্টুরা কোনো কিছু ভোলে না, কাউকে কখনও ক্ষমাও করে না। আর একজন বান্টুকে নিষ্ঠুরভাবে মেরে ফেলা হয়েছে। ডেভিড নিশ্চিত, বান্টুরা যদি ছোট্ট জেমিকে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে, অমানুষিক যন্ত্রণা দিয়ে তাকে তারা হত্যা করেছে। কারণ বান্টুরা নির্মমভাবে প্রতিশোধ নেয়।

বিধস্ত চেহারা নিয়ে ভোরবেলা বাড়ি ফিরল জেমি। সে শহরের লোকজন, সেপাই, ডিগার সবাইকে খোঁজে লাগিয়েছিল। গোটা শহর তন্ন তন্ন করে ছেলেটার সন্ধান চালিয়েছে তারা। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে।

স্টাডিরুমে জেমির জন্য অপেক্ষা করছিল ডেভিড। জেমিকে ঘরে ঢুকতে দেখে সে উঠে দাঁড়াল। 'মি. ম্যাকগ্রেগর, আপনার মেয়েকে কেউ ধরে নিয়ে গেছে।'

জেমি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল, রক্তশূন্য চেহারায় তারপর সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঢুকল নিজের শয়নকক্ষে।

গত আটচল্লিশ ঘণ্টা বিছানার ধারেকাছেও যেতে পারেনি জেমি, বিছানায় বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে গেল। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে বান্ডা। জেমি কথা বলতে যাচ্ছিল, তার মুখে হাত চাপা দিল বান্ডা।

'চুপ!' জেমিকে সে উঠে বসতে দিল।

'আমার ছেলে কোথায়?' চাপা গর্জন ছাড়ল জেমি।

'সে মারা গেছে।'

ঘরটা হঠাৎ বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল।

'আমি দুঃখিত। আমার দেরি হয়ে গিয়েছিল ওদেরকে বাধা দিতে। তোমার লোকেরা বান্টুদের শরীরের রক্ত ঝরিয়েছে। আমার লোকেরা প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে।'

দু'হাতে মুখ ঢাকল জেমি। 'ওহ, মাই গড! ওরা ওর কী করেছে?'

বান্ডার কণ্ঠে সীমাহীন যাতনা। 'ওরা ওকে মরুভূমিতে ফেলে রেখেছিল। আ-আমি ওর লাশ খুঁজে পাই এবং কবর দিই।'

'ওহ্, নো! ওহ্, প্লিজ, নো!'

'আমি ওকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলাম, জেমি।

জেমি মন্থরগতিতে মাথা দোলাল। বান্ডার কথা বিশ্বাস করেছে। তারপর ভোঁতা গলায় বলল, 'আর আমার মেয়েটা?'

'ওরা ওকে অপহরণ করার আগেই আমি নিয়ে যাই। তোমার মেয়ে এখন তার বেডরুমে। ঘুমাচ্ছে। তুমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা পালন করলে ওর কোনো ক্ষতি হবে না।'

মুখ তুলে চাইল জেমি, ঘৃণায় জ্বলজ্বল করছে চোখ।

'আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব। তবে আমার ছেলেকে যারা হত্যা করেছে তাদেরকে আমি ছাড়ব না। আমি এর শোধ নেবই।'

মৃদু গলায় বান্ডা বলল, 'তাহলে আমার গোটা গোষ্ঠীকে তোমার হত্যা করতে হবে, জেমি।'

চলে গেল সে।

এটা তো স্রেফ একটা দুঃস্বপ্ন। তবু শক্ত করে চোখ বুজে আছে মার্গারেট। কারণ সে জানে চোখ মেলে তাকালেই দুঃস্বপ্নটা বাস্তবে পরিণত হবে এবং তার ছেলে মেয়েরা মারা যাবে। তাই সে একটা খেলা খেলছে। সে চোখ বুজে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ছোট্ট জেমির নরম হাতের পরশ পায় এবং জেমি বলে, 'সব ঠিক আছে, মা। এইতো আমরা এখানে আমাদের এখন কোনো ভয় নেই।

তিনদিন ধরে শয্যাশায়ী মার্গারেট, কারও সঙ্গে কথা বলছে না, কারও সঙ্গে দেখা করতেও চাইছে না। ডা. টিগার এসে যে ওকে দেখে গেছেন জানে মার্গারেট। মাঝরাতে মার্গারেট বিছানায় শুয়ে আছে চোখ বুজে। হঠাৎ তার ছেলের রুম থেকে দুড়ুম করে একটা শব্দ হলো। চোখ মেলে চাইল সে। কান পেতে শুনল। আবার শব্দ হলো। ছোট্ট জেমি ফিরে এসেছে?

মার্গারেট তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল বিছানা থেকে, এক ছুটে করিডোর পার হয়ে তার ছেলের কক্ষের বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজার ওপাশ থেকে জান্তব একটা আওয়াজ ভেসে আসছে। মার্গারেটের কলজে লাফাতে লাগল ধড়াস ধড়াস। সে ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল দরজা।

তার স্বামী পড়ে আছে মেঝেতে। ব্যথায় বিকৃত মুখ, দুমড়ে মুচড়ে রয়েছে শরীর। একটা চোখ বন্ধ, অপর চোখটি বিকট ভঙ্গিতে কটমট করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কথা বলার চেষ্টা করল জেমি, গলা দিয়ে বেরিয়ে এল জান্তব, জড়ানো গোঙানি।

ফিসফিস করল মার্গারেট। 'ওহ্, জেমি– জেমি!'

ডা. টিগার বললেন, 'খবর খুব খারাপ, মিসেস ম্যাকগ্রেগর। আপনার স্বামীর ভয়ানক স্ট্রোক হয়েছে। বেঁচে থাকার সম্ভাবনা মাত্র পঞ্চাশ ভাগ তবে বেঁচে থাকলেও

তিনি পরিণত হবেন একটা ভেজিটেবলে। সেবা শুশ্রুষা ও সুচিকিৎসার জন্য ওনাকে ভালো কোনো প্রাইভেট স্যানাটারিয়ানে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।'

'না।'

বিস্মিত হয়ে তাকালেন তিনি মার্গারেটের দিকে। 'না.. কেন?'

'আমি ওকে কোনো হাসপাতালে পাঠাব না। আমি চাই ও আমার কাছেই থাকবে।'

একটু ভেবে ডাক্তার বললেন, 'ঠিক আছে। আপনার একজন নার্সের প্রয়োজন হবে। আমি–'

'আমার কোন নার্সের প্রয়োজন হবে না। আমি একাই জেমির সেবা-যত্ন করতে পারব।'

মাথা নাড়লেন ডা. টিগার। 'তা সম্ভব নয়, মিসেস ম্যাকগ্রেগর। আপনি জানেন না আপনাকে কীসের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। আপনার স্বামী এখন আর সচল মানব নন। তিনি সম্পূর্ণ চলৎশক্তিহীন একজন মানুষ এবং যতদিন বেঁচে রইবেন এরকম অবস্থাতেই থাকবেন।'

মার্গারেট বলল, 'আমি ওর সেবা-শুশ্রূষা করব।'

অবশেষে জেমিকে একান্তভাবে নিজের করে পাবে সে।

তেইশ

অসুস্থ হওয়ার পরে আর মাত্র এক বছর বেঁচে ছিল জেমি ম্যাক গ্রেগর। ওই একটা মাস ছিল মার্গারেটের জীবনের সবচেয়ে সুখের দিন। জেমি ছিল সম্পূর্ণ অসহায়। কথা বলতে পারে না, নড়াচড়া করতে পারে না। মার্গারেট তার স্বামীর সবরকম সেবা-শুশ্রূষা করছে। রাতদিন তার পাশে জেগে থাকে। দিনের বেলা সে জেমিকে হুইলচেয়ারে বসিয়ে সেলাই ঘরে নিয়ে আসে। বসে বসে সেলাই করে আর কথা বলে জেমির সঙ্গে। সাংসারিক ছোটখাট ঝুটঝামেলা নিয়ে কথা বলত যেসব সমস্যার কথা কোনোদিন শোনার সময় ছিল না জেমির। বলে ছোট্ট কেট কীভাবে বড় হয়ে উঠছে। রাতের বেলা সে জেমির কংকালসার শরীরটাকে কোলে তুলে বেডরুমে নিয়ে যায়, শুইয়ে দেয় নিজের বিছানায়। পাশে শুয়ে জেমিকে গল্প বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ে মার্গারেট।

ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল খুব ভালোভাবে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেড। মাঝে মাঝেই সে বাড়িতে আসে মার্গারেটকে দিয়ে কাগজপত্র সই করিয়ে নিতে। হুইল চেয়ারে বসা নির্জীব, অসহায় জেমিকে দেখে দুঃখে তার বুক ফেটে যায়। *আমার আজকের যা কিছু অর্জন সবই তো এ মানুষটার জন্য,* ভাবে ডেভিড।

'তুমি খুব ভালো একজন মানুষকে বাছাই করেছ, জেমি,' মার্গারেট বলে তার স্বামীকে। সেলাইয়ের জিনিসপত্র পাশে রেখে সে হাসে। 'ও তোমার কথা আমাকে মনে করিয়ে দেয়। তবে তোমার মতো বুদ্ধিমান নিশ্চয় কেউ নয়। কোনোদিন তোমার মতো কাউকে পাবোও না। তুমি স্বপ্ন দেখতে কখনও ভয় পেতে না। এখন তোমার সকল স্বপ্ন সফল হয়েছে। কোম্পানি দিনদিন বড় হচ্ছে।' আবার সেলাইয়ের জিনিসপত্র হাতে তুলে নেয় সে। 'কেট সোনা আধো আধো বুলিতে কথা বলতে শুরু করেছে। আজ সকালে শুনলাম ও 'মা' বলে ডাকল...'

জেমি বিস্ফারিত এক চক্ষু মেলে মার্গারেটের কথা শোনে।

'ও তোমার চোখ আর তোমার মুখের গড়ন পেয়েছে। বড় হয়ে খুব সুন্দরী হবে আমার মেয়ে...

পরদিন সকালে মার্গারেট ঘুম থেকে জেগে দেখে মারা গেছে জেমি ম্যাকগ্রেগর। সে তাকে জড়িয়ে ধরল।

'ঘুমাও, আমার প্রিয়, ঘুমাও। তোমাকে সব সময় আমার প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছি, জেমি। হয়তো তুমি তা জানতে। বিদায়, আমার ভালোবাসা।'

মার্গারেট এখন একা। তার স্বামী এবং ছেলে তাকে ছেড়ে চলে গেছে। এখন শুধু আছে সে আর তার মেয়ে। মার্গারেট বেবি রুমে ঢুকল। তাকাল কেটের দিকে। দোলনায় শুয়ে ঘুমাচ্ছে তার মেয়ে। ক্যাথেরিন কেট। নামটা গ্রিক। এর অর্থ পরিচ্ছন্নতা বা বিশুদ্ধতা। এ নাম রাখা হয় সেইন্ট, নান কিংবা রানীদের।

মার্গারেট জোরে বলল, 'তুমি কোনটা হবে, কেট?'

দক্ষিণ আফ্রিকায় সমৃদ্ধি আর উন্নয়নের জোয়ারের পাশাপাশি দ্বন্দ্ব আর লড়াইয়ের অশুভ সংকেতও উঁকি দিচ্ছিল। বোয়ের আর ব্রিটিশদের মধ্যে সংঘাত চলে আসছিল দীর্ঘদিন ধরেই। তবে এর চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটল ১৮৯৯ সালের ১২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার, কেটের সপ্তম জন্মদিনে। ব্রিটিশরা যুদ্ধ ঘোষণা করে বসল বোয়েরদের বিরুদ্ধে। তিনদিন পরে অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট-এ হামলা চালাল তারা। ডেভিড মার্গারেটকে অনুরোধ করল কেটকে নিয়ে যেন দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু দেশ ছাড়তে রাজি হলো না মার্গারেট।

'আমার স্বামী এখানে ঘুমিয়ে আছে,' বলল সে।

ডেভিড বলল, 'আমি বোয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দেব। তোমার একা থাকতে সমস্যা হবে না তো?'

'একদমই না,' বলল মার্গারেট। 'আমি ঠিকঠাক চালিয়ে নেব কোম্পানি।'

পরদিন যুদ্ধে গেল ডেভিড।

ব্রিটিশরা ভেবেছিল খুব দ্রুত এবং সহজেই তারা যুদ্ধে জিতে যাবে। তাই হালকা মেজাজে, ছুটির দিনের আমেজ নিয়ে তারা লড়াই শুরু করেছিল। কিন্তু ক'দিন পরেই তারা ধাক্কা খেল। বোয়েররা তাদের নিজেদের দেশে বসে লড়াই করছে। তারা কঠিন এবং সংকল্পবদ্ধ। প্রথম লড়াইটা হলো মেককিং নামে ছোট একটি গাঁয়ে। ব্রিটিশরা টের পেল বোয়েররা মোটেই হেলাফেলার পাত্র নয়। ইংল্যান্ড থেকে দ্রুত আরও সেনা তলব করা হলো। তারা কিম্বার্লি দখল করল, ভয়ংকর এবং রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পরেই কেবল লেডিস্মিথ শহর নিজেদের কজায় নিতে পারল ব্রিটিশরা। বোয়েরদের কাছে লম্বা পাল্লার কামান ছিল। ফলে এদেরকে প্রতিহত করতে ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ থেকে লম্বা পাল্লার কামান নিয়ে আসা হলো।

ক্লিপড্রিফটে বসে যুদ্ধের সমস্ত খবরাখবরই পাচ্ছিল মার্গারেট। তার মধ্যে কিছু গুজব, কিছু সত্যি কথা। একদিন সকালে মার্গারেটের এক কর্মচারী ছুটতে ছুটতে ঢুকল তার অফিসে। বলল, 'শুনলাম ব্রিটিশরা ক্লিপড্রিফটে হামলা করতে এগিয়ে আসছে। আমাদের সবাইকে ওরা হত্যা করবে।'

'বোকার মতো কথা বোলো না। ওরা আমাদের কেশাগ্র স্পর্শ করার সাহস পাবে না।'

পাঁচ ঘণ্টা পরে বন্দী হলো মার্গারেট।

মার্গারেট এবং কেটকে পাঠিয়ে দেয়া হলো পার্ডিবার্গে।

গোটা দক্ষিণ আফ্রিকা জুড়ে ছিটিয়ে থাকা শতাধিক প্রিজন ক্যাম্পের এটি একটি। বন্দীদের রাখা হলো প্রকাণ্ড খোলা মাঠে, মাঠের চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া, সেখানে নিয়মিত টহল দিচ্ছে সশস্ত্র ব্রিটিশ সৈনিকরা। এখানকার নোংরা পরিবেশ কহতব্য নয়।

মার্গারেট কেটকে কোলে নিয়ে বলল, 'চিন্তা কোরো না, সোনা। তোমার কিছু হবে না।'

তবে কথাটা ওদের দু'জনের কেউই বিশ্বাস করল না। প্রতিটি দিন হাজির হলো আতংক নিয়ে। ওরা দেখল মহামারী জ্বরে দিন দিন ওদের চারপাশে বন্দী মৃত্যুর হার বেড়েই চলেছে। আহত বা রোগীদের জন্য কোনো ডাক্তার কিংবা ওষুধ নেই, খাদ্যাভাব প্রকট। এ দুঃস্বপ্নের কাল চলল টানা তিন বছর। তীব্র অসহায়বোধ করছিল মার্গারেট এবং কেট। তাদের বাঁচামরা পুরোটাই নির্ভর করছে ওদের আটককারীদের ওপর। মহা আতংকে দিন কাটছিল কেটের, দেখছিল তার চারপাশের বাচ্চারা অকাতরে প্রাণ হারাচ্ছে। ভয় পাচ্ছিল ভেবে, হয়তো পরবর্তী পালা তার। মা কিংবা নিজেকে রক্ষা করার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা তার নেই। তবে এ দুর্দশা থেকে সে একটা দারুণ শিক্ষা পেয়েছে যার কথা ভুলবে না কোনোদিন। তা হলো *ক্ষমতা, প্রভাব, প্রতিপত্তি*। তোমার ক্ষমতা থাকলে, প্রভাব থাকলে খাবারের অভাব হবে না তোমার। পাবে পর্যাপ্ত ওষুধপত্র। পাবে স্বাধীনতা। চারপাশে অগণিত মৃত্যু দেখে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল কেট *একদিন আমারও ক্ষমতা হবে। তখন কেউ আমার সঙ্গে এরকম আচরণ করতে পারবে না।*

ভয়ংকর যুদ্ধ চলল দীর্ঘ তিন বছর। তবে প্রবল প্রতিপত্তিশীল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত টিকতে পারল না বোয়েররা। ১৯০২ সালে আত্মসমর্পণ করল তারা। পঞ্চাশ হাজার বোয়ের যুদ্ধ করছিল, এর মধ্যে চৌত্রিশ হাজার সৈন্য, নারী এবং শিশু প্রাণ হারিয়েছে। এর মধ্যে আটাশ হাজারই মারা গেছে ব্রিটিশ বন্দীশিবিরে।

বন্দী শিবিরের ফটক যেদিন খুলে দেয়া হলো, মার্গারেট এবং কেট ফিরে এল ক্লিপড্রিফটে। কিছুদিন পরে, এক রোববার আবির্ভূত হলো ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল। তিন বছরের নারকীয় যুদ্ধের পুরো সময়টাই সে দুশ্চিন্তা করেছে মার্গারেট আর কেটকে নিয়ে, ওরা বেঁচে আছে কিনা। ওদেরকে সুস্থ দেখে আনন্দে পূর্ণ হলো ডেভিডের অন্তর।

'তোমাদেরকে আমি নিরাপত্তা দিতে পারিনি বলে খুবই দুঃখিত,' মার্গারেটকে বলল ডেভিড।

'যা গেছে গেছে, ডেভিড। এখন আমাদের ভাবতে হবে ভবিষ্যত নিয়ে।'

আর ভবিষ্যত হলো ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেড।

পৃথিবীর জন্য ১৯০০ সালটি ছিল পরিষ্কার একটি স্লেট যাতে লেখা হবে ইতিহাস।

এ এক নতুন যুগ যা সবার জন্য শান্তি আর আশা নিয়ে আসবে। নতুন এক শতকের শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং নিত্য নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার পৃথিবীর চেহারাটাই পাল্টে দিচ্ছিল। স্টিম এবং ইলেকট্রিক অটোমোবাইল কমবাশটন ইঞ্জিন হটিয়ে দিল। আবিষ্কৃত হলো ডুবোজাহাজ এবং উড়োজাহাজ। এ হলো স্ফীতি এবং প্রসারের সময় এবং পরবর্তী ছয় বছরে মার্গারেট ও ডেভিড প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করল।

এই বছরগুলোতে আপন খেয়ালেই যেন বড় হয়ে উঠছিল কেট। তার মা ডেভিডকে নিয়ে কোম্পানি চালাতে এমনই ব্যস্ত মেয়ের দিকে নজর দেয়ার তার সময় কোথায়?

অত্যন্ত দুরন্ত, জিদ্দি, একগুঁয়ে এবং দুর্দান্ত হয়ে উঠছিল সে। একদিন বিকেলে মার্গারেট বিজনেস মিটিং সেরে বাড়ি ফিরেছে, দেখে তার চতুর্দশবর্ষীয়া কন্যারত্নটি ধুলোভরা উঠোনে দুটো ছেলের সঙ্গে হাতাহাতি করছে। দেখে অবিশ্বাসে চোখ বড়বড় হয়ে গেল মার্গারেটের।

'সব্বোনাশ!' হাঁপিয়ে ওঠার মতো শব্দ করল সে। 'ওই মেয়েটাই একদিন ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেড এর মালিক হবে। ঈশ্বর বাঁচাও।'

দ্বিতীয় খণ্ড

কেট ও ডেভিড

১৯০৬-১৯১৪

চব্বিশ

১৯১৪ সাল। গ্রীষ্মের এক উষ্ণ রাত। জোহানেসবার্গে ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেডের নতুন সদর দপ্তরের অফিসে বসে কাজ করছে কেট ম্যাকগ্রেগর, গাড়ির শব্দ শুনতে পেল। হাতের কাগজপত্রগুলো টেবিলে নামিয়ে রাখল সে, হেঁটে গেল জানালার ধারে। উঁকি দিল। পুলিশের দুটো গাড়ি আর সন্দেহভাজনদের পুলিশ হেফাজতে নিয়ে যাওয়া একটি ভ্যানগাড়ি এসে থেমেছে তার ভবনের সামনে। ভুরু কুঁচকে কেট দেখল উর্দিধারী জনা ছয় পুলিশ লাফিয়ে নামল গাড়ি থেকে এবং ভবনের প্রবেশদ্বার ও বহির্গমনের পথ আটকে দাঁড়াল। রাত গভীর বলে রাস্তাঘাট জনশূন্য। জানালার কাচে নিজের ঢেউ খেলানো প্রতিবিম্ব পড়েছে। কেট দেখতে বেশ সুন্দরী, সে তার বাবার হালকা ধূসর চক্ষু আর মায়ের চমৎকার ফিগার পেয়েছে।

অফিসের দরজায় নক হলো। কেট জোরে বলল, 'ভেতরে আসুন।'

খুলে গেল দরজা। দুই ইউনিফর্মধারী ঢুকল ভেতরে। একজনের বুকের ব্যাজ ঘোষণা করছে, সে পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট।

'কী ব্যাপার?' রাগ রাগ গলায় জানতে চাইল কেট।

'এত রাতে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চাইছি, মিস ম্যাকগ্রেগর। আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট কমিনস্কি।

'কী সমস্যা, সুপারিনটেন্ডেন্ট?'

'জেল পালানো এক খুনে আসামী কিছুক্ষণ আগে এ বিল্ডিংয়ে ঢুকে পড়েছে বলে আমরা খবর পেয়েছি।'

আঁতকে উঠল কেট। 'এই বিল্ডিংয়ে?'

'জ্বী, ম্যাম। লোকটা সশস্ত্র এবং বিপজ্জনক।'

ভীত গলায় কেট বলল, 'আপনি তাহলে দয়া করে অফিসের সব জায়গায় খুঁজে দেখুন, সুপারিনটেন্ডেন্ট।'

'আমরা সেজন্যেই এখানে এসেছি, মিস ম্যাকগ্রেগর। সন্দেহজনক কিছু আপনার চোখে পড়েছে কি বা কিছু শুনতে পেয়েছেন?'

'না। তবে আমি এখানে একা আর আমার অফিসে লুকোবার জায়গার অভাব নেই। আপনি আপনার লোকজন দিয়ে আগপাশতলা সার্চ করুন।'

'আমরা ইতিমধ্যে সার্চ শুরু করে দিয়েছি, ম্যাম।'

ঘুরল সুপারিনটেন্ডেন্ট। হলওয়েতে তার লোকজনকে হাঁক ছেড়ে বলল, 'সবাই ছড়িয়ে পড়ো। শুরু করো বেসমেন্ট থেকে। ছাদটাদ কিছুই বাদ দেবে না।' ফিরল সে কেটের দিকে। 'কোনো অফিসে কি তালা মারা আছে?'

'মনে হয় না।' জবাব দিল কেট। 'তবে তালা মারা থাকলেও আমি খুলে দেব।'

সুপারিনটেন্ডেন্ট বুঝতে পারছে খুব ভয় পেয়েছে কেট। এজন্য তাকে দোষ দেয়া যায় না। লোকটি যে কীরকম বেপরোয়া জানলে আরও ভয় পেয়ে যেত মহিলা। 'আমরা ওকে খুঁজে পাবোই,' কেটকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল সে।

যে কাগজপত্রে চোখ বুলাচ্ছিল কেট, তুলে নিল সেগুলো। কিন্তু ওতে মনোযোগ দিতে পারল না। পুলিশ এক অফিস থেকে আরেক অফিসে ছোটাছুটি করছে। হৈচৈয়ের মাঝে কি অফিসিয়াল কাগজ পড়া যায়? *ওকে কি ওরা খুঁজে পাবে?* শিউরে উঠল কেট।

পুলিশের লোকেরা বেসমেন্ট থেকে ছাদ পর্যন্ত কিছুই খোঁজা বাদ দিল না। পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে কমিনস্কি ফিরে এল।

কেট তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওকে খুঁজে পাননি?'

'এখনও পাইনি বটে তবে চিন্তা করবেন না–'

'চিন্তা করছি, সুপারিনটেন্ডেন্ট। জেল পালানো কোনো দাগী আসামী যদি এ ভবনে লুকিয়ে থাকে তাকে খুঁজে বের করাই আপনার কর্তব্য।'

'আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করব, মিস ম্যাকগ্রেগর। আমরা সঙ্গে ট্র্যাকিং কুকুরও নিয়ে এসেছি।'

করিডোর থেকে ভেসে এল ঘেউ ঘেউ আওয়াজ, একটু পরেই একজন হ্যান্ডলার অফিসে ঢুকল দুটো বিরাট আকারের জার্মান শেফার্ড কুকুর নিয়ে। কুকুরগুলোর গলায় শিকল পরানো।

'কুকুরগুলো সারা বিল্ডিং খুঁজে দেখেছে, স্যার। এ অফিসের প্রতিটি আনাচ-কানাচে তারা উঁকি দিয়েছে। কিন্তু পায়নি কিছুই।'

সুপারিনটেন্ডেন্ট তাকাল কেটের দিকে। 'আপনি কি গত এক ঘণ্টার মধ্যে কোনো কাজে অফিসের বাইরে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। ফাইল রুমে কিছু রেকর্ড দেখতে গিয়েছিলাম। আপনার কি ধারনা সে–?' শিউরে উঠল কেট। 'এ অফিসটাও একটু চেক করে দেখুন, প্লিজ।'

সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঙ্গিত করতেই হ্যান্ডলার কুকুরগুলোর শিকল ছেড়ে দিল। হুকুম করল, 'খোঁজো।'

পাগল হয়ে উঠল কুকুর দুটো। একটা বন্ধ দরজায় ছুটে গেল তারা। উন্মাদের মতো ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছে।

'ওহ, মাই গড!' চেঁচিয়ে উঠল কেট।

পকেট থেকে আগ্নেয়াস্ত্র বের করে দুই পুলিশ এগুলো ক্লজিট ডোর অভিমুখে। টান মেরে খুলে ফেলল দরজা। ক্লজিট খালি। একটি কুকুর আরেকটি দরজার কাছে গিয়ে

উত্তেজিতভাবে থাবা দিয়ে খামচাতে লাগল।

'এ দরজার ওপাশে কী?' জিজ্ঞেস করল সুপারিনটেন্ডেন্ট কমিনস্কি।

'ওয়াশরুম।'

দুই পুলিশ দরজার দুই পাশে এসে দাঁড়াল তারপর এক ঝটকায় খুলে ফেলল কপাট। ভেতরে কেউ নেই।'

বোকা বনে গেল হ্যান্ডলার। 'ওরাতো এর আগে কখনও এরকম আচরণ করেনি।' কুকুর দুটো এখন ঘরের চারপাশে ক্ষিপ্তের মতো ছোটাছুটি শুরু করেছে। 'ওরা লোকটার গায়ের গন্ধ পেয়েছে। কিন্তু কোথায় সে?'

কেটের ডেস্কের ড্রয়ারে ছুটে গেল দুই কুকুর। ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল।

'ওই যে আপনার প্রশ্নের জবাব,' হেসে উঠল কেট। 'সে ড্রয়ারে লুকিয়েছে।'

বিব্রত হলো সুপারিনটেন্ডেন্ট কমিনস্কি। 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত, মিস ম্যাকগ্রেগর।' হ্যান্ডলারের দিকে ফিরে খেঁকিয়ে উঠল, 'কুকুরগুলোকে এখান থেকে নিয়ে যাও।'

'আপনারা চলে যাচ্ছেন নাকি?' উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল কেট।

'মিস ম্যাকগ্রেগর, আপনার কোনো ভয় নেই। এখানে আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ। আমার লোকেরা বিল্ডিংয়ের প্রতিটি ইঞ্চি খুঁজে দেখেছে। আমি আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি সে এখানে নেই। মনে হয় গোটা ব্যাপারটাই একটা সাজানো ঘটনা ছিল। ফলস অ্যালার্ম। আমাকে মাফ করবেন।'

ঢোক গিলল কেট, আপনি আমাকে যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।'

কেট জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল পুলিশের গাড়িগুলো চলে যাচ্ছে। শেষ গাড়িটি অদৃশ্য হওয়ার পর সে ডেস্ক ড্রয়ার খুলে রক্তমাখা ক্যানভাসের একজোড়া জুতো বের করল। জুতোজোড়া হাতে নিয়ে সে Private, Authorized Personnel only লেখা একটি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। ঘরে দেয়াল জোড়া একটি আলমারি ছাড়া কিছু নেই। মাল পাঠানোর আগে ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেডের হিরেগুলো এই গোপন ভল্টে রাখা হয়। কেট সেফের কম্বিনেশন মিলিয়ে বিরাট একটি দরজা খুলে ফেলল। ভল্টের দু'পাশে সারি সারি ধাতব সেফ-ডিপোজিট বক্স। সবগুলো বোঝাই হিরেতে। ঘরের মাঝখানে, মেঝেয় অর্ধ সচেতন অবস্থায় পড়ে আছে বান্ডা।

কেট তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে বলল, 'ওরা চলে গেছে।'

ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল বান্ডা, দুর্বল হাসি ফুটল মুখে।

'এই ভল্ট থেকে বেরুবার রাস্তা আমার জানা থাকলে কতবড় ধনী হয়ে যেতাম চিন্তা করো, কেট?'

ওকে যত্নের সঙ্গে সিধে হতে সাহায্য করল কেট। বান্ডার বাহুতে হাত ছোঁয়াতেই

ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল তার চেহারা। রক্তাক্ত বাহুতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল কেট, তবু ব্যান্ডেজ চুঁইয়ে রক্ত পড়তে লাগল।

'জুতো পরতে পারবে?' কেট বান্ডার পা থেকে জুতো জোড়া খুলে নিয়েছিল কুকুরগুলোকে বোকা বানাতে। কারণ সে জানত পুলিশের দল ট্রেইনড কুকুর নিয়ে আসবে। তাই জুতো জোড়া সে ড্রয়ারে লুকিয়ে রেখেছিল।

কেট বলল, 'চলো তোমাকে এখান থেকে বেরুবার ব্যবস্তা করি।'

মাথা নাড়ল বান্ডা, 'আমি একাই যেতে পারব। ওরা যদি জানতে পারে তুমি আমাকে পালাতে সাহায্য করেছ, আমার চেয়ে অনেক বেশি বিপদে পড়ে যাবে।'

'ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

বান্ডা ভল্টের দিকে শেষবার তাকাল।

'তোমার কোনো হিরে লাগবে?' জিজ্ঞেস করল কেট। 'যা লাগে নিয়ে নাও।'

কেটের দিকে তাকাল বান্ডা। মেয়েটির চেহারা সিরিয়াস। 'তোমার বাবাও একই প্রস্তাব দিয়েছিল আমাকে, অনেকদিন আগে।'

হাসল কেট। 'জানি আমি।'

'আমার টাকার দরকার নেই। শুধু কিছুদিনের জন্য শহরের বাইরে থাকলে হবে।'

'কীভাবে জোহানেসবার্গ থেকে বেরুবে ভেবেছ কিছু?'

'একটা কোনো রাস্তা ঠিক বের করে ফেলব।'

'আমার কথা শোনো। পুলিশ রোডব্লক দিয়েছে। শহর থেকে বেরুনোর সমস্ত রাস্তায় পাহারা বসানো হবে। তুমি একা একা কিছুতেই পুলিশের চোখ ফাঁকি দিতে পারবে না।'

একগুঁয়ে স্বরে বান্ডা বলল, 'তুমি যথেষ্ট করেছ।' অনেক কষ্টে জুতো পরল সে। ভয়ানক বিধ্বস্ত চেহারা। গায়ে রক্তমাখা শার্ট এবং জ্যাকেট। তার মুখে বলিরেখা পড়েছে, চুল সাদা, তবে কেটের চোখে সে এখনও আগের মতোই সুদর্শন।

'বান্ডা, ওরা তোমাকে ধরতে পারলে খুন করে ফেলবে,' মৃদু গলায় বলল কেট। 'তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছ।'

সে জানে রোডব্লক সম্পর্কে যা বলেছে তা সত্যি। জোহানেসবার্গের প্রতিটি বহির্গমন পথে পাহারা দেবে পুলিশ পেট্রল। বান্ডাকে ধরার ব্যাপারে টপ প্রায়োরিটি ঘোষণা করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ তাকে জীবিত অথবা মৃত হিসেবে কব্জা করার হুকুম দিয়েছে। রেলরোড স্টেশন এবং রাস্তায় থাকবে প্রহরা।

'মনে হচ্ছে তোমার বাবার চেয়ে তোমার প্ল্যানটা বেশি পোক্ত,' ঠাট্টা করল বান্ডা। তার কণ্ঠস্বর দুর্বল শোনাল। ঈশ্বর জানে বেচারার শরীর থেকে কতটা রক্ত ঝরেছে।

'ফাজলামো রাখো। কথা বোলো না। কথা বললে শক্তি ক্ষয় হবে। সবকিছু স্রেফ আমার ওপর ছেড়ে দাও।' কণ্ঠে আত্মবিশ্বাসের সুর ফোটাল কেট। যদিও অতটা আত্মবিশ্বাস তার নেই। বান্ডার জীবন এখন তার হাতে। ওর কিছু হলে সে তা সইতে

পারবে না। আবার ভাবল, ইস, ডেভিড যদি এখন এখানে থাকত! যাকগে, ডেভিড নেই তো কী হয়েছে সে একাই ম্যানেজ করতে পারবে।

'আমি গলিতে আমার গাড়ি নিয়ে আসছি,' বলল কেট। আমাকে দশ মিনিট সময় দাও। তারপর বেরিয়ে এসো। আমি গাড়ির পেছনের দরজা খুলে রাখব। ভেতরে ঢুকে মেঝেয় শুয়ে থাকবে। একটা কম্বল পাবে। গা মুড়ি দিতে।'

'কেট, শহর থেকে বেরুনো প্রতিটি গাড়ি ওরা সার্চ করবে। যদি–'

'আমরা গাড়িতে যাব না। সকাল আটটার সময় কেপটাউনের উদ্দেশে একটি ট্রেন ছাড়বে। আমি ওটার সঙ্গে আমার প্রাইভেট কার সংযুক্ত করার হুকুম দিয়েছি।'

'তুমি তোমার প্রাইভেট রেলরোড কারে করে আমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

হাসল বান্ডা। 'তোমরা ম্যাকগ্রেগররা পারোও বটে!'

ত্রিশ মিনিট পরে গাড়ি নিয়ে রেলরোড চত্বরে চলে এল কেট। পেছন দিককার আসনের মেঝেয় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে বান্ডা। শহরের রোডব্লকগুলো পার হতে কোনো সমস্যা হয়নি ওদের, তবে ট্রেন ইয়ার্ডে গাড়ি মোড় নিলে আকস্মিক একটা আলো ঝলসে উঠতে দেখল কেট। অনেকগুলো পুলিশ রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে। চেনা চেনা একটি কাঠামো এগিয়ে এল কেটের দিকে।

'সুপারিনটেন্ডেন্ট কমিনস্কি।'

লোকটিও বেশ অবাক হয়েছে ওকে দেখে। 'মিস ম্যাকগ্রেগর, আপনি এখানে কী করছেন?'

কেট শংকার হাসি ফোটাল মুখে। 'ভাবতে পারেন আমি খুব ভীতু টাইপের মহিলা, সুপারিনটেন্ডেন্ট, তবে সত্যি বলছি, অফিসের ঘটনাটি আমাকে এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছে, ভাবলাম আপনার ওই খুনিটা ধরা না পড়া পর্যন্ত আমার শহরে থাকা উচিত হবে না। নাকি ওর খোঁজ পেয়েছেন?'

'এখনও পাইনি, ম্যাম। তবে পাবো। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে সে এই রেলরোড ইয়ার্ড দিয়েই পালাবার চেষ্টা করবে। যেখানেই যাক ওকে আমরা ধরবই।'

'নিশ্চয় ধরতে পারবেন।'

'আপনি যাচ্ছেন কোথায়?'

'আমার রেলওয়ে কারটা সামনেই আছে। কেপটাউন যাচ্ছি।'

'আমার কোনো লোক দিয়ে দেব সঙ্গে আপনাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে?'

'ওহ্, অনেক ধন্যবাদ, সুপারিনটেন্ডেন্ট, তবে তার প্রয়োজন হবে না। আপনারা আশপাশেই আছেন দেখে এখন একটু স্বস্তি বোধ করছি।'

পাঁচ মিনিট পরে কেট এবং বান্ডা নিরাপদেই প্রবেশ করল প্রাইভেট রেলওয়ে কার-

এ। ভেতরটা ঘুটঘুট্টি অন্ধকার।

বান্ডাকে বিছানায় শুইয়ে দিল কেট। 'সকাল পর্যন্ত তুমি এখানে আরামেই থাকবে। যখন রওনা হব, ওয়াশরুমে লুকিয়ে থেকো।

মাথা ঝাঁকাল বান্ডা। 'ধন্যবাদ।'

জানালার পর্দাগুলো টেনে দিল কেট। 'আমরা কেপটাউনে পৌঁছানোর পরে একজন ডাক্তার দেখাব।'

বান্ডা কেটের চোখে চোখ রাখল। 'আমরা?'

'তুমি নিশ্চয় ভাবছ না আমি তোমাকে একা ছেড়ে দিয়ে বোকার মতো ঘরে বসে থাকব?'

বান্ডা হেসে উঠল। মেয়েটা হয়েছে অবিকল তার বাবার মতো।

পরদিন ভোরে পূর্বাকাশে সূর্য উঠি উঠি করছে, প্রাইভেট রেলরোড কারের সঙ্গে একটি ইঞ্জিন জুড়ে দিয়ে কেপটাউনগামী ট্রেনের পেছনে ওটাকে সংযুক্ত করা হলো।

সকাল ঠিক আটটার সময় স্টেশন ত্যাগ করল ট্রেন। কেট তার লোকদের বলে দিয়েছিল তাকে যেন বিরক্ত করা না হয়। বান্ডার ক্ষতে আবার রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে। কেট নতুন ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। আগেরদিন সন্ধ্যার পর থেকে বান্ডার সঙ্গে আর কথা বলার সুযোগ হয়নি কেটের। তখন তো বান্ডা কেটের অফিসে আধমরা হয়ে পড়েছিল। এখন সে জানতে চাইল, 'কী হয়েছিল সব খুলে বলো, বান্ডা।'

পঁচিশ

বান্ডা তাকাল কেটের দিকে। কোত্থেকে শুরু করব আমি? কীভাবে ওকে সে বোঝাবে ট্রেকবোয়ারদের কথা, যারা বান্টুদের তাদের পূর্বপুরুষদের জমিন থেকে উৎখাত করেছে। ওরাই কি এটা শুরু করেছিল নাকি শুরুটা করেছিলেন ট্রান্সভালের প্রেসিডেন্ট উম পল ক্রুগার যিনি সাউথ আফ্রিকার পার্লামেন্টের বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'আমরা কালোদের ওপর কর্তৃত্ব করব এবং তাদেরকে আমাদের দাস বানিয়ে রাখব... নাকি এর আরম্ভ বিখ্যাত সাম্রাজ্য স্রষ্টা সেসিল রোডসের দ্বারা যার উদ্দেশ্যই ছিল 'শ্বেতাঙ্গদের জন্য আফ্রিকা।' সে কী করে একটিমাত্র বাক্যে তার লোকদের ইতিহাস তুলে ধরবে? একটু ভেবে নিয়ে বান্ডা বলল, 'পুলিশ আমার ছেলেকে হত্যা করেছে।'

তারপর গড়গড় করে বলে যেতে লাগল বান্ডা। বান্ডার বড় ছেলে নটম বেন্টল একটি রাজনৈতিক মিছিলে অংশ নিয়েছিল। পুলিশ ওই মিছিলে হামলা চালায়। কয়েকটি গুলি বর্ষণের ঘটনা ঘটে তারপর শুরু হয়ে যায় দাঙ্গা। গ্রেফতার হয় নটম বেন্টল, পরদিন কারাগারে ফাঁসিতে ঝুলন্ত অবস্থায় তাকে পাওয়া যায়। 'ওরা বলেছিল এটা আত্মহত্যা,' বলল বান্ডা। 'তবে আমি জানি ওরা ওকে হত্যা করেছে।'

'ঈশ্বর, কত কম বয়স ছিল ছেলেটার।'

ফোঁস করে শ্বাস ফেলল কেট। ছেলেটার সঙ্গে একসাথে কত খেলেছে সে, আড্ডা দিয়েছে। খুব সুদর্শন ছিল নটম বেন্টল।

'আমি দুঃখিত, বান্ডা। খুবই দুঃখিত। কিন্তু ওরা তোমার পিছু লেগেছে কেন?'

'আমার ছেলে খুন হওয়ার পরে আমি কালোদেরকে একত্রিত করতে শুরু করি। আমাকে পাল্টা লড়াই করতে হয়েছে, কেট। স্রেফ ঘরে বসে থাকতে পারিনি আমি। পুলিশ আমাকে রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে ঘোষণা করে। আমি যে ডাকাতি করিনি তার মিথ্যা অভিযোগে তারা আমাকে গ্রেফতার করে কুড়ি বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিল। আমরা চারজন মিলে সেল ভেঙ্গে পালাই। একজন গার্ড গুলি খেয়ে মারা যায়। এজন্য তারা আমাদেরকে দোষারোপ করছে। আমি জীবনেও কোনো আগ্নেয়াস্ত্র ছুঁয়ে দেখিনি।'

'আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি,' বলল কেট। 'সবার আগে যে কাজটি করতে হবে তা হলো কোনো নিরাপদ জায়গায় তোমাকে পাঠিয়ে দেয়া।'

'তোমাকে এর মধ্যে জড়িয়ে ফেলার জন্য আমি দুঃখিত।'

'তুমি আমাকে কোনো কিছুর মধ্যে জড়াওনি। তুমি আমার বন্ধু।'

হাসল বান্ডা। 'জানো, প্রথম কবে একটি সাদা মানুষ বলেছিল সে আমার বন্ধু? সে তোমার বাবা। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'তুমি কেপটাউনে আমাকে ট্রেন থেকে নামাবে কী

করে?'

'তুমি তো কেপটাউন যাচ্ছ না।'

'কিন্তু তুমি তো বললে–'

'আমি একজন নারী। আমি যখন তখন আমার মত বদলাতে পারি।'

মাঝরাতে উরচেস্টারে থামল ট্রেন। কেট তার প্রাইভেট রেলরোড কার কেপটাউনগামী ট্রেনের পেছন থেকে বিযুক্ত করল। সরিয়ে নিল অন্য পাশে। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সে বান্ডার ঘরে গেল। বিছানা খালি। চলে গেছে বান্ডা। কেটকে সে আর বিপদের মধ্যে জড়াতে চায় না। কেট প্রার্থনা করল বান্ডা যেন সহি সালামতে থাকে। অবশ্য বান্ডার অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে। ওরা ঠিকই বান্ডাকে লুকিয়ে রাখতে পারবে। *আমি কী করেছি শুনলে ডেভিড নিশ্চয় গর্ববোধ করবে,* ভাবল কেট।

'এরকম নির্বোধের মত কাজ তুমি করতে পার কল্পনাও করিনি!' গর্জে উঠল ডেভিড। কেট জোহানেসবার্গ থেকে ফিরে সব কথা বলার পরে এমন প্রতিক্রিয়া ডেভিডের। 'তুমি শুধু নিজের নিরাপত্তাই বিঘ্নিত করনি, কোম্পানিকেও বিপদে ফেলেছ। পুলিশ যদি এখানে বান্ডাকে পেত তাহলে তারা কী করত, জানো?'

উদ্ধত গলায় জবাব দিল কেট, 'জানি। ওরা ওকে হত্যা করত।'

হতাশ ভঙ্গিতে কপাল চাপড়াল ডেভিড। 'তুমি কি কিছুই বুঝবে না?'

'আমি সবকিছুই বুঝি। বুঝতে পারছি তোমার মধ্যে মানুষের জন্য কোনো দয়ামায়া নেই।' রাগে জ্বলছে কেটের চোখ।

'তুমি এখনও বাচ্চাই রয়ে গেলে।'

ডেভিডকে মারার জন্য হাত তুলল কেট, চট করে ওর হাত ধরে ফেলল ডেভিড। 'কেট, মেজাজটা সামলাও।'

শব্দগুলো প্রতিধ্বনি তুলল কেটের মাথায়। *'কেট, তোমার মেজাজটা সামলাও....*

সে অনেকদিন আগের কথা। তখন কেটের বয়স চার। একটা ছেলে ওকে নিয়ে তামাশা করেছিল বলে তার সঙ্গে হাতাহাতি করছিল কেট। মারামারির মাঝখানে ডেভিড চলে এলে ছেলেটি পালিয়ে গেল। কেট ওকে ধাওয়া করতে চাইলে ডেভিড খপ করে তাকে ধরে ফেলে বলল, 'থামো, কেট। তোমার মেজাজটা সামলাও। ইয়ং লেডিরা হাতাহাতি করে না।'

'আমি ইয়ং লেডি নই,' খেঁকিয়ে উঠল কেট। 'আমাকে ছেড়ে দাও।' ওকে ছেড়ে দিল ডেভিড।

ওর পরনের গোলাপি ফ্রকটা কাদামাটি লেগে নোংরা হয়ে গেছে, ছিঁড়েও গেছে, গালে পড়েছে খামচির দাগ।

'তোমার মা দেখে ফেলার আগে গা-হাত-পা ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নাও,' ডেভিড বলল ওকে।

পলায়নপর ছেলেটির দিকে তাকিয়ে আফসোস করল কেট, 'তুমি আমাকে না ধরলে আজ ওকে আচ্ছা করে পিট্টি দিতাম।'

ডেভিড মিষ্টি মুখখানার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল, 'তা তুমি দিতে পারতে।'

ডেভিডের কথা শুনে খুশি হলো কেট। ডেভিড ওকে কোলে নিয়ে বাড়িতে ঢুকল। ডেভিডের কোলে চড়তে খুব পছন্দ করে কেট। আসলে ডেভিডের সবকিছুই তার পছন্দ। বড়দের মধ্যে একত্রে ডেভিডই তাকে বুঝতে পারে। শহরে থাকলে ডেভিড কেটের সঙ্গেই সময় কাটায়। অবসর সময়ে ডেভিড কেটকে তার বাবা এবং বান্ডার অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শুনিয়েছিল। তারপর থেকে কেটের বায়না অমুক গল্পটা বলতে হবে।

'কীভাবে ওরা ভেলা বানিয়েছিল সেই গল্পটা আবার বলো।'

ডেভিড তাকে গল্পটা বলে।

'হাঙরের গল্পটা বলো... সাগর-কুয়াশার গল্প বলো... সেই দিনটার গল্প বলো যেদিন...

কেটের সঙ্গে তার মায়ের দেখা-সাক্ষাৎ খুব কমই হয়। ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেড পরিচালনায় ভয়ানক ব্যস্ত মার্গারেট। সে এসব কাজ করছে শুধু জেমির জন্য।

মার্গারেট প্রতি রাতে জেমির সঙ্গে কথা বলে, যেভাবে বছরখানেক আগে সে বেঁচে থাকার সময় বলত। 'ডেভিড আমাকে অনেক সাহায্য করছে, জেমি। কেট যখন কোম্পানি চালাবে তখনও ও থাকবে। তোমাকে আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করতে চাই না, কিন্তু মেয়েটাকে নিয়ে যে আমি কী করব বুঝতে পারছি না...'

কেট ভয়ানক জিদ্দি, দুষ্টু আর একগুঁয়ে। সে তার মা কিংবা মিসেস টেলি কাউকেই মানতে চায় না। তারা কেটের জন্য কোনো পোশাক পছন্দ করলে সে ওটা সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দেয়। সে সময় মেনে খাওয়া-দাওয়া করে না। তার যখন মন চায় খায়, যা ইচ্ছে করে তা-ই খায়, তাকে হুমকি-ধামকি কিংবা ঘুষের প্রলোভন দেখিয়ে কোনো লাভ নেই। তাকে জন্মদিনের পার্টিতে দাওয়াত দেয়া হলে সে ওটার বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে। তার কোনো বান্ধবী নেই। ডান্স ক্লাসে যাওয়ার বদলে কিশোর বয়সী ছেলেদের সঙ্গে রাগবি খেলে সময় কাটাতেই তার আনন্দ। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরে দুষ্টামির চূড়ান্ত করল কেট। মাসে অন্তত একবার স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার কাছে মার্গারেটকে যেতে হয় তার কন্যারত্নটির দুষ্টামির জন্য ক্ষমা চাইতে যাতে কেটকে স্কুল থেকে বের করে দেয়া না হয়।

'আমি আপনার মেয়েকে বুঝতে পারি না, মিসেস ম্যাকগ্রেগর,' দীর্ঘশ্বাস ফেলেন হেড মিসট্রেস। 'ওর মাথা খুব সাফ তবে সব কিছুর বিরুদ্ধেই সে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসেছে। আমি জানি না ওকে নিয়ে কী করব।'

জানে না মার্গারেটও।

কেটকে একমাত্র ডেভিডই সামলাতে পারে। 'শুনলাম আজ বিকেলে নাকি এক

জন্মদিনের পার্টিতে তোমার দাওয়াত,' বলল ডেভিড।

'জন্মদিনের পার্টি আমি ঘেন্না করি।'

ডেভিড ওর সামনে হাঁটু মুড়ে বসল। চোখে চোখ রেখে বলল, 'তা আমি জানি, কেট। তবে যে মেয়েটির আজ জন্মদিন তার বাবা আবার আমার বন্ধু। তুমি যদি পার্টিতে না যাও এবং ভদ্র, সভ্য হয়ে না থাকো তাহলে ব্যাপারটা খুবই খারাপ দেখাবে।'

কেট চোখ কুঁচকে বলল, 'সে কি তোমার ভালো বন্ধু?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমি যাব।'

সেদিন পার্টিতে কেট কোনো গন্ডগোল করল না। শান্ত হয়ে রইল।

'জানি না কী করে অসম্ভবকে সম্ভব করলে,' 'ডেভিডকে বলল মার্গারেট। 'এতো স্রেফ জাদু।'

'ওর আসলে আবেগ-উচ্ছ্বাসের মাত্রাটা একটু বেশি,' হাসল ডেভিড। 'এ আবেগ বড় হলে আর থাকবে না। তবে খেয়াল রেখো ওর উৎসাহ উদ্দীপনা যেন কেউ ভেঙে না ফেলে।'

'তোমাকে একটা সত্যি কথা বলি,' গম্ভীর মুখে বলল মার্গারেট। 'বেশিরভাগ সময় ইচ্ছে করে ওর মাথাটাই আমি ভেঙে ফেলি।'

কেটের বয়স যখন দশ, একদিন সে ডেভিডকে বলল, 'আমাকে বান্ডার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও।'

ডেভিড বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকাল। 'তা সম্ভব নয়, কেট। বান্ডার খামারবাড়ি এখান থেকে অনেক দূরে।'

'তুমি আমাকে ওখানে নিয়ে যাবে, ডেভিড, নাকি আমি একাই যাব?'

পরের সপ্তাহে কেটকে নিয়ে বান্ডার খামারে গেল ডেভিড। বেশ অনেকখানি জমি নিয়ে গড়ে উঠেছে বান্ডার ফার্ম। সে মাটিতে গম চাষ করে, জমিনে ঘুরে বেড়ায় তার পোষা ভেড়া আর উটপাখির দল। শুকনো মাটি দিয়ে তৈরি গোলাকার কুটিরে বাস করে বান্ডা। কুটিরের ত্রিভুজাকৃতির ছাদ খড়ে ছাওয়া। বান্ডা তার ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিল। দেখল ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামছে কেট এবং ডেভিড। লম্বা, পাতলা, গম্ভীর মুখের মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'আমি জানি তুমি জেমি ম্যাকগ্রেগরের মেয়ে।'

'এবং আমি জানি তুমি বান্ডা,' গম্ভীর মুখে বলল কেট। 'আমার বাবার জীবন বাঁচানোর জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিতে এসেছি।'

হেসে উঠল বান্ডা। 'কেউ নিশ্চয় তোমাকে বাড়িয়ে বলেছে। এসো। ভেতরে এসো। আমার পরিবারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

বান্ডার বউ বেশ সুন্দরী, নাম নটামি। বান্ডার দুটি ছেলে। নটম বেন্টল, কেটের চেয়ে সাত বছরের বড়। আর ম্যাগেনা, সে ছয় বছরের বড়। নটম বেন্টলের চেহারা হুবহু তার

বাবার মতো। একই রকম সুদর্শন দেখতে।

ছেলে দুটির সঙ্গে সারাটি বিকেল খেলাধুলা করে কাটিয়ে দিল কেট। ডিনার করল ছোট্ট, পরিচ্ছন্ন কিচেনে। কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারটির সঙ্গে একসঙ্গে খানা খেতে অস্বস্তিবোধ করছিল ডেভিড। সে বান্ডাকে শ্রদ্ধা করে তবে সাদা এবং কালোর মধ্যে কোনো সামাজিক আদান প্রদান হতে পারে না, এ ঐতিহ্যেও সে বিশ্বাসী। তাছাড়া বান্ডার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কেও অবগত ডেভিড। জানে বান্ডা জন টেঙ্গো জাভাবুর একজন শিষ্য, তিনি আমূল সামাজিক পরিবর্তনের জন্য লড়াই করছেন। খনির মালিকরা তাদের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী। স্থানীয়দের যথেষ্ট পরিমাণে জোগাড় করতে পারে না বলে সরকার যেসব নেটিভ খনি-শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে না তাদের ওপর দশ শিলিং-এর কর বসিয়ে দিয়েছে। এ নিয়ে গোটা দক্ষিণ আফ্রিকা জুড়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা চলছে।

সন্ধ্যার দিকে ডেভিড বলল, 'এখন রওনা হওয়া দরকার, কেট। অনেক দূরের পথ।'

'আমি এখন যাব না,' কেট ফিরল বান্ডার দিকে। 'সেই হাঙরগুলোর গল্প আমাকে বলো।'

তারপর থেকে যখনই ডেভিড শহরে এসেছে, কেট তাকে বাধ্য করেছে বান্ডার কাছে তাকে নিয়ে যেতে।

বড় হলে কেট ক্রমে শান্ত হয়ে আসবে, দুষ্টুমি কমবে, ডেভিডের এ ভবিষ্যদ্বাণী ফলল না। বরং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে আরও দুরন্ত হয়ে উঠল মেয়েটি। সে তার বয়সী কোনো মেয়ের সঙ্গেই খেলা করতে আগ্রহী নয়। বরং সে উৎসাহ বোধ করে ডেভিডের সঙ্গে খনিতে ঘুরতে যেতে। ডেভিড তাকে শিকারে নিয়ে যায়, মাছ ধরতে যায়, ক্যাম্পিং করে। কেট এসব জিনিস খুব ভালোবাসে। একদিন কেট আর ডেভিড ভ্যাল নদীতে মাছ ধরছে, কেট বিরাট একটি ট্রাউট মাছ বড়শিতে গেঁথে খেলাচ্ছলে তুলে ফেলল। ডেভিড বলল, 'তোমার আসলে ছেলে হয়ে জন্মানো উচিত ছিল।'

বিরক্ত হলো কেট। 'বোকার মতো কথা বোলো না, ডেভিড। ছেলে হয়ে জন্মালে তো আর তোমাকে বিয়ে করতে পারতাম না।'

হেসে উঠল ডেভিড।

'বড় হয়ে আমরা বিয়ে করব।'

'কিন্তু তাতো সম্ভব নয়, কেট। আমি তোমার চেয়ে বাইশ বছরের বড়। তোমার প্রায় বাপের বয়সী। তোমার সঙ্গে একদিন চমৎকার কোনো তরুণের পরিচয় হবে–'

'আমার চমৎকার তরুণের দরকার নেই,' দুষ্টামির গলায় বলল কেট। 'আমি তোমাকে চাই।'

দুষ্টামি করে কথাটা বললেও কেট মন থেকে জানে সে ডেভিড ব্ল্যাকওয়েলকেই বিয়ে করবে। পৃথিবীতে সে-ই তার জীবনের একমাত্র পুরুষ।

ছাব্বিশ

সপ্তাহে একদিন মার্গারেট ডেভিডকে তার বাড়িতে ডিনারের দাওয়াত দেয়। এমনিতে কেট সাধারণত কিচেনে বসে ডিনার খায়, ভৃত্যরা খাবার পরিবেশন করে। এবং ওখানে বসে সে ভব্য আচরণের ধার ধারে না। তবে শুক্রবার রাতে ডেভিড এলে সে ডেভিডের সঙ্গে বড় ডাইনিং রুমে বসে ডিনার করে। ডেভিড সাধারণত একাই আসে তবে কখনও কোনো মহিলা অতিথিকে নিয়ে এলে কেট সঙ্গে সঙ্গে তাকে অপছন্দ করে ফেলে।

ডেভিডকে একা পেলে কেট নিরীহ মুখ করে বলে, 'তোমার সঙ্গে আসা ওই মেয়েটার চুলের স্টাইল যা বাজে!' কিংবা 'ওই ড্রেসটাতে ওই মেয়েটাকে একদমই মানায়নি, তাই না?' অথবা 'ওই মেয়েটা কি ম্যাডাম অ্যাগনেসের বাড়ি থেকে এসেছে?'

কেটের চোদ্দ বছর বয়সে হেড মিস্ট্রেস মার্গারেটকে তলব করলেন। 'আমি একটা নামী স্কুল চালাই, মিসেস ম্যাকগ্রেগর। কিন্তু আপনার কেট খুব বাজে প্রভাব ফেলছে স্কুলের ওপর।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মার্গারেট। 'আবার সে কী করল?'

'সে অন্য বাচ্চাদের অশ্লীল সব শব্দ শেখাচ্ছে,' থমথমে হয়ে আছে প্রধান শিক্ষিকার চেহারা। 'এমন সব শব্দ আমি নিজেও কোনোদিন শুনিনি, মিসেস ম্যাকগ্রেগর। কল্পনাই করতে পারছি না মেয়েটা কোত্থেকে এসব শিখল।'

মার্গারেট জানে কেট কোত্থেকে এসব শিখেছে। রাস্তার বন্ধুদের কাছ থেকে। ওরা বস্তির পোলাপান। *নাহ্, এর একটা বিহিত করতেই হবে, সিদ্ধান্ত নিল সে।*

হেড মিস্ট্রেস বললেন, 'আপনি ওর সঙ্গে কথা বলুন। আমরা ওকে আরেকটা সুযোগ দিতে রাজি আছি। তবে–'

'না, আমি কেটকে অন্য স্কুলে ভর্তি করাব।'

কেটকে অন্য স্কুলে পাঠানোর বুদ্ধি শুনে হাসল ডেভিড। 'ও মোটেই অন্য কোনো স্কুলে ভর্তি হতে চাইবে না।'

'কিন্তু এছাড়া আমার করার কিছু নেই। হেড মিস্ট্রেস এখন কেটের কথা বলার ঢঙ নিয়েও অভিযোগ করছেন। এসব বাজে ভাষা সে শিখেছে ওই প্রসপেক্টরদের কাছ থেকে। সবসময়ই তো দেখছি ওদের আশপাশে ঘুরঘুর করছে আমার মেয়ে। সে ওদের

মতো আচরণ করছে, ওদের মতো দেখতে হয়েছে এবং ওদের মতো গন্ধও ছড়াচ্ছে। সত্যি ডেভিড, আমি ওকে বুঝতেই পারি না। জানি না এরকম আচরণ কেন করছে ও। ও দেখতে ভালো, মাথায় ঘিলু আছে, ও–'

'মনে হয় ওর মাথায় ঘিলুর পরিমাণটা একটু বেশিই।'

'মাথায় ঘিলু বেশি থাক বা কম, ওকে অন্য স্কুলে ভর্তি হতেই হবে।'

সেদিন বিকেলে কেট বাড়ি ফিরলে তাকে খবরটা দিল তার মা।

শুনে তো কেট রেগে কাঁই। 'আমাকে তুমি তাড়িয়ে দিতে চাইছ!'

'অবশ্যই না, সোনা। ভাবলাম তুমি ওখানে গেলে ভালো থাকবে–'

'আমি এখানেই ভালো আছি। এখানে আমার সব বন্ধুবান্ধব আছে। তুমি আমার বন্ধুদের কাছ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছ।'

'তুমি যদি ওসব নোংরা কথা বলার অভ্যাস–'

'ওসব নোংরা কথা নয়। এভাবেই সবাই কথা বলে।'

'কেট, তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করব না। তুমি বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি হচ্ছ, ব্যস।'

'আমি ঠিক আত্মহত্যা করব,' হুমকি দিল কেট।

'ঠিক আছে, ডার্লিং। ওপরতলায় একটা ক্ষুর আছে আর তুমি একটু খুঁজলেই বাড়িতে নানারকম বিষ পেয়ে যাবে।'

চোখ ফেটে জল এল কেটের। 'আমার সঙ্গে এরকম কোরো না, মা।'

মার্গারেট মেয়েকে কাছে টেনে নিল। 'এসবই তোমার ভালোর জন্য করছি, কেট। শীঘ্রি বড় হবে তুমি। তোমার বিয়ের বয়স হবে। কিন্তু যে মেয়ে তোমার মতো নোংরা কথা বলে এবং ছেলেদের মতো ড্রেস পরে সেই মেয়েকে কোনো ছেলে বিয়ে করবে না।'

'কথাটা তুমি ঠিক বলোনি,' নাক সিটকাল কেট। 'ডেভিড করবে।'

'ডেভিড কী করবে?'

'আমাকে বিয়ে করবে।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মার্গারেট। 'আমি মিসেস টেলিকে বলছি তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে দিতে।'

কিশোরীদের জন্য আধডজন ভালো ইংলিশ স্কুল আছে। মার্গারেট কেটের জন্য গ্লুচেস্টারশায়ারের চেল্টেনহাম স্কুলটি বাছাই করল। এখানে নিয়ম-কানুন খুবই কড়া। কয়েক একর জমি নিয়ে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত। চারপাশে ঘিরে রেখেছে দুর্গ প্রাচীর। এ স্কুলে বড়লোকদের সন্তানরাই শুধু পড়াশোনা করার সুযোগ পায়। স্কুলের হেড মিস্ট্রেস মিসেস কিটনের সঙ্গে ডেভিডের ভালো জানাশোনার সুবাদে এখানে কেটকে ভর্তি করতে কোনো বেগ পেতে হলো না।

কোন্ স্কুলে ভর্তি হচ্ছে শোনার পরে রাগে বিস্ফোরিত হলো কেট। 'ওই স্কুলের কথা আমি শুনেছি। খুবই বাজে স্কুল। আমি একটা ইংরেজ পুতুল হয়ে ওখান থেকে ফিরে

আসব। তুমি কি তা-ই চাও?'

'আমি চাই তুমি কিছু ভদ্র-সভ্য আচরণ শিখবে,' বলল মার্গারেট।

'আমার ভদ্র-সভ্য আচরণ শেখার দরকার নেই। আমার মাথায় বুদ্ধি আছে তা-ই যথেষ্ট।

'কোনো পুরুষ প্রথমে কোনো মেয়ের বুদ্ধিমত্তা যাচাই করতে যায় না,' শুকনো গলায় বলল মার্গারেট। 'তাছাড়া তুমি বড় হচ্ছ।'

'আমি বড় হতে চাই না,' চিৎকার দিল কেট। 'তোমরা ল্যাওড়া আমাকে একা থাকতে দিচ্ছ না কেন?'

'ছি! ওই ভাষায় কেউ কথা বলে! তোমাকে আর অশ্লীল কথা বলতে দেব না আমি।'

তারপর একদিন সকালে কেটের রওনা হওয়ার সময় উপস্থিত হলো। ডেভিড ব্যবসার কাজে লন্ডন যাচ্ছিল, মার্গারেট বলল, 'তুমি কি কেটকে একটু স্কুলে পৌঁছে দিতে পারবে? ঈশ্বর জানেন একা একা গেলে মেয়েটা আবার কী ঝামেলা বাধিয়ে বসে।'

'নিশ্চয় পারব,' বলল ডেভিড।

'তুমি।' চেঁচাল কেট। 'তুমি আমার মায়ের মতোই খারাপ। তুমিও আমাকে তাড়াতে পারলে বাঁচো!'

মুচকি হাসল ডেভিড। 'কথাটা ভুল।'

ক্লিপড্রিফট থেকে কেপটাউনে প্রাইভেট রেলওয়ে কার-এ চড়ে গেল ওরা এবং সেখান থেকে জাহাজে সাউদাম্পটন। ভ্রমণে চার সপ্তাহ সময় লাগল। কেট প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও মনে মনে সে যথেষ্টই রোমাঞ্চিত ছিল ডেভিডের সঙ্গে এ ভ্রমণে। *এ যেন এক হানিমুন,* মনে মনে বলল ও, *শুধু পার্থক্য হলো আমরা বিয়ে করিনি। এখনও অন্তত নয়।*

জাহাজে বসে কাজের মধ্যে বেশিরভাগ সময় ডুবে থাকল ডেভিড। ওই সময়টা কাউচে বসে নীরবে তাকে দেখল কেট। সে যে ডেভিডের কাছাকাছি আছে এটাই তাকে মানসিক শান্তি দিচ্ছিল।

একদিন সে ডেভিডকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আমি কি আমার বাবার মতো হয়েছি?'

'অনেকটাই। তোমার বাবা ছিলেন জিদ্দি এবং স্বাধীনচেতা।'

'আমিও কি জিদ্দি এবং স্বাধীনচেতা নারী?'

'তুমি হচ্ছ বখে যাওয়া টাইপের বালিকা। তোমাকে যে বিয়ে করবে তার কপালে অশেষ দুর্গতি রয়েছে।'

মৃদু হাসল কেট। *বেচারি ডেভিড।*

সাগর ভ্রমণের শেষ রাতে ডাইনিং রুমে বসে খেতে খেতে ডেভিড জিজ্ঞেস করল,

'তুমি এমন একরোখা কেন, কেট?'

'আমি একরোখা নাকি?'

'তুমি ভালো করেই জান তুমি কী। তোমার বেচারি মাকে পাগল করে তুলেছ।'

কেট ডেভিডের হাতে হাত রাখল। 'আমি কি তোমাকে পাগল করে তুলেছি?'

লাল হয়ে গেল ডেভিড। 'ফাজলামি বাদ দাও। আমি তোমাকে বুঝতে পারি না।'

'অবশ্যই তুমি আমাকে বুঝতে পার।'

'তুমি তোমার বয়সী মেয়েদের মতো হতে পার না?'

'আমি কারও মতো হতে চাই না।' একটু থেমে কেট যোগ করল, 'আমি বড় না হওয়া পর্যন্ত তুমি কাউকে বিয়ে করবে নাতো, ডেভিড? আমি যত তাড়াতাড়ি পারি বড় হব। শুধু কাউকে যেন তুমি তোমার মন দিও না, প্লিজ।'

কেটের কণ্ঠে এমন এক আকুতি ছিল যা দারুণভাবে স্পর্শ করল ডেভিডকে। সে কেটের হাত নিজের মুঠোয় পুরে বলল, 'কেট, আমি যখন বিয়ে করব, চাইব আমার মেয়েটি যেন অবিকল তোমার মতো হয়।'

ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ল কেট, তার কণ্ঠ প্রতিধ্বনি তুলল গোটা ডাইনিং সেলুনে। 'তুমি ল্যাওড়া জাহান্নামে যাও, ডেভিড ব্ল্যাকওয়েল।' সবাইকে স্তম্ভিত করে দিয়ে সে ঝড় তুলে বেরিয়ে গেল ডাইনিং রুম থেকে।

লন্ডনে তিনদিন ওরা একত্রে রইল। প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করল কেট। লন্ডন শহরে তার খুব ভালো লাগছিল। কত গাড়ি, সুন্দর সুন্দর ড্রেস পরা নারী। ওরা রিজ হোটেলে ডিনার করল, এমনকী নাটক দেখার প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ না থাকলেও শুধু ডেভিডের গা ঘেঁষে কয়েক ঘণ্টা বসে থাকা যাবে এই লোভে কেট গেইটিতে নাটকও দেখতে গেল। পরে স্যাভয়ে সুস্বাদু সাপার সেরে বেরিয়ে আসার সময় কেট মনে মনে বলল, আমরা এখানে আবার আসব, আমি আর ডেভিড।

চেলটেনহ্যামে পৌঁছে ওরা মিসেস কিটনের কাছে গেল।

'কেটকে ভর্তি করার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ,' বলল ডেবিড।

'আমরা ওকে ভর্তি করতে পেরে খুশি। আপনি আমার স্বামীর বন্ধু। আপনার অনুরোধ আমরা রক্ষা না করে পারি?'

ঠিক সে মুহূর্তে কেট বুঝতে পারল তার সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। ডেভিডই আসলে ওকে বাড়ি থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছে তা-ই এতদূরে ভর্তি করেছে।

এমন কষ্ট পেল কেট আর রাগ হলো যে বিদায় বেলায় সম্ভাষণটুকু পর্যন্ত জানাল না ডেভিডকে।

সাতাশ

চেলটেনহ্যাম স্কুল এক কথায় অসহ্য। সব কিছুতেই কড়া নিয়ম-কানুন। মেয়েদের সবাইকে তাদের নিকার পর্যন্ত লম্বা একই রকমের ইউনিফর্ম পরতে হয়। টানা দশ ঘণ্টা চলে স্কুল এবং এর প্রতিটি মিনিট কঠিন নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ। মিসেস কিটন এবং তাঁর কর্মচারীরা শক্ত হাতে শাসন করেন ছাত্রীদের। মেয়েদের এখানে আচরণ, শৃঙ্খলা, আদবকায়দা, ঔচিত্য বা ভব্যতা শিখতে হয় যাতে একদিন তারা তাদের পছন্দের স্বামীদের আকৃষ্ট করতে পারে।

কেট তার মাকে লিখল, 'এ এক কারাগার। এখানকার মেয়েগুলো খুবই উদ্ভট। এরা সারাক্ষণ তাদের পোশাক আশাক আর ছেলেদের নিয়ে বকবক করে। শিক্ষকগুলো একেকটা দানব বিশেষ। ওরা আমাকে এখানে আটকে রাখতে পারবে না। আমি পালাবো।'

কেট তিনবার স্কুল পালাল এবং প্রতিবারই ধরা খেয়ে তাকে স্কুলে ফিরতে হলো। তবে স্কুল পালানোর জন্য তার কোনো লজ্জাবোধ নেই।

সাপ্তাহিক স্টাফ মিটিংয়ে কেটের প্রসঙ্গ তোলা হলো। একজন শিক্ষক বললেন, 'এ মেয়েটিকে কিছুতেই পোষ মানানো যাচ্ছে না। ওকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফেরত পাঠিয়ে দেয়া উচিত।'

মিসেস কিটন বললেন, 'আমি এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে একমত তবে এটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিন। আমরা যদি কেট ম্যাকগ্রেগরকে ডিসিপ্লিন শেখাতে পারি তাহলে যে কাউকে পারব।'

কেটকে রেখে দেয়া হলো স্কুলে।

শিক্ষকরা বিস্মিত হয়ে আবিষ্কার করলেন, কেট স্কুলের খামারটির বিষয়ে বেশ আগ্রহী। খামারে রয়েছে বাগান, মুরগি, গরু, শুয়োর এবং ঘোড়া। কেট সুযোগ পেলেই ওখানে চলে যায় এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা খামারে থাকে। একথা শুনে খুব খুশি হলেন মিসেস কিটন।

'দেখলেন তো,' হেড মিস্ট্রেস বললেন তার স্টাফদেরকে। এ সবই ধৈর্য্যের ব্যাপার। কেট অবশেষে জীবন সম্পর্কে আগ্রহ খুঁজে পেয়েছে। একদিন সে কোনো ভূস্বামীকে বিয়ে করবে এবং তার কাজে অনেক সাহায্য করবে।'

পরদিন সকালে, ফার্মের দায়িত্বে থাকা অস্কার ডেকার ছুটে এল হেড মিস্ট্রেসের সঙ্গে দেখা করতে। 'আপনার এক ছাত্রী,' বলল সে, 'ওই কেট ম্যাকগ্রেগর–তাকে আমার খামারে আসতে দেবেন না।'

'কেন কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস কিটন। 'শুনেছি সে খামারের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী।'

'আগ্রহী তো বটেই কিন্তু কীসে আগ্রহী জানেন? জানোয়ারদের যৌন মিলন দেখে সে।'

'কী!'

'জ্বী। সারাদিন খামারে দাঁড়িয়ে থেকে সে ওই কাজই করে।'

'ব্লাডি হেল!' বললেন মিসেস কিটন।

ডেভিড তাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে সেজন্য ওকে এখনও ক্ষমা করতে পারেনি কেট। তবে ডেভিডকে সাংঘাতিক মিস করছিল সে। *এ আমার নিয়তি যে,* গম্ভীর মুখে ভাবে সে, *যাকে আমি ঘৃণা করি তারই প্রেমে পড়েছি।*

সে শুধু দিন গোনে কতদিন হলো ডেভিডের কাছ থেকে দূরে আছে। ভয় হয় ডেভিড হয়তো উল্টোপাল্টা কিছু করে ফেলবে, কেট এই ফালতু স্কুলে বন্দী ওদিকে ডেভিড হয়তো অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করে ফেলবে! যদি এমন কোনো কাজ করে সে, ভাবে কেট, তাহলে ওদের দু'জনকেই আমি খুন করে ফেলব। না, আমি শুধু মহিলাকে খুন করব। ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করবে, ফাঁসিতে ঝোলাবে এবং আমি যখন ফাঁসিমঞ্চে এগিয়ে যাব তখন ডেভিড বুঝতে পারবে যে সে আমাকে ভালোবাসে। কিন্তু ততক্ষণে তো সব শেষ। আমার কাছে সে ক্ষমা চাইবে। 'হ্যাঁ, ডেভিড, মাই ডার্লিং, তোমাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। তুমি খুব বোকা তাই বুঝতে পারনি তোমার হাতের তালুতে কত বড় ভালোবাসা ছিল। তুমি ওটাকে ছোট্ট পাখির মতো উড়িয়ে দিয়েছ। সেই ছোট্ট পাখিটির এখন ফাঁসি হবে। বিদায়, ডেভিড তবে শেষ মুহূর্তে ফাঁসির দণ্ডাদেশ মওকুফ করবেন আদালত এবং ডেভিড কেটকে তার বুকে জড়িয়ে ধরবে, তাকে নিয়ে যাবে সুন্দর কোনো দেশে যেখানে ল্যাওড়া মার্কা চেলটেনহ্যামের ল্যাওড়া খিচুড়ির চেয়ে অনেক ভালো খাবার পাওয়া যায়।

ডেভিডের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছে কেট। ডেভিড জানিয়েছে সে লন্ডনে আসছে এবং কেটের সঙ্গে দেখা করবে। কেটের কল্পনার ডানা মেলল। উজ্জীবিত হলো আশা। ডেভিডের এ চিঠির হাজারটা গোপন অর্থ থাকতে পারে। *সে কেন ইংল্যান্ডে আসছে? নিশ্চয় কেটের সঙ্গ পাবার জন্য। কেন সে কেটের সঙ্গে দেখা করবে? কারণ অবশেষে ডেভিড বুঝতে পেরেছে সে কেটকে ভালোবাসে ও কেটকে ছেড়ে সে থাকতে পারছিল না। সে কেটকে নিয়ে এই বিশ্রী জায়গাটা থেকে চলে যাবে।* এত আনন্দ

কোথায় রাখে সে? সে ডেভিডকে নিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখতে শুরু করল। ডেভিড যেদিন লন্ডন এল, কেট ক্লাশমেটদের কাছে বিদায় নিতে গেল। 'আমার প্রেমিক আসছে এখান থেকে আমাকে নিয়ে যেতে।'

মেয়েরা অবিশ্বাস নিয়ে তাকাল কেটের দিকে। জর্জিনা ক্রিস্টি শুধু মন্তব্য করল, 'তুমি আবার মিথ্যা কথা বলছ, কেট ম্যাকগ্রেগর।'

'জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড সি। ও খুব লম্বা এবং হ্যান্ডসাম আর আমার জন্য দিওয়ানা।'

ডেভিড ক্লাসে ঢুকে বিস্মিত হয়ে গেল দেখে মেয়েরা সবাই তার দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে। তারা ফিসফিস করছে, খিকখিক হাসছে, ডেভিডের চোখে চোখ পড়তে লজ্জা পেল। মুখ ঘুরিয়ে তাকাল অন্যদিকে।

'ওরা এমনভাব করছে যেন জীবনে কোনো পুরুষ মানুষ দেখেনি,' ডেভিড বলল কেটকে। সন্দেহ নিয়ে তাকাল তার দিকে।

'তুমি ওদেরকে আমার সম্পর্কে কিছু বলেছ নাকি?'

'অবশ্যই না,' অহঙ্কারী গলায় বলল কেট। 'আমি কেন তোমার সম্পর্কে ওদেরকে কিছু বলতে যাব?'

স্কুলের প্রকাণ্ড ডাইনিংরুমে ওরা লাঞ্চ করল। ডেভিড বাড়ির সমস্ত খবরাখবর দিল কেটকে। 'তোমার মা তোমাকে ভালোবাসা জানিয়েছে। গরমের ছুটিতে তোমাকে বাড়িতে আশা করছে সে।'

'মা কেমন আছে?'

'ভালো। খুব খাটাখাটুনি করছে।'

'কোম্পানি কেমন চলছে, ডেভিড?'

কেটের এ প্রশ্নে অবাক হলো ডেভিড। 'কোম্পানি ভালোই চলছে। কেন?'

কারণ, মনে মনে বলল কেট, *একদিন এটা আমার হবে। তুমি আর আমি মিলে কোম্পানি চালাব।*

মুখে বলল, 'জাস্ট কৌতূহল।'

কেটের প্লেটের দিকে তাকাল ডেভিড। 'তুমি তো কিছুই খাওনি।'

খেতে ইচ্ছে করছে না কেটের। সে জাদুর মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছে যে মুহূর্তটিতে ডেভিড বলবে, 'আমার সঙ্গে চলো, কেট। তুমি এখন নারী হয়েছ। তোমাকে আমি চাই। আমরা বিয়ে করব।'

ডেজার্ট এল। ডেভিড খেল। কফি এল। পান করল ডেভিড। কিন্তু এখনও সে ওই কথাটা কেন বলছে না?

ডেভিড যখন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি এখন উঠি নইলে মিস করব ট্রেন।' আর তখন আতঙ্ক নিয়ে কেট বুঝতে পারল ডেভিড ওকে নিয়ে যেতে আসেনি। হারামজাদা ওকে এই আবর্জনার মধ্যে ফেলে রেখে যাচ্ছে।

ডেভিড কেটের সঙ্গ বেশ উপভোগ করেছে। মেয়েটা বুদ্ধিমতী এবং রসিক। আগের

মতো দুরন্তপনাও তার মধ্যে অনুপস্থিত। ডেভিড সস্নেহে কেটের হাত চাপড়ে দিল। 'তোমার জন্য কি আমি কিছু করতে পারি, কেট?'

কেট ডেভিডের চোখে চোখ রাখল। মিষ্টি করে বলল, 'হ্যাঁ, ডেভিড পার। আমার মস্ত একটা উপকার করতে পার তুমি। গেট আউট অব মাই ব্লাডি লাইফ!' বলে চেয়ার ছাড়ল কেট, মাথা সটান রেখে, গটগট করে বেরিয়ে গেল ডাইনিং রুম থেকে। তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ডেভিড।

কেটকে খুব মিস করছিল মার্গারেট। মেয়েটা অবাধ্য এবং একরোখা কিন্তু ও ছাড়া তো মার্গারেটের আপনজন কেউ নেই। *ও খুব ভালো মেয়ে হবে,* গর্ব নিয়ে ভাবছিল মার্গারেট। *কিন্তু ওকে তো ভদ্র-সভ্য-নম্র হতে হবে।*

গরমের ছুটিতে বাড়ি এল কেট। 'স্কুল কেমন চলছে?' জানতে চাইল মার্গারেট।

'স্কুল আমি ঘেন্না করি। যেন কতগুলো ন্যানি দিয়ে সবসময় ঘিরে আছি।'

মার্গারেট লক্ষ করছিল তার মেয়েকে। 'অন্য মেয়েরাও কি তোমার মতো ভাবে, কেট?'

'তার আমি কী জানি!' ঠোঁট ওল্টাল কেট। 'ওই স্কুলের মেয়েগুলোকে যদি তুমি দেখতে! সারা জীবন মায়ের আঁচলের তলায় বড় হয়েছে। পুতুপুতু স্বভাবের। ওরা জীবন কী তা-ই জানে না।'

'ইসসিরে,' বলল মার্গারেট। 'তাহলে তো তোমার জন্য খুব মুশকিল হয়ে গেল।'

'ঠাট্টা কোরো না প্লিজ। ওরা কোনোদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় যায়নি। শুধু চিড়িয়াখানাতেই জন্তু জানোয়ার দেখেছে। ওরা হিরে বা সোনার খনি কিছুই দেখেনি।'

'সুযোগ পায়নি বলেই হয়তো দেখেনি।'

কেট বলল, 'ঠিক আছে তোমার কথা মেনে নিলাম। তবে আমি যদি ওদের মতো হয়ে যাই তখন তোমার আফসোসই হবে।'

'তুমি কি ওদের মতো হতে চাইছ?'

দুষ্টু হাসল কেট। 'অবশ্যই না। তুমি কি পাগল হলে?'

আটাশ

বাড়ি ফেরার ঘণ্টাখানেক পরেই ভৃত্যদের সন্তানদের সঙ্গে রাগবি খেলা শুরু করে দিল কেট। মার্গারেট তাকে জানালা দিয়ে দেখতে দেখতে মনে মনে বলল, *খামোকাই টাকা নষ্ট করছি আমি। ও কোনোদিনই বদলাবে না।*

সেদিন রাতে, ডিনারে বসে নিরাসক্ত গলায় কেট জানতে চাইল, 'ডেভিড কি শহরে আছে?'

'ও অস্ট্রেলিয়া গেছে। কাল ফিরবে।'

'শুক্রবার রাতের ডিনারে সে কি আসছে?'

'সম্ভবত,' জবাব দিল মার্গারেট। মেয়েকে দেখতে দেখতে প্রশ্ন করল, 'তুমি ডেভিডকে খুব পছন্দ করো, তাই না?'

কাঁধ ঝাঁকাল কেট। 'করি আর কী।'

'ও আচ্ছা,' বলল মার্গারেট। ডেভিডকে কেট বিয়ে করতে চেয়েছিল মনে পড়তে তার হাসি পেয়ে গেল।

'আমি ওকে ঠিক অপছন্দ করি না, মা। মানুষ হিসেবে ওকে ভালোই লাগে আমার। তবে পুরুষ হিসেবে ওকে সহ্য করতে পারি না।'

শুক্রবার রাতে ডিনারে এসেছে ডেভিড, দরজায় উড়ে গেল কেট তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে। ডেভিডকে জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করল, 'তোমাকে আমি ক্ষমা করে দিয়েছি। ওহ্, তোমাকে যা মিস করছিলাম আমি, ডেভিড! তুমি কি আমাকে মিস করেছ?'

নিজের অজান্তেই ডেভিডের মুখ থেকে বেরিয়ে এল শব্দটি 'করেছি।' বলেই বিস্মিত হয়ে ভাবল, সত্যি তো ওর কথা আমার খুব মনে পড়ছিল! এ মেয়েটিকে সে চোখের সামনে বড় হতে দেখেছে। প্রতিবারই ওকে বিস্ময়কর মনে হয় ডেভিডের কাছে। কেট ষোল ছুঁইছুঁই করছে, তার শরীর জানান দিচ্ছে সে এখন তরুণী। কালো ঝলমলে কেশরাজি পিঠের ওপর ছড়িয়ে আছে মখমলের মতো, ভরাট দেহ এবং ওর মধ্যে এমন একটা যৌনাবেদন রয়েছে যা আগে কখনও লক্ষ্য করেনি ডেভিড। মেয়েটি বেশ সুন্দরী, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। *যে পুরুষ ওকে পাবে সে ধন্য হয়ে যাবে*, ভাবল ডেভিড।

ডিনারে বসে জানতে চাইল ডেভিড, 'স্কুল কেমন চলছে কেট?'

'খুব ভালো,' হড়বড় করে বলতে শুরু করল কেট। 'অনেক কিছু শিখছি। শিক্ষকরা সবাই খুব ভালো। আমার অনেক বন্ধু হয়েছে।'

বিমূঢ় নিস্তব্ধতায় বসে রইল মার্গারেট।

'ডেভিড, তুমি আমাকে একটু খনি দেখিয়ে নিয়ে আসবে?'

'খনি দেখে তোমার ছুটিটা নষ্ট করবে?'

'হ্যাঁ, প্লিজ।'

খনি দেখতে পুরো একটা দিন সময় লাগে আর পুরো দিনটাই সে ডেভিডের সঙ্গে থাকতে পারবে।

'তোমার মা যদি তোমাকে যেতে দেন–'

'প্লিজ, মা!'

'ঠিক আছে, সোনা। ডেভিড সঙ্গে থাকলে আমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই। তুমি নিরাপদেই থাকবে।' মার্গারেট প্রার্থনা করল ডেভিড যেন নিরাপদ থাকে।

ক্লোয়েমফন্টেনের কাছে ক্রুগার-ব্রেন্ট ডায়মন্ড মাইন এক এলাহী কারবার। শতশত মানুষ মাটি খুঁড়ছে, যন্ত্র বসাচ্ছে, পাথর ধুচ্ছে, আলাদা করছে।

'এটা আমাদের কোম্পানির অন্যতম লাভজনক খনি,' ডেভিড বলল কেটকে। ম্যানেজারের অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। অপেক্ষা করছে একটি এসকর্ট এসে ওদেরকে নিচে নিয়ে যাবে। অফিসের এক দেয়ালে শোকেস ভর্তি নানা রঙ আর আকৃতির হিরে।

'প্রতিটি হিরের রয়েছে আলাদা বৈশিষ্ট্য,' ব্যাখ্যা দিল ডেভিড।

'ভ্যাল নদীর তীর থেকে যে হিরেগুলো তুলে আনা হয় সেগুলোর গায়ে পলিমাটি লেগে থাকে। এগুলোর ধার বা কোণগুলো ভাঙা বা খয়ে গেছে।'

ও আগের চেয়ে অনেক সুদর্শন হয়েছে দেখতে, ভাবছিল কেট। ওর ভুরু জোড়া খুব সুন্দর।

'এই পাথরগুলো বিভিন্ন খনি থেকে আসে, তবে চেহারা দেখেই বলা যায় কোন খনি থেকে কোনটা এসেছে। এটা দেখছ? এটার আকার এবং হলদে রঙ দেখে বোঝা যায় এ হিরে এসেছে পারডসপান থেকে। ডি বিয়ার্সের হিরের গা থাকে তেল চকচকে আর আকারে চৌকোনা।'

ও ব্রিলিয়ান্ট। ও সবকিছু জানে।

'এ হিরেটা কিম্বার্লির কারণ এটি অকটাহেডরন। কিম্বার্লির খনির হিরে ধোয়াটে থেকে ধবধবে সাদা রঙের হয়।'

কী জানি ম্যানেজার হয়তো ভাবছে ডেভিড আমার নাগর। ভাবুক গে।

'হিরের রঙ দেখে যাচাই করা হয় তার দাম। স্কেল অনুসারে রঙের নামকরণ করা

হয়। এক থেকে দশ পরিমাপ করা হয় স্কেলে। সবচেয়ে দামী রঙের হিরে হলো নীলচে-সাদা, আর সবচেয়ে কম দামী রঙের হিরে বাদামী।'

ওর গা থেকে কী সুন্দর গন্ধ বেরুচ্ছে। খুব ভালো লাগছে আমার। ওর হাত আর কাঁধের গড়ন দারুণ। ও যদি–

'কেট?'

চমক ভাঙল কেটের, 'বলো, ডেভিড?'

'তুমি কি আমার কথা শুনছ?'

'অবশ্যই শুনছি,' রোষকষায়িত কণ্ঠে বলল কেট। 'তোমার প্রতিটি কথা আমার কানে গেছে।'

ওরা পরবর্তী দুই ঘণ্টা খনির ভেতরে কাটাল। তারপর লাঞ্চ করল। পুরো সময়টা দারুণ উপভোগ করল কেট।

সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরল কেট। মার্গারেট জানতে চাইল, 'কেমন লাগল খনি ভ্রমণ?'

'চমৎকার!'

আধঘণ্টা পরে মার্গারেট দেখল তার মেয়ে তার মালীর ছেলের সঙ্গে উঠোনে কুস্তি লড়ছে।

পরের বছর স্কুল থেকে কেটের নামে যেসব চিঠিপত্র এল সবগুলোতেই তার প্রশংসা। কেটকে হকি টিমের ক্যাপ্টেন বানানো হয়েছে, সে ক্লাস ক্যাপ্টেনও বটে। কেট তার মাকে লিখল সে দু'একজন বান্ধবীকে নিয়ে গরমের ছুটিতে বাড়ি আসতে চায়। শুনে খুশিই হলো মার্গারেট। তার মেয়ের আগমনে বাড়িটি আবার জ্যান্ত হয়ে উঠবে। তার সকল স্বপ্ন এখন কেটকে ঘিরে। *আমি আর জেমি তো অতীত,* ভাবে মার্গারেট। *কেট হলো ভবিষ্যত। আর ওর ভবিষ্যত হবে অসাধারণ সুন্দর!*

কেট ছুটিতে ক্লিপড্রিফটে এলে সকল তরুণ ছেলে তার পেছনে ঘুরঘুর করতে থাকে ডেটিংয়ের আশায়। কিন্তু এদের কারও প্রতি কোনো আগ্রহ নেই কেটের। ডেভিড আমেরিকা গেছে, তার ফেরার অপেক্ষায় অধৈর্য হয়ে দিন গুনছে কেট। ডেভিড বাড়ি এসেছে, তাকে দোরগোড়ায় স্বাগত জানাচ্ছে কেট। তার পরনে সাদা একটা পোশাক, সরু কোমর বেড় দিয়ে রেখেছে কালো ভেলভেটের বেল্ট, সুডৌল ভরা বক্ষজোড়া সদর্পে ঘোষণা করছে তাদের উপস্থিতি। ডেভিড আলিঙ্গন করতে গেলে কেটের উষ্ণ প্রতিক্রিয়া তাকে বিস্মিত করে। কদম হঠে সে তাকায় কেটের দিকে। মেয়েটি হঠাৎ করেই যেন বদলে গেছে। তার চোখে যে ভাব ফুটে উঠেছে তার সংজ্ঞা জানে না ডেভিড। ব্যাপারটা তাকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়।

ডেভিড খুব কমই কেটকে দেখেছে ছেলে পরিবৃষ্ট হয়ে গল্প করতে। ডেভিড ভেবেছে

এর মধ্যে কে হবে সেই ভাগ্যবান যাকে ভালোবাসবে কেট।

স্কুলের শেষ বছরে, এক সন্ধ্যায় আকস্মিক হাজির হলো ডেভিড। সাধারণত সে আসার আগে ফোন করে বা চিঠি লিখে জানিয়ে দেয় তার আগমনবার্তা। এবারে হঠাৎ করেই উপস্থিত।

'ডেভিড! হোয়াট আ ওয়ান্ডারফুল সারপ্রাইজ!' তাকে জড়িয়ে ধরল কেট। 'তোমার বলা উচিত ছিল যে আসছ। তাহলে আমি–'

'কেট, আমি তোমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছি।'

ওকে ছেড়ে দিল কেট, মুখ তুলে তাকাল। 'কোনো সমস্যা?'

'তোমার মা খুব অসুস্থ।'

বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইল কেট এক মুহূর্ত। তারপর বলল, 'আমি এক্ষুনি রেডি হয়ে আসছি।'

মা'র অবস্থা দেখে ভয়ানক ধাক্কা খেল কেট। মাত্র কয়েক মাস আগেও মার্গারেটকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখে গেছে ও। এখন মুখটা ভীষণ শুকনো, শরীর ভয়ানক দুর্বল, সেই দারুণ শক্তির দীপ্তিটা চোখ থেকে একদম উধাও। ক্যান্সার হয়েছে তার। ক্যান্সার শুধু মার্গারেটের শরীরই খেয়ে ফেলছে না, তার আত্মাটাও গ্রাস করছে।

কেট বিছানায় বসে তার মায়ের একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতে। 'ওহ্, মা। আমি খুবই দুঃখিত।'

মার্গারেট মেয়ের হাতে চাপ দিল। 'আমি রেডি, ডার্লিং। তোমার বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম।'

তিনদিন পরে মার্গারেটকে কবর দেয়া হলো। তার মায়ের মৃত্যু ভীষণভাবে নাড়া দিল কেটকে। সে তার বাবা এবং ভাইকে হারিয়েছে। কিন্তু তাদেরকে সে দেখেওনি। শুধু গল্প শুনেছে। তার মা-ই ছিল তার কাছে সব। কেটের বয়স মাত্র আঠারো। এ বয়সেই একদম একা হয়ে গেল সে দুনিয়ায়। এ চিন্তাটা তাকে ভীত করে তুলল।

ডেভিড দেখছিল মায়ের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে না কাঁদার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে কেট। বাড়ি ফিরেই সে অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়ল। 'আমার মা কত ভালো ছিল,' কাঁদতে কাঁদতে বলল সে।' আর আমি তার সঙ্গে কত বিশ্রী ব্যবহার করতাম।'

ওকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল ডেভিড। 'তুমিও খুব ভালো মেয়ে, কেট।'

'আ-আমি আমার মাকে শুধু ঝামেলাই দিয়েছি। আমার মা কেন মরে গেল ডেভিড? ঈশ্বর কেন আমার সঙ্গে এমনটা করল?'

কেঁদে বুকটা হালকা করার সময় ওকে দিল ডেভিড। কেট শান্ত হবার পরে বলল, 'জানি এ মুহূর্তে কথাটা বিশ্বাস করতে চাইবে না তবে একদিন এ বেদনা তোমার চলে

যাবে। তখন শুধু কী থাকবে জানো, কেট? সুখের স্মৃতিগুলো। তোমার মা'র সঙ্গে কাটানো মধুর সব স্মৃতিই তোমার মনে পড়বে।'

'হয়তো বা। তবে এখন ভী-ভীষণ কষ্ট হচ্ছে আমার।'

পরদিন সকালে ডেভিড কেটকে মনে করিয়ে দিল, 'স্কটল্যান্ডে কিন্তু তোমার পরিবার আছেন।'

'না!' কাটা কাটা গলায় বলল কেট। 'তারা আমার পরিবার নয়। তারা শুধুই আমার আত্মীয়-স্বজন।' তার কণ্ঠস্বর তিক্ত শোনাল। 'বাবা যখন এ দেশে আসতে চেয়েছিল বাবাকে নিয়ে তারা তখন হাসাহাসি করেছে। তার মা ছাড়া আর কেউ তাকে সাহায্য করেনি। তার মা মারা গেছেন। না, ওদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

ডেভিড একটু চিন্তা করে বলল, 'তুমি কি স্কুলের পাঠ শেষ করবে?' কেট জবাব দেয়ার আগেই যোগ করল। 'তোমার মা কিন্তু তোমার পড়াশোনা শেষ করতে বলতেন।'

'তাহলে শেষ করব,' মেঝের দিকে আনমনা দৃষ্টি ফেলে বলল কেট।

কেট যথারীতি তার স্কুলের পাঠ শেষ করল এবং গ্রাজুয়েশনের দিন ডেভিড উপস্থিত থাকল।

প্রাইভেট রেলওয়ে কারে জোহানেসবার্গ থেকে ক্লিপড্রিফটে চলেছে ডেভিড ও কেট। ডেভিড বলল, 'তুমি জানো আর কয়েক বছরের মধ্যে এসব কিছুর মালিক হবে তুমি। এই গাড়ি, খনি, কোম্পানি–সবই তোমার। তুমি খুবই ধনবতী। তুমি কোটি কোটি টাকায় তোমার কোম্পানি বিক্রি করে দিতে পার অথবা রেখেও দিতে পার। কী করবে ভাবছ?'

'এ নিয়ে ভেবেছি আমি,' জবাব দিল কেট। 'আমি কোম্পানি বিক্রি করব না। আমি এটা চালিয়ে নেব যতদিন তুমি আমার সঙ্গে আছ।'

মৃদু গলায় ডেভিড বলল, 'আমাকে তোমার যতদিন প্রয়োজন হবে আমি তোমার সঙ্গে থাকব।'

'আমি বিজনেস স্কুলে পড়ব ঠিক করেছি।'

'বিজনেস স্কুল?' বিস্মিত ডেভিড।

'এটা ১৯১০ সাল,' বলল কেট। 'জোহানেসবার্গে বিজনেস স্কুল আছে। ওখানে মেয়েরা ভর্তি হতে পারে।'

'কিন্তু–'

'তুমি জানতে চেয়েছিলে আমি আমার টাকা দিয়ে কী করব,' ডেভিডের চোখে চোখ রাখল কেট। 'আমি টাকা দিয়ে আরও টাকা বানাবো।'

ঊনত্রিশ

বিজনেস স্কুল যেন এক উত্তেজক নতুন অভিযান। চেলটেনহ্যাম স্কুলটি কেটের কাছে খুব একঘেয়ে লাগল। তবু তাকে পড়াশোনা করতে হতোই। কিন্তু বিজনেস স্কুলটি একদম অন্যরকম। প্রতিটি ক্লাসই কেটকে প্রয়োজনীয় কিছু শেখাচ্ছে, এ শিক্ষা কোম্পানি পরিচালনায় তার খুব কাজে লাগবে। তার কোর্সের মধ্যে রয়েছে অ্যাকাউন্টিং, ম্যানেজমেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এবং বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। সপ্তাহে একদিন ডেভিড কেটকে ফোন করে পড়াশোনার খোঁজ নেয়।

'আই লাভ ইট,' কেট বলে তাকে। 'এটা খুবই এক্সাইটিং, ডেভিড।'

একদিন সে এবং ডেভিড একসঙ্গে কাজ করবে, পাশাপাশি বসে, গভীর রাত অবধি শুধু ওরা দু'জন। তারপর এক রাতে ডেভিড ওকে বলবে, 'কেট, ডার্লিং তোমাকে প্রপোজ না করে এতদিন কী ভুলটাই না করেছি। তুমি আমাকে বিয়ে করবে?' পরের মুহূর্তে ডেভিডের বাহুডোরে বাঁধা পড়বে কেট...।

কিন্তু সেদিন পরে আসলেও ক্ষতি নেই। ইতিমধ্যে অনেক কিছু শিখে নিতে হবে কেটকে।

বিজনেস কোর্সের মেয়াদ ছিল দু'বছরের। কেট তার কুড়িতম জন্মদিন উদযাপন করতে ফিরে এল ক্লিপড্রিফটে। ডেভিড ওকে নিয়ে আসতে স্টেশনে গেল। কেট উড়ে এসে পড়ল ডেভিডের বুকে। ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ওহ্, ডেভিড, তোমাকে দেখে কী যে ভাল্লাগছে আমার!

নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ডেভিড, অদ্ভুত স্বরে বলল, 'তোমাকে দেখে আমিও খুব খুশি হয়েছি, কেট।' তার আচরণে কেমন আড়ষ্টতা।

'কোনো সমস্যা?'

'না। মানে যুবতী মেয়েদের যেখানে সেখানে পরপুরুষদের জড়িয়ে ধরতে নেই।'

ওর দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে কেট বলল, 'ও আচ্ছা। ঠিক আছে। তোমাকে আমি আর কখনও এভাবে বিব্রত করব না।'

গাড়িতে বাড়ি ফেরার পথে কেটকে লক্ষ্য করছিল ডেভিড। মেয়েটি আশ্চর্য রূপবতী হয়েছে, চেহারাটা কী নিষ্পাপ! দেখলেই মায়া লাগে।

সোমবার সকালে কেট ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেডে, তার নতুন অফিসে এসে বসল। সে

লক্ষ্য করল কোম্পানির বিভিন্ন শাখার জেনারেল ম্যানেজাররা তাদের নানান সুপারিশ দিলেও ডেভিডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়। সে এর ব্যাখ্যাও দিল কেটকে।

'জেনারেল ম্যানেজাররা কাজ জানে,' বলল ডেভিড। 'প্রতিটি ম্যানেজারই তার নিজের শাখাকে বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু বলে মনে করে। আর সেটাই হওয়া উচিত। তবে কারও না কারও সামগ্রিক একটা দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে এবং তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন্ সুপারিশ বা মতামত কোম্পানির জন্য সর্বাপেক্ষা প্রযোজ্য। চলো, আজ লাঞ্চে একজনের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব।'

ডেভিড কেটকে নিয়ে অফিস সংলগ্ন বৃহদায়তনের ডাইনিং রুমে ঢুকল। তীক্ষ্ণ বাদামী চোখের হালকা পাতলা গড়নের এক তরুণ ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

'এ হলো ব্রাড রজার্স,' বলল ডেভিড। 'ব্রাড, ইনি তোমার নতুন বস কেট ম্যাক গ্রেগর।'

হাত বাড়িয়ে দিল ব্রাড রজার্স। 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মিস ম্যাক গ্রেগর।'

'ব্রাড আমাদের গোপন অস্ত্র,' বলল ডেভিড। 'ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেডের সমস্ত আটঘাট আমার মতোই চেনে সে এবং জানে। আমি যদি কোনদিন চলেও যাই, সমস্যা হবে না তোমার। ব্রাড থাকবে।'

আমি যদি কোনোদিন চলেও যাই, কথাটা আতংকের ঢেউ বইয়ে দিল কেটের দেহে। *ডেভিড কোম্পানি ত্যাগ করতে পারেই না।* লাঞ্চের সময় ডেভিডের কথাই শুধু ভাবছিল কেট, তাই মনে নেই কী খেয়েছে সে মধ্যাহ্নভোজনে।

কেট তার নতুন জীবনটি দারুণভাবে উপভোগ করছিল। প্রতিটি সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িত কোটি কোটি পাউন্ডের জুয়া। বড় ব্যবসা মানে বুদ্ধি, জুয়ো খেলার সাহস আর এ জ্ঞানটুকু থাকা– কখন ছাড়তে হবে আর কখন এগোতে হবে সামনে।

'ব্যবসা একটা খেলা,' কেটকে বলল ডেভিড, 'বিশাল বাজির খেলা, এ খেলার প্রতিযোগীরা প্রত্যেকেই এক্সপার্ট। জিততে চাইলে তোমাকে শিখতে হবে কীভাবে খেলার প্রধান ক্রীড়নক হওয়া যায়।'

আর সেটাই শিখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কেট। ও হতে চায় মাস্টার অব দ্য গেম।

কেট বিরাট একটি বাড়িতে বাস করে। সে বাড়িতে চাকর বাকর ছাড়া অন্য কেউ নেই। প্রতি শুক্রবার রাতে ডেভিডের সঙ্গে নিয়ম করে ডিনার করে কেট। শুক্রবার ছাড়া অন্য কোনো রাতে ডেভিডকে দাওয়াত দিলে সে কোন না কোনো অজুহাতে এড়িয়ে যায় দাওয়াত। কাজের সময় একত্রে কাজ করলেও ডেভিড সব সময়ই একটা দেয়াল তুলে রাখে দু'জনের মাঝে। সে দুর্ভেদ্য দেয়াল ভেদ করার ক্ষমতা কেটের নেই।

একুশতম জন্মদিনে ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেডের সমস্ত শেয়ারের মালিক বনে গেল কেট। এখন থেকে সে অফিশিয়ালি নিয়ন্ত্রণ করবে কোম্পানি। 'চলো, একসঙ্গে ডিনার করে আজকের দিনটি সেলিব্রেট করি।' ডেভিডকে প্রস্তাব দিল সে।

'দুঃখিত, কেট। আমার অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে।'

কেট সে রাতে একা ডিনার করতে করতে ভাবছিল ডেভিড বোবা-কালা-অন্ধ কিছুই নয় তবু কেন সে তার প্রতি কেটের অনুভূতি বুঝতে পারে না। নাহ, এ ব্যাপারে কেটকে কিছু একটা করতেই হবে।

কিছুদিন পরে একটি শিপিং লাইনের ব্যবসার কাজে আমেরিকা এল কেট এবং ব্রাড রজার্স। শিপিং লাইন চুক্তি ঠিকঠাক মতই হলো। দেশে ফেরার আগে কেট ডেট্রয়েট, শিকাগো, পিটার্সবাগ এবং নিউইয়র্কে তাদের কোম্পানির শাখা অফিসগুলোতে ঢুঁ মারল। সে একদিন এক শিল্পীর আমন্ত্রণে মেইন শহরের ডার্ক হারবারে গিয়ে খুবই মুগ্ধ হলো। ডার্ক হারবারের ছোট্ট দ্বীপ আইলসবোরো তাকে দারুণ আকর্ষণ করল। ওখানে শতবর্ষ পুরনো একটি দোতলা বাড়ি কেটকে মোহিত করে ফেলল।

সাগরের তীর ঘেঁষা বাড়িটার চারপাশে ফুলের বাগান। দেখলে মনে হয় রূপকথার বাড়িতে এসেছি। বাড়ির কাচের দেয়াল দিয়ে সমুদ্র দেখা যায়। হলঘরের একপাশে বৃহদায়তনের বলরুম আরেক পাশে কাঠের তৈরি লিভিং রুম, সঙ্গে প্রকাণ্ড একটি ফায়ার প্লেস। আছে একটি লাইব্রেরি, প্রকাণ্ড রান্না ঘরে লোহার চুল্লি, পাইন কাঠের বিরাট একটি ওয়ার্ক টেবিল, বাটলারের প্যাস্ট্রি এবং লন্ড্রি রুম। নিচতলায় ভৃত্যদের জন্য ছ'টি বেডরুম এবং একটি বাথরুম। ওপর তলায় মাস্টার বেডরুম সুইটসহ চারটে অপেক্ষাকৃত ছোট বেডরুম। এ বাড়িতে এক সময় এক জাহাজের ক্যাপ্টেন থাকতেন। এখন কেউ থাকে না। মাত্র পঞ্চাশ হাজার ডলারে প্রাসাদোপম এ বাড়িটি কিনে ফেলল কেট। সে ভাবছিল ডেভিড আর আমার যখন বাচ্চাকাচ্চা হবে তখন এ বাড়ির সবগুলো ঘর আমাদের কাজে আসবে। বাড়ির পরেই বে, সেখানে একটি প্রাইভেট ডক রয়েছে।

বাড়িটি কেনার পরে কেট এর নাম রাখল সিডার হিল হাউজ। ডেভিড বাড়িটি দেখলে যে কী খুশি হবে!

ডেভিডকে নতুন বাড়ি কেনার খবর দিতে তর সইছিল না কেটের। সে আমেরিকা থেকে যেদিন ক্লিপড্রিফট ফিরল, বিকেলেই গেল ডেভিডের অফিসে। ডেভিড ডেস্কে বসে কাজ করছিল। তাকে দেখামাত্র কলজের ভেতরটায় উত্তেজনায় ধুকপুক শুরু হয়ে গেল। ওকে এতটা মিস করছিল কেট, কাজের চাপে বুঝতেই পারে নি।

কেটকে দেখে সিধে হলো ডেভিড। 'কেট! ওয়েলকাম হোম!' ও কিছু বলার আগেই ডেভিড বলল, 'তোমাকেই প্রথম খবরটা জানাচ্ছি। আমি বিয়ে করতে চলেছি।'

ত্রিশ

ঘটনার শুরু ছয় সপ্তাহ আগে। প্রচণ্ড ব্যস্ত এক দিনের মাঝে ডেভিড তার আমেরিকান ডায়মন্ড বায়ার বন্ধু টিম ও'নিলের কাছ থেকে একটি চিঠি পেল। ও'নিল বলছেন তিনি এ মুহূর্তে ক্লিপড্রিফটে রয়েছেন। জানতে চেয়েছেন ডেভিড তাঁকে ডিনারের আমন্ত্রণ জানাতে পারবে কিনা। ট্যুরিস্টদের জন্য নষ্ট করার মতো সময় ডেভিডের নেই তবে টিম ও'নিল একজন গুরুত্বপূর্ণ ক্রেতা এবং ডেভিড তার খদ্দেরদেরকে হতাশ করতে চায় না। দর্শনার্থীকে এন্টারটেইন করানোর জন্য কেটকে সে অনুরোধ করত। কিন্তু কেট এ মুহূর্তে কোম্পানির কাজে ব্রাড রজার্সের সঙ্গে উত্তর আমেরিকায়। বাধ্য হয়ে ডেভিড ও'নিলের হোটেলে ফোন করে তার সঙ্গে সেদিন রাতে ডিনারের আমন্ত্রণ জানাল।

'আমার মেয়ে এসেছে আমার সঙ্গে,' ওকে বললেন ও'নিল। 'আমি ওকে নিয়ে এলে কোনো সমস্যা নেই তো?'

কোন বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে সন্ধ্যা কাটানোর মুড একদমই নেই ডেভিডের। 'একদমই না,' মুখে বলল সে। সিদ্ধান্ত নিল দ্রুত ডিনার শেষ করে বিদায় নেবে।

গ্রান্ড হোটেলের ডাইনিং রুমে ওদের সাক্ষাৎ হলো। ডেভিড এসে দেখে ও'নিল আর তার মেয়ে আগেই পৌঁছে গেছে। ও'নিল সুদর্শন, মাথার চুল ধূসর, ৫২/৫৩ বছরের আইরিশ-আমেরিকান। আর তার মেয়ে জোসেফিন, এর মতো সুন্দর নারী জীবনে দেখেনি ডেভিড। জোসেফিনের বয়স ৩২/৩৩, চোখে ঘোর লাগানোর মতো ফিগার, নরম সোনালি চুল, ঝলকাচ্ছে নীল চোখ। তাকে দেখেই ডেভিডের দম বন্ধ হয়ে এল।

'আ-আমি দুঃখিত, দেরি হয়ে গেছে,' বলল সে। 'শেষ মুহূর্তে একটা কাজ পরে গিয়েছিল।'

মজা করে ডেভিডের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিল জোসেফিন।

'মাঝে মাঝে শেষ মুহূর্তের কাজগুলো সবচেয়ে জরুরি হয়,' সুরেলা কণ্ঠে বলল সে। 'আমার বাবা বলেছেন, আপনি রুই-কাতলা টাইপের একজন মানুষ, মি. ব্ল্যাকওয়েল।'

'আরে না– আর আমাকে শুধু ডেভিড বলে ডাকবেন।'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি। 'সুন্দর নাম।'

ডিনার শেষ হবার আগেই জোসেফিন বিষয়ে কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল ডেভিড। মেয়েটি সুন্দরীই নয়, মাথায়ও অনেক বুদ্ধি, তার রসবোধ বেশ প্রখর এবং খুব সহজেই ডেভিডকে সে আপন করে নিয়েছে তার অস্বস্তি তাড়িয়ে দিয়ে। ডেভিড টের

পেল মেয়েটি তার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তাকে এমন সব প্রশ্ন করছে যেগুলো আগে কখনও কেউ করেনি। ডেভিড জোসেফিনের প্রেমে পড়ে গেল।

'আপনার বাড়ি কোথায়?' টিম ও'নিলকে জিজ্ঞেস করল ডেভিড।

'সানফ্রান্সিসকো।'

'শিঘ্রি ফিরবেন নাকি বাড়ি?' কণ্ঠে নিরাসক্তভাব ফোটানোর চেষ্টা করল ডেভিড।

'আগামী সপ্তাহে যাব।'

ডেভিডের দিকে তাকিয়ে হাসল জোসেফিন। 'ক্লিপড্রিফট শহরটা ভালো লেগে গেলে বাবাকে আরও দু'একদিন থেকে যেতে বলব।'

'আমি আপনাদেরকে শহরটা ভালো লাগানোর ব্যবস্থা করব,' জোসেফিনকে বলল ডেভিড। 'হিরের খনি দেখতে যাবেন?'

'আনন্দের সঙ্গে,' জবাব দিল জোসেফিন।

এক সময় গুরুত্বপূর্ণ ভিজিটরদেরকে নিজেই খনি ঘুরিয়ে দেখাত ডেভিড, বহুদিন হলো দায়িত্বটা সে ছেড়ে দিয়েছে তার অধীনস্তদের ওপর। সে বলল, 'তাহলে চলুন কাল সকালেই যাই?'

কাল সকালে আধ ডজন মিটিং আছে ডেভিডের, কিন্তু সেগুলো হঠাৎ তার কাছে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলল।

রকশ্যাফটে চেপে, ও'নিলদের নিয়ে বারোশ ফুট পাতালে নেমে এল ডেভিড। শ্যাফটটি ছয় ফুট চওড়া, কুড়ি ফুট লম্বা, চারটে কমপার্টমেন্টে বিভক্ত, একটি পাম্পিং এর জন্য, দুটো ব্যবহার করা হয় হিরে মেশানো নীল মাটি তোলার কাজে, একটা ডাবলডেক খাঁচায় মাইনার পাতালে ওঠা-নামা করে।

'একটা ব্যাপার জানতে আমার সবসময়ই খুব ইচ্ছে করে,' বলল জোসেফিন। 'ক্যারেট দিয়ে কেন হিরে পরিমাপ করা হয়?'

'ক্যারব সিড থেকে ক্যারেটের নামকরণ করা হয়েছে,' জবাব দিল ডেভিড। 'এর ওজনের ঘনত্ব দিয়ে ক্যারেট নির্ণয় করা হয়। এক ক্যারেট হলো দুশো মিলিগ্রামের সমান।'

জোসেফিন বলল, 'বাহ্, চমৎকার।'

'কাল যদি আপনারা ফ্রি থাকেন,' বলল ডেভিড, 'তাহলে গ্রামের দিকটা একবার ঘুরিয়ে আনব।'

বাপ কিছু মন্তব্য করার আগেই জোসেফিন বলে উঠল, 'তাহলে তো খুবই ভালো হয়।'

এরপর থেকে প্রতিদিন জোসেফিন এবং তার বাবাকে নানান জায়গা ঘুরিয়ে দেখাতে লাগল ডেভিড। আর প্রতিদিনই আরও গভীরভাবে জোসেফিনের প্রেমে পড়তে লাগল।

কোনো নারী দ্বারা এভাবে আগে কখনও সম্মোহিত হয়নি ডেভিড।

একদিন রাতে ডেভিড এসেছে ও'নিলদেরকে ডিনারে নিয়ে যেতে, টিম ও'নিল বললেন, 'আজ আমি খুব ক্লান্ত, ডেভিড। আমি না গেলে কিছু মনে করবে?' ডেভিড তার আনন্দ গোপন করার চেষ্টা করল।

'না, স্যার।'

জোসেফিন দুষ্টু হেসে বলল, 'আমি আপনাকে এন্টারটেইন করব।'

ডেভিড ওকে নতুন একটি হোটেলের রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেল। প্রচুর খদ্দের থাকা সত্ত্বেও হোটেলটি ডেভিডের পরিচিত বলে সঙ্গে সঙ্গে একটি টেবিল পেয়ে গেল ওরা। তিনজনের একটি বাদক দল আমেরিকান মিউজিক বাজাচ্ছিল।

ডেভিড় জিজ্ঞেস করল, 'আমার সঙ্গে নাচবেন?'

'সানন্দে।'

একটু পরেই ডান্স ফ্লোরে ডেভিডের বাহুলগ্না হয়ে নাচতে লাগল জোসেফিন। পুরো ব্যাপারটাই ম্যাজিকের মতো মনে হচ্ছিল ডেভিডের কাছে। জোসেফিনের নরম দেহ নিজের শরীরের সঙ্গে চেপে রেখেছে সে। জোসেফিনও সাড়া দিচ্ছিল।

'জোসেফিন, আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি।'

ডেভিডের ঠোঁটে চম্পক কলি আঙুল চাপা দিল জোসেফিন। 'প্লিজ, ডেভিড... না...'

'কেন?'

'কারণ আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারব না।'

'তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল জোসেফিন, ঝিকমিক করছে নীল চোখজোড়া। 'আমি তোমার জন্য পাগল হয়ে আছি, মাই ডার্লিং, সে কি তুমি বোঝো না?'

'তাহলে?'

'আমি ক্লিপড্রিফটে থাকতে পারব না। পাগল হয়ে যাব।'

'চেষ্টা করতে পার।'

'আমি জানি চেষ্টা করেও লাভ হবে না। তোমাকে বিয়ে করে আমাকে যদি এখানে থাকতে হয়, আমি মানসিকভাবে খুবই অস্বস্তিতে থাকব। সারাদিন তোমার সঙ্গে চিল্লাচিল্লি করব। সংসারে শান্তি বলে কিছু থাকবে না। তারচেয়ে এখান থেকে বিদায় নেয়াই ভালো।'

'আমি 'বিদায়' শব্দটি উচ্চারণ করতে চাই না।'

ডেভিডের চোখে চোখ রাখল জোসেফিন। ডেভিডের শরীরের সঙ্গে গলে যেতে যেতে বলল, 'ডেভিড, তুমি কি সানফ্রান্সিসকো গিয়ে থাকতে পারবে?'

এ অসম্ভব। 'ওখানে গিয়ে আমি কী করব?'

'কাল সকালে আমাদের সঙ্গে নাশতা করতে এসো। বাবার সঙ্গে কথা বলো।'

টিম ও'নিল বললেন, 'জোসেফিন গত রাতের কথা আমাকে বলেছে। মনে হচ্ছে তোমরা দু'জনে একটা সমস্যায় পড়েছ। তুমি আগ্রহবোধ করলে আমি একটা সমাধান দিতে পারি।'

'আমি যথেষ্ট আগ্রহী, স্যার।'

বাদামী চামড়ায় মোড়া একটি ব্রিফকেস খুলে কিছু ব্লুপ্রিন্ট বের করলেন ও'নিল। 'ফ্রোজেন ফুড বা হিমায়িত খাবার সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা আছে?'

'জ্বী না, নেই।'

'১৮৬৫ সালে প্রথম খাদ্য হিমায়িত করে রাখার প্রক্রিয়া শুরু করে আমেরিকা। সমস্যা হলো, খাবার না পচিয়ে বিরাট দূরত্বে তা সরবরাহ করা। আমাদের রেফ্রিজারেটেড রেলওয়ে কার আছে কিন্তু রেফ্রিজারেটেড ট্রাক নিয়ে এখন পর্যন্ত কেউ কাজ করেনি।' ব্লু প্রিন্টের গায়ে টোকা দিলেন ও'নিল। 'আমি এর ওপর একটি পেটেন্ট পেয়ে গেছি। এ জিনিসটি গোটা খাদ্য শিল্পে বিরাট বিপ্লব ঘটিয়ে ছাড়বে, ডেভিড।'

ব্লু প্রিন্টের দিকে এক ঝলক তাকাল ডেভিড। 'ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার হলো না আমার কাছে।'

'তাতে কিছু আসে যায় না। আমি কোনো টেকনিক্যাল এক্সপার্ট খুঁজছি না। ও আমার অনেক আছে। আমি এমন একজনকে খুঁজছি যে এতে বিনিয়োগ করবে এবং চালিয়ে নেবে ব্যবসা। এটা বুনো হাঁসের পেছনে হাঁটার কোনো বিষয় নয়। আমি এ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বড় বড় ফুড প্রসেসরদের সঙ্গে কথা বলেছি। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কত বড় ব্যবসা হতে যাচ্ছে এটা। আমার তোমার মতো একজন মানুষ দরকার।

'কোম্পানির সদর দপ্তর হবে সানফ্রান্সিসকো,' যোগ করল জোসেফিন।

ডেভিড বসে রইল চুপচাপ। যা শুনেছে হজম করার চেষ্টা করছে। 'এর ওপরে আপনি পেটেন্ট পেয়ে গেছেন?'

'হ্যাঁ। এখন শুধু কাজে নামার অপেক্ষা।'

'আমি ব্লু প্রিন্টগুলো যদি কাউকে দেখাই আপনার আপত্তি নেই তো?'

'একদমই না।'

ডেভিড প্রথমেই টিম ও'নিল সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিল। জানল সানফ্রান্সিসকোয় ও'নিলের যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে। তিনি বার্কলি কলেজের সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের প্রধান ছিলেন এবং সবাই তাঁকে খুব সম্মান করত। হিমায়িত খাবার সম্পর্কে কিছুই জানে না ডেভিড। কিন্তু ওকে জানতে হবে।

'আমি পাঁচ দিনের মধ্যেই ফিরে আসছি, ডার্লিং। তুমি আর তোমার বাবা আমার জন্য অপেক্ষা কোরো।'

'তোমার যতদিন ইচ্ছা সময় নাও,' বলল জোসেফিন। 'তবে আমি তোমাকে খুব

মিস করব।'

'আমিও,' বলল ডেভিড।

ট্রেনে চেপে জোহানেসবার্গ চলে এল ডেভিড। দেখা করল দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে বড় মিট প্যাকিং প্ল্যান্টের মালিক এডোয়ার্ড ব্রডরিকের সঙ্গে।

'একটা বিষয়ে তোমার মতামত জানতে চাই,' তাকে ব্লু প্রিন্টগুলো দিল ডেভিড। 'জানতে চাই এটা দিয়ে কাজ হবে কিনা।'

'ফ্রোজেন ফুড বা ফ্রোজেন ট্রাক সম্পর্কে আমার কোনোই ধারণা নেই। তবে যাদের ধারণা আছে তাদের সঙ্গে আমার চেনাশোনা আছে। তুমি বিকেলে এসো। আমি কয়েকজন এক্সপার্টকে আসতে বলব বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য।'

বিকেল চারটায় প্যাকিং প্ল্যান্টে আবার হাজির হলো ডেভিড। ওর কেমন নার্ভাস লাগছে, অস্বস্তিতে ভুগছে। মিটিংটা করবে কী করবে না তা নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটছিল না। দুই সপ্তাহ আগেও যদি কেউ ওকে ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেড ত্যাগ করার প্রস্তাব দিত, হেসেই খুন হয়ে যেত ডেভিড। এ কোম্পানি তার একটা অংশ। তবে জোসেফিন ও'নিল তার জীবনে এসে সব কেমন গোলমাল করে দিয়েছে।

এডোয়ার্ড ব্রডরিকের সঙ্গে দু'জন লোক আছেন ঘরে।

'ইনি ড. ক্রফোর্ড আর ইনি মি. কাউফম্যান, ডেভিড।'

ওরা শুভেচ্ছা বিনিময় করল। ডেভিড জানতে চাইল, 'আপনারা কি ব্লুপ্রিন্টে চোখ বুলিয়েছেন?'

জবাব দিলেন ড. ক্রফোর্ড। 'নিশ্চয়, মি. ব্ল্যাকওয়েল। খুব ভালোভাবে আমরা ওগুলো পড়েছি।'

গভীর দম নিল ডেভিড, 'তারপর?'

'ইউনাইটেড স্টেটস পেটেন্ট অফিস এর পেটেন্ট অনুমোদন করেছে শুনলাম?'

'ঠিকই শুনেছেন?'

'ওয়েল, মি. ব্ল্যাকওয়েল, যিনি এ পেটেন্টটা পেয়েছেন তিনি অচিরেই বিরাট বড়লোক বনে যাবেন।'

জবাবে মৃদু মাথা দোলাল ডেভিড। ওর ভেতরে টানাপোড়েন চলছে।

'বিখ্যাত সব আবিষ্কারের চেয়ে এটি কোনো অংশে কম নয়– এতই সহজ সরল একটি বিষয়, আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে আরও আগে কেউ এটি নিয়ে কেন ভাবল না।'

কী করবে বুঝতে পারছিল না ডেভিড। মনে ক্ষীণ আশা ছিল টিম ও'নিলের আবিষ্কার অর্থহীন বলে প্রমাণিত হলে জোসেফিনকে দক্ষিণ আফ্রিকায় থেকে যেতে

অনুরোধ করার একটা সুযোগ পাওয়া যেত। কিন্তু ও'নিল যা বলেছেন তা সত্যি। এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে ডেভিডকে।

ক্লিপড্রিফটে ফেরার পথে আর কিছু ভাবতে পারছিল না ও। টিম ও'নিলের প্রস্তাব গ্রহণ করা মানে বর্তমান কোম্পানি ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটি ব্যবসা শুরু করা। সে আমেরিকান তবে আমেরিকা তার কাছে বিদেশ। সে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী একটি প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদে অধিষ্ঠিত। নিজের কাজটাকে ভালোবাসে ডেভিড। জেমি এবং মার্গারেট ম্যাকগ্রেগর কখনও তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি। আর এখন আছে কেট। ওকে শিশুকাল থেকে দেখে এসেছে ডেভিড। ওর চোখের সামনে বড় হয়ে গেল জিদ্দি, একগুঁয়ে মেয়েটা। তার মনে কেটের স্মৃতি যেন এক ছবির অ্যালবাম। পৃষ্ঠাগুলো ওল্টাতে লাগল সে আর দেখতে থাকল চার বছরের কেট, আট বছরের কেট, দশ, চোদ্দ, একুশ– ভালনারেবল, আন প্রেডিক্টেবল...

ক্লিপড্রিফটে পৌঁছে গেল ট্রেন। ততক্ষণে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ডেভিড। ক্রুগার, ব্রেন্ট লিমিটেড ছেড়ে সে কোথাও যাবে না।

গাড়ি নিয়ে সোজা গ্রান্ড হোটেলে চলে এল ডেভিড। ওপরে উঠে ও'নিলদের সুইটের দরজায় টোকা দিতে দরজা খুলে দিল জোসেফিন।

'ডেভিড!'

জোসেফিনকে জড়িয়ে ধরে ক্ষুধার্তের মতো চুমু খেতে শুরু করল ডেভিড।

'ওহ্, ডেভিড। তোমাকে আমি সাংঘাতিক মিস করছিলাম। আর কোনোদিন তোমাকে আমার কাছছাড়া হতে দেব না।'

'তার প্রয়োজনও হবে না,' ধীর গলায় বলল ডেভিড। 'আমি সানফ্রান্সিসকো যাচ্ছি...'

একত্রিশ

প্রচণ্ড উত্তেজনা নিয়ে আমেরিকা থেকে কেটের ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিল ডেভিড। সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে নতুন জীবন শুরু করবে। জোসেফিনকে বিয়ে করার জন্য তার আর তর সইছিল না।

কেট এখন ফিরে এসেছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে ডেভিড বলল, 'আমি বিয়ে করতে চলেছি।'

শব্দগুলো সমুদ্র গর্জনের মতো আছড়ে পড়ল কেটের কানে। মনে হলো অজ্ঞান হয়ে যাবে, ডেস্কের কিনারাটা হাত দিয়ে চেপে না ধরলে ও হয়তো পড়েই যেত। *আমি মরে যেতে চাই,* মনে মনে বলল কেট। *ঈশ্বর আমাকে মেরে ফ্যালো।*

প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির জোরে তবু ঠোঁটে হাসি ফোটাল কেট।

'ওর কথা বলো শুনি, ডেভিড।' কণ্ঠ শান্ত রাখতে পেরেছে বলে গর্ব হলো ওর। 'কে সে?'

'ওর নাম জোসেফিন ও'নিল। ওর বাবার সঙ্গে এখানে ঘুরতে এসেছে। আমি জানি তোমরা দু'জনে খুব ভালো বন্ধু হবে, কেট। ও চমৎকার একটি মেয়ে।'

'তুমি যেহেতু মেয়েটির প্রেমে পড়েছ কাজেই সে চমৎকার না হয়েই যায় না, ডেভিড।'

একটু ইতস্তত করে ডেভিড বলল, 'আরেকটা কথা। আমি কোম্পানি ছেড়ে দিচ্ছি।'

বিল্ডিং ভাঙার মতো হুড়মুড় করে কেটের গায়ে যেন আছড়ে পড়ল কথাগুলো। 'তুমি বিয়ে করছ বলে তোমাকে কোম্পানি ছাড়তে হবে–'

'সে কারণে নয়। জোসেফিনের বাবা সানফ্রান্সিসকোতে নতুন ব্যবসা শুরু করছেন। আমাকে ওদের দরকার।'

'তাহলে– তাহলে তুমি সানফ্রান্সিসকো চলে যাবে।'

'হ্যাঁ। আমার কাজগুলো ব্রাড রজার্সই করতে পারবে। আমরা ওকে সাহায্য করার জন্য খুব ভালো একটা ম্যানেজমেন্ট টিম দেব। কেট, আ-আমি বোঝাতে পারব না কোম্পানি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়াটা আমার জন্য কতটা কঠিন ছিল।'

'সে আমি বুঝতে পারছি, ডেভিড। তুমি– তুমি নিশ্চয় ওকে খুব ভালোবাস। কনের সঙ্গে কবে আমার সাক্ষাৎ হচ্ছে?'

কেট সহজভাবে খবরটা নিয়েছে বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ডেভিড। হেসে বলল,

'আজ রাতেই। যদি তুমি ডিনারের জন্য ফ্রি থাকো।'

'হ্যাঁ, আমি ফ্রি আছি।'

একা হওয়ার আগ পর্যন্ত চোখের জল ধরে রাখল কেট।

ম্যাকগ্রেগর ম্যানসনে চারজনে মিলে ডিনার করল। জোসেফিনকে দেখামাত্র ভেতরে ভেতরে ভয়ে কুঁকড়ে গেল কেট। *ওহ্, গড! ডেভিড এ মেয়ের প্রেমে তো পড়বেই!* চোখ ধাঁধানো রূপসী বোধহয় একেই বলে। জোসেফিনের সামনে নিজেকে হতকুচ্ছিত লাগল কেটের। আর এ মেয়েও যে ডেভিডের প্রেমে পাগল তা তার কথা এবং আচরণেই বোঝা যাচ্ছিল। *ল্যাওড়া!*

ডিনারের সময় টিম ও'নিল তাঁর নতুন কোম্পানি সম্পর্কে বললেন কেটকে।

'শুনে তো ভালোই মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল কেট।

'তবে এটা ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেডের ধারেকাছেও নয়, মিস ম্যাকগ্রেগর। শুরুটা স্বল্প পরিসরে হবে আমাদের। তবে ডেভিডই এটার দেখভাল করবে।'

'ডেভিড দেখভাল করলে আর চিন্তার কিছু নেই।'

সন্ধ্যাটা কাঁটা হয়ে বিঁধে রইল কেটের বুকে। সে এমন একটা মানুষকে হারিয়েছে যে ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেডের জন্য অপরিহার্য ছিল। ইচ্ছে করছিল না তবু জোর করে অতিথিদের সঙ্গে আড্ডা চালিয়ে গেল কেট। অবশ্য ওরা চলে গেলে ওদের সঙ্গে কী কথা বলেছিল বা ওরা কী বলেছিল কিছুই মনে করতে পারছিল না কেট। তার শুধু মনে আছে যতবার জোসেফিন আর ডেভিড চোখাচুখি করেছে কিংবা একে অন্যের হাত স্পর্শ করেছে, ততবার আত্মহত্যা করার ইচ্ছে জেগেছিল কেটের।

হোটেলে ফেরার পথে জোসেফিন ডেভিডকে বলল, 'মেয়েটা তোমার প্রেমে পড়েছে, ডেভিড।'

হাসল ডেভিড। 'কেট? আরে, আমরা স্রেফ বন্ধু। ও সেই পিচ্চিকাল থেকে আমার বন্ধু। তোমাকে ওর খুব পছন্দ হয়েছে।'

মৃদু হাসল জোসেফিন। *পুরুষরা কী বোকা!*

পরদিন সকালে ডেভিডের অফিসে বসে সে আর টিম ও'নিল কথা বলছিল। 'এখানকার কাজকর্ম গুছিয়ে দিতে আমার মাস দুই সময় লাগবে।' বলল ডেভিড। 'আমাদের নতুন কোম্পানি শুরু করার জন্য টাকা কোত্থেকে আসবে তা নিয়ে ভাবছিলাম। বড় কোম্পানিগুলোর কাছে গেলে ওরা আমাদেরকে গিলে ফেলবে এবং শেয়ার দেবে কম। তখন আর কোম্পানি আমাদের কাছে থাকবে না। কাজেই নিজেদেরই অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। হিসেব করে দেখেছি শুরু করতে আশি হাজার ডলার লাগবে। আমার কাছে চল্লিশ হাজার ডলার আছে। আমাদের আরও চল্লিশ হাজার ডলার দরকার।'

'আমার কাছে আছে দশ হাজার ডলার,' বলল টিম ও'নিল। 'আমার এক ভাই পাঁচ হাজার ডলার ধার দেবে বলেছে।'

'তবু পঁচিশ হাজার ডলার কম পড়ে যাচ্ছে,' বলল ডেভিড।

'টাকাটা আমরা কোনো ব্যাংক থেকে লোন নেব।'

'আমরা শীঘ্রি সানফ্রান্সিসকো ফিরছি,' বললেন ও'নিল। 'ওখানে পৌঁছেই তোমার জন্য সব ঠিকঠাক করে ফেলব।'

দিন দুই পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে যাত্রা করল জোসেফিন এবং তার বাবা। কেট ডেভিডকে বলল, 'ওদেরকে প্রাইভেট রেলওয়ে কারে কেপটাউন পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করো।'

'তাহলে তো খুবই ভালো হয়।'

যেদিন সকালে চলে গেল জোসেফিন, বুকটা শূন্য হয়ে গেল ডেভিডের। যেন জীবনের একটা অংশ ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সানফ্রান্সিসকো গিয়ে জোসেফিনের সঙ্গে আবার মিলিত হওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে রইল সে।

কয়েকদিন পরে, এক সকালে কেটের অফিসে শুকনো মুখে ঢুকল ডেভিড। 'আমার চাকরিটা এখনও আছে নাকি গেছে?'

ওর ম্লান চেহারা দেখে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল কেট। 'কী হয়েছে, ডেভিড?'

'আ-আমি,' ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল ডেভিড। 'খুব খারাপ খবর আছে।'

ডেভিডের পাশে এসে দাঁড়াল কেট। 'কী হয়েছে খুলে বলো।'

'আমি আজ টিম ও'নিলের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছি। সে ব্যবসাটা বিক্রি করে দিয়েছে।'

'মানে?'

'মানে যা বললাম তা-ই। তাকে শিকাগোর থ্রি স্টার মিট প্যাকিং কোম্পানি দুই লাখ ডলার এবং সঙ্গে পেটেন্টের রয়্যালিটি দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। প্রস্তাবটা গিলে বসে আছে ও'নিল।'

গলার স্বর কর্কশ শোনাল ডেভিডের। 'কোম্পানি এখন আমাকে ভাড়া করতে চায়। ও'নিল দুঃখপ্রকাশ করেছে কিন্তু অত টাকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার হিম্মত নাকি তার ছিল না।'

কেট অনিসন্ধিৎসু চোখে তাকাল ডেভিডের দিকে। 'আর জোসেফিন? সে কী বলে? সে নিশ্চয় তার বাবার ওপর খুব রেগে আছে।'

'ওরও একটা চিঠি পেয়েছি আমি। আমি সানফ্রান্সিসকো গেলেই ও বিয়ের পিড়িতে বসতে রাজি।'

'কিন্তু তুমি যাচ্ছ না, তাই না?'

'অবশ্যই আমি যাব না।' বিস্ফোরিত হলো ডেভিড। 'কোথায় কোম্পানিটাকে বিরাট বড় করার স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি, সেখানে টাকার লোভে ওরা কোম্পানিটা বিক্রি করে দিল!'

'ডেভিড, 'ওরা' শব্দটা ব্যবহার করা তোমার উচিত হলো না। জোসেফিন হয়তো–'

'জোসেফিন রাজি না থাকলে তার বাবা ওই চুক্তিতে জীবনেও যেত না।'

'আ-আমি বুঝতে পারছি না ডেভিড কী বলব।'

'কিছু বলতে হবে না তোমাকে। আমি আরেকটু হলেই জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করতে যাচ্ছিলাম।'

ডেভিড এরপর থেকে নিজের কাজে আরও বেশি মনোযোগী হয়ে উঠল। মনের কষ্ট ভুলতে এবং ধাক্কাটা সামলাতে। জোসেফিন ও'নিল তাকে অনেকগুলো চিঠি লিখল কিন্তু সবগুলো চিঠির জায়গা হলো আবর্জনার ঝুড়িতে। ওগুলো সে পড়ল না পর্যন্ত। ডেভিডের বেদনা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন কেট সবসময় তার পাশে পাশে রইল বোঝাতে যে কোন প্রয়োজনে কেট তার সঙ্গেই রয়েছে।

টিম ও'নিলের কাছ থেকে চিঠি পাবার পরে ছয়মাস কেটে গেছে। এ সময়ে কেট এবং ডেভিড একসঙ্গে কাজ করল, একত্রে সফর করল, বেশিরভাগ সময় দু'জনে একসঙ্গে রইল। ডেভিডকে খুশি রাখার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই কেটের। সে ডেভিডের পছন্দের ড্রেস পরে, ডেভিড কী কী করলে আনন্দ পেতে পারে সেগুলোর পরিকল্পনা করে, তাকে সর্বদা সুখী রাখতে চায় কেট। কিন্তু ডেভিডের ওপর এসবের যেন কোনো প্রভাবই পড়ছিল না। শেষে ধৈর্য হারিয়ে ফেলল কেট।

সে এবং ডেভিড রিও ডি জেনেরিও এসেছে নতুন একটি খনি দেখতে। হোটেলে ডিনার সেরে কেটের ঘরে গেল দু'জনে ব্যবসায়িক কিছু কাগজপত্র রেডি করতে। কাজ শেষ করতে করতে গভীর হলো রাত। ডেভিড শরীরের দু'পাশে হাত ছড়িয়ে দিয়ে গা মুচড়ে বলল, 'আজ এ পর্যন্তই থাক। এখন ঘুমবো।'

কেট মৃদু গলায় বলল, 'তোমার শোকের কাল কি শেষ হয়নি, ডেভিড?'

অবাক হলো ডেভিড। 'শোকের কাল?'

'জোসেফিন ও'নিলের জন্য আহাজারি।'

'ও আমার কেউ না। আমি তাকে ভুলে গেছি।'

'তাহলে প্রমাণ দেখাও।'

'তুমি আসলে কী বলতে চাইছ বলোতো, কেট?' কাঠখোট্টা গলা ডেভিডের।

রেগে গেল কেট। রাগ তার ডেভিডের কোনো কিছু এতদিনেও বুঝতে না পারার ওপর, ক্রোধ তার এতদিন বেহুদাই সময় নষ্ট করেছে বলে। 'আমি বলতে চাইছি আমি যা চাই তুমি তা করবে– আমাকে চুমু খাও।'

'কী?'

'আরে ল্যাওড়া, ডেভিড! আমি তোমার বস, ড্যাম ইট!' সে ডেভিডের পাশে এসে বসল। 'আমাকে চুমু খাও।' নিজের অধর ডেভিডের ঠোঁটে চেপে ধরল কেট, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল গলা। টের পেল ডেভিড ধস্তাধস্তি করছে, নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইছে। কিন্তু কেট ছাড়ল না ডেভিডকে, আরও জোরে চেপে ধরল, আগ্রাসী চুম্বন করতে লাগল। অবশেষে সাড়া দিল ডেভিড। তার হাত কেটের কিমানো পরা শরীরটা আলিঙ্গন করল। সে চুমু খেল কেটকে।

'কেট...'

কেট ফিসফিস করল ডেভিডের কানে।' আমি ভেবেছিলাম তুমি হয়তো কোনোদিন...'

ছয় সপ্তাহ পরে বিয়ে করল ওরা। ক্লিপড্রিফটের মানুষ এমন মহা ধুমধামের বিয়ের কথা জীবনে শোনেনি, দেখা দূরে থাক। শহরের সবচেয়ে বড় গির্জাটিতে বিয়ে হলো, ভোজের আয়োজন করা হলো টাউন হলে। শহরের সবাই দাওয়াত পেল। পাহাড় সমান খাবার আর বিয়ার, হুইস্কি এবং শ্যাম্পেনের বন্যা বইল। মিউজিশিয়ানরা সারা রাত বাজিয়ে গেল বিয়ের বাজনা। ভোর হবার পরে কেট এবং ডেভিড বিচ্ছিন্ন হল অনুষ্ঠান থেকে।

'আমি বাড়ি যাচ্ছি,' বলল কেট ডেভিডকে।' জিনিসপত্র বাঁধা ছাদা করব। আমাকে একঘণ্টা পরে এসে তুলে নিয়ে যেয়ো।'

ভোরের ধূসর আলোয় প্রকাণ্ড বাড়িটিতে একা প্রবেশ করল কেট। দোতলায় নিজের বেডরুমে চলে এল। দেয়ালে ঝোলানো একটি পেইন্টিংয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। ফ্রেমে চাপ দিতেই ছবিটি পেছন দিকে হঠে গেল। ওখানে আত্মপ্রকাশ করল একটি ওয়াল সেফ। সেফ খুলে একটি চুক্তিপত্র বের করল কেট। চুক্তিতে লেখা শিকাগোর থ্রি স্টার মিট প্যাকিং কোম্পানি কিনে নিয়েছেন মিস কেট ম্যাকগ্রেগর। ওটার পাশে আরেকটি চুক্তিপত্র। ওতে লেখা থ্রি স্টার মিট প্যাকিং কোম্পানি টিম ও'নিলের ফ্রিজিং প্রসেস-এর স্বত্বাধিকার দুই লাখ ডলারে কিনে নিয়েছে। কেট একটু ইতস্তত করল তারপর কাগজগুলো আলমারিতে ঢুকিয়ে তালা মেরে দিল। ডেভিড এখন তার। সবসময়ই তার ছিল। তারা দু'জনে মিলে ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেডকে বিশ্বের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবে।

জেমি এবং মার্গারেট ম্যাক গ্রেগর যেভাবে চেয়েছিল।

তৃতীয় খণ্ড

ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেড

১৯১৪-১৯৪৫

বত্রিশ

ওরা লাইব্রেরিতে বসে কথা বলছে যেখানে ব্রান্ডি পান করতে করতে আলোচনা করতে পছন্দ করত জেমি। ডেভিড বলছিল মধুচন্দ্রিমা করার মতো সময় ওদের হাতে নেই। কিন্তু ওর যুক্তি মানতে রাজি নয় কেট। সে ডেভিডের কোলে চেপে বসে আছে। পাতলা কাপড় ভেদ করে ওর শরীরের উষ্ণতা টের পাচ্ছিল ডেভিড। ওরা দু'জনে মিলে যেসব ডকুমেন্টে চোখ বুলাচ্ছিল সেগুলো এ মুহূর্তে লুটোপুটি খাচ্ছে মেঝেয়। দু'হাত দিয়ে ডেভিডের গলা জড়িয়ে ধরল কেট। আস্তে আস্তে নিতম্ব ঘষছে ডেভিডের গায়ে। ওর আহ্বানে সাড়া দিল ডেভিড। কোল থেকে নেমে পড়ল কেট। খুলে ফেলল ড্রেস। কেটের অপূর্ব শরীর মুগ্ধ হয়ে দেখছে ডেভিড। ভাবছে এতদিন কী করে ও চোখে ঠুলি পরেছিল? ডেভিডের কাপড় খুলছে কেট। হঠাৎ তীব্র কামনাবোধ করল ডেভিড। ওরা দু'জনেই এখন সম্পূর্ণ নগ্ন, দুটি দেহ চেপে আছে পরস্পরের সঙ্গে। কেটকে আদর করতে শুরু করল ডেভিড। তার আঙুল হালকাভাবে ছুঁয়ে গেল কেটের মুখ, ঘাড়, নেমে এল সুডৌল এবং উদ্ধত দুই বক্ষে। সুখে গোঙাচ্ছে কেট। ডেভিডের হাত কেটের বুক, পেট, তলপেট বেয়ে ক্রমে নেমে গেল আরও নিচে। স্পর্শ পেল দুই উরুর মাঝখানের মখমল স্বর্গ। ওখানে আঙুল ঘষছে ডেভিড, ফিসফিস করল কেট, 'আমাকে নাও, ডেভিড,' ওরা নরম কম্বলের ওপর শুয়ে পড়ল। কেটের ওপরে উঠে এল ডেভিড। ওর কঠিন, শক্ত পৌরুষ টের পেল কেট। ওর শরীর যেন ভরে গেল। ডেভিডের সঙ্গে তাল দিতে লাগল কেট। এ যেন এক জলোচ্ছ্বাসের ঢেউ, ক্রমে ওপর থেকে আরও ওপরে উঠছে কেট, শেষে মনে হলো তীব্র এ সুখ আর বুঝি সহ্য করতে পারবে না ও। অকস্মাৎ ওর ভেতরে দারুণ এক বিস্ফোরণ ঘটল। একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটতেই থাকল। কেট তখন ভাবছিল *আমি মারা গেছি এবং স্বর্গে চলে গেছি।*

সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াল ওরা; প্যারিস, জুরিখ, সিডনি এবং নিউইয়র্ক। গেল কোম্পানির কাজে তবে উন্মুখ হয়ে রইল দু'জনে কখন একত্রিত হবে সে মুহূর্তটির জন্য। সারারাত ধরে ওরা গল্প করল এবং প্রেম করল, একে অন্যের মন এবং দেহ আবিষ্কার করল। ডেভিডের কাছে কেট হয়ে উঠল অক্লান্ত এক আনন্দের নাম। ভোরবেলায় কেট ওকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে বুনো হয়ে ওঠে। কয়েক ঘণ্টা পরে দেখা যায় দু'জনে খুব গম্ভীর মুখে কোনো বিজনেস কনফারেন্সে অংশ নিয়েছে। ব্যবসা বুঝবার সহজাত দক্ষতা

এবং বুদ্ধি রয়েছে কেটের যেটা মোটেই কল্পনা করা যায়নি। পুরুষশাসিত সমাজে কেটকে শুরুতে তার ব্যবসায়িক প্রতিযোগিরা খুব একটা পাত্তা দিত না। কিন্তু শীঘ্রি তারা বুঝে গেল এ মেয়েটির ব্যবসায়িক বুদ্ধি অত্যন্ত পাকা এবং তাদের চেয়ে অনেক বেশি দূরদর্শী। ফলে তারা এখন রীতিমত সমীহ এবং শ্রদ্ধার চোখে দেখে কেটকে। ডেভিড লক্ষ করে বুদ্ধির খেলায় কেট কত দ্রুত তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে দিচ্ছে। জয়ী হবার একটা সহজাত প্রবৃত্তিই যেন রয়েছে কেটের মধ্যে। সে জানে সে কী চায় এবং কীভাবে তা হস্তগত করতে হয়। *ক্ষমতা।*

ওরা ওদের হানিমুন পর্ব শেষ করল পার্ল হারবারের সিডার হিল হাউজে।

১৯১৪ সালের ২৮ জুন, প্রথম শোনা গেল যুদ্ধের কথা। সাসেক্সের একটি গ্রামের বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিল ডেভিড এবং কেট। ডিনারের সময় খবর এল অস্ট্রিয়ান- হাঙ্গেরিয়ান সিংহাসনের উত্তরাধিকার ফ্রান্সিস ফার্ডিনান্ড এবং তার স্ত্রী সোফিয়া গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হয়েছেন।

ওদের হোস্ট লর্ড ম্যানি মন্তব্য করলেন, 'একজন মহিলাকে গুলি করাটা খুবই অন্যায় হয়েছে। তবে ক্ষুদ্র একটি বলকান রাজ্যের জন্য কেউ যুদ্ধে জড়াবে না।'

এরপরে আলোচনা মোড় নিল ক্রিকেটে।

পরে, বিছানায় শুয়ে কেট জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি মনে হয় যুদ্ধ হবে, ডেভিড?'

'সামান্য একজন আর্চডিউক নিহত হয়েছেন বলে? প্রশ্নই ওঠে না।'

কিন্তু ডেভিডের ধারণা ছিল ভুল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সন্দেহ হলো তার প্রতিবেশী সার্বিয়ার চক্রান্তে নিহত হয়েছেন ফার্ডিনান্ড। তারা অক্টোবর মাসে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসল। এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল বিশ্বের বেশিরভাগ বৃহৎ শক্তি। এ ছিল নতুন এক ধরনের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে প্রথমবারের মতো যান্ত্রিক যানবাহন ব্যবহার করা হলো– এয়ারপ্লেন, এয়ারশিপ এবং সাবমেরিন।

যেদিন জার্মানি যুদ্ধ ঘোষণা করল, কেট বলল, 'এ যুদ্ধ আমাদের জন্য দারুণ সুযোগ সৃষ্টি করবে, ডেভিড।'

ভুরু কুঁচকে গেল ডেভিডের। 'কী বলছ তুমি?'

'জাতিগুলোর অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদের দরকার হবে এবং–'

'ওসব আমরা ওদেরকে সরবরাহ করব না,' কেটকে বাধা দিল ডেভিড। 'আমাদের লাভজনক ব্যবসার অভাব নেই, কেট। কারও রক্ত দিয়ে আমরা প্রফিট করতে চাই না।'

'একটু বেশি নাটক হয়ে গেল না? কেউ না কেউ অস্ত্র তো তৈরি করবেই।'

'আমি যতদিন এ কোম্পানির সঙ্গে আছি ততদিন আমি এসবের মধ্যে নিজেকে জড়াব না। আমরা এ বিষয়টি নিয়ে আর কথা বলব না, কেট। দ্য সাবজেক্ট ইজ ক্লোজড।'

ডেভিডের কথায় কেট খুবই বিরক্ত হলো। সেদিন আর একত্রে ঘুমাল না ওরা। কেট একা একা শুয়ে ভাবছিল ডেভিড হঠাৎ করে এমন আদর্শবাদী হয়ে গেল কী করে?

আর ডেভিড ভাবছিল কেট এমন নির্দয় হলো কী করে? আসলে ব্যবসাই ওকে বদলে দিয়েছে। সামান্য এ ঘটনা ওদের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি করল। এ দূরত্বটা ঘটুক মোটেই চায়নি ডেভিড তবে কীভাবে সম্পর্কের ফাঁকটা বন্ধ করবে তা-ও ভেবে পাচ্ছিল না সে। আর প্রচণ্ড অহংকারী এবং জিদ্দি কেট হার স্বীকার করার পাত্রীই নয়। কারণ সে মনে করে সে যা করছে তা-ই ঠিক।

প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন কথা দিয়েছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তিনি যুদ্ধে জড়াবেন না। কিন্তু জার্মানি ডুবোজাহাজগুলো যখন নিরস্ত্র যাত্রীবাহী জাহাজ টর্পেডো মেরে ডুবিয়ে দিতে লাগল এবং জার্মানদের নৃশংসতার কাহিনী ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল, ত্রিপক্ষকে সাহায্যের জন্য আমেরিকার ওপর চাপ বৃদ্ধি পেল। 'গণতন্ত্রের জন্য পৃথিবীকে নিরাপদ করো,' ছড়িয়ে পড়ছিল এ স্লোগান।

ডেভিড প্লেন চালাতে শিখেছিল। ফ্রান্সে যখন আমেরিকান পাইলটদের নিয়ে গঠিত হলো লাফায়েত্তি এস্কাড্রিল, ডেভিড কেটকে একদিন বলল, 'আমি যুদ্ধে যাব।'

আতংকবোধ করল কেট। 'না! এটা তোমার যুদ্ধ নয়!'

'এটা আমাদের যুদ্ধ হতে চলেছে,' শান্ত গলায় বলল ডেভিড। 'আমেরিকা গা এড়িয়ে চলতে পারে না। আমি একজন আমেরিকান। আমি এখন সাহায্য করতে চাই।'

'তোমার বয়স ছেচল্লিশ!'

'আমি এখনও প্লেন চালাতে পারি, কেট। ওদের সব রকমের সাহায্য দরকার।'

ডেভিডকে নিবৃত্ত করার ক্ষমতা কেটের ছিল না। ওরা পরের অল্প ক'টা দিন একসঙ্গে রইল। ভুলে গেল রাগ-অভিমান। ওরা একে অপরকে ভালোবাসে সেটাই আসল কথা।

ফ্রান্সে যাত্রা করার আগের রাতে ডেভিড কেটকে বলল, 'তুমি আর ব্রাড রজার্স মিলে খুব ভালোভাবে কোম্পানি চালাতে পারবে। এমনকী আমার চেয়েও ভালো পারবে।'

'তোমার যদি কিছু হয়ে যায়? আমি তা সইতে পারব না।'

কেটকে জড়িয়ে ধরল ডেভিড। 'আমার কিছু হবে না, কেট। আমি অনেকগুলো মেডেল জিতে আবার তোমার কাছে ফিরে আসব।'

পরদিন সকালে রওনা হলো ডেভিড।

ডেভিডের অনুপস্থিতি যেন কেটের কাছে মৃত্যুর মতো। ওকে জয় করতে দীর্ঘদিন সময় লেগেছে কেটের আর এখন ওকে হারাবার কুৎসিত একটা ভয় কাজ করছে নিজের মধ্যে। ডেভিডকে প্রতিদিন লম্বা লম্বা চিঠি লেখে কেট। ডেভিডের চিঠি পেলে ওটা বারবার পড়েও আশ মেটে না। ডেভিড লিখে জানায় সে ভালো আছে। জার্মানরা এখন অবশ্য আকাশে খুব ফাইট দিচ্ছে তবে এ বিজয় তারা বেশিদিন ধরে রাখতে পারবে না।

গুজব শোনা যাচ্ছে, আমেরিকা শীঘ্রি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। ডেভিড সময় পেলে আবারও চিঠি লিখবে কেটকে। কেট যে তার জান।

নিজের একাকীত্ব এবং কষ্টগুলো ভুলে থাকতে বেশি বেশি কাজের মধ্যে ডুবে থাকে কেট। যুদ্ধের শুরুর দিকে ফ্রান্স এবং জার্মানী ছিল ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ ফাইটিং ফোর্স যাদের যুদ্ধ সরঞ্জামের কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু মিত্রপক্ষের কাছে তাদের চেয়ে অনেক বেশি ম্যানপাওয়ার রিসোর্স এবং ম্যাটেরিয়াল ছিল। পৃথিবীর বৃহত্তম সেনাবাহিনীর অধিকারী হয়েও রাশিয়ার রসদপত্র ছিল খুবই কম, তাদের যোগ্য নেতৃত্বেরও অভাব ছিল।

'এদের সবার সাহায্য প্রয়োজন,' ব্রাড রজার্সকে বলল কেট।

'ওদের ট্যাংক, অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ দরকার।'

অস্বস্তি নিয়ে ব্রাড বলল, 'কেট, ডেভিড কিন্তু–'

'ডেভিড তো এখানে নেই, ব্রাড। বিষয়টি এখন শুধু তোমার আর আমার ওপর নির্ভর করছে।'

কিন্তু ব্রাড রজার্স ঠিকই জানে কেট আসলে কী বলতে চেয়েছে। *এটা শুধু আমার ওপর নির্ভর করছে।*

অস্ত্র উৎপাদনে ডেভিডের অনীহার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না কেট। মিত্রপক্ষের অস্ত্রশস্ত্র দরকার আর কেট মনে করে অস্ত্র সরবরাহ করে সে একজন দেশপ্রেমিকের দায়িত্ব পালন করবে। এটা তার কর্তব্য। সে আধডজন বন্ধুভাবাপন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করল এবং এক বছরের মাথায় ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেড বন্দুক, ট্যাংক, বোমা এবং গোলাবারুদ উৎপাদন শুরু করে দিল। কোম্পানি ট্রেন, ট্যাংক, ইউনিফর্ম এবং অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে লাগল। ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেড অত্যন্ত দ্রুত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ কর্পোরেশনে পরিণত হচ্ছিল। স্রোতের মতো টাকা আসছিল। দ্রুত ফুলতে থাকা ব্যাংক হিসাবে চোখ বুলাতে বুলাতে কেট একদিন ব্রাডকে বলল, 'দেখেছ? ডেভিডকে স্বীকার করতেই হবে সে একটা ভুল করেছিল।'

এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় খুবই বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছিল। মিত্রবাহিনীর প্রতি নিজেদের সমর্থন জানিয়েছিলেন পার্টি নেতারা, জার্মানির কবল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকাকে রক্ষার বিষয়ে মিত্রপক্ষের দায়দায়িত্বের বিষয়টিও তারা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনকে দেশের সমর্থন বেশিরভাগ আফ্রিকানরা মেনে নিতে পারেনি। অত দ্রুত অতীত ভুলে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ইউরোপে মিত্রপক্ষের যুদ্ধ অনুকূল ছিল না। পশ্চিম রণাঙ্গনের লড়াই একটা অচল অবস্থার মধ্যে চলছিল। দু'পক্ষই ট্রেঞ্চ খুঁড়েছিল নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য। ফ্রান্স থেকে বেলজিয়াম পর্যন্ত বিস্তৃত এসব ট্রেঞ্চ। সৈন্যদের অবস্থা ছিল খুবই করুণ। বৃষ্টিতে প্লাবিত

হয়ে যাচ্ছিল মাটিতে খোঁড়া গর্ত, ওতে বড় বড় ইঁদুর সাঁতরে বেড়ায় এবং হামলা চালায় সৈন্যদের ওপর। কেট নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবত যাক বাবা, মাটির গর্তে বসে ডেভিডকে যুদ্ধ করতে হয় না। সে লড়াই করে আকাশে।

১৯১৭ সালের ৬ এপ্রিল যুদ্ধ ঘোষণা করলেন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন। ডেভিডের ভবিষ্যদ্বাণীই ফলল। আমেরিকা সমবেত হতে লাগল।

প্রথম আমেরিকান এক্সপিডিশনারি ফোর্স জেনারেল জন জে পার্সিয়েংয়ের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালের ২৬ জুন ফ্রান্সে অবতরণ করল। মিত্রপক্ষ পরিণত হলো এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে। ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর যুদ্ধের অবসান ঘটল।

এবারে ডেভিডের বাড়ি ফেরার সময় হলো।

নিউইয়র্কে, ট্রুপ শিপ থেকে যখন নেমে এল ডেভিড, ওকে স্বাগত জানাতে বন্দরে হাজির হলো কেট। সমস্ত হৈ চৈ হল্লা ভুলে অনেকক্ষণ একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর পরস্পরের বাহুডোরে বাঁধা পড়ল দু'জনে। ডেভিড অনেকটা শুকিয়েছে, ক্লান্ত চেহারা। কেট ভাবছিল, *ওহ গড, আমি যে ওকে কী মিস করেছি।* কত যে প্রশ্ন জমা আছে ওর বুকে। এসব প্রশ্ন করার অনেক সময় পাওয়া যাবে। 'চলো, আমরা সেডার হিল হাউজে যাব।' কেট বলল ওকে। 'বিশ্রাম করার জন্য ওটাই তোমার উপযুক্ত স্থান।'

ডেভিডের গৃহ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে বাড়িটি খুব সুন্দর সাজিয়েছে কেট। দেখে মুগ্ধ ডেভিড। ঘর দেখানো শেষ করার পরে কেট জিজ্ঞেস করল, 'আমার ঘর সাজানো তোমার পছন্দ হয়েছে, ডার্লিং?'

'খুব সুন্দর হয়েছে, কেট। এখন বসো। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

মনের ভেতর শংকার ঘণ্টি বেজে উঠল কেটের। 'কোনো সমস্যা?'

'দেখে মনে হচ্ছে আমরা অর্ধেক পৃথিবীর অ্যামুনিশন সাপ্লায়ার বনে গেছি।'

'আরে কাগজপত্রে একবার চোখ বুলিয়েই দেখ না,' শুরু করল কেট। 'আমাদের লাভের পরিমাণ—'

'আমি অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলছি। যদ্দুর মনে পড়ে আমি দেশ ছাড়বার আগে আমাদের কোম্পানি বেশ ভালোই লাভের মুখ দেখছিল। বলেছিলাম আমরা যুদ্ধের রসদ সরবরাহ সংক্রান্ত কোনো উৎপাদনে জড়াব না।'

কেট টের পেল ওর ভেতরে রাগের একটা ঢেউ উথলে উঠছে।

'তুমি প্রস্তাব দিয়েছিলে। কিন্তু আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি হইনি।' রাগ নিয়ন্ত্রণের প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে। 'সময় বদলায়, ডেভিড। সে সঙ্গে আমাদেরকেও বদলে যেতে হয়।

কেটের দিকে তাকাল ডেভিড। 'তুমি কি বদলেছ?'

সে রাতে বিছানায় শুয়ে নিজেকে প্রশ্ন করছিল কেট, কে আসলে বদলেছে ও নাকি ডেভিড? ও কি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে নাকি ডেভিড দুর্বল হয়ে গেছে? অস্ত্র তৈরি নিয়ে ডেভিডের দুর্বল তর্কের কথা মনে পড়ল কেটের। মিত্রপক্ষকে কেউ না কেউ রসদ সরবরাহ করতই কারণ এতে লাভের পরিমাণ খুবই বেশি। ডেভিডের ব্যবসায়িক বুদ্ধি কি ঘোলা হয়ে গেছে? অথচ ওকে অত্যন্ত চতুর ব্যবসায়ী বলেই মনে করত কেট। কিন্তু এখন দেখছি ডেভিডের চেয়ে সে-ই ভালো ব্যবসা চালাতে পারছে। সে রাতে এসব আগড়ম বাগড়ম চিন্তায় আর ঘুম এল না কেটের।

সকাল বেলা নাশতা সেরে কেট এবং ডেভিড বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ডেভিড বলল, 'জায়গাটা খুব সুন্দর। এখানে এসে খুব ভাল্লাগছে আমার।'

কেট বলল, 'গতরাতের ঘটনাটা–'

'ওটা আমি ভুলে গেছি। তুমি যা ভালো মনে করেছ, করেছ। এতে আমার কিছু বলার নেই।'

তুমি যদি এখানে থাকতে তাহলে কি এতকিছু আমি করতে পারতাম? ভাবল কেট। তবে মুখে কিছু বলল না। সে যা করেছে সবই কোম্পানির স্বার্থে। *কোম্পানি কি আমার সংসার জীবনের চেয়েও বড়?* এ প্রশ্নের জবাব দিতে সাহস হলো না কেটের।

তেত্রিশ

পরবর্তী পাঁচ বছর বিশ্বব্যাপী অবিশ্বাস্য সমৃদ্ধি ঘটল। হিরে এবং সোনা দিয়ে ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেড ব্যবসা শুরু করলেও সারা পৃথিবীতে নানান বিচিত্র ব্যবসা ছড়িয়ে দিল তারা। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা আর তাদের ব্যবসার কেন্দ্রবিন্দু রইল না। কোম্পানিটি সম্প্রতি পাবলিশিং সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে, সঙ্গে ইনসিওরেন্স কোম্পানি খুলেছে এবং পাঁচ লাখ একর জুড়ে রয়েছে তাদের টিম্বারল্যান্ড।

এক রাতে কেট কনুইয়ের ধাক্কা মেরে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল ডেভিডকে। 'ডার্লিং, চলো কোম্পানির সদরদপ্তর অন্য কোথাও স্থানান্তর করি।'

ডেভিড ঘুম চোখ নিয়ে উঠে বসল। 'ক-কী?'

'বর্তমানে বিশ্বের বিজনেস সেন্টার হলো নিউইয়র্ক। আমাদের হেডকোয়ার্টার্স ওখানেই হওয়া উচিত। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সবকিছুই বেশ দূরে দূরে। তাছাড়া এখন টেলিফোন এবং কেবলের সুবিধা রয়েছে, আমরা যেকোনো মুহূর্তে আমাদের যে কোনো অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব।'

'আমার মাথায় এ বুদ্ধিটা আসেনি কেন?' বিড়বিড় করল ডেভিড। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

নিউইয়র্ক এক নয়া উত্তেজক ভুবন। এর আগে কেট এ শহরে যতবার এসেছে, মহানগরীর দ্রুত হৃৎস্পন্দন অনুভব করেছে, কিন্তু এখানে বসবাস করা মানে একটা ম্যাট্রিক্সের কেন্দ্রবিন্দুতে বাঁধা পড়া। এখানে পৃথিবী যেন অত্যন্ত দ্রুত আবর্তিত হচ্ছে, সবকিছুই দারুণ গতিতে ছুটে চলেছে।

কেট এবং ডেভিড মিলে ওয়াল স্ট্রিটের একটি জায়গা বেছে নিল কোম্পানির সদর দপ্তর হিসেবে। স্থপতিরা কাজে লেগে গেলেন। কেট আরেকজন আর্কিটেক্টকে দিয়ে ফিফথ এভিন্যুতে ষষ্ঠদশ শতকের ফরাসী রেনেসাঁর আদলে আরেকটা ডিজাইন করাল।

'এ শহরটিতে বড্ড বেশি হাউকাউ,' অনুযোগের সুরে বলল ডেভিড।

ঠিকই বলেছে সে। আকাশ ছোঁয়া ভবনের এ মহানগরীতে হৈচৈ হট্টগোলের কোনো বিরাম নেই। সারা বিশ্বের বাণিজ্যিক কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে নিউইয়র্ক। শিপিং, ইনসিওরেন্স, কম্যুনিকেশন এবং ট্রান্সপোর্টেশন কোম্পানিগুলোর সদর দপ্তর বসানো হচ্ছে এ শহরে। অসাধারণ জীবনীশক্তির এক মহানগর নিউইয়র্ক। শহরটি কেটের খুবই

পছন্দ হয়েছে তবে ডেভিডের অসন্তোষের কারণও সে বুঝতে পারছিল।

'ডেভিড, দিস ইজ দ্য ফিউচার। এ শহর বেড়ে চলছে সেইসঙ্গে আমরাও সামনে কদম ফেলতে থাকব।'

'মই গড! কেট, আর কত চাই তোমার?'

বিন্দুমাত্র না ভেবে জবাব দিল কেট। 'দুনিয়ার সব টাকা।'

ডেভিড কেন এ প্রশ্নটা করল বুঝতে পারছে না কেট। মানুষ খেলা করে জেতার জন্য আর সবাইকে পরাজিত করেই জিততে হয়। এ ব্যাপারটা একদম পরিষ্কার কেটের কাছে। কিন্তু ডেভিড কেন এটা বুঝতে পারে না? ডেভিড ভালো ব্যবসায়ী সন্দেহ নেই কিন্তু একটা জিনিসের অভাব আছে ওর মধ্যে আর তা হলো খিদে, জয় করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, সবার সেরা হওয়ার ইচ্ছে। কেটের বাবার ভেতরে এ জিনিসগুলো ছিল এবং তার মধ্যেও আছে। কেট জানে না ঠিক কীভাবে ঘটনাটা ঘটল, তবে তার জীবনে কোম্পানি পরিণত হয়েছে প্রভুতে আর সে কোম্পানির দাস। কোম্পানি তাকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

নিজের অনুভূতিগুলো ডেভিডের কাছে প্রকাশ করতে গেলে সে হাসতে হাসতে বলেছে, 'তুমি আসলে খুব বেশি পরিশ্রম করছ।' *মেয়েটা হয়েছে তার বাবার মতো,* ভাবে ডেভিড। কিন্তু এ ভাবনা কেন যে তাকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয় জানে না সে।

খুব বেশি পরিশ্রম আবার কী জিনিস? ভেবে পায় না কেট। আরে কাজই তো জীবন। যতক্ষণ কাজের মধ্যে থাকে কেট মনে হয় বেঁচে আছে। প্রতিদিন নতুন নতুন সমস্যা এসে হাজির হয়, প্রতিটি সমস্যাই একেকটি চ্যালেঞ্জ, এ ধারণার সমাধান করতে হবে, নতুন এ খেলায় জিততে হবে। আর এ কাজগুলো খুব ভালো পারে কেট। তার রয়েছে ক্ষমতা। বিপুল ক্ষমতা। এ ক্ষমতা ব্যবহার করে সে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা কোম্পানির হাজার হাজার মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে। যতদিন এ ক্ষমতার মালিক সে থাকবে, সত্যিকার অর্থেই কাউকে তার প্রয়োজন হবে না। এ এক কল্পনাতীত অস্ত্র।

রাজা-রানী এবং প্রেসিডেন্টদের সঙ্গে ডিনারের দাওয়াত পায় কেট। সবাই তার সাহায্যপ্রার্থী। ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেড এখন এক দানবের নাম।

নিউইয়র্কে থিতু হবার এক বছর পরে, মার্চ মাসে অসুস্থ বোধ করতে লাগল কেট। ডেভিড ওকে ডাক্তার দেখাতে বলল।

'ডাক্তারের নাম জন হার্লি। বয়স কম হলেও ডাক্তারি করে অনেক নাম কামিয়েছে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ডাক্তারের কাছে গেল কেট। জন হার্লি হালকা-পাতলা, গম্ভীর চেহারার ছাব্বিশ বছরের এক যুবক। কেটের চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট। ডাক্তারের বাড়ি বোস্টনে।

'আমার এখন কিন্তু অসুস্থ হবার সময় নেই,' ডাক্তারকে বলল কেট।

ডাক্তার কেটকে পরীক্ষা করে দেখল। কয়েকটা টেস্ট নিল। তারপর বলল, 'মনে

হয় না আপনার সিরিয়াস কিছু হয়েছে। টেস্টের রেজাল্ট দু'একদিনের মধ্যে পেয়ে যাব। আমাকে বুধবার একটা ফোন করবেন।'

বুধবার সকালে কেট ফোন করল ডা. হার্লিকে। 'আপনার জন্য সুসংবাদ আছে, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল,' খুশি খুশি গলায় জানাল ডাক্তার। 'আপনি মা হতে চলেছেন।'

এমন খুশির খবর জীবনে শোনেনি কেট। ডেভিডকে সুসংবাদটি দিতে তার তর সইছিল না।

ডেভিড খবর শুনে খুশিতে ধেই ধেই নৃত্য শুরু করে দিল। কেটকে দু'হাতে শূন্যে তুলে ধরে বলল, 'আমাদের নিশ্চয়ই মেয়ে হবে এবং সে দেখতে অবিকল তোমার মতো হবে।' মনে মনে ভাবল, *কেট এখন থেকে বেশিরভাগ সময় বাড়িতেই থাকবে। সংসার-ধর্ম পালন করবে।*

আর কেট ভাবছিল, *আমার ছেলে হবে। একদিন সে ক্রুগার-ব্রেন্টের দায়িত্ব বুঝে নেবে।*

সন্তান জন্মদানের দিনক্ষণ যত ঘনিয়ে আসছিল, কাজের চাপ তত কমিয়ে দিচ্ছিল কেট। তবে অফিসে সে প্রতিদিনই যাচ্ছে।

'কাজের কথা ভুলে একটু রিল্যাক্স করো,' ডেভিড পরামর্শ দিল কেটকে।

কিন্তু সে জানে না কাজের মধ্যে থাকলেই বরং রিল্যাক্স বোধ করে কেট।

উদর ক্রমে স্ফীত হচ্ছে কেটের। অফিসে যাওয়া এখন তার জন্য বেশ কষ্টকর। ডেভিড কিংবা ব্রাড রজার্স তাকে বাড়িতে থাকার পরামর্শ দিলে কেট বলে, 'আমার মস্তিষ্ক এখনও কাজ করছে।' সন্তান জন্মের মাস দুই আগে ডেভিড দক্ষিণ আফ্রিকা গেল নিয়েলের একটি খনি পরিদর্শনে। পরের সপ্তাহেই তার নিউইয়র্ক ফিরবার কথা।

কেট স্রেফ বসে কাজ করছিল, দরজায় কড়া না নেড়েই ঘরে ঢুকে পড়ল ব্রাড রজার্স। তার চেহারা থমথমে, কালো। কেট তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা বোধহয় শ্যাননের কাজটা পাচ্ছি না, তাই না?'

'না। আ-কেট। আমি এইমাত্র একটা খবর পেলাম। একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। খনি দুর্ঘটনা।'

আঁতকে উঠল কেট। 'কোথায়? খুব খারাপ কিছু? কেউ কি মারা গেছে?'

গভীর দম নিল ব্রাড। 'আধডজন লোক মারা গেছে, কেট। ডেভিড তাদের মধ্যে একজন।'

শব্দগুলো প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল ঘরে, দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ফিরে ফিরে আসতে লাগল কেটের কাছে। ক্রমে উচ্চকিত হয়ে উঠল, শেষে চিৎকারে পরিণত হলো। কেটের কানে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের মতো আছড়ে পড়তে লাগল ভয়ংকর শব্দগুলো, ওকে যেন

ডুবিয়ে দিতে লাগল, ও ডুবে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে। আর শ্বাস নিতে পারছে না।

অকস্মাৎ সবকিছু ঢেকে গেল আঁধার এবং নীরবতায়।

শিশুটি জন্ম নিল এক ঘন্টা পরে, নির্ধারিত সময়ের দুই মাস আগে। প্রিম্যাচিউর বেবী। কেট তার নাম রাখল অ্যান্থানি জেমস ব্ল্যাকওয়েল।

একমাস পরে ফিফথ এভিন্যুর ম্যানসনে নবজাতককে নিয়ে উঠে এল কেট। এটি একটি রাজপ্রাসাদ বিশেষ। *আমার রাজা এখানে বড় হবে,* মনে মনে বলল কেট।

১৯২৮ সালে, টনির বয়স তখন চার, তাকে নার্সারি স্কুলে ভর্তি করে দিল কেট। টনি দেখতে বেশ সুদর্শন হয়েছে, মায়ের ধূসর চক্ষু আর দৃঢ় চিবুক পেয়েছে। তাকে মিউজিক শিক্ষা দেয়া হলো, পাঁচ বছর বয়সে ভর্তি করা হলো নাচের স্কুলে। মা আর ছেলে তাদের সেরা সময়গুলো কাটায় ডার্ক হারবারে, সেডার হিল হাউজে। আশি ফুট লম্বা, মোটর চালিত একটি ইয়ট কিনেছে কেট। নাম কর্স এয়ার। সে আর টনি মিলে ইয়টে চড়ে মেইন শহরের উপকূলে ভেসে বেড়ায়। ইয়টভ্রমণ খুব পছন্দ করে টনি। তবে তার মা কাজের মধ্যেই সবচেয়ে আনন্দ খুঁজে পায়।

জেমি ম্যাকগ্রেগরের প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির মধ্যে কেমন যেন এক রহস্যময়তার গন্ধ পায় কেট। মনে হয় কোম্পানিটির জীবন্ত সত্ত্বা রয়েছে। এ যেন তার প্রেমিক তবে এ প্রেমিকের কোনোদিন মৃত্যু হবে না। তাকে কোনোদিন একা রেখে চলে যাবে না। এ বেঁচে থাকবে চিরদিন। একদিন কোম্পানিটি নিজের ছেলের হাতে তুলে দেবে কেট।

চৌত্রিশ

নিজের জন্মস্থান নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছে কেট। দক্ষিণ আফ্রিকাকে সে গভীরভাবে ভালোবাসে। কিন্তু এ দেশে জাতিগত সমস্যা দিনদিন বেড়েই চলেছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী জেমস হার্টজগ এবং ম্যান স্কুটস মিলে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করে নিউল্যান্ড অ্যাক্ট নামে একটি আইন পাস করেছেন। এ আইনের ফলে কালোদের আর ভোট দেয়ার অধিকার থাকল না, তাদের নিজস্ব জমিজমা বলেও আর কিছু রইল না। বিভিন্ন সংখ্যালঘু দলে বিভক্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ এ নতুন আইনের কারণে আরও বিভক্ত হয়ে গেল। যেসব অঞ্চলে কোনো খনি নেই, নেই শিল্প কারখানা এবং বন্দর সে সব জায়গা কৃষ্ণাঙ্গদের বসবাসের জন্য বরাদ্দ করা হলো।

কেট একদিন দক্ষিণ আফ্রিকার উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে মিটিং করল। 'এটা একটা টাইম বম্ব,' বলল সে ওদেরকে। 'আপনারা যা করছেন তা আসলে আশি লাখ মানুষকে ক্রীতদাস বানিয়ে রাখার চেষ্টা।'

'এ ক্রীতদাসত্ব নয়, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। আমরা যা করছি সব তাদের ভালোর জন্যই।'

'তাই নাকি? তা ব্যাখ্যাটা কী শুনি?'

'প্রতিটি জাতিরই কিছু না কিছু দেয়ার আছে। কালোরা যদি সাদাদের সঙ্গে মিশে যায় তাহলে তারা তাদের পরিচয় হারিয়ে ফেলবে। আমরা ওদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করছি।'

'একদম বাজে কথা,' প্রতিবাদ করল কেট। 'দক্ষিণ আফ্রিকা এখন সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

'কথাটা ঠিক নয়। অন্যান্য দেশ থেকে হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে কালোরা এদেশে আসছে। একটি জাল পাসপোর্টের জন্য তাদেরকে ছাপ্পান্ন পাউন্ড দিতে হয়। পৃথিবীর যে কোনো জায়গার চেয়ে কালোরা এখানে ভালো আছে।'

'তাহলে তাদের জন্য আমার করুণাই হচ্ছে,' বলল কেট।

সে তার দেশের জন্য গভীর হতাশা এবং দুঃখ নিয়ে সভা ত্যাগ করল।

বান্ডাকে নিয়েও খুব চিন্তিত কেট। প্রায়ই সংবাদ শিরোনাম হচ্ছে বান্ডা। দক্ষিণ আফ্রিকার খবরের কাগজগুলো তার নাম দিয়েছে স্কারলেট পিম্পারনেল। তাকে নিয়ে নানান চিত্তাকর্ষক গল্প ছাপা হয় কাগজে। সে কখনও শ্রমিক, কখনও গাড়িচালক কিংবা

কখনওবা দারোয়ান সেজে পুলিশের চোখে ধুলো দেয়। সে একটি গেরিলা বাহিনী গঠন করেছে। পুলিশের মোস্ট ওয়ারেন্ট তালিকার শীর্ষে তার নাম। সে বিভিন্ন গ্রামে ছাত্রদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়। কিন্তু পুলিশ গিয়ে তাকে খুঁজে পায় না। শোনা যায় বন্ধু এবং ভক্তদের সম্মিলিত শতাধিক ব্যক্তিগত দেহরক্ষী রয়েছে বান্ডার, সে প্রতি রাতে আলাদা কোনো বাড়িতে ঘুমায়। কেট জানে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই তাকে রুখতে পারবে না।

বান্ডার সঙ্গে দেখা করার খুব ইচ্ছে করছিল কেটের। সে এক বিশ্বস্ত কৃষ্ণাঙ্গ ফোরম্যানকে তলব করল। 'উইলিয়াম, বান্ডার সঙ্গে কি তোমার দেখা হবার সম্ভাবনা আছে?'

'শুধু তিনি ইচ্ছা করলেই দেখা হতে পারে।'

'চেষ্টা করো। আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'দেখছি কী করা যায়।'

পরদিন সকালে ফোরম্যান বলল, 'আজ সন্ধ্যায় আপনি ফ্রি থাকলে একটা গাড়ি আপনাকে নিয়ে শহরের বাইরে যাবে।'

জোহানেসবার্গের সত্তর মাইল উত্তরে ছোট একটি গাঁয়ে নিয়ে আসা হলো কেটকে। ছোট একটি কাঠের বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল ড্রাইভার। কেট ভেতরে ঢুকল। বান্ডা তার জন্য অপেক্ষা করছিল। শেষ যেবার যেমন দেখেছিল কেট বান্ডাকে, সেরকমই আছে সে। যদিও লোকটির বয়স এখন ষাট। বছরের পর বছর পুলিশের তাড়া খেয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে বান্ডা অথচ তাকে কত শান্ত এবং সমাহিত লাগছে।

কেটকে আলিঙ্গন করল বান্ডা। 'তোমাকে যতবার দেখি ততবারই মনে হয় তুমি আগের চেয়ে সুন্দরী হয়েছ?'

হেসে উঠল কেট। 'আমি বুড়ি হয়ে যাচ্ছি। আর কয়েক দিন পরেই চল্লিশে পা দেব।'

'কিন্তু তোমার কাছে এসে বয়স থমকে গেছে, কেট।'

ওরা কিচেনে ঢুকল। বান্ডা কফি বানাচ্ছে, কেট বলল, 'যা ঘটছে আমার ঠিক ভাল্লাগছে না, বান্ডা। শেষ পর্যন্ত কী হতে যাচ্ছে?'

'অবস্থা আরও খারাপের দিকে মোড় নেবে,' স্বীকার করল বান্ডা। 'সরকার আমাদের সঙ্গে কথা বলতে রাজি নয়। সাদারা তাদের আর আমাদের মধ্যেকার সেতু ধ্বংস করে ফেলেছে। তবে একদিন তারা বুঝতে পারবে আমাদের কাছে পৌঁছুবার জন্য ওই সেতুগুলো দরকার।'

'তবে সকল শ্বেতাঙ্গই খারাপ নয়,' মন্তব্য করল কেট।

'তোমার অনেক শ্বেতাঙ্গ বন্ধু আছে যারা এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য লড়াই করছে। একদিন অবস্থার পরিবর্তন ঘটবেই, বান্ডা। তবে সময় লাগবে।'

'সময় আওয়ার গ্লাসের বালুর মতো। ফুরিয়ে যায়।'

'বান্ডা, নটামি আর ম্যাগেনার কী খবর?'

'আমার স্ত্রী এবং পুত্র লুকিয়ে আছে,' মন খারাপের গলায় বলল বান্ডা। 'পুলিশ আমাকেই বেশি খুঁজছে।'

'আমি তোমাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি? আমি স্রেফ বসে থাকতে চাই না। তোমাকে যদি কিছু টাকা দিই?'

'টাকা সব সময়ই কাজে লাগে।'

'আমি টাকার ব্যবস্থা করছি। আর কিছু দরকার?'

'প্রার্থনা। আমাদের সবার জন্য প্রার্থনা করো।'

পরদিন সকালে নিউইয়র্কে ফিরে এল কেট।

ভ্রমণ করার উপযুক্ত বয়স যখন হলো টনির, ওকে নিয়ে স্কুল ছুটির দিনগুলোতে বিজনেস ট্রিপে যেতে শুরু করল কেট। জাদুঘর খুব পছন্দ করে টনি। বিশ্বসেরা চিত্রকরদের আঁকা ছবির দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে সে। বাড়ির দেয়াল বোঝাই করে ফেলে সে ছবি এঁকে, তবে মাকে ছবিগুলো দেখতে দেয় না।

টনি ভারী মিষ্টি, বুদ্ধিমান একটি ছেলে। সে খুব লাজুকও। লোকে তার এই লাজুক লাজুক ভাবটা খুব পছন্দ করে। ছেলেকে নিয়ে অনেক গর্ব কেটের। টনি ক্লাসে সবসময় ফার্স্ট হয়। 'তুমি ওদের সবাইকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিয়েছ। তাই না, ডার্লিং?' বলে হেসে উঠে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কেট।

১৯৩৬ সালে, টনির দ্বাদশ জন্মদিনে, কেট মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ শেষে বাড়ি ফিরল। টনিকে ভীষণ মিস করছিল সে। ছেলেকে দেখার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। বাড়িতে মা'র জন্য অপেক্ষা করছিল টনি। কেট ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'হ্যাপি বার্থ ডে, ডার্লিং! কেমন কাটল সারাদিন?'

'জ্বী-জ্বা-ম্য-ম্যাম' খু-খুব ভালো।'

কেট ওকে ছেড়ে দিয়ে পিছু হঠল। ছেলেকে কোনোদিন তোতলাতে দেখেনি সে। 'তুমি ঠিক আছ তো, টনি?'

'ভা-ভালো আছি, ধন্যবাদ, ম্- মা।'

'তোতলাচ্ছ কেন? ধীরে ধীরে কথা বলো।'

'হ্যাঁ। ম্-মা।'

দিন যত গেল অবস্থা আরও খারাপ হলো। ডা. হার্লির সঙ্গে কথা বলবে ঠিক করল কেট। টনিকে পরীক্ষা শেষ করে ডা. হার্লি বলল, 'শারীরিক দিক থেকে ছেলেটির কোনো সমস্যা নেই কেট। ওকে কি কোনোরকম চাপের মধ্যে রাখা হয়?'

'আমার ছেলেকে? প্রশ্নই ওঠে না। এ প্রশ্ন করার মানে?'

'টনি খুব সেনসিটিভ টাইপের। হতাশা থেকে তোতলামিটা চলে আসে। যদি কোনো

কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারে তখন কেউ কেউ তোতলায়।'

'তুমি ভুল ভেবেছ, জন। টনি ক্লাসের ফার্স্ট বয়। গত টার্মে সে তিনটে পুরস্কার জিতেছে। বেস্ট অল-অ্যারাউন্ড অ্যাথলেট, বেস্ট অল অ্যারাউন্ড স্কলার এবং শিল্পকলার সেরা হাতের পুরস্কার। কাজেই ও কিছুর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে নি এ আমি বিশ্বাস করি না।'

'ও আচ্ছা,' বলল ডা. হার্লি। 'টনি যখন তোতলায় তখন তুমি কী করো, কেট?'

'অবশ্যই আমি ওকে শুধরে দিই।'

'ওটা আর কোরো না। শুধরে দিতে গিয়ে তুমি বরং ওকে আরও ঘাবড়ে দিচ্ছ।'

রেগে গেল কেট। 'টনির যদি কোনো মানসিক সমস্যা হয়ে থাকে, আমার ধারণা তুমি সে রকমই কিছু হয়েছে বলে ভাবছ, সে ক্ষেত্রে তোমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি এতে আমার কোনো ভূমিকা নেই। আমি ওকে ভালোবাসি, এবং ও জানে আমার চোখে ও পৃথিবীর সবচেয়ে ফ্যান্টাস্টিক ছেলে।'

'আর সমস্যাটা তো ওখানেই। কোনো বাচ্চার পক্ষেই অমন চাপ সহ্য করা সম্ভব নয়।' ডা. হার্লি টনির চার্টে চোখ বুলিয়ে বলল, 'ওর বয়স বারো?'

'হুঁ।'

'ওকে কিছুদিনের জন্য অন্য কোথাও পাঠিয়ে দাও। কোনো ভালো প্রাইভেট স্কুলে।'

কেট কটমট করে তাকিয়ে রইল ডাক্তারের দিকে।

'ওকে কিছুদিন ওর নিজের মতো থাকতে দাও। অন্তত হাই স্কুলের পাট চুকানো পর্যন্ত। সুইটজারল্যান্ডে অনেক ভালো ভালো স্কুল আছে।'

সুইটজারল্যান্ড! টনিকে অতদূরে পাঠিয়ে একা কী করে থাকবে কেট? 'ঠিক আছে। আমি বিষয়টা ভেবে দেখব,' ডাক্তারকে বলল কেট।

সেদিন বিকেলে একটি বোর্ড মিটিং ক্যান্সেল করে আগেই বাড়ি ফিরল কেট। টনি নিজের ঘরে বসে হোম ওয়ার্ক করছিল।

টনি বলল, 'আ-আজ সারাদিন এ-এই কাজগুলো ক-করেছি,' ম্-মা।'

'তুমি সুইটজারল্যান্ডের স্কুলে পড়তে যাবে, ডার্লিং?'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল টনির চেহারা। যা-যাব।

ছয় সপ্তাহ পরে টনিকে একটি জাহাজে তুলে দিল কেট। টনি চলেছে লেক জেনেভার তীরে ছোট্ট একটি শহর রোল-এ। ওখানে ইনস্টিটিউট লো রোসিতে ভর্তি হবে সে। নিউইয়র্কের জাহাজঘাটায় দাঁড়িয়ে কেট দেখছিল বিশালকায় জলযানটি ক্রমে টাগবোট থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে ফেলল। ব্লাডি হেল! আমি ওকে খুব মিস করব। ঘুরল কেট, ফিরে চলল নিজের লিমুজিনে। অফিসে যাবে।

কোম্পানি আয়তনে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, সে সঙ্গে বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছিল

কেট। তার চ্যারিটি ফাউন্ডেশন থেকে অর্থ সাহায্য দেয়া হয় কলেজ, চার্চ এবং স্কুলগুলোতে। নিজের আর্ট কালেকশনও বাড়িয়ে চলছিল কেট। সে বিখ্যাত রেনেসাঁ এবং রেনেসাঁ পরবর্তী যুগের শিল্পী র‍্যাফায়েল, টিটিয়ান, টিনটোরেন্টো এবং এল গ্রেসের ছবি সংগ্রহ করেছে। তার সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে বারোক পেইন্টার রুবেল, কারাভাগ্গিও এবং ভ্যানডিকের বিখ্যাত সব চিত্রকলা।

ব্ল্যাকওয়েল কালেকশন বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান ব্যক্তিগত সংগ্রহ হিসেবে পরিচিতি পেয়ে গেল। তবে সে অমূল্য সংগ্রহ বাইরের কোনো অতিথি দেখার সুযোগ পায় না। কেট তার নিচতলার ছবিও কাউকে তুলতে দেয় না, প্রেসের সঙ্গে এ নিয়ে সে কখনও কথাও বলে না। ব্ল্যাকওয়েল পরিবারের ব্যক্তিগত জীবনের কথা বাইরের মানুষ খুব কমই জানতে পারে। ভৃত্য কিংবা কোম্পানির কোনো কর্মচারীর ব্ল্যাকওয়েল পরিবারকে নিয়ে আলাপ আলোচনার কোনো অনুমতি নেই। তাই বলে গুজব তো আর থামিয়ে রাখা যায় না।

কেট ব্ল্যাকওয়েল, বিশ্বের সবচেয়ে ধনবতী এবং অন্যতম প্রভাবশালী নারী– এক জীবন্ত প্রহেলিকা। তাকে নিয়ে মানুষের মনে সহস্র প্রশ্ন, কিন্তু খুব কম প্রশ্নেরই জবাব মেলে।

লো রোসি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে ফোন করল কেট। 'টনি কেমন আছে?'

'ও খুব ভালো আছে, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। আপনার ছেলে ছাত্র হিসেবে খুবই অসাধারণ। সে–'

'আমি তা জানতে চাইনি। আমি আসলে জানতে চেয়েছি–'

ইতস্তত করছে কেট, ব্ল্যাকওয়েল পরিবারের একটি দুর্বলতার কথা স্বীকার করতে হচ্ছে বলে দ্বিধান্বিত। 'ওর তোতলামিটা সেরে গেছে কিনা–'

'ম্যাডাম, ও মোটেই তোতলায় না। হি ইজ পারফেক্টলি ফাইন।'

মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কেট। সে জানত টনির এ তোতলামি স্রেফ সাময়িক। সময়ে ঠিক হয়ে যাবে। ডাক্তাররা যে কী!

চার সপ্তাহ পরে বাড়ি ফিরল টনি। কেট এয়ারপোর্টে গেল ছেলেকে নিয়ে আসতে। টনির চেহারা-স্বাস্থ্য বেশ ভালো হয়েছে, দেখতেও অনেক সুদর্শন লাগছে। ছেলেকে নিয়ে গর্ব অনুভব করল কেট। 'হ্যালো, মাই লাভ। কেমন আছ তুমি?'

'আমি ভা-ভালো আছি, ম্-মা। তু-তুমি কেমন আছ?'

পঁয়ত্রিশ

বাড়িতে ছুটি কাটাতে এসে টনি খুব আগ্রহ নিয়ে তার মায়ের নতুন চিত্রকলার সংগ্রহগুলো দেখতে লাগল। ফরাসী চিত্রকর মোনেট, রেনোয়া, ম্যানেট এবং মরিসটের অপূর্ব সব পেইন্টিং দেখে সে দারুণ মুগ্ধ। টনির জন্য এ যেন এক জাদুর দুনিয়া। সে এক সেট রঙ আর ঈজেল কিনে এনে কাজে লেগে গেল। তবে নিজের আঁকা ছবিগুলো নিজেরই পছন্দ না হওয়ায় সেগুলো দেখালো না কাউকে।

কেট বলল, 'একদিন এসব পেইন্টিং তোমার হবে, ডার্লিং।'

মা'র কথা শুনে তেরো বছরের বালকটি খুব একটা খুশি হতে পারল না। তার মা আসলে তাকে বুঝতে পারে না। এ ছবিগুলো তার কী করে হবে, সে তো আর এগুলো নিজের পয়সা দিয়ে কেনে নি। টনির খুব ইচ্ছে নিজেই অর্থোপার্জন করবে। মা'র কাছ থেকে যখন সে দূরে থাকে, মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয় তার, মা'র সবকিছুই তার কাছে দারুণ ত্তজক মনে হয়। মা যেন এক ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রবিন্দু, লোকজনকে হুকুম করছে, অবিশ্বাস্য সব কাজ করছে, তাকে নিয়ে নানান জায়গায় যাচ্ছে, দারুণ সব মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। মা এক দুর্দান্ত নারী। মাকে নিয়ে কত যে গর্ব টনির! তার মনে হয় মা'র মতো নারী আর নেই পৃথিবীতে। তবে মা সামনে থাকলেই সে তোতলায় বলে এক ধরনের অপরাধবোধও কাজ করে তার মধ্যে।

কেট জানতই না তার সম্পর্কে তার ছেলে কী বিশাল ধারণা পোষণ করে আছে। একদিন টনি তার মাকে জিজ্ঞেস করল, 'ম্-মা, তুমি কি দু-দুনিয়াটাকে চালাও?'

হেসে উঠল কেট। 'অবশ্যই না। এরকম উদ্ভট প্রশ্ন তোমার মনে উদয় হলো কেন?'

'আমাদের স্কুলের স-সব বন্ধু তোমাকে নিয়ে গল্প করে। ব-বলে তুমি নাকি বি-বিরাট কিছু।'

'আমি তো বিরাট কিছুই,' বলল কেট। 'আমি যে তোমার মা।'

মাকে খুশি করতে পারলে পৃথিবীতে আর কিছু চায় না টনি। সে জানে মা তার সঙ্গ কতটা উপভোগ করে, তার জানা আছে মা চায় একদিন এ কোম্পানির দায়িত্বভার সে নেবে। আর এ কথা ভাবলেই অপরাধবোধে ভোগে টনি। কারণ জানে ওই কাজটাই সে পারবে না। কোম্পানি চালানোর জন্য তার জন্ম হয়নি। সে চায় চিত্রশিল্পী হতে। সে দেশের বাইরে যাবে, চিত্রকলা নিয়ে পড়াশোনা করবে প্যারিসে। তবে নিজের আকাঙ্ক্ষার কথা মাকে বলতে হবে খুব সাবধানে।

ওরা খুব চমৎকার সময় কাটাচ্ছিল। পৃথিবীজুড়ে সম্পত্তি রয়েছে কেটের। পাম বিচে তার বাড়ি রয়েছে, আছে দক্ষিণ ক্যারোলাইনায়, আছে কেনটাকিতে বিরাট একটি খামারবাড়ি। টনির স্কুলের ছুটিতে এসব জায়গায় ঘুরে বেড়াল মা-ছেলে। একদিন ডার্ক হারবারের বাড়িতে ডিনার শেষে কেট তার ছেলেকে বলল, 'ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেড একদিন তোমার হবে, টনি। তুমি এ কোম্পানি চালাবে এবং–'

'আ-আমি এ কো-কোম্পানি চালাতে চাই না, মা। ব-বড় ব্যবসা কিংবা ক্ষ-ক্ষমতা আমার দরকার নেই।'

শুনে ভয়ানক রেগে গেল কেট। 'গর্দভ! বড় ব্যবসা আর ক্ষমতার ব্যাপারে তুমি কী জানো? তোমার কি ধারণা আমি সারা পৃথিবীতে শয়তানী করে বেড়াচ্ছি? মানুষজনকে কষ্ট দিচ্ছি? তোমার কি ধারণা ক্রুগার-ব্রেন্ট একটি নির্দয় মেশিন সামনে চলার পথে যা পায় সব ভেঙে গুঁড়ো করে দেয়? শোনো ছেলে, আমার কোম্পানির যিশাস ক্রাইস্টের পরেই অবস্থান। আমরা হলাম পুনরুত্থান, টনি। আমরা লাখ লাখ মানুষের জীবন রক্ষা করি। আমরা যখন গরিব কোনো দেশে কারখানা খুলি খানকার লোকজন তখন স্কুল, কলেজ এবং চার্চ বানাতে সমর্থ হয়, তারা তাদের ছেলে মেয়েদের ভালো খাবার খেতে দিতে পারে, ভালো পোশাক পরতে দেয়, বিনোদনের ব্যবস্থা করে।' জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে কেট।

'যে এলাকার মানুষ না খেয়ে আছে, বেকার সেখানে আমরা শিল্প-কারখানা গড়ে তুলি যাতে তারা সুন্দর জীবন যাপন করতে পারে, মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। আমরা তাদের রক্ষাকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হই। আর কোনোদিন যেন বড় ব্যবসা আর ক্ষমতা নিয়ে তোমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে না শুনি।'

টনি শুধু ঢোক গিলে বলতে পারল, 'আ-আমি দুঃ-দুঃখিত, ম্-মা।'

মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করল বড় হয়ে আমি চিত্রশিল্পী হব।

টনির পনের বছর বয়সে কেট ছেলেকে তার গরমের ছুটি দক্ষিণ আফ্রিকায় কাটানোর প্রস্তাব দিল। 'আমি এ মুহূর্তে তোমার সঙ্গে যেতে পারছি না, টনি। তবে ও জায়গাটি তোমার খুব পছন্দ হবে। আমি সমস্ত ব্যবস্থা করে রাখব।'

'আ-আমি ছুটিটা ডার্ক হারবারে কা-কাটাব ভেবেছিলাম, ম্-মা।'

'পরের বার,' দৃঢ় গলায় বলল কেট। 'এবারে তুমি জোহানেসবার্গে যাবে।'

কেট জোহানেসবার্গের কোম্পানি সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে সতর্কতার সঙ্গে টনির ভ্রমণ রুটিন তৈরি করল। প্রতিদিনই টনিকে নিয়ে বাইরে যাওয়া হবে। তাকে কোম্পানির চিত্তাকর্ষণীয় জিনিসগুলো ঘুরে দেখানো হবে যাতে সে বুঝতে পারে ভবিষ্যতে এসব নিয়েই তাকে কাজ করতে হবে।

ছেলের প্রতিদিনকার সফর বৃত্তান্তের রিপোর্ট পেয়ে যাচ্ছিল কেট। টনিকে সোনার খনিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ডায়মন্ড ফিল্ডে সে দুটো দিন কাটিয়েছে। ক্রুগার-ব্রেন্ট

প্ল্যান্টে সে ঘুরতে গেছে গাইডের সঙ্গে। কেনিয়ায় সাফারি করেছে।

টনির ছুটি শেষ হওয়ার কয়েকদিন আগে জোহানেসবার্গে কোম্পানি ম্যানেজারকে ফোন করল কেট। 'টনির হালচাল কী?'

'সে এখানে খুব ভালো আছে, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। আজ সকালেই জিজ্ঞেস করছিল আরও ক'টা দিন থাকা যাবে কিনা।'

শুনে খুশি হলো কেট। 'বাহ্, চমৎকার। ধন্যবাদ।'

টনির ছুটি ফুরিয়ে গেলে সে ইংল্যান্ডের সাউদাম্পটনে গেল। ওখানে প্যান আমেরিকান এয়ারওয়েজ সিস্টেমের প্লেনে উঠল আমেরিকা ফিরে আসার জন্য। নিউইয়র্কের নবনির্মিত লা গুয়ারডিয়া বিমান বন্দরে কেট গেল ছেলেকে নিয়ে আসতে। উৎসাহে জ্বলজ্বল করছিল টনির সুদর্শন চেহারা।

'কেমন সময় কাটালে, সোনা?'

'দক্ষিণ আফ্রিকা দা-দারুণ একটা দেশ, ম্-মা। ওরা আমাকে নামিব মরুভূমিতে নি-নিয়ে গিয়েছিল যেখান থেকে আমার দা-দাদু হিরে চুরি করেছিল।'

'তোমার দাদু হিরে চুরি করেননি, টনি,' কেট শুধরে দিল ছেলেকে। 'শুধু নিজের ভাগের অংশটা নিয়ে এসেছিলেন।'

'ও, আ-আচ্ছা,' বলল টনি। 'আমি সি-সি মিস দেখতে পাইনি। তবে এ-এখনও গার্ড আর কুকুর আছে সবখানে।' হাসল সে। 'ওরা আমাকে কোনো স্যা-সাম্পল আনতে দিল না।'

হাসল কেট। 'তোমার স্যাম্পল আনার কোনো দরকার নেই, সোনা। একদিন ওগুলো সবই তোমার হবে।'

'তু-তুমি কি জানো আমার সবচেয়ে কোন জিনিসটা ভালো লেগেছে?'

'কোন্ জিনিস?'

'ছবি আঁকতে। আ-আমি ওখানকার ল্যান্ডস্কেপের অ-অনেক ছবি এঁকেছি। আমার তো আসতেই ইচ্ছে করছিল না। আমি আবার ওখানে যা-যাব, মা। ছবি আঁকতে।'

'ছবি আঁকতে?' কণ্ঠে উৎসাহ ফোটানোর চেষ্টা করল কেট। 'এটা তো খুব ভালো একটা হবি।'

'না। এটা আ-আমার হবি নয়, মা। আমি চি-চিত্রশিল্পী হতে চাই। আমি এ নিয়ে অনেক ভেবেছি। আমি পড়াশোনা করতে প্যা-প্যারিস যাব। আমি খুব ভালো ছবি আঁকতে পারব।'

উদ্বেগ বোধ করল কেট। 'সারাজীবন তুমি নিশ্চয় ছবি এঁকে নষ্ট করবে না?'

'হ্যাঁ। আমি তা-ই করব, ম্-মা। আমি শুধু ছ-ছবি আঁকতেই ভালোবাসি।'

কেট বুঝতে পারল সে হেরে গেছে।

নিজের মতো করে জীবন গড়ে তোলার অধিকার ওর আছে, ভাবছিল কেট। কিন্তু

ওকে এরকম মারাত্মক একটা ভুল আমি কী করে করতে দিই?

কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে বেঁধে গেল যুদ্ধ। কেট টনিকে বলল, 'তুমি হোয়ার্টন স্কুলে ফিন্যান্স অ্যান্ড কমার্স নিয়ে পড়বে। দুই বছর পরেও যদি তুমি আর্টিস্ট হতে চাও সেক্ষেত্রে তোমার প্রতি আমার আশীর্বাদ থাকবে।'

কেট নিশ্চিত দুই বছর পরে টনির মন মানসিকতার পরিবর্তন হয়ে যাবে। যে ছেলে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ একটি কোম্পানি চালাতে পারবে সে কিনা হাতে রংতুলি নিয়ে ক্যানভাসে ছবি আঁকবে– ভাবাই যায় না!

কেট ব্ল্যাকওয়েলের কাছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরেকটি বিশাল সুযোগ। বিশ্বজুড়ে সামরিক রসদের স্বল্পতা চলছিল আর ক্রুগার-ব্রেন্ট সে অভাব পূরণ করতে প্রস্তুত। কোম্পানির একটি শাখা সশস্ত্র বাহিনীর জন্য নানান সরঞ্জামের জোগান দেবে, আর একটি শাখা বেসামরিক মানুষজনের বিভিন্ন চাহিদা মেটাবে। কোম্পানিতে দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা শুরু হয়ে গেল কাজ।

কেট নিশ্চিত ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ মহাযুদ্ধে নিরপেক্ষ বসে থাকতে পারবে না। জার্মানী নামের দানবটিকে অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল কেউ থামাতে পারবে না। ভার্সাই চুক্তির অপমানের শোধ নিতে অ্যাডলফ হিটলার তৈরি করেছিলেন ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ যুদ্ধযন্ত্র। নতুন ঝটিকা আক্রমণের কৌশল অবলম্বন করে জার্মানী দ্রুত হামলা চালিয়ে দখল করে নিল পোল্যান্ড, বেলজিয়াম এবং নেদারল্যান্ডস। তারপর জার্মান মেশিন গুঁড়িয়ে দিল ডেনমার্ক, নরওয়ে, লুক্সেমবার্গ এবং ফ্রান্স।

কেট শুনেছে নাজি অধিকৃত ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেডের কারখানায় যেসব ইহুদি কাজ করছিল তাদেরকে ধরে ধরে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হচ্ছে। সে দুটি ফোন করল তারপর উড়ে গেল সুইটজারল্যান্ডে। জুরিখের বাউর অ লাক হোটেলে উঠেছে কেট, খবর এল তার সঙ্গে কর্নেল ব্রিন্‌কম্যান দেখা করতে চায়। ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেডের বার্লিন শাখার ম্যানেজার ছিল ব্রিন্‌কম্যান। কারখানাটি নাজি সরকার দখল করে নিলে ব্রিন্‌কম্যানকে কর্নেলের পদোন্নতি দেয়া হয় এবং ওটার দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত থাকে।

সে হোটেলে এল কেটের সঙ্গে দেখা করতে। হালকা পাতলা, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার একজন মানুষ, টাক মাথাটা ক'গাছা সোনালী চুল দিয়ে সযত্নে ঢেকে রেখেছে। 'আমি আপনাকে দেখে অত্যন্ত খুশি হলাম, কেট ব্ল্যাকওয়েল। আমার সরকারের তরফ থেকে আপনার জন্য একটি মেসেজ নিয়ে এসেছি। আমাকে বলা হয়েছে আপনাকে নিশ্চিত করার জন্য যে আমরা যুদ্ধে জেতার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কলকারখানা আপনাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। জার্মানী হবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পাওয়ার যার কথা কেউ কোনোদিন শোনেনি। আর আপনার মতো মানুষদের সহযোগিতাকে আমরা স্বাগত জানাই।'

'কিন্তু জার্মানী যদি হেরে যায়?'

ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটতে দিল কর্নেল ব্রিন্‌কম্যান। 'আমরা দু'জনেই জানি তা

ঘটবে না, ফ্রাউ ব্ল্যাকওয়েল। ইউরোপের ঘটনার সঙ্গে নিজেকে না জড়ানোর মতো ঘটে যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আশা করি সে এটা অব্যাহত রাখবে।'

'সে আশা আপনি করতেই পারেন, কর্নেল।' সামনে ঝুঁকে এল কেট। 'গুজব শুনছি ইহুদিদেরকে নাকি গ্রেফতার করে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়ার পরে হত্যা করা হচ্ছে। কথা কি সত্য?'

'এ সবই ব্রিটিশ প্রোপাগান্ডা। এ কথা সত্যি die judenদেরকে শ্রমিক ক্যাম্পে পাঠানো হচ্ছে। তবে একজন সেনা কর্মকর্তা হিসেবে আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি তাদের সঙ্গে তাদের প্রাপ্য আচরণই করা হচ্ছে।'

কথাটির মানে ঠিক বুঝতে পারল না কেট। সিদ্ধান্ত নিল ঘটনা খতিয়ে দেখবে।

পরদিন কেট অ্যাপয়েন্টমেন্ট করল বিখ্যাত জার্মান ব্যবসায়ী অটো বুয়েলারের সঙ্গে। বুয়েলারের বয়স পঞ্চাশ, চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ, দয়ালু মুখ, চোখ দুটিতে বহু যাতনা সহ্য করার বেদনা। ব্যানহফের কাছে ছোট একটি ক্যাফেতে সাক্ষাৎ করল দু'জনে। নির্জন এক কোনার টেবিলে বসল ওরা।

'শুনলাম,' নরম গলায় বলল কেট, 'আপনি নাকি গোপনে ইহুদিদেরকে নিরপেক্ষ দেশগুলোতে নিয়ে যাচ্ছেন। কথা কি সত্য?'

'কথা সত্য নয়, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। এ ধরনের কাজ থার্ড রাইখের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা।'

'আমি এও শুনেছি এ কাজটি চালিয়ে নিতে আপনার ফান্ডের দরকার হয়ে পড়েছে।'

কাধ ঝাঁকালেন বুয়েলার। 'আমি যেহেতু গোপন কোনো কিছু করছি না কাজেই তার জন্য ফান্ডেরও দরকার নেই, তাই না?'

ক্যাফের চারপাশে সতর্ক নজর বুলাচ্ছেন তিনি। এই মানুষটি প্রচণ্ড বিপদ আর ঝুঁকির মধ্যে দিনাতিপাত করছেন।

'আমি হয়তো এ ব্যাপারে কিছু সাহায্য করতে পারব,' সাবধানে বলল কেট। 'ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেডের বহু কারখানা রয়েছে নিরপেক্ষ এবং মিত্র দেশগুলোতে। ওখানে কেউ উদ্বাস্তুদেরকে পাঠাতে পারলে আমি তাদেরকে চাকরি দিতে পারব।'

তেতো কফির কাপে চুমুক দিতে লাগলেন বুয়েলার। শেষে নীরবতা ভেঙে বললেন, 'আমি এসবের কিছুই জানি না। আজকাল রাজনীতি খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। তবে আপনি যদি দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদেরকে সাহায্য করতে চান, ইংল্যান্ডে আমার এক চাচা আছেন, জটিল রোগে ভুগছেন। তার ডাক্তারের বিল খুবই চড়া।'

'কত চড়া?'

'প্রতি মাসে পঞ্চাশ হাজার ডলার। লন্ডনে আগে টাকাটা পাঠাতে হবে তারপর ওটা সুইস ব্যাংকে ট্রান্সফার করা হবে।'

'সে ব্যবস্থা করা যাবে।'

'আমার চাচা কথাটা শুনলে খুব খুশি হবেন।'

আট সপ্তাহ পরে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ইহুদী উদ্বাস্তুরা মিত্র দেশগুলোতে হাজির হতে লাগল এবং ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেডের কারখানাগুলোতে তারা কাজ পেয়ে গেল।

দুই বছর পরে স্কুলের পাট চুকল টনির। সে খবরটা দিতে কেটের অফিসে গেল। 'আ-আমি চেষ্টা করেছিলাম, ম্-মা। পেরেছিও। তবে আ-আমি আমার ম-মন স্থির করে ফেলেছি। আমি পে-পেইন্টিং নিয়ে পড়াশোনা করব। যু-যুদ্ধ শেষ হলে আমি প্যা-প্যারিসে যাব।'

প্রতিটি শব্দ হাতুড়ির আঘাত হানল কেটকে।

'আ-আমি জানি তুমি হ-হতাশ হয়েছ। কিন্তু আমি আমার জী-জীবন নিজের মতো করে বাঁ-বাঁধতে চাই। আমি পেইন্টিং-এ ভালো করব– খুব ভালো করব।' মায়ের চেহারা দেখে সে যোগ করল, 'তুমি আমাকে যে আদেশ করেছিলে আমি তা পালন করেছি। এখন আমাকে সু-সুযোগ দিতে হবে। ওরা শিকাগোর আর্ট ই-ইনস্টিটিউটে আমাকে ভর্তি নিতে রাজি হয়েছে।'

কেটের মনের মধ্যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। টনি যা করতে চাইছে তা স্রেফ সময়ের অপচয়। সে শুধু বলতে পারল, 'কবে যেতে চাইছ?'

'পনেরো তারিখ থেকে ভর্তি শুরু।'

'আজ কয় তারিখ?'

'ছ-ছয় ডিসেম্বর।'

১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর ইম্পেরিয়াল জাপানিজ নেভির নাকাজিমা বোম্বার এবং জিরো ফাইটার প্লেনগুলো একযোগে হামলা চালাল পার্ল হারবারে। পরদিনই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেদিন বিকেলে টনি যোগ দিল ইউনাইটেড স্টেটস মেরিন কর্পস-এ। তাকে পাঠানো হলো ভার্জিনিয়ার কোয়ানটিকোতে, সেখানে সে অফিসার্স ট্রেনিং স্কুলে গ্রাজুয়েশন করল তারপর তাকে সাউথ প্যাসিফিকে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

কেট যেন এক অতল খাদের কিনারে বাস করছিল। কোম্পানি চালানোর চাপ সবসময়ই ছিল তার ওপর তবে প্রতিটি মুহূর্তে সে টনির কথা ভাবত। টনির কোনো ভয়ংকর খবর না জানি আসে– হয় সে আহত হয়েছে নতুবা মারা গেছে যুদ্ধে।

জাপানের সঙ্গে লড়াইয়ে এঁটে উঠতে পারছিল না মিত্রপক্ষ। জাপানী বোম্বাররা গুয়াম, মিডওয়ে এবং ওয়েক আইল্যান্ডে আমেরিকান ঘাঁটিগুলো এক এক করে দখল করে নিল। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারিতে তারা দখল করল সিঙ্গাপুর এবং খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল নিউ ব্রিটেন, নিউ আয়ারল্যান্ড, অ্যাডমিরানটি ও সলোমন দ্বীপপুঞ্জে। ফিলিপাইন থেকে সরে আসতে বাধ্য হলেন জেনারেল ডগলাস ম্যাক আর্থার। অপশক্তির শক্তিশালী

দল ধীরে ধীরে জয় করে নিচ্ছিল দুনিয়া এবং সর্বত্র তার গাঢ় ছায়া ঘনীভূত হচ্ছিল। কেট ভয় পাচ্ছিল ভেবে টনি হয়তো যুদ্ধ করতে গিয়ে ধরা পড়বে এবং তার ওপর নির্যাতন চালানো হবে। সমস্ত ক্ষমতা এবং প্রভাব খাটিয়েও কোনো লাভ হবে না বুঝতে পেরে ছেলের জন্য শুধু প্রার্থনাই করছিল সে। টনির কাছ থেকে চিঠি পেলে নতুন আশায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে কেট। যাক, ছেলেটা তার অন্তত বেঁচে আছে!

১৯৪২ সালের ৭ আগস্ট মিত্রপক্ষ প্রথম তাদের প্রতিরক্ষামূলক অ্যাকশন দেখাল প্রশান্ত মহাসাগরে। মার্কিন মেরিনরা সলোমন দ্বীপপুঞ্জের গুয়াডাল ক্যানাল-এ অবতরণ করল। তারপর থেকে জাপানী অধিকৃত দ্বীপগুলো তারা একে একে পুনরুদ্ধার করতে লাগল।

ইউরোপে মিত্রবাহিনী একের পর এক বিজয়ের আস্বাদ পেয়ে চলছিল। ১৯৪৪ সালের ৬ জুন নরমান্ডি উপকূলে একযোগে অবতরণ করল আমেরিকান, ব্রিটিশ এবং কানাডিয়ান ট্রুপ। একবছর পরে, ১৯৪৫ সালের ৭ মে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করল জার্মানী।

১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট জাপানের হিরোশিমায় ২০ হাজার টন টিএনটি ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক বোমা ফেলা হলো। তিনদিন পরে আরেকটি আণবিক বোমা ধ্বংস করে দিল নাগাসাকি শহর। ১৪ আগস্ট আত্মসমর্পণ করল জাপান। দীর্ঘ এবং রক্তাক্ত যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল।

তিন মাস পরে বাড়ি ফিরল টনি। ডার্ক হারবারের বাড়িতে মিলিত হলো মা আর ছেলে। *যুদ্ধ আমার ছেলেকে পাল্টে দিয়েছে,* ভাবছিল কেট। টনির চেহারায় ম্যাচুরিটি এসেছে। সে গোঁফ রেখেছে, রোদে পোড়া চামড়া, আরও হ্যান্ডসাম লাগছে দেখতে। কেট নিশ্চিত দীর্ঘদিন দেশের বাইরে থাকার কারণে টনি কোম্পানিতে যোগ না দেয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেছে।

'তোমার এখন পরিকল্পনা কী, পুত্র?' জিজ্ঞেস করল কেট।

হাসল টনি। 'আমি প্যা-প্যারিসে যাব, ম্-মা।'

চতুর্থ খণ্ড

টনি
১৯৪৬-১৯৫০

ছত্রিশ

প্যারিসে এর আগেও এসেছে টনি তবে এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন। আলোর শহরের আলো জার্মান অবরোধের কারণে স্তিমিতপ্রায় হয়ে এসেছিল। তবে এটিকে ওপেন সিটি হিসেবে ঘোষণা করার কারণে ধ্বংসজ্ঞের কবল থেকে রেহাই পেয়েছে। শহরের মানুষজনকে বিস্তর দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে, নাজী বাহিনী ল্যুভর মিউজিয়াম লুঠ করলেও প্যারিসকে তুলনামূলকভাবে সুরক্ষিতই দেখল টনি। এবারে ট্যুরিস্ট হিসেবে নয়, এখানে সে থাকতে এসেছে, এ শহরের একটি অংশ হয়ে উঠবে টনি। সে এভিন্যু দু মাথেশাল ফস্-এ কেটের বিলাসবহুল পেন্থ হাউজে স্বচ্ছন্দেই থাকতে পারত, যুদ্ধের সময় বাড়িটির কোনোরকম ক্ষতি হয়নি, কিন্তু সে গ্রান্ড মন্টাপারনাসের পেছনে, আসবাবহীন একটি পুরনো বাড়ির ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠল। অ্যাপার্টমেন্টটাতে কক্ষ বলতে ফায়ারপ্লেসসহ একটি লিভিংরুম, ছোট একটি বেডরুম এবং রেফ্রিজারেটরবিহীন একটি কিচেন। বেডরুম এবং কিচেনের মাঝখানে হামাগুড়ি দিয়ে রয়েছে একটি বাথরুম। সে বাথরুমের বাথটাবটি খুবই ছোট, টয়লেটের অবস্থাও তাই। এবং টয়লেটের আসনটি ভাঙ্গা।

বাড়িওয়ালি ফ্ল্যাটের জীর্ণদশার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে যাচ্ছিল, টনি তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এতেই আমার দিব্যি চলে যাবে।'

শনিবার পুরোটা দিন ফ্লি মার্কেটে (সস্তা ও পুরানো জিনিসপত্রের খোলা বাজার) কেনাকাটা করে কাটিয়ে দিল টনি। সোম এবং মঙ্গলবারটা ব্যস্ত থাকল লেফট ব্যাহকের তীরের সেকেন্ডহ্যান্ড জিনিসপত্র বিক্রির দোকানগুলোয়। বুধবারের মধ্যে ওর প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ঘরে চলে এল। এর মধ্যে রয়েছে একটি সোফা-বেড, একটি পুরনো টেবিল, দুটো বহু ব্যবহৃত চেয়ার, একটি পুরনো অলংকৃত ওয়াড্রোব, ল্যাম্প এবং নড়বড়ে কিচেন টেবিল ও দুটো পিঠখাড়া চেয়ার। *মা এগুলো দেখলে আতংকিত হয়ে উঠবে,* ভাবল টনি। সে ইচ্ছে করলেই বহুমূল্য অ্যান্টিক দিয়ে সাজিয়ে ফেলতে পারত ঘর। কিন্তু কমদামী জিনিস নিয়েই সন্তুষ্ট টনি।

পরবর্তী পদক্ষেপ হলো ভালো কোনো আর্ট স্কুলে ভর্তি হওয়া। ফ্রান্সের সবচেয়ে খ্যাতনামা আর্ট স্কুল ইকোল দে ব্যু আর্টস অব প্যারিস। টনি ওখানে আবেদন করল। *ওরা আমাকে কোনোদিনই নেবে না। ভাবছিল টনি। কিন্তু যদি নেয়!* তাহলে যেখানেই হোক তার মাকে প্রমাণ করে দেখাবে সঠিক সিদ্ধান্তটিই সে নিয়েছিল। টনি নিজের আঁকা

গোটা তিনেক ছবি জুড়ে দিয়েছে আবেদনপত্রের সঙ্গে। ভর্তি হতে পারবে কিনা জানতে সপ্তাহ চারেক অপেক্ষা করতে হবে ওকে। চার সপ্তাহ শেষে ওর কনসিয়ার্জ (বাড়ির দারোয়ান) ওকে একটা চিঠি দিল। স্কুল থেকে এসেছে। পরের সোমবার টনিকে দেখা করতে বলা হয়েছে।

ইকোল দে ব্যু আর্টস একটি বড়সড় পাথুরে ভবন, দোতলা, ডজনখানেক রুম বোঝাই ছাত্র-ছাত্রী। টনি রিপোর্ট করতে গেল স্কুল প্রধান মেইতর গ্রেস্যান্ডের কাছে। তালগাছের মতো লম্বা বিরস বদনের লোকটির ঘাড় বলে কিছু নেই এবং এমন পাতলা ঠোঁট জীবনে দেখেনি সে।

'তোমার ছবিগুলো দেখলে মনে হয় বালকদের আঁকা,' বললেন তিনি টনিকে। 'তবে ওতে সম্ভাবনার ছাপও রয়েছে। মেইতর ক্যান্টালের কাছে তুমি আঁকা শিখবে। আগামী পাঁচ বছরের জন্য তিনিই হবেন তোমার শিক্ষক– অবশ্য অতদিন যদি টিকতে পারো।'

আমি অবশ্যই টিকব, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল টনি।

মেইতর ক্যান্টাল ভয়ানক বেঁটে, একগাছি চুলও নেই বলে বেগুনি রঙের একটি টুপি দিয়ে ঢেকে রাখেন মাথা। চোখের রঙ গাঢ় বাদামী, মস্ত নাকটা কন্দের মতো ফোলা, ঠোঁটজোড়া সসেজের কথা মনে করিয়ে দেয়। তিনি টনিকে এই বলে সম্বোধন করলেন, 'আমেরিকানরা সঙ্গীত, চিত্রকলা ইত্যাদি কিছুই বোঝে না, বর্বর। তুমি এখানে এসেছ কেন?'

'শেখার জন্য, মেইতর।'

মেইতর ক্যান্টাল ঘোঁত ঘোঁত করে উঠলেন।

ক্লাসে ছাত্রের সংখ্যা পঁচিশজন, বেশিরভাগ ফরাসী। ঘরের চারপাশে বসানো হয়েছে ঈজেল, টনির জায়গা হলো একটি জানালার ধারে। জানালা দিয়ে বাইরে একটি খাবারের দোকান দেখা যায়। ঘরে ছড়ানো ছিটানো গ্রিক স্ট্যাচু অবলম্বনে নির্মিত মানব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্লাস্টার কাস্ট। মডেল কে দেখার জন্য ঘরে চোখ বুলাল টনি। দেখতে পেল না কাউকে।

'তোমাদের ক্লাস এখন শুরু হবে,' ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে বললেন মেইতর ক্যান্টাল।

'মাফ করবেন,' বলল টনি। 'আ-আমি-আমার পেইন্টগুলো আনতে ভুলে গেছি।'

'পেইন্টের দরকার হবে না। কীভাবে ছবি আঁকতে হয় প্রথম বছর শুধু তা-ই শিখবে তোমরা।'

মেইতর গ্রিক স্ট্যাচুর দিকে একটা আঙুল তুললেন।

'ওগুলোর ছবি আঁকবে তোমরা। কাজটা যদি খুব সহজ মনে হয়ে থাকে তোমাদের কাছে তাহলে আগেই সতর্ক করে দিচ্ছি, বছর শেষ হওয়ার আগেই তোমাদের অর্ধেকের বেশি ঝরে পড়ে যাবে।' তিনি আরাম করে বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। 'প্রথম বছরটা তোমরা অ্যানাটমি আঁকা শিখবে। দ্বিতীয় বছর– যারা কোর্স পাস করে উঠতে পারবে-

তারা জীবন্ত মডেলদের ছবি আঁকবে তেল রঙে। তৃতীয় বছর– নিশ্চিত করে বলতে পারি খুব অল্প ক'জনই ততদিনে টিকে থাকবে তোমরা– আমার সঙ্গে ছবি আঁকবে, আমার স্টাইলে এবং অবশ্যই ভালো ছবি আঁকতে হবে। আর চতুর্থ এবং পঞ্চম বছরে তোমরা বেছে নেবে যে যার স্টাইল, নিজস্ব কণ্ঠ। এসো, এখন কাজ শুরু করি।'

সবাই নেমে গেল কাজে।

মেইতর ক্লাসরুমে ঘুরে ঘুরে বেড়ালেন, প্রতিটি ঈজেলের সামনে থেমে সমালোচনার বান ছুড়ে দিলেন অথবা মন্তব্য করলেন। টনির কাছে এসে তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'না! না! ঠিকমতো আঁকা হচ্ছে না। আমি একটা হাতের বাইরের অংশ দেখতে পাচ্ছি। আমি দেখতে চাই ভেতরটা। পেশী, হাড়, লিগামেন্ট। আমি জানতে চাই ওর নিচে প্রবাহিত হচ্ছে রক্ত। কীভাবে কাজটা করবে জানা আছে তোমার?'

'জ্বী, মেইতর। আপনাকে ভাবতে হবে, অনুভব করতে হবে তারপর আপনি ছবি আঁকবেন।'

যখন ক্লাস থাকে না ঘরে বসে ছবি আঁকে টনি। সে সারারাত জেগে ছবি আঁকতে পারে। পেইন্টিং তাকে অজানা এক স্বাধীনতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। ঈজেলের সামনে হাতে ছবি আঁকার তুলি নিয়ে বসে থাকার সময় নিজেকে ঈশ্বরের মতো মনে হয় টনির। সে এক হাত দিয়ে গোটা পৃথিবী সৃষ্টি করতে পারে। সে তৈরি করতে পারে গাছ, ফুল, মানুষ, ব্রহ্মাণ্ড। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। এ জন্যই তো ওর জন্ম হয়েছে। যখন ছবি আঁকে না, শহর ঘুরতে বেরোয় টনি। প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। এ শহর এখন তার যেখানে তার শিল্পকলার জন্ম হচ্ছে। সিন নদী প্যারিসকে দুটো ভাগে ভাগ করেছে। লেফট ব্যাংক এবং রাইট ব্যাংক। রাইট ব্যাংকে যত ধনী লোকের বাস। আর লেফট ব্যাংকে বাস করে ছাত্র, শিল্পী, খেটে খাওয়া সংগ্রামী মানুষের দল। টনির কাছে লেফট ব্যাংকই তার বাড়ি। সে বুলে ব্লানশে কিংবা লা কুপলে ক্লাসমেটদের সঙ্গে বসে তাদের রহস্যময় জগত নিয়ে গল্প করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়।

লা রোসিতে ফরাসী ভাষা শিখেছে টনি। ফলে ক্লাসের ফরাসী ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে সহজে। টনির ক্লাসমেটরা জানে না সে কোন পরিবার থেকে এসেছে। তাই তারা টনিকে নিজেদের একজন করে নিয়েছে। গরীব, সংগ্রামী চিত্র শিল্পীরা একত্রিত হয় ক্যাফে ফ্লোর এবং লে দু ম্যাগটস-এ, তারা লাঞ্চ করে রু দ্য ক্যানেটের লো পট ডি' টিয়ান-এ। তারা বিলাসবহুল রেস্টুরেন্ট লাসেরি কিংবা ম্যাক্সিম'স-এ জীবনেও যায়নি।

১৯৪৬ সালে প্যারিসে জায়ান্টরা ছবি আঁকতেন। টনি পাবলো পিকাসোকে দেখল, একদিন মার্ক শাগালকেও দেখে ফেলল। শাগাল ক্যাফের একটি টেবিল দখল করে কতগুলো লোকের সঙ্গে গল্প করছিলেন।

'ওঁকে দেখতে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার,' টনির বন্ধু ফিসফিস করে বলল ওকে। 'উনি খুব কমই আসেন প্যারিসে। তাঁর বাড়ি ভেন্সে, মেডিটেরানিয়ান কোস্টের কাছে।'

মার্ক্স আর্নস্ট, আলবার্টো গিয়াকোমেত্তি, হ্যানস বেলমার প্রমুখ জায়ান্ট চিত্রকরদেরও কালেভদ্রে দেখতে পেল টনি। ব্র্যাকের সঙ্গে একজন তার পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু উত্তেজনায় গলা দিয়ে রা বেরোয়নি টনির।

কেট টনির অ্যাপার্টমেন্টের দশা দেখে রীতিমতো স্তম্ভিত। *ব্লাডি হেল! আমার ছেলে এই ভাঙাচোরা ক্লজিটের মধ্যে কী করে থাকছে?* ভাবল সে। তবে মুখে বলল, 'তুমি এখানে নিশ্চয় ভালো আছ, টনি। কিন্তু রেফ্রিজারেটর তো নেই। খাবার দাবার রাখো কোথায়?'

'জা-জানালার ধারে।'

জানালার সামনে গেল কেট। একটা আপেল তুলে নিয়ে বলল, 'আমি তোমার কোনো সাবজেক্ট খেয়ে ফেলছি না তো?'

হেসে উঠল টনি। 'ন্-না, মা।'

আপেলে কামড় বসাল কেট। 'এখন শুনি তোমার আঁকাআঁকির খবর।'

'খ-খবর তেমন কিছু নেই,' বলল টনি। 'আমরা এ বছরটা শুধু ড-ড্রয়িং করছি।'

'মেইতর ক্যান্টাল কেমন মানুষ?'

'চ-চমৎকার। তবে আসল কথা হলো উনি আমাকে প-পছন্দ করেন কিনা। ক্লাসের তিন ভাগের একভাগ মাত্র প-পরের ক্লাসে ওঠার সুযোগ পাবে।'

কোম্পানিতে যোগদানের বিষয়ে টনিকে আজ কোনো প্রশ্ন করল না কেট।

মেইতর ক্যান্টাল সহজে কারও প্রশংসা করেন না। তার মুখ থেকে সবচেয়ে বড় যে প্রশংসা বাক্যটি শুনেছে টনি তা হলো তিনি ঘোঁত ঘোঁত করে বলেছেন, 'আমি এর চেয়েও বাজে ছবি দেখেছি।'

স্কুল টার্ম শেষ হওয়ার পরে যে আটজন ছাত্র দ্বিতীয় বর্ষে উন্নীত হলো টনি ছিল তাদের একজন। এ আনন্দ উদযাপন করতে তারা সবাই মিলে মন্তমার্তের একটি নাইটক্লাবে গেল, মদ খেয়ে মাতাল হলো এবং ফ্রান্সে বেড়াতে আসা কয়েকজন ইংরেজ তরুণীর সঙ্গে কাটিয়ে দিল রাত।

আবার স্কুল শুরু হওয়ার পরে টনি তেল-রং এবং জ্যান্ত মডেল নিয়ে কাজ আরম্ভ করল। এ যেন কিন্ডারগার্টেন থেকে ছাড়া পাওয়া। অ্যানাটমি নিয়ে বছরখানেক স্কেচ করার পরে টনি বুঝতে পারল এখন সে মানব শরীরের প্রতিটি পেশী, স্নায়ু এবং গ্ল্যান্ড চেনে। তবে ওটা অংকন ছিল না– ছিল কপি করা। এখন হাতে রং-তুলি এবং সামনে জলজ্যান্ত মডেল নিয়ে টনি সৃষ্টি করতে শুরু করল। এমনকী মেইতর ক্যান্টাল পর্যন্ত ওর কাজ দেখে খুশি হলেন।

'তোমার ভেতরে অনুভূতিটা আছে,' ঘোঁতঘোঁত গলায় বললেন তিনি। 'এখন আমরা টেকনিক নিয়ে কাজ করব।'

স্কুলে ক্লাসের সময় প্রায় ডজন খানেক মডেল কাজ করে। মেইতর ক্যান্টাল যেসব মডেলকে নিয়ে সাধারণত কাজ করেন তাদের মধ্যে রয়েছে কার্লোস নামে মেডিকেল স্কুলের এক ছাত্র, অ্যানেট নামে ছোটখাট গড়নের সুগোল বক্ষের এক কৃষ্ণকেশী যার পিউবিক হেয়ারগুলো লাল এবং পেটভর্তি ফুটকি; এবং রয়েছে ডোমিনিক ম্যাসন নামে অপূর্ব সুন্দরী এক স্বর্ণকেশী, যার চোখগুলো গভীর সবুজ। ডোমিনিক অনেক বিখ্যাত পেইন্টারের মডেল হয়েছে। তাকে সবাই খুব পছন্দ করে। প্রতিদিন ক্লাস শেষে পুরুষ ছাত্ররা তার পাশে ঘুর ঘুর করে ডেটিংয়ের আশায়।

'বিজনেসের সঙ্গে আমি কখনও প্লেজারকে জড়াই না,' ঠাট্টার সুরে বলে ডোমিনিক। 'কাজটা ঠিক না। আমার যা দেয়ার সবই তো তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছি। তোমরা আমাকে কী দেবে?'

ডোমিনিককে পটানোর চেষ্টা করে তারা। কিন্তু কারও পটানিতে গলে যায় না ডোমিনিক।

একদিন সন্ধ্যায় অন্যান্য ছাত্ররা সবাই চলে গেছে, টনি তখনও ডোমিনিকের একটা ছবি আঁকা নিয়ে ব্যস্ত, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে তার পেছনে এসে হাজির মেয়েটা।

'আমার নাকটা খুব বেশি লম্বা।'

অপ্রস্তুত বোধ করল টনি। 'ওহ্, আমি দুঃখিত। আমি এখুনি এটা ঠিক করে দিচ্ছি।'

'না, না। ছবির নাক ঠিকই আছে। আমার আসল নাকের কথা বলছিলাম। ওটা বেশি লম্বা।'

হাসল টনি। 'কিন্তু ওই নাক নিয়ে আমার কিছু করার নেই।'

'কোনো ফরাসী হলে বলত, 'তোমার নাক একদম ঠিক আছে, শেরী।'

'তোমার নাকটা আমার বেশ পছন্দ। তবে আমি ফরাসী নই।'

'জানি আমি। তুমি কোনোদিন আমাকে ডেটিংয়ের জন্য বলোনি কিন্তু।'

ডোমিনিকের কথায় বিস্মিত হলো টনি। 'সবাই তো তোমাকে ডেটিংয়ে যেতে বলে কিন্তু তুমি তো কারও সঙ্গে বাইরে যাও না।'

ডোমিনিক হাসল। 'সবাই-ই কারও না কারও সঙ্গে বাইরে যাচ্ছে। গুড নাইট।'

চলে গেল ডোমিনিক।

টনি লক্ষ্য করেছে যখনই ও ক্লাসে বসে ছবি আঁকে সবাই চলে যাওয়ার পরে, কোত্থেকে হাজির হয়ে যায় ডোমিনিক এবং তার পেছনে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকা দেখে।

'তুমি খুব ভালো ছবি আঁকো,' একদিন ঘোষণার সুরে বলল ডোমিনিক। 'তুমি একদিন চিত্রশিল্পী হিসেবে খুব নাম করবে।'

'ধন্যবাদ, ডোমিনিক। তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।'

'ছবি আঁকার ব্যাপারে তুমি খুব সিরিয়াস, না?'

'হুঁ।'

'ভবিষ্যতের নামী একজন চিত্রশিল্পী কি আমাকে ডিনারে নিয়ে যাবে?' টনির চেহারায় বিস্ময় ফুটতে দেখল সে। 'তবে আমি বেশি খাই না। ফিগার ঠিক রাখতে হবে না!'

হেসে উঠল টনি। 'নিশ্চয়। তোমাকে ডিনার খাওয়াতে পারলে খুশিই হব।'

ওরা সাক্রে কুয়েরের কাছে একটি বিস্ত্রোতে ডিনার করল। খেতে খেতে পেইন্টার আর পেইন্টিং নিয়ে গল্প চলল। যেসব বিখ্যাত মানুষদের জন্য মডেল হিসেবে পোজ দিয়েছে ডোমিনিক তাদের গল্প শুনল টনি মোহিত হয়ে। cate au lait খেতে খেতে ডোমিনিক বলল, 'তুমি ওদের মতোই ভালো ছবি আঁকো।'

শুনে ভীষণ খুশি টনি। বলল, 'আমাকে অনেক লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে।'

ক্যাফে থেকে বেরিয়ে ডোমিনিক বলল, 'আমাকে তোমার অ্যাপার্টমেন্ট দেখাবে না?'

'দেখতে চাইলে নিশ্চয় দেখাব। তবে আমার বাসা দেখার মতো কিছু নয়।'

ডোমিনিক টনির ক্ষুদ্র, অগোছালো অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে চারপাশে চোখ বুলিয়ে মন্তব্য করল, 'তুমি ঠিকই বলেছিলে তোমার বাসাটা দেখার মতো কিছু নয়। তোমার ঘর পরিষ্কার করে কে?'

'এক ঠিকা কাজের বুয়া সপ্তাহে একদিন আসে।'

'ওকে বাদ দিয়ে দাও। ঘরদোর ভীষণ নোংরা করে রেখেছে। 'তোমার কোনো গার্লফ্রেন্ড নেই?'

'না।'

টনির অপাঙ্গে চোখ বুলাল ডোমিনিক। 'তুমি সমকামী নও তো?'

'না।'

'গুড। আমাকে এক বালতি পানি আর সাবান এনে দাও।'

কাজে লেগে গেল ডোমিনিক। সাবান গোলা পানি দিয়ে ঘর মুছে কিছুক্ষণের মধ্যে তকতকে করে ফেলল। কাজ শেষ করার পরে বলল, 'যাক, আপাতত এতেই চলবে। মাই গড, আমাকে গোসল করতে হবে?'

ক্ষুদ্রাকৃতির বাথরুমে ঢুকল সে। টাবে পানি ভরল। 'এর মধ্যে বসে গোসল করো কীভাবে?'

'আমি শুধু পা চুবিয়ে বসে থাকি।'

হাসল ডোমিনিক, 'দেখব একদিন দৃশ্যটা।'

পনের মিনিট পরে গোসল সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল ডোমিনিক। গায়ে শুধু একটি তোয়ালে জড়ানো। কাঁধে লুটাচ্ছে সোনালী ভেজা চুল। তার ফিগার খুবই সুন্দর। পরিপূর্ণ একজোড়া বক্ষ, সরু কোমর, লম্বা, সুঠাম পদযুগল। টনির কাছে ডোমিনিক এতদিন স্রেফ একটি মডেল ছিল, সে তার নগ্নদেহের ছবি এঁকেছে ক্যানভাসে। কিন্তু ডোমিনিকের গায়ের তোয়ালেটা সব কেমন গোলমাল করে দিল। অসাধারণ লাগছে ওকে। টনির গা দিয়ে হঠাৎ যেন ভাঁপ বেরুতে লাগল।

ডোমিনিক ওকে লক্ষ করছিল।' আমার সঙ্গে প্রেম করতে চাও?'

'সাংঘাতিকভাবে।'

আস্তে গা থেকে তোয়ালে খুলে ফেলেন ডোমিনিক। 'দেখাও তাহলে।'

সাঁইত্রিশ

ডোমিনিকের মতো মেয়ে টনির জীবনে কখনও আসেনি। ডোমিনিক টনিকে সবকিছুই দেয় কিন্তু বিনিময়ে চায় না কিছুই। প্রায় প্রতি রাতে টনির বাড়ি এসে সে রেঁধেবেড়ে দিয়ে যায়। দু'জনে মিলে ডিনারে গেলে সবচেয়ে সস্তা রেস্টুরেন্ট বেছে নেয় ডোমিনিক। 'অযথা টাকা খরচ কোরো না তো,' টনিকে মৃদু ভর্ৎসনা করে ডোমিনিক। 'টাকা জমিয়ে রাখো।'

ওরা ভোরবেলা লেস হ্যালেসে যায়, পিয়েড ডি কোচন-এ পেঁয়াজের সুপ খায়। ওরা মুসে কার্নাভ্যালেসহ এমনসব জায়গায় ঘুরতে যায় যেখানে ট্যুরিস্টরা কখনও যায় না। যেমন সিমেত্রি পেরে লাশাইজ–এখানে ঘুমিয়ে আছেন অস্কার ওয়াইল্ড, ফ্রেডেরিক শোপিন, অনর দ্য বালযাক এবং মার্শেল প্রাউর্স। ওরা সমাধিস্থল ঘুরে বেড়ায় এবং অলস ছুটির দিন কাটিয়ে দেয় সীন নদীতে ডোমিনিকের বন্ধুর ভাড়া করা বজরায়।

ডোমিনিকের সঙ্গটাই দারুণ। তার রসবোধ প্রখর, কোন কারণে টনির মন খারাপ হলে সে হাসিঠাট্টা করে মন ভালো করে দেয়। প্যারিসে হেন লোক নেই যাকে চেনে না ডোমিনিক, সে টনিকে মজার মজার সব পার্টিতে নিয়ে যায়। সেখানে টনির সঙ্গে কবি পল এলুয়ার্দ, কিংবা গ্যালেরি ম্যাগেটের তত্ত্বাবধায়ক অ্যান্ড্রু ব্রেটনের মতো বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

উৎসাহ-উদ্দীপনার এক অফুরন্ত উৎস যেন ডোমিনিক। সে সবসময়ই টনিকে বলে, 'তুমি ওদের সবার চেয়ে ভালো করবে, শেরি। আমার কথা বিশ্বাস করো। আমি জানি।'

রাতের বেলা ছবি আঁকার মুড এলে ডোমিনিক সানন্দে ওর জন্য পোজ দেয়, যদিও সারাদিন সে কাজ করেছে। *ঈশ্বর, আমি কত ভাগ্যবান,* ভাবে টনি। এই প্রথম কেউ তার মূল্যায়ন করে তাকে ভালোবাসছে, এ ব্যাপারটি খুব উপভোগ করে টনি। ডোমিনিককে কখনও বলেনি পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ একটি কোম্পানির উত্তরাধিকারী সে। বলেনি এ ভয়ে, এ কথা শোনার পরে ডোমিনিক যদি বদলে যায়, ওরা যা পেয়েছে তা যদি হারিয়ে ফেলে! তবে ডোমিনিকের জন্মদিনে ওকে একটি রাশান লিনক্স কোট কিনে দেয়ার লোভ সামলাতে পারল না টনি।

'এমন সুন্দর জিনিস আমার জীবনে দেখি নি!' কোট গায়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে নাচতে নাচতে বলল ডোমিনিক। তারপর হঠাৎ নাচ বন্ধ করে দিল সে। 'কিন্তু এটা এল কোত্থেকে, টনি। এত দামী জিনিস কেনার টাকা কোথায় পেলে তুমি?'

প্রশ্নের জবাব তৈরিই ছিল। 'এটা চুরি করা জিনিস। রোডিন মিউজিয়ামের রাস্তায় এক লোকের কাছ থেকে কিনেছি। খুব কম দামে।'

ডোমিনিক টনির দিকে ট্যারা হয়ে তাকিয়ে রইল এক মুহূর্ত তারপর ভেঙে পড়ল খিলখিল হাসিতে।

'এ জিনিস পরলে যদি আমাদেরকে জেলে যেতে হয় তাতেও আপত্তি নেই আমার।'

তারপর টনির গলা জড়িয়ে ধরে সে কাঁদতে শুরু করল। 'ওহ্, টনি, ইউ ইডিয়ট। ইউ ডার্লিং, ফ্যান্টাস্টিক ইডিয়ট।'

এক রাতে ডোমিনিক টনিকে প্রস্তাব দিল সে যেন তার জিনিসপত্র নিয়ে ডোমিনিকের ফ্ল্যাটে উঠে যায়। ইকোল দে ব্যু– আর্টস স্কুল এবং প্যারিসের খ্যাতনামা কয়েকজন শিল্পীর মডেল হয়ে বেশ ভালোই কামাচ্ছে ডোমিনিক। সে রু পেত্রে সেইন্ট সেভিরিনে আধুনিক ও বিরাট একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়েছে। 'এরকম একটা জায়গায় তোমার থাকা উচিত হচ্ছে না, টনি। এটা একটা থাকার জায়গা হলো? আমার সঙ্গে তুমি থাকবে। তোমাকে একটা পয়সাও ঘর ভাড়া দিতে হবে না। আমি তোমার জামাকাপড় ধুয়ে দেব, তোমার জন্য রান্না করব এবং–'

'না, ডোমিনিক। ধন্যবাদ।'

'কিন্তু কেন?'

কীভাবে ব্যাপারটা সে ব্যাখ্যা করবে? শুরুতে বলে দিলেই পারত ও ধনী মানুষ, কিন্তু এখন দেরি হয়ে গেছে। বললে অপমানবোধ করবে ডোমিনিক। তাই টনি বলল, 'তোমার ওপর আমি আসলে বোঝা হয়ে থাকতে চাই না। তুমি ইতিমধ্যে আমাকে অনেক দিয়েছ।'

'তাহলে আমি আমার অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে দিয়ে তোমার এখানে উঠব। আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাই।'

পরদিনই টনির ফ্ল্যাটে এসে উঠল ডোমিনিক।

ওদের মধ্যে চমৎকার একটা বন্ধন গড়ে উঠেছে। ছুটির দিনগুলোতে ওরা গ্রামাঞ্চলে যায়। সেখানে ঈজেল আর ব্রাশ নিয়ে বসে পড়ে টনি। নিস্বর্গের ছবি আঁকে। ক্ষিদে পেলে দু'জনের জন্য নিয়ে আসা পিকনিক লাঞ্চ পরিবেশন করে ডোমিনিক। তৃণভূমিতে বসে দু'জনে লাঞ্চ খায়। তারপর প্রেম করে। নিজেকে ভীষণ সুখী মনে হয় টনির।

টনির কাজের অগ্রগতি হচ্ছিল দারুণ। একদিন সকালে মেইতর ক্যান্টল টনির একটি ছবি নিয়ে ক্লাসের সবাইকে দেখালেন। 'শরীরটির দিকে তাকাও। মনে হচ্ছে এটা শ্বাস করছে।'

ডোমিনিককে ঘটনাটি সে রাতে বলার পরে ডোমিনিক প্রথমে খুশি হয়ে বেশ হাসল তারপর সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল, 'টনি, আমার মনে হয় না আরও তিন বছর তোমার স্কুলে পড়ার দরকার আছে। তুমি এখনই রেডি হয়ে গেছ। স্কুলের সবাই সেটা জানে, এমনকী ক্যান্টালও।'

তবে টনির ভয় সে খুব একটা ভালো চিত্রশিল্পী নয়, সে আর দশজনের মতোই অতি সাধারণ এবং তার কাজ অন্য সাধারণ আর্টিস্টের মতোই হারিয়ে যাবে। তবে মাঝে মাঝে নিজের আঁকা ছবি দেখে টনি নিজেই উল্লসিত হয়ে ভাবে আমার সত্যি ট্যালেন্ট আছে। আবার কখনও মনে হয় নাহ্, আমি স্রেফ একজন নবিশ।

তবে ডোমিনিকের উৎসাহে নিজের কাজের ব্যাপারে ক্রমেই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছিল টনি। সে ইতিমধ্যে দু'ডজন ছবি এঁকে ফেলেছে। ল্যান্ডস্কেপ, স্টিল লাইফ, একটি ছবিতে আছে ডোমিনিক নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে গাছের নিচে, সূর্যের আলো খেলা করছে তার শরীরে। একজন পুরুষ মানুষের জ্যাকেট এবং শার্ট পড়ে আছে মাটিতে। দেখেই বোঝা যায় নারীটি অপেক্ষা করছে তার প্রেমিকের জন্য।

ছবিটি দেখে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করল ডোমিনিক।

'তোমার অবশ্যই এক্সিবিশন করা উচিত!'

'পাগল হয়েছ, ডোমিনিক! আমি এখনও রেডি নই।'

'তোমার ধারণা ভুল, মা মেরী।

পরদিন বিকেলে টনি বাসায় ফিরে দেখে ডোমিনিক একা নয়। তার সঙ্গে আছে অ্যান্টন জর্জ। পেটমোটা অ্যান্টন জর্জ গ্যালারির মালিক। টনির ছবিগুলো ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

'ঘটনা কী?' জিজ্ঞেস করল টনি।

'ঘটনা হলো, মশিউ,' বলল অ্যান্টন জর্জ, 'আপনার কাজগুলো আমার দারুণ লেগেছে।' সে টনির পিঠ চাপড়ে দিল। 'আমার গ্যালারিতে আপনার ছবির একটি প্রদর্শনী করতে পারলে সম্মানিত বোধ করব।'

ডোমিনিকের দিকে তাকাল টনি। হাসিতে উদ্ভাসিত চেহারা।

'আ-আমি কী বলব বুঝতে পারছি না।'

'আপনার যা বলার সবকিছুই এ ক্যানভাসের মাধ্যমে বলে দিয়েছেন,' বলল অ্যান্টন জর্জ।

সেদিন অর্ধেক রাত জেগে এ বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করল টনি আর ডোমিনিক।

'আমি এখনও রেডি নই। সমালোচকরা আমার ছাল ছাড়াবে।'

'তুমি ভুল বলছ, শেরী। তুমি যথেষ্ট রেডি। এ গ্যালারিটা ছোট। এখানে শুধু স্থানীয় লোকজন এসে তোমার ছবির ভালোমন্দ বিচার করবে। কেউ তোমাকে দুঃখ দিতে আসছে না। তোমার ওপর ভরসা না থাকলে মশিউ জর্জ তোমার প্রদর্শনী করতেন না। আমার সঙ্গে তিনিও একমত যে একদিন খুব বড় মাপের চিত্রশিল্পী হবে তুমি।'

'ঠিক আছে,' অবশেষে বলল টনি। 'কে জানে? আমার দু'একটা ছবি হয়তো বিক্রিও হতে পারে।'

কেবল-এ লেখা **শনিবার প্যারিস আসছি। প্লিজ, আমার সঙ্গে ডিনার করবে। ভালোবাসা। মা**

মাকে স্টুডিওতে ঢুকতে দেখে টনির প্রথমেই যে কথাটি মনে হলো তা হলো *আমার মা এখনও কত সুন্দর!*

কেটের বয়স এখন মধ্য পঞ্চাশ, ঝলমলে কালো চুলের মাঝে দু'একটি রূপোলি ঝিলিক। মা'র অবয়ব থেকে সর্বদাই বিচ্ছুরিত হয় শক্তি। টনি একবার জিজ্ঞেস করেছিল কেন মা আবার বিয়ে করল না। জবাবে কেট বলেছিল, 'আমার জীবনে দু'জন মাত্র মানুষ গুরুত্বপূর্ণ। তুমি আর তোমার বাবা।'

প্যারিসে, নিজের ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে, মা'র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে টনি বলল, 'তো-তোমাকে দেখে খুব ভালো লাগছে, মা।'

'টনি, তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে। দাড়িতে দারুণ মানিয়েছে।' হাসল কেট, ছেলের দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'তোমাকে লাগছে তরুণ আব্রাহাম লিংকনের মতো।' ছোট অ্যাপার্টমেন্টে নজর বুলিয়ে মন্তব্য করল, 'থ্যাংক গড, তুমি কাজের বুয়া জোগাড় করেছ দেখছি। ঘরের চেহারাই বদলে গেছে।'

ঈজেলের সামনে এসে দাঁড়াল কেট। ক্যানভাসে নতুন ছবি এঁকে রেখেছে টনি। ছবিটির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল কেট। মা কী বলে শোনার জন্য দুরুদুরু বক্ষে অপেক্ষা করছে টনি।

কেট ভীষণ নরম গলায় বলল, 'ইটস ব্রিলিয়ান্ট, টনি। সত্যি দারুণ হয়েছে।' ছেলের জন্য তার খুব গর্ব হচ্ছিল। টনির দিকে ফিরল সে। 'তোমার আরও কিছু ছবি দেখাওতো।'

পরবর্তী দু'ঘণ্টা টনির আঁকা ছবি দেখল কেট। প্রতিটি ছবি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করল। তারপর বলল, 'তোমার ছবির একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করব। কয়েকজন ডিলারের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে তারা–'

'ধন্যবাদ, ম্-মা। তবে তোমাকে ব্য-ব্যস্ত হতে হবে না। আগামী শু-শুক্রবার আমার একটা শো আছে। একটা গ্যালারি আমার ছবির প্র-প্রদর্শনী করবে।'

টনিকে জড়িয়ে ধরল কেট। 'বাহ্, খুব ভালো খবর।

'কোন্ গ্যালারি?'

'জ-জর্জ গ্যালারি।'

'নাম শুনিনি।'

'ছো-ছোট গ্যালারি। তবে আমি হ্যামার কিংবা ভি-ভিল ডেডনেটিন গ্যালারিতে জায়গা পাবার মতো বড় শিল্পী এখনও হইনি।'

গাছের নিচে শুয়ে থাকা ডোমিনিকের ছবিটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল কেট। 'তুমি ভুল বলছ, টনি। আমার ধারণা এটি–'

সদর দরজা খুলে যাওয়ার শব্দ হলো। 'আমি কামোত্তেজিত হয়ে আছি, শেরি। তোমার জামাকাপড় খুলে–' কেটকে দেখতে পেল ডোমিনিক। 'ওহ্, merdi! আমি দুঃখিত। জা-জানতাম না তোমার মেহমান এসেছে, টনি।'

বরফশীতল নিস্তব্ধতা নামল ঘরে।

'ডোমিনিক, ইনি আমার ম্-মা। মা, আর এ হলো ডো-ডোমিনিক ম্যাসন।'

দুই নারী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল, দেখছে একে অন্যকে।

'কেমন আছেন, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল?'

কেট বলল, 'তোমাকে নিয়ে আমার ছেলের আঁকা ছবির প্রশংসা করছিলাম।'

আবার অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করল।

'টনির যে এক্সিবিশন হচ্ছে সে কথা কি ও আপনাকে বলেছে, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল?'

'হ্যাঁ, বলেছে। খুব খুশি হয়েছি শুনে।'

'তু-তুমি কি থাকতে পারবে, ম্-মা?'

'থাকতে পারলে খুব খুশি হতাম। কিন্তু পরশুদিন জোহানেসবার্গে আমার একটি বোর্ড মিটিং আছে। আর ওতে আমাকে উপস্থিত থাকতেই হবে। তোমার এক্সিবিশনের কথা আগে জানলে আমার শিডিউল রি-অ্যারেঞ্জ করা যেত।'

'ঠি-ঠিক আছে,' বলল টনি। 'আমি বুঝতে পারছি।' টনি ভেবে শংকিত মা আবার কোম্পানি সম্পর্কে ডোমিনিকের সামনে কী না কী বলে বসে। তবে কেটের মাথায় তখন পেইন্টিং ঘুরছে।

'তোমার প্রদর্শনীতে সঠিক মানুষজনের আসা উচিত।'

'সঠিক মানুষজন কারা, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল?'

ডোমিনিকের দিকে ফিরল কেট। 'অপিনিয়ন মেকার্স। সমালোচক। আন্দ্রে দেসিউ'র মতো মানুষের ওখানে যাওয়া উচিত।'

ফ্রান্সের সবচেয়ে নামী শিল্প সমালোচক আন্দ্রে দেসিউ। তিনি শিল্পকলার মন্দিরটা ভয়ংকর সিংহের মতো পাহারা দিয়ে রাখছেন, তার সামান্য রিভিউ বা সমালোচনা একজন চিত্রশিল্পীকে রাতারাতি বিখ্যাত করতে পারে আবার ধ্বংসও করে দিতে পারে। প্রতিটি প্রদর্শনীর উদ্বোধনীতে আমন্ত্রণ পান দেসিউ কিন্তু খুব বড় এক্সিবিশন ছাড়া কোথাও যান না তিনি। গ্যালারিটির মালিক এবং চিত্রশিল্পীরা তাঁকে দেখলে ভয়ে কাঁপে, উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করে কাগজে তাঁর লেখা সমালোচনা পড়ার জন্য। প্যারিসের শিল্পকলায় আন্দ্রে দেসিউকে সবাই সবচেয়ে ঘৃণা করে আবার একই সঙ্গে সম্মানও করে। তাঁর নিষ্ঠুর সমালোচনা সহ্য করা হয় কারণ এ বিষয়টিতে তিনি একজন এক্সপার্ট।

টনি কেটকে বলল, 'আন্দ্রে দেসিউ ছোট গ্যা-গ্যালারিতে কখনও যান না।'

'ওহ্, টনি। উনি নিশ্চয় যাবেন। তোমাকে উনি রাতারাতি বিখ্যাত করে দিতে পারবেন।'

'কিংবা আমাকে ভে-ভেঙেও ফেলতে পারেন।'

'নিজের ওপর তোমার ভরসা নেই?' কেট তার ছেলেকে লক্ষ করছে।

'অবশ্যই আছে,' বলল ডোমিনিক। 'তবে মশিউ দেসিউ আমাদের প্রদর্শনীতে আসবেন এতটা আশা করার দুঃসাহস আমরা দেখাই না।'

'আমি হয়তো এ ব্যাপারে কোনো সাহায্য করতে পারব,' বলল কেট। 'আমার কয়েকজন বন্ধু আছে যাদের সঙ্গে মশিউ দেসিউ'র জানাশোনা ভালো।'

খুশিতে উজ্জ্বল দেখাল ডোমিনিকের চেহারা। 'তাহলে তো খুবই ভালো হয়।' সে টনির দিকে ফিরল। 'শেরি, তোমার প্রদর্শনীতে ওনার আসার মানে বুঝতে পারছ তো?'

'আমি অতলে তলিয়ে যাব?'

'বাজে কথা বোলো না। আমি ওনার রুচি জানি, টনি। জানি উনি কী ধরনের ছবি পছন্দ করেন। তোমার ছবি ওনার পছন্দ হবেই।'

কেট বলল, 'তুমি না চাইলে আমি এ ব্যাপারে নাক গলাব না, টনি।'

'অবশ্যই ও চায়, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল।'

গভীর দম নিল টনি। 'আ-আমার ভয় করছে। তবে চেষ্টা করতে ক্ষ-ক্ষতি কী?'

'ঠিক আছে দেখছি কী করা যায়,' ঈজেলের ছবিটির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল কেট। তারপর ঘুরল টনির দিকে। চেহারায় বিষণ্নতা। 'খোকা, কাল আমি চলে যাব। আজ রাতে আমার সঙ্গে ডিনার করবে?'

টনি জবাব দিল, 'অবশ্যই করব, মা। আ-আমরা ফ্রি আছি।'

কেট ডোমিনিককে বলল, 'তোমরা কোথায় ডিনার করতে চাও ম্যাক্সিম'স নাকি—'

টনি দ্রুত বলে উঠল, 'ডোমিনিক আর আমি এ-এখান থেকে কাছেই একটা খু-খুব ভালো ক্যাফে চিনি।'

ওরা প্লেস ভিক্টোরির একটি বিস্ত্রোতে ডিনার করল। এখানকার খাবারটা বেশ সুস্বাদু, মদটাও চমৎকার। দুই নারীর মধ্যে বেশ সখ্য হয়ে গেছে লক্ষ করে মনে মনে গর্ব অনুভব করল টনি। *আমার জীবনের অন্যতম সেরা রাত আজ। আমি আছি আমার মায়ের সঙ্গে এবং সেই নারীটির সঙ্গে যাকে আমি বিয়ে করব।*

পরদিন সকালে এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করল কেট। 'আমি কয়েক জায়গায় ফোন করেছি। তবে আন্দ্রে দেসিউ সম্পর্কে কেউ আমাকে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারল না। সে যাই হোক, তোমাকে নিয়ে আমার খুব গর্ব হচ্ছে, সোনা। তোমার ছবিগুলো খুব ভালো হয়েছে, টনি। আই লাভ ইউ।'

'আ-আই লাভ ইউ, টু, ম্-মা।'

আটত্রিশ

জর্জ গ্যালারির দেয়ালে টনির ছবিগুলো উদ্বোধনের একেবারে শেষ মুহূর্তে যত্রতত্রভাবে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। মার্বেল পাথরের সাইনবোর্ডে দর্শকদের জন্য রাখা হয়েছে পনির, বিস্কিট এবং চ্যাবলিসের বোতল। গ্যালারিতে অ্যান্টন জর্জ, টনি, ডোমিনিক আর এক তরুণী সহকারী ছাড়া আর কেউ নেই। এ মেয়েটি শেষ কয়েকটি পেইন্টিং দেয়ালে ঝুলিয়ে দিচ্ছিল।

অ্যান্টন জর্জ ঘড়ি দেখল। 'আমন্ত্রণপত্রে উদ্বোধনীর কথা বলা হয়েছে সন্ধ্যা সাতটা। লোকজন যে কোনো সময় এসে পড়ল বলে।'

'কিন্তু কেউ যদি না আসে?' জিজ্ঞেস করল টনি। সে নার্ভাস নয়, আতংকবোধ করছে।

হাসল ডোমিনিক। ওর গাল ধরে আদর করল। 'তাহলে সবগুলো চিজ আর মদ আমরাই ভক্ষণ করব।'

লোকজন আসতে শুরু করল। প্রথমে আস্তে-ধীরে, তারপর দল বেঁধে। মশিউ জর্জ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করছে দর্শকদের। *এদেরকে দেখে ক্রেতা বলে মনে হচ্ছে না,* ভাবছে টনি। তার তীক্ষ্ণ চোখ দর্শকদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছে; একদল আর্টিস্ট এবং আর্ট স্টুডেন্ট থাকে যারা প্রতিটি প্রদর্শনীতে যায় প্রতিযোগিতা মূল্যায়ন বা বিশ্লেষণ করতে। দ্বিতীয় দল হলো আর্ট ডিলার যারা প্রতিটি এক্সিবিশনে যায় এ উদ্দেশ্য নিয়ে যাতে নতুন পেইন্টারদের সম্পর্কে অবমাননাকর খবর ছড়াতে পারে, আর তিন নম্বর দলে থাকে হোমোসেক্সুয়াল আর লেসবিয়ানরা যাদের কাজই হলো বেহুদা চিত্রকলার জগতে ঘোরাঘুরি করা।

আমি একটি ছবিও বিক্রি করতে পারব না, হতাশ হয়ে ভাবছে টনি।

মশিউ জর্জ ঘরের প্রান্ত থেকে ইশারা করছিল টনিকে।

'এদের কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছে আমার নেই,' ডোমিনিককে ফিসফিস করে বলল টনি। 'এরা এখানে এসেছে আমাকে ছিঁড়ে ফেলবার জন্য।'

'বোকার মতো কথা বলো না। ওরা এসেছে তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে। এখন মুখখানা একটু হাসিহাসি করো তো, টনি।'

মুখ হাসি হাসি করে সবার সঙ্গে মিলিত হলো টনি। তারা টনির ছবির বেশ প্রশংসা করল। লোকজনের আগমন অব্যাহত রইল। টনি ভাবছিল এরা কি মাগনা মদ আর চিজ

খাওয়ার লোভেই শুধু আসছে। কেউ তো একটি ছবিও কিনছে না। কিন্তু মদ, বিস্কিট আর পনির দ্রুত গলাধকরণ করে চলেছে সকলে।

'ধৈর্য ধরো,' মশিউ জর্জ টনির কানে কানে বলল। 'ওরা ছবির ব্যাপারে আগ্রহী। আগে ওদেরকে ছবির গন্ধ পেতে দাও। কোনো ছবি মনে ধরে গেলেই ওরা দাম জানতে চাইবে। ব্যস, বড়শি গিলে ফেলবে মাছ।'

একটু পরেই মশিউ জর্জ একটা সুখবর দিল টনিকে। নরম্যান্ডি ল্যান্ডস্কেপের ছবিটি বিক্রি হয়ে গেছে পাঁচশো ফ্রাঁয়।

এ মুহূর্তটির কথা সারাজীবন মনে থাকবে টনির। কেউ একজন সত্যি তার ছবি কিনল। কেউ ভেবেছে পয়সা খরচ করে সত্যি ওর শিল্পকর্মটা কেনা যায়। সে হয়তো টনির ছবিটি তার বাড়ি কিংবা অফিসে ঝোলাবে, ওটা দেখবে, বন্ধুদেরকে দেখাবে। একজন সফল চিত্রকরের ছবি বিশ্বজুড়ে শত শত মানুষের বাড়ি, অফিস কিংবা জাদুঘরে স্থান পায়, হাজার হাজার মানুষ সেসব ছবি দেখে মুগ্ধ হয়– কখনওবা লক্ষাধিক লোক। টনির মনে হলো সে দা ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো এবং রেমব্রান্ডটের মন্দিরে পা রেখেছে। সে আর শিক্ষানবিশ চিত্রশিল্পী নয়, একজন পেশাদার। কেউ টাকা দিয়ে তার সৃষ্টি কিনেছে।

ডোমিনিক দ্রুত হেঁটে এল ওর কাছে, উত্তেজনায় ঝিকঝিকে চোখ। 'তোমার আরেকটি ছবি বিক্রি হয়েছে, টনি।'

'কোনটি?'

'ফুলের ছবিটি।'

ছোট গ্যালারিটি এখন লোকের ভিড়ে পূর্ণ। তারা উচ্চস্বরে কথা বলছে, গ্লাসের ঠুনঠুন আওয়াজ হচ্ছে। অকস্মাৎ সমস্ত কোলাহল থেমে গেল, আশ্চর্য এক নৈশব্দ নেমে এল ঘরে। সবার গলার স্বর নেমে গিয়ে ফিসফিসানিতে পরিণত হয়েছে, তাদের চোখ দরজায়।

গ্যালারিতে প্রবেশ করছেন আন্দ্রে দেসিউ। ভদ্রলোকের বয়স মধ্য পঞ্চাশ, গড়পড়তা ফরাসীদের চেয়ে বেশ লম্বা। দৃঢ়, সিংহের মতো চেহারা, মাথাভর্তি সাদা কেশরের মতো কেশ। পরনে কেপ, মাথায় বসালিনো হ্যাট, তাঁর পেছন পেছন ঢুকল তাঁর একদল অনুসারী। যন্ত্রচালিতের মতো সবাই বিখ্যাত চিত্র সমালোচকটির জন্য পথ করে দিল। ঘরের প্রতিটি মানুষ একে চেনে।

টনির হাত খামচে ধরল ডোমিনিক। 'উনি এসেছেন! এখানে এসেছেন!'

মশিউ জর্জের বাপের জন্মেও এমন সম্মানিত ব্যক্তির আগমন ঘটেনি তার গ্যালারিতে। সে আন্দ্রে দেসিউকে কুর্নিশ করতে করতে মাথা প্রায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলল, সে সঙ্গে গদগদ স্বরে বলে চলেছে প্রবাদপ্রতীম মানুষটির আগমনে সে কীরকম ধন্য হয়ে গেছে ইত্যাদি।

'মশিউ দেসিউ,' তোতলাতে তোতলাতে বলল জর্জ,' আপনি এসেছেন কী যে

সম্মানিত বোধ করছি আমি! আপনি কি কিছু ওয়াইন আর চিজ নেবেন?' দামী কোনো মদের ব্যবস্থা নেই বলে মনে মনে নিজেকে গালি দিল সে।

'ধন্যবাদ,' বললেন বিখ্যাত মানুষটি। 'আমি আমার চোখের খিদে মেটাতে এসেছি। আমি শিল্পীর সঙ্গে পরিচিত হতে চাই।'

এমন অবাক হয়েছে টনি, নড়াচড়া ভুলে গেছে। ডোমিনিক তাকে সামনে ঠেলে দিল।

'ওইযে সে,' বলল মশিউ জর্জ। 'মি. আন্দ্রে দেসিউ, এ হলো টনি ব্ল্যাকওয়েল।'

গলার স্বর খুঁজে পেল টনি। 'কেমন আছেন, স্যার? আ-আপনি এসেছেন বলে অনেক ধন্যবাদ।'

জবাবে মৃদু মাথা ঝাঁকালেন আন্দ্রে দেসিউ তারপর দেয়ালে ঝোলানো ছবিগুলোর দিকে এগিয়ে গেলেন। সবাই সরে গিয়ে তাঁর জন্য জায়গা করে দিল। তিনি প্রতিটি ছবি দীর্ঘক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখলেন। টনি তার চেহারার ভাব পড়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। দেসিউ'র চেহারায় বিরক্তি বা আনন্দ কোনো ভাবই ফুটে নেই। তিনি ডোমিনিকের নগ্ন ছবিটির সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর কদম বাড়ালেন সামনে। পুরো ঘরটি চক্কর দিলেন তিনি যাতে কোনো ছবি মিস না করেন। ওদিকে বেদম ঘামছে টনি।

ছবি দেখা শেষ করে আন্দ্রে দেসিউ টনির কাছে গেলেন।

'ভাগ্যিস আমি এসেছিলাম,' ব্যস শুধু এ মন্তব্যই করলেন তিনি।

বিখ্যাত সমালোচকটি চলে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মাথায় গ্যালারির সবগুলো ছবি বিক্রি হয়ে গেল। একজন নতুন বিখ্যাত শিল্পীর জন্ম হয়েছে এবং সবাই জন্মলগ্নটিতে তার সঙ্গে থাকতে চায়।

'এমন ঘটনা আমার জীবনে এই প্রথম,' বলল উত্তেজিত মশিউ জর্জ। 'আন্দ্রে দেসিউ আমার গ্যালারিতে এসেছিলেন। আমার গ্যালারিতে! গোটা প্যারিস কাল এ ঘটনা জেনে যাবে। 'ভাগ্যিস আমি এসেছিলাম', আন্দ্রে দেসিউ কখনও ফালতু কথা বলেন না। এ ঘটনা শ্যাম্পেন পান করে স্মরণীয় রাখতে হবে। চলো, সেলিব্রেট করি।'

সে রাতে নিজেদের মতো করে সেলিব্রেট করল টনি আর ডোমিনিক। ডোমিনিক টনির বুকের মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে যেতে বলল, 'আমি এর আগেও চিত্র শিল্পীদের সঙ্গে শুয়েছি। তবে তোমার মতো বিখ্যাত হতে যাওয়া কারও সঙ্গে বিছানায় যাইনি। কাল প্যারিসের সবাই জেনে যাবে তুমি কী।'

ঠিকই বলেছিল ডোমিনিক।

পরদিন ভোর পাঁচটায় টনি আর ডোমিনিক দ্রুত জামাকাপড় পরে বেরিয়ে পড়ল সকালের খবরের কাগজ কিনতে। সংবাদপত্রের দোকানে মাত্র কাগজ এসেছে, টনি কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে চিত্রকলার পাতায় চলে গেল। তাকে নিয়ে আন্দ্রে দেসিউ'র রিভিউ বেশ বড় করেই ছাপানো হয়েছে। টনি জোরে জোরে পড়তে লাগল

'অ্যান্থনি ব্ল্যাকওয়েল নামে এক তরুণ আমেরিকান চিত্রকরের আঁকা ছবির প্রদর্শনী হয়ে গেল গতকাল জর্জ গ্যালারিতে। এ সমালোচনা লেখার জন্য ওটা ছিল দারুণ এক অভিজ্ঞতা। আমি এত বেশি প্রতিভাবান চিত্রশিল্পীদের চিত্র প্রদর্শনীতে গিয়েছি যে ভুলেই গিয়েছিলাম খারাপ পেইন্টিং কী জিনিস। গত রাতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনে পড়ে গেল...।

টনির মুখ ছাইবর্ণ হয়ে গেল।

'আর পড়তে হবে না,' মিনতি করল ডোমিনিক। সে টনির কাছ থেকে কাগজটি কেড়ে নিতে চাইল।

'ছাড়ো,' হুকুম করল টনি।

সে পড়ে চলল

প্রথমে ভেবেছিলাম বোধহয় মশকরা করা হচ্ছে। আমার বিশ্বাসই হতে চাইছিল না এরকম নবিশ পেইন্টিং কেউ প্রদর্শনীতে নিয়ে আসার সাহস দেখাতে পারে এবং এগুলোকে 'আর্ট' বলার দুঃসাহস দেখায়! আমি ছবিগুলোতে প্রতিভার ক্ষুদ্রতম স্ফূলিঙ্গটুকুর সন্ধান করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাইনি কিছুই। আমি বিভ্রান্ত মি. ব্ল্যাকওয়েলকে উপদেশ দেব তার আসল পেশায় যেন তিনি ফিরে যান, আর তা হাউজ পেইন্টিং হবে বলেই অনুমান করি।'

'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না,' ফিসফিস করল ডোমিনিক। 'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না তিনি তোমার ছবির মধ্যে কিছু দেখতে পাননি। ওহ্, ওই ব্যাটা একটা হারামী!' হুঁহুঁ করে কেঁদে ফেলল সে।

টনির বুকে যেন কেউ দশমনী পাথর চাপিয়ে দিয়েছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। 'উনি ছবিগুলো দেখেছেন,' বলল সে। 'এবং তিনি জানেন, ডোমিনিক। তিনি বুঝতে পেরেছেন আমাকে দিয়ে কিছু হবে না।' কণ্ঠে ওর তীব্র বেদনা। 'আমার যে কী কষ্ট লাগছে। ক্রাইস্ট! বোকার মতো কী কাজটাই না করেছি!' সে হাঁটা দিল।

'কোথায় যাচ্ছ, টনি?'

'জানি না।'

সে ভোরের শীতল রাস্তায় এলোমেলো পদক্ষেপে ঘুরে বেড়াল। জানে না দুচোখ বেয়ে অঝোরে ঝরছে অশ্রু। আর কিছুক্ষণের মধ্যে প্যারিসের সবাই এ সমালোচনামূলক লেখাটি পড়ে ফেলবে। সে সকলের হাসির পাত্রে পরিণত হবে। তবে টনির কষ্ট বেশি হচ্ছে এ কথা ভেবে, সে নিজেকে এতদিন ঠকিয়ে এসেছে। সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত চিত্রকর হিসেবে দারুণ একটি ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে পারবে। যাক, আন্দ্রে দেসিউ ওকে সে ভুলটা থেকে অন্তত রক্ষা করেছেন। সে সদ্য খোলা একটি বার-এ আকণ্ঠ মদ্যপান করে মাতাল হলো।

টনি পরদিন সকাল পাঁচটায় নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরল। ডোমিনিক তার জন্য অপেক্ষা করছিল। তীব্র উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে। 'এতক্ষণ কোথায় ছিলে, টনি? তোমার মা তোমাকে বেশ কয়েকবার ফোন করেছেন। তোমার চিন্তায় তিনি অস্থির।'

'তুমি মাকে লেখাটা পড়ে শুনিয়েছ?'

'হ্যাঁ, এমন পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন যে আমি–'

বেজে উঠল ফোন। টনির দিকে একবার তাকিয়ে রিসিভার তুলল ডোমিনিক। 'হ্যালো? জ্বী, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। ও এইমাত্র এল।' সে রিসিভার এগিয়ে দিল টনির দিকে। একটু ইতস্তত করে ফোনটা নিল টনি।

'হ্যালো, ম্-মা।'

বেদনার্ত শোনাল কেটের কণ্ঠ। 'টনি, ডার্লিং, আমার কথা শোনো। আমি ওনাকে তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করার জন্য চাপ দেব–'

'মা,' বিষণ্ন গলায় বলল টনি। 'এটা বি-বিজনেস ট্রানজেকশন নয়। এ হলো স-সমালোচকের মতামত। তাঁর মতে আমি খুবই বাজে একজন আর্টিস্ট।'

'ডার্লিং, আমি কী বলব বুঝতে পারছি না–' কেটের কণ্ঠ বুজে এল।

'ঠিক আছে, ম্-মা। আমি একটা ধা-ধাক্কা খেয়েছি। আমি চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কা-কাজ হয়নি। আমার আসলে প্র-প্রতিভাই নেই। দেসিউ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আর্ট ক্রিটিক। তিনি আমাকে ম-মস্ত একটা ভুল করা থেকে রক্ষা করেছেন।'

'টনি, তোমাকে আর কী বলব–'

'দ-দেসিউ যা বলার বলে দিয়েছেন। দ-দশ বছর পরে যে জিনিসটা জানতে পারতাম তা এ-এখনই জেনে গেলাম। এতে বরং ভালোই হলো। আমি এ শ-শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি।'

'এখনই কোথাও যেয়ো না, সোনা। আমি কাল জোহানেসবার্গ ছাড়ছি তারপর তুমি আর আমি একত্রে নিউইয়র্ক ফিরব।'

'আচ্ছা,' বলে রিসিভার রেখে দিল টনি। ফিরল ডোমিনিকের দিকে। 'আমি দুঃখিত, ডোমিনিক। তুমি ভুল মানুষটাকে বাছাই করেছিলে।'

ডোমিনিক কিছু বলল না। শুধু অপরিসীম বেদনা নিয়ে তাকিয়ে রইল টনির দিকে।

পরদিন রু-ম্যাতিননে ক্রুগার-ব্রেন্টের অফিসে বসে একটি চেক লিখছিল কেট ব্ল্যাকওয়েল। তার সামনে বসা লোকটি একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। 'বলতে আমার খারাপই লাগছে মিসেস ব্ল্যাকওয়েল, তবে আপনার ছেলের সত্যি ট্যালেন্ট আছে। সে খুব বড় চিত্রশিল্পী হতে পারত।'

কেট লোকটির দিকে শীতল চোখে তাকাল। 'মি. দেসিউ, পৃথিবীতে চিত্রশিল্পীর অভাব নেই। আমার ছেলে হাজারো পেইন্টারদের একজন হোক তা আমি চাই না।'

চেকটি এগিয়ে দিল সে মশিউ দেসিউর দিকে। 'আপনি আপনার ভূমিকা পালন করেছেন। আমি এখন আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব। জোহানেসবার্গ, লন্ডন এবং নিউইয়র্কের আর্ট মিউজিয়ামগুলোর স্পন্সর করবে ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেড। আপনি ছবি নির্বাচন করার দায়িত্বে থাকবেন– বিনিময়ে উচ্চহারে কমিশন পাবেন, অবশ্যই।'

দেসিউ চলে যাবার পরে মন খারাপ করে নিজের ডেস্কে বসে রইল কেট। সে তার ছেলেকে অসম্ভব ভালোবাসে। টনি যদি কোনোদিন জানতে পারে... সে জানে সে কী দারুণ ঝুঁকি নিয়েছে। কিন্তু টনি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ব্যবসা-বাণিজ্য এভাবে পায়ে ঠেলে সরিয়ে দেবে কেট তা সহ্য করতে পারছিল না। যত টাকাই লাগুক, যতই ঝুঁকি থাকুক, ছেলেকে সে প্রটেক্ট করবে। কোম্পানি রক্ষা করতে হবে। সিধে হলো কেট। খুব ক্লান্ত লাগছে। টনিকে নিয়ে সে বাড়ি ফিরবে। টনির মনের কষ্ট ভুলিয়ে দেবে সে। তারপর যে জন্য টনির জন্ম, কোম্পানির দায়িত্ব তার হাতে তুলে দেবে কেট।

উনচল্লিশ

পরবর্তী দুটো বছর টনি ব্ল্যাকওয়েলের মনে হলো সে একটা ঘানির মধ্যে পড়ে গেছে। ঘানিটা অনবরত ঘুরছে কিন্তু ওটা ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে জানে না সে। সে এক বিরাট প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকারী। ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেডের সাম্রাজ্যে এখন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পেপার মিল, এয়ারলাইনার, ব্যাংক এবং অনেকগুলো হাসপাতাল। টনিকে ইউনিয়ন ক্লাব, দ্য ব্রুক এবং দ্য লিঙ্কস ক্লাবের সদস্য করা হয়েছে। যেখানে খুশি তার অবাধ প্রবেশাধিকার কিন্তু নিজেকে একটা নকল লোক বলে মনে হয় টনির। মনে হয় এসবের কোনো কিছুরই যোগ্য নয় সে। সে তার দাদুর বিরাট ছায়ায় ঢাকা পড়ে আছে।

ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেডের যে কোনো কর্মচারীর চেয়ে দ্বিগুণ পরিশ্রম করে টনি। সে রাতদিন কাজে ডুবে থাকে অতীতের স্মৃতি ভুলে থাকতে। ডোমিনিককে সে চিঠি লিখেছিল। কিন্তু প্রাপককে পাওয়া যায়নি বলে সে চিঠি ফেরত এসেছে। মেইতর ক্যান্টলকে ফোন করেছিল টনি। জেনেছে স্কুলে আর মডেলের কাজ করে না ডোমিনিক। একেবারেই উধাও হয়ে গেছে সে।

টনি নিজের কাজ করে যায় দক্ষতা এবং নিয়ম কানুন মেনে তবে তাতে আবেগ বা ভালোবাসার কোনো ছোঁয়া থাকে না। সে সর্বক্ষণ নিজের মাঝে প্রগাঢ় এক শূন্যতা অনুভব করে। কেউ তা জানে না। এমনকী কেটও নয়। সে প্রতি সপ্তাহে টনির কাজের রিপোর্ট পায়। ছেলের কর্মদক্ষতায় সে প্রীত।

'ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি ওর প্রকৃতিগত একটা দক্ষতা রয়েছে,' ব্রাড রজার্সকে বলে কেট।

কেটের কাছে ছেলের ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করা মানে সে কোম্পানির প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ। টনি কীভাবে তার ভবিষ্যত নষ্ট করতে চলছিল মনে পড়লেই শিউরে ওঠে কেট এবং ছেলেকে সর্বনাশের কবল থেকে রক্ষা করতে পেরেছে বলে বাহবা দেয় নিজেকে।

১৯৪৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় ক্ষমতায় এল ন্যাশনালিস্ট পার্টি। অভিবাসন কঠোর হলেও দমন করা হলো প্রতিটি কালো মানুষকে benyshoek বহন করতে হলো। এটি একটি পাসের চেয়েও বেশি, তাদের লাইফ লাইন। এতে থাকছে কৃষ্ণাঙ্গদের বার্থ সার্টিফিকেট, ওয়ার্ক পারমিট এবং ট্যাক্সের রশিদ। এই পাস কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতিটি মুভমেন্ট

এবং জীবন নিয়ন্ত্রণ করে চলল। দক্ষিণ আফ্রিকায় বৃদ্ধি পেল দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং পুলিশ অত্যন্ত নির্মমভাবে সে রায়ট দমন করল। কেট খবরের কাগজে প্রায়ই এ অস্থিরতা এবং স্যাবোটাজের কথা পড়ে, আর বান্ডার নাম অবধারিতভাবে থাকবেই। বয়স হওয়া সত্ত্বেও সে এখনও আন্ডারগ্রাউন্ডের নেতা। নিজের লোকের জন্য সে তো লড়াই করবেই, ভাবে কেট। ও যে বান্ডা।

ফিফথ এভিন্যুর বাড়িতে টনির সঙ্গে নিজের ছাপ্পান্নতম জন্মদিন পালন করল কেট। *টেবিলের ওপাশে বসা চব্বিশ বছর বয়সী ওই সুদর্শন যুবকটি আমার ছেলে হতে পারে না,* মৃদু হেসে ভাবে সে। *কারণ আমি এখনও যথেষ্ট ইয়াং।*

টনি তার মা'র উদ্দেশে টোস্ট করল। 'টু-মা-মাই ফ্যান্টাস্টিক মা-মাদার। হ্যাপি বা-বার্থ ডে!'

'তুমি বরং বলো মাই ফ্যান্টাস্টিক ওল্ড মাদার,' *শীঘ্রি আমি অবসরে যাব,* ভাবে কেট, *তবে আমার ছেলে আমার জায়গাটা নিয়ে নেবে। আমার ছেলে!*

কেটের পীড়াপীড়িতে টনি ফিফথ এভিন্যুতে তার মায়ের বাসায় চলে এসেছে।

'এত বড় বাড়িতে বড্ড একা লাগে নিজেকে,' কেট বলেছিল ছেলেকে। 'পুরো ইস্ট উইংটা তোমাকে দিয়ে দেব আমি। তুমি তোমার মতো করে থাকবে।' মা'র সঙ্গে তর্ক করে লাভ হবে না ভেবে তার আদেশ মেনে নিয়েছে টনি।

প্রতিদিন সকালে মা আর ছেলে মিলে নাশতা করে, তারপর স্বাভাবিকভাবেই আলোচনা গড়ায় ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেডকে ঘিরে। টনি ভেবে পায় না এত টাকা আর ক্ষমতা দিয়ে তার মা কী করবে? মাকে সে বুঝতে পারে না। তবে মাকে সে ভালোবাসে। তাই মা'র কথামতো চলার চেষ্টা করে।

প্যান আমেরিকান ফ্লাইটে রোম থেকে নিউইয়র্কে ফিরছিল টনি। এ এয়ারলাইনটাকে ও বেশ পছন্দ করে। আরামদায়ক এবং দক্ষ। প্লেন আকাশে ওড়ার পরের মুহূর্ত থেকে কোম্পানির বৈদেশিক কিছু কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল টনি। সে ডিনার খায়নি, স্টুয়ার্ডেস তাকে ড্রিংক সেধেছে, বালিশ বা অন্য কিছু লাগবে কিনা জানতে চেয়েছে। সুদর্শন যাত্রীটিকে খুশি করতে তার চেষ্টার অন্ত নেই। কিন্তু টনি তাকে প্রতিবারই ফিরিয়ে দিয়েছে কিছু লাগবে না বলে।

টনির পাশের আসনে বসা মধ্যবয়স্কা এক নারী একটি ফ্যাশন পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিল। সে একটি পাতা উল্টেছে, ঘটনাক্রমে ওদিকে চোখ পড়ল টনির এবং সে প্রস্তরবৎ হয়ে গেল। বল গাউন পরা এক মডেলের ছবি। মডেলটি ডোমিনিক কোনো সন্দেহ নেই। সেই উঁচু, মসৃণ চোয়াল, গভীর সবুজ চোখ, মাথাভর্তি সোনালী কেশ। টনির হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পেল।

'মাফ করবেন,' মহিলাকে বলল টনি। 'আমি কি এ পৃষ্ঠাটি পেতে পারি?'

পরদিন সকালে টনি ড্রেসশপে ফোন করে তাদের অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সির নামটা জেনে নিল। তারপর ওখানে ফোন করল। বলল, 'এ মাসের ভোগ পত্রিকায় একটি ছবি দেখলাম। রথম্যান স্টোরের জন্য বল গাউন পরে একটি মেয়ে পোজ দিচ্ছে। রথম্যান স্টোর কি আপনাদের অ্যাকাউন্ট?'

'জ্বী।'

'আপনাদের মডেল এজেন্সির নামটা কী বলবেন?'

'কার্লটন ব্লেসিং এজেন্সি।' সে টনিকে ফোন নাম্বার দিল।

এক মিনিট পরে ব্লেসিং এজেন্সির এক মহিলার সঙ্গে ফোনে কথা বলল টনি। 'আমি আপনাদের এক মডেলকে খুঁজছি,' বলল সে। 'ডোমিনিক ম্যাসন।'

'আমি দুঃখিত। আমরা কাউকে পার্সোনাল ইনফরমেশন দিই না।' ওপাশে কেটে দেয়া হলো লাইন।

টনি রিসিভারের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইল। ডোমিনিকের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো রাস্তা বের করতেই হবে। সে ব্রাড রজার্সের অফিসে গেল।

'মর্নিং, টনি। কফি?'

'নো, থ্যাংকস, ব্রাড। তুমি কার্লটন ব্লেসিং মডেল এজেন্সির নাম শুনেছ?'

'শুনেছি বোধহয়। ওটার মালিক আমরা।'

'কী?'

'আমাদের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে ওটা কাজ করছে।'

'এজেন্সিটা কবে কিনলাম আমরা?'

'এই তো কয়েক বছর আগে। তুমি কোম্পানিতে জয়েন করার সময়। হঠাৎ এ ব্যাপারে আগ্রহ কেন?'

'আমি ওদের এক মডেলের খোঁজ করছি। আমার পুরনো এক বান্ধবী।'

'নো প্রবলেম। আমি ফোন করে–'

'তার দরকার হবে না। আমিই ফোন করতে পারব। ধন্যবাদ, ব্রাড।'

সেদিন বিকেলে টনি কার্লটন ব্লেসিং এজেন্সিতে গিয়ে নিজের নাম বলল। ষাট সেকেন্ড পরে অফিসের প্রেসিডেন্ট মি. টিলটনের ঘরে তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাওয়া হলো।

'আমাদের কী সৌভাগ্য মি. ব্ল্যাকওয়েল আপনি এসেছেন। আশা করি কোনো সমস্যা হয়নি। গত তিনমাসে আমাদের লাভের পরিমাণ–'

'আমি লাভ-ক্ষতির হিসাব নিতে আসিনি। এসেছি আপনাদের একজন মডেল ডোমিনিক ম্যাসনের ব্যাপারে খোঁজ নিতে।'

টিলটনের চেহারা উজ্জ্বল দেখাল। 'সে আমাদের খুব ভালো একজন মডেল। আপনার মা মানুষ চেনেন।'

চোখ পিটপিট করল টনি। 'ঠিক বুঝলাম না।'

'আপনার মা ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেছিল আমাদের এজেন্সিতে যেন ডোমিনিককে নিই। ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেডের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে আমরা আপনাদের কথামতো কাজ করতে বাধ্য। সব ফাইলপত্রে লেখা আছে। যদি দেখতে চান–'

'তার দরকার নেই,' খবরটা হজম করতে পারছে না টনি। মডেল এজেন্সির সঙ্গে তার মায়ের কী সম্পর্ক? 'আমি কি ডোমিনিকের ঠিকানাটি পেতে পারি, প্লিজ?'

'নিশ্চয়, মি. ব্ল্যাকওয়েল। ডোমিনিক আজ ভারমন্টে একটা লে আউটে ব্যস্ত থাকবে–' ডেস্কে রাখা শিডিউলে চোখ বুলালেন তিনি– 'তবে কাল বিকেলে সে ফিরছে।'

ডোমিনিকের অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে টনি, একটি কালো সেডান থামল। গাড়ি থেকে নেমে এল ডোমিনিক। সঙ্গে অ্যাথলেটদের মতো দেখতে প্রকাণ্ড চেহারার একটি লোক। সে ডোমিনিকের সুটকেস বহন করছে। টনিকে দেখতে পেয়ে ভয়ানক চমকে গেল মেয়েটি।

'টনি! মাই গড! তুমি– তুমি এখানে কী করছ?'

'তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।'

'অন্য সময় কথা হবে, বন্ধু,' বলল অ্যাথলেট। 'আজ বিকেলে আমরা ব্যস্ত আছি।'

টনি লোকটার দিকে তাকাল না পর্যন্ত। 'তোমার বন্ধুকে চলে যেতে বলো।'

ডোমিনিক লোকটার দিকে ফিরল। 'তুমি চলে যাও, বেন। আমি রাতে তোমাকে ফোন করব।'

লোকটা একটু ইতস্তত করে কাঁধ ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে।' সে কটমটে চোখে একবার টনিকে দেখে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। চলে গেল। ডোমিনিক টনিকে বলল, 'চলো, ভেতরে যাই।'

অ্যাপার্টমেন্টটি ডুপ্লেক্স ধরনের। সাদা কার্পেট, পর্দা এবং আধুনিক আসবাব দিয়ে সাজানো। নিশ্চয় অনেক দামী বাড়ি।

'তুমি তাহলে ভালোই কামাচ্ছ,' মন্তব্য করল টনি।

'হুঁ। আমি ভাগ্যবতী।' ডোমিনিক নার্ভাস ভঙ্গিতে ব্লাউজের ওপর হাত বুলাচ্ছে। 'ড্রিংক খাবে?'

'না, ধন্যবাদ। আমি প্যারিস ছাড়ার পরে বহুবার তোমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি।'

'আমি প্যারিস থেকে চলে গিয়েছিলাম।'

'আমেরিকা?'

'হ্যাঁ।'

'কার্লটন ব্লেসিং এজেন্সিতে কাজ পেলে কী করে?'

'আ-আমি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন করেছিলাম,' ভীরু গলায় জবাব

দিল সে।

'আমার মায়ের সঙ্গে তোমার কবে প্রথম দেখা হয়, ডোমিনিক?'

'কেন– প্যারিসে। তোমার অ্যাপার্টমেন্টে। মনে নেই তোমার?

'আমরা–'

'আমার সঙ্গে আর খেলা নয়,' বলল টনি। প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে তার। 'ইটস ওভার। আমি কোনোদিন কোনো মেয়ের গায়ে হাত তুলিনি। তবে যদি আরেকটা মিথ্যা কথা বলো, তোমার চেহারা আর ছবি তোলার উপযুক্ত থাকবে না।'

ডোমিনিক আপত্তি করে কিছু বলতে যাচ্ছিল, টনির চোখের ভয়ংকর ক্রোধ তাকে থামিয়ে দিল।

'আমি আরেকবার জানতে চাইছি। আমার মায়ের সঙ্গে তোমার প্রথম কবে পরিচয় হয়?'

এবারে আর জবাব দিতে ইতস্তত করল না ডোমিনিক।

'তুমি যখন ইকোল দে ব্যু আর্টসে ভর্তি হলে, সে সময়। তোমার মা-ই আমাকে ওখানে মডেলিংয়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন।'

অসুস্থ বোধ করল টনি। তবু কথা চালিয়ে গেল। 'যাতে তোমার সঙ্গে আমার খাতির হয়?'

'হ্যাঁ। আমি–'

'এবং আমার রক্ষিতা হওয়ার জন্য সে তোমাকে পয়সা দিয়েছিল যাতে তুমি আমার সঙ্গে ভালোবাসার ভান করতে পার?'

'হ্যাঁ। তখন সবে যুদ্ধ থেমেছে। আমার কাছে টাকা-পয়সাও ছিল না। ব্যাপারটা বুঝতে পারছ, টনি? তবে বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে সত্যি খুব পছন্দ করতাম–'

'স্রেফ আমার প্রশ্নের জবাব দাও।' টনির ভয়ংকর কণ্ঠ ভীত করে তুলল ডোমিনিককে। এ মানুষটাকে সে চেনে না। এ লোক ভয়াবহ কিছু একটা করে বসতে পারে।

'কেন?'

'তোমার মা চেয়েছিলেন আমি যেন সবসময় তোমাকে চোখে চোখে রাখি।'

ডোমিনিকের মধুর মধুর প্রেমের সংলাপ, ওর সঙ্গে মিলনের দৃশ্যগুলো টনির চোখের সামনে ভেসে উঠল। প্রচণ্ড ঘৃণা লাগল। সে আসলে তার মায়ের হাতের পুতুল ছাড়া কিছু নয়। মা সবসময় তাকে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে। মা তাকে একটুও গ্রাহ্য করে না। সে তার মায়ের ছেলে নয়। মা শুধু তাকে কোম্পানির উত্তরাধিকারী হিসেবেই দেখে। মা'র কাছে তার কোম্পানিই সবকিছু। শেষ বারের মতো ডোমিনিকের দিকে তাকাল সে, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ওর দিকে তাকিয়ে রইল ডোমিনিক। চোখ ভরে গেছে জলে। *আমি তোমাকে সত্যি ভালোবাসতাম, টনি। বিশ্বাস করো, আমার ভালোবাসায় ভান ছিল না, ছিল না কোনো মিথ্যা।*

কেট লাইব্রেরিতে বসে কাজ করছিল, পুরো টাল হয়ে ঘরে ঢুকল টনি।

'আমি ডো-ডোমিনিকের সঙ্গে ক-কথা বলেছি,' বলল সে।

'তু-তুমি, নিশ্চয় আমাকে নিয়ে অনেক ঠা-ঠাট্টা তামাশা করেছ।

কেটের শিরদাঁড়া টানটান হয়ে গেল। 'টনি–'

'আজ থেকে তুমি আমার ব্য-ব্যক্তিগত ব্যাপার থেকে দূরে থাকবে। শুনেছ আমার কথা?' সে টলোমলো পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ছেলের অপসৃয়মাণ দেহের দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ তীব্র আশংকায় কেঁপে উঠল কেট।

চল্লিশ

পরদিনই গ্রিনউইচ ভিলেজে একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করল টনি। সে আর তার মা'র সঙ্গে ডিনার করে না। কেটের সঙ্গে তার বর্তমান সম্পর্ক স্রেফ ব্যবসায়িক। ছেলের সঙ্গে বহুবারই আপোস করতে চেয়েছে কেট। প্রতিবারই তাকে এড়িয়ে গেছে টনি।

ছেলের আচরণ কষ্ট দেয় মাকে। কিন্তু কেট মনে করে সে যা করেছে টনির ভালোর জন্যই করেছে। যেমন সে একদা ডেভিডের মঙ্গলের জন্য করত। সে ডেভিডকে কোম্পানি ছেড়ে চলে যেতে দেয়নি, টনিকেও দেবে না। পৃথিবীতে কেটের ভালোবাসার শুধু ওই একজনই– তার ছেলে টনি। সে লক্ষ্য করেছে টনি দিনদিন নিজেকে সবার কাছ থেকে গুটিয়ে নিচ্ছে, নিজের মতো করে থাকছে। তার কোনো বন্ধু নেই। যে ছেলে একসময় ছিল হল্লাপ্রিয় এবং আড্ডাপ্রিয়, সে এখন একদমই কারও সঙ্গে আড্ডফাড্ডা দেয় না, একাকী থাকে। নিজের চারপাশে এমন একটা দেয়াল তৈরি করে রেখেছে সে ওই দেয়াল ভেদ করে তার কাছে পৌঁছানো অসম্ভব। *ওর আসলে একটা বউ দরকার দেখাশোনা করার জন্য,* ভাবে কেট। *আর দরকার একটি পুত্র সন্তান। ওকে এ ব্যাপারে সাহায্য করব আমি। সাহায্য করতেই হবে।*

কোম্পানিতে কেটের সবচেয়ে বিশ্বাসভাজন ব্রাড রজার্স তার মনিবীনীর অফিসে ঢুকে বলল, 'একটা খারাপ খবর আছে, কেট।'

'কী হয়েছে?

কেটের ডেস্কে একটি কেবল রাখল ব্রাড। 'সাউথ আফ্রিকান পার্লামেন্ট নেটিভস রিপ্রেজেন্টেটিভ কাউন্সিল বাতিল করে কম্যুনিস্ট অ্যাক্ট পাস করেছে।'

কেট আঁতকে উঠল, 'মাই গড!' এ অ্যাক্টের সঙ্গে কম্যুনিজমের কোনো সম্পর্ক নেই। এ আইনে বলা হয়েছে, যদি কেউ সরকারের কোনো নীতির বিরোধিতা করে কিংবা পরিবর্তনের চেষ্টা করে, কম্যুনিস্ট অ্যাক্টের অধীনে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে কারাগারে পাঠানো হবে।

'এ হলো কৃষ্ণাঙ্গ আন্দোলন নস্যাৎ করার ফন্দি,' বলল কেট।

'যদি–' বাধা পেল সে ইন্টারকমে সেক্রেটারির কথায়।

'বিদেশ থেকে আপনার জন্য একটা ফোন এসেছে। জোহানেসবার্গ থেকে মি. পিয়ার্স।'

জোহানেসবার্গ শাখা অফিসের ম্যানেজার জোনাথন পিয়ার্স।

ফোন তুলল কেট। 'হ্যালো, জনি, কী খবর? কেমন আছ?'

'আমি ভালো আছি, কেট। আপনাকে একটা খবর দিতে ফোন করলাম।'

'কী খবর?'

'এইমাত্র শুনলাম পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে বান্ডাকে।'

পরবর্তী ফ্লাইটে জোহানেসবার্গে উড়ে এল কেট। সে কোম্পানির আইনজীবীদের কাছে জানতে চেয়েছিল বান্ডার জন্য কী করা যেতে পারে। আইনজীবীরা তেমন আশ্বাসবাণী শোনাতে পারেনি। ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেড ক্ষমতাবান হলেও বান্ডাকে বোধহয় সাহায্য করতে পারবে না। তাকে রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কেট কল্পনা করতেও ভয় পাচ্ছে বান্ডার কপালে না জানি কী আছে ভেবে। তবে সে বান্ডার সঙ্গে দেখা করবে, কথা বলবে এবং জানতে চাইবে তাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে।

জোহানেসবার্গের অফিসে ঢুকেই কারাগারের পরিচালককে ফোন করল কেট।

'উনি আইসোলেশন ব্লকে আছেন, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। কারও সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে দেয়া হচ্ছে না। তবে আপনার কথা আলাদা। দেখি আপনার জন্য কী করতে পারি।'

পরদিন সকালে জোহানেসবার্গ জেলখানায় গেল কেট। সামনাসামনি দেখল বান্ডাকে। তার হাতে হাতকড়ি, পায়ে লোহার বেড়ি। ওদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে মাঝখানের একটি কাচের দেয়াল। বান্ডার সমস্ত চুল পেকে ধবধবে সাদা। তাকে দেখে হতাশ বা ক্রুদ্ধ কোনোটাই মনে হলো না। বরং কেটকে দেখে মৃদু হাসল বান্ডা। 'জানতাম তুমি আসবে। তুমি হয়েছ অবিকল তোমার বাবার মতো। বিপদ আর ঝামেলা থেকে কিছুতেই নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পার না।'

'দ্যাখো কী বলে!' আপত্তি জানাল কেট। 'এসব বাদ দিয়ে বলো এখান থেকে বেরুবার উপায় কী?'

'বাক্সে করে। একমাত্র কফিনে পুরেই ওরা আমাকে এখান থেকে বেরুতে দেবে।'

'আমার জানাশোনা অনেক ভালো লইয়ার আছেন। তাঁরা–

'বাদ দাও, কেট। আইনজীবীর দরকার নেই আমার। আমি খাঁচায় থাকতে পছন্দ করি না। আর ওদের এমন কোনো খাঁচা নেই যাতে আমাকে বন্দী করে রাখতে পারে।'

কেট বলল, 'বান্ডা, খবরদার, এমন কিছু করতে যেয়ো না। ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে।'

'আমাকে কেউ মেরে ফেলতে পারবে না,' বলল বান্ডা। 'আমি হচ্ছি সেই মানুষ যে হাঙর, ল্যান্ড মাইন আর শিকারী কুকুরের কবল থেকেও বেঁচে ফিরেছে।' তার চোখে নরম একটি আভা ফুটল। 'একটা কথা কী জানো, কেট, মাঝে মাঝে মনে হয় ওটাই

ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়।'

পরদিন কেট বান্ডার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, সুপারিনটেন্ডেন্ট বলল, 'আমি দুঃখিত, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। নিরাপত্তাজনিত কারণে ওনাকে আমরা এখান থেকে সরিয়ে ফেলেছি।'

'কোথায় আছে সে?'

'সে কথা আপনাকে বলা যাবে না।'

পরদিন সকালে কেট ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজে চোখ বুলাতে গিয়ে দেখল বড় বড় হেডিংয়ে ছাপা হয়েছে **কারাগার থেকে পালাতে গিয়ে গুলি খেয়ে মারা গেছেন বিদ্রোহী নেতা**। ঘণ্টাখানেক বাদে কারাগারে, সুপারিনটেন্ডেন্টের অফিসে হাজির হয়ে গেল কেট।

'কারাগার ভেঙে পালাতে গিয়ে উনি পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। ব্যস, ঘটনার এখানেই শেষ।'

তুমি ভুল বলছ, মনে মনে বলল কেট। ঘটনার এখানেই শেষ নয়। বান্ডা মারা গেছে। তাই বলে কি তার লোকের জন্য স্বাধীনতার স্বপ্নেরও মৃত্যু হয়েছে?

দিন দুই পরে, বান্ডার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষে নিউইয়র্কগামী প্লেনে উড়াল দিল কেট। জানালা দিয়ে তার প্রিয় স্বদেশভূমি দেখতে দেখতে মনে মনে বলল, উর্বর এ ভূমির নিচে লুকিয়ে আছে কোটি কোটি টাকার সম্পদ। এ ঈশ্বরের দান। তিনি অকাতরে দান করেছেন প্রাকৃতিক সম্পদ। কিন্তু এ দেশের ওপরে একটি অভিশাপ আছে। আমি এ দেশে আর কোনোদিন ফিরব না, করুণ মনে ভাবল কেট। কোনোদিন না।

ব্রাড রজার্সের অন্যতম দায়িত্ব হলো ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেডের লং-রেঞ্জ প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্টের বৈদেশিক বিষয়গুলো তত্ত্বাবধান করা। দেশের বাইরে কার সঙ্গে, কোথায় ব্যবসা করলে কোম্পানি লাভবান হবে এ লাইনঘাট খুঁজে বের করতে সে অত্যন্ত দক্ষ।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহের একদিনে সে কেট ব্ল্যাকওয়েলের অফিসে ঢুকল। 'একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি,' দুটো ফোল্ডার রাখল সে ডেস্কে।

'দুটো কোম্পানি। এদের যে কোনো একটি কোম্পানির সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলতে পারলেই কেল্লা ফতে।'

'ধন্যবাদ, ব্রাড। আমি রাতে এগুলোতে চোখ বুলাব।'

সে রাতে একা একা ডিনার শেষে ব্রাড রজার্সের দেয়া দুই কোম্পানির কনফিডেনশিয়াল রিপোর্টগুলো পড়ল কেট। কোম্পানি দুটোর নাম উইয়াট অয়েল অ্যান্ড টুল এবং ইন্টারন্যাশনাল টেকনোলজি। রিপোর্টগুলো দীর্ঘ এবং বিস্তারিত তবে দুটো

রিপোর্টের সঙ্গেই একটি চিঠি এঁটে দেয়া হয়েছে যে এ কোম্পানি দুটোর কোনোটিই নিজেদেরকে বিক্রি করতে আগ্রহী নয়। আর এ জন্যই কোম্পানি দুটোর প্রতি আগ্রহবোধ করল কেট। দুটি কোম্পানিরই মালিক দু'জন ধনবান ব্যক্তি। এবং তাঁরা অত্যন্ত দৃঢ় চরিত্রের মানুষ– তাদের কোম্পানি বিক্রি করবেন না। একটা চ্যালেঞ্জ অনুভব করল কেট। বহুদিন সে কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় না। আর যতই কোম্পানি দুটো নিয়ে সে ভাবতে লাগল ততই মনে হলো এ কোম্পানি সে হস্তগত করতে পারবে। উত্তেজিত বোধ করছিল কেট। সে কোম্পানি দুটোর গোপন ব্যালান্স শিট-এ আবার চোখ বুলাল। উইয়াট অয়েল অ্যান্ড টুলের মালিক একজন মেক্সিকান, চার্লি উইয়াট। কোম্পানির অ্যাসেটের মধ্যে রয়েছে তেলের খনি, একটি ইউটিলিটি কোম্পানিসহ ডজনখানেক লাভজনক অয়েল লিজ। কোনো সন্দেহ নেই উইয়াট অ্যান্ড টুল হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে পারলে দারুণ লাভবান হবে ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেড।

দ্বিতীয় কোম্পানিটিতে মনোযোগ ফেরাল কেট। ইন্টারন্যাশনাল টেকনোলজির মালিক একজন জার্মান, কাউন্ট ফ্রেডেরিক হফম্যান। ইসেন-এ ছোট একটি ইস্পাত কারখানা দিয়ে শুরু হয়েছিল কোম্পানি, কয়েক বছরের মধ্যে মহীরূহে পরিণত হয়েছে। তাদের বর্তমান ব্যবসার মধ্যে রয়েছে শিপইয়ার্ড, পেট্রো কেমিক্যাল প্ল্যান্ট, অয়েল ট্যাংকারের একটি বহর এবং কম্পিউটার ডিভিশন।

ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেড একবারে এ দু'টি কোম্পানির যে কোনো একটিকে হজম করতে পারবে। কোন কোম্পানিটি কিনবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কেট। NIS বা Not interested in selling লেখা চিঠিতে আরেকবার চোখ বুলাল সে।

দেখা যাক ওকে আমি কিনতে পারি কিনা, ভাবল কেট।

পরদিন সকালে ব্রাড রজার্সকে ডেকে পাঠাল কেট। 'তুমি ওই কনফিডেনশিয়াল ব্যালান্স শিটগুলো কীভাবে জোগাড় করলে জানতে খুব আগ্রহ হচ্ছে আমার।' হাসল সে। 'চার্লি উইয়াট আর ফ্রেডেরিক হফম্যান সম্পর্কে কিছু বলো শুনি।'

ব্রাড এদের বিষয়ে আগেই তথ্য-উপাত্ত জোগাড় করেছে।

'চার্লি উইয়াটের জন্ম ডালাসে। সে খুবই জৌলুসপূর্ণ জীবন যাপন করে, নিজের সাম্রাজ্য নিজেই চালায়, খুবই চালাকচতুর মানুষ। শূন্য হাতে শুরু করে এখন সে টেক্সাসের অর্ধেক শহরের মালিক।'

'বয়স কত তার?'

'সাতচল্লিশ।'

'ছেলেমেয়ে?'

'একটি মেয়ে আছে, পঁচিশ বছর বয়স। শুনেছি সে নাকি অপূর্ব সুন্দরী।'

'বিয়ে করেছে?'

'ডিভোর্সড।'

'আর ফ্রেডেরিক হফম্যান?'

'হফম্যান চার্লি উইয়াটের চেয়ে কয়েক বছরের ছোট। তার জন্ম জার্মানীর এক খ্যাতনামা পরিবারে। ভদ্রলোক বিপত্নীক। তার দাদু ছোট একটি ইস্পাতের কারখানা দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলেন। ফ্রেডেরিক হফম্যান পৈতৃক সূত্রে কারখানাটির মালিক হয়ে ওটাকে বিশাল এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। কম্পিউটারের রাজ্যে শুরুর দিকে যে ক'জনের প্রবেশাধিকার ঘটেছিল, হফম্যান তাদের একজন। মাইক্রোপ্রসেসরের প্রচুর পেটেন্টের মালিক সে। আমরা যতবার কম্পিউটার ব্যবহার করি, প্রতিবারই রয়ালিটি পায় হফম্যান।'

'সন্তান-সন্ততি?'

'একটি মেয়ে, তেইশ বছর বয়স।'

'দেখতে কেমন?'

'তা জানি না,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল ব্রডা রজার্স। 'পরিবারটি খুব রক্ষণশীল। নিজেদের ক্ষুদ্র সার্কেলের মধ্যেই শুধু ঘোরাফেরা করে।' একটু ইতস্তত করে যোগ করল, 'আমরা বোধহয় বেহুদা সময় নষ্ট করছি, কেট। আমি এ দুটি কোম্পানিরই টপ এক্সিকিউটিভদের সঙ্গে দু'তিনবার মদ্যপান করেছি। উইয়াট কিংবা হফম্যান কারোরই তাদের কোম্পানি বিক্রি করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। তারা জয়েন্ট ভেঞ্চারেও যেতে চায় না। তাদের আর্থিক অবস্থার কথা তো জানোই। কাজেই কোন দুঃখে তারা তাদের কোম্পানি বিক্রি করতে যাবে?'

আবার সেই চ্যালেঞ্জটা হুংকার ছাড়ল কেটের বুকের মধ্যে।

দশদিন পরে কেট একটা আমন্ত্রণ পেল মার্কিন রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে। ওয়াশিংটনে বিশ্বের প্রথম সারির আন্তর্জাতিক শিল্পপতিরা অনুন্নত দেশগুলোকে কীভাবে সাহায্য করতে পারেন সে বিষয়ে একটা কনফারেন্স হবে। কেট একটি ফোন করল। কিছুক্ষণ পরেই চার্লি ইউয়াট এবং কাউন্ট ফ্রেডেরিক হফম্যান কনফারেন্সে যোগ দেয়ার দাওয়াত পেল।

টেক্সান এবং জার্মান উভয়েরই একটা কাল্পনিক চেহারা মনে মনে খাড়া করেছিল কেট। বাস্তবে এদের সঙ্গে তার কল্পনা মিলে গেল। চার্লি উইয়াট প্রকাণ্ডদেহী– প্রায় ছয় ফুট চার ইঞ্চি লম্বা– কৃষ্ণাঙ্গ, ফুটবল খেলোয়ারদের মতো শরীর তবে ওতে এখন মেদ বাসা বেঁধেছে। তার মুখখানা বিরাট এবং টকটকে লাল, কথা বলে গমগমে স্বরে। চার্লি উইয়াট সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মায়নি। নিজের পরিশ্রমে বড় হয়েছে। সে এক বিজনেস জিনিয়াস। কেট তার সঙ্গে দশ মিনিট কথা বলেই বুঝতে পারল এ লোক যদি কোনো কিছুতে একবার 'না' বলে দেয় তাহলে তা 'হ্যাঁ' তে পরিণত করা অসম্ভব। ভীষণ একগুঁয়ে এবং জিদ্দি স্বভাবের মানুষ। কেউ তাকে ভয়-ভীতি কিংবা প্রলোভন দেখিয়ে

অথবা চালাকি করে তার কোম্পানি হস্তগত করতে পারবে না। তবে লোকটির একটি দুর্বল দিকের কথা জেনে ফেলেছে কেট এবং ওটাই তার জন্য যথেষ্ট।

ফ্রেডেরিক হফম্যান একদম চার্লি উইয়টের বিপরীত। সে সুদর্শন, অভিজাত অবয়ব, মাথার নরম বাদামী চুল, চাঁদিতে সামান্য পাক ধরেছে। সে অত্যন্ত কেতাদুরস্ত এবং সজ্জন ব্যক্তি। বাইরে ফ্রেডেরিক হফম্যানকে আমোদপ্রিয়, নরম-সরম মনে হলেও তার ভেতরটা ইস্পাতের মতো কঠিন, কথা বলেই টের পেয়েছে কেট।

একচল্লিশ

ওয়াশিংটনে কনফারেন্স চলল তিনদিন এবং সফলই হলো। চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট, সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন প্রেসিডেন্ট। কেট ব্ল্যাকওয়েল উপস্থিত সবাইকে তার ব্যক্তিত্বের ছটায় মুগ্ধ করল। সে আকর্ষণীয়া, ক্যারিশম্যাটিক এক নারী, এক কর্পোরেট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর।

কেট কিছুক্ষণের জন্য একাকী পেয়েছিল চার্লি উইয়াটকে। সেই ফাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ফ্যামিলিকে সঙ্গে আনেননি, মি. উইয়াট?'

'আমার মেয়েকে নিয়ে এসেছি। সে শপিংয়ে বেরিয়েছে।'

'তাই নাকি? বাহ্ চমৎকার।' কেউ জানে না হফম্যানের মেয়ে সম্পর্কে সমস্ত খোঁজ-খবর নিয়েছে কেট। হফম্যানের মেয়ে যে সকালে গারফিংকল থেকে একটা ড্রেস কিনেছে তা-ও কেটের জানা।

'আমি শুক্রবার রাতে ডার্ক হারবারে ছোট একটি ডিনার পার্টি দিচ্ছি। আপনি আর আপনার মেয়ে যদি সাপ্তাহিক ছুটিটা আমার ওখানে কাটান তো খুব খুশি হব।'

উইয়াট বলল, 'আপনার ডিনার পার্টির অনেক সুনাম আমি শুনেছি, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। নিশ্চয় যাব।'

হাসল কেট। 'খুশি হলাম শুনে। কাল রাতে আপনাদেরকে আমার ওখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করব।'

দশ মিনিট পরে ফ্রেডেরিক হফম্যানের সঙ্গে কথা বলল কেট।

'আপনি কি ওয়াশিংটনে একা এসেছেন, মি. হফম্যান? নাকি আপনার স্ত্রী আছেন সঙ্গে?'

'আমার স্ত্রী কয়েক বছর আগে মারা গেছেন,' বলল হফম্যান। 'আমার মেয়ে আছে আমার সঙ্গে।'

কেট জানে বাপ-মেয়ে হে-অ্যাডামস হোটেলের ৪১৮ নম্বর সুইটে উঠেছে। 'আমি ডার্ক হারবারে ছোটখাটো একটি ডিনার পার্টি দিচ্ছি। কাল যদি আপনি আপনার মেয়েকে নিয়ে আসেন তো খুব খুশি হই। সাপ্তাহিক ছুটিটা আমার এখানেই না হয় কাটালেন।'

'আমার জার্মানী ফিরে যাওয়ার কথা,' বলল হফম্যান। কেটকে একনজর দেখে নিয়ে মৃদু হাসল। 'তবে দু'একদিন পরে গেলেও কোনো ক্ষতি নেই।'

'চমৎকার। আমি আপনাদেরকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করব।

ডার্ক হারবারের বাড়িতে প্রতি মাসে দু'বার করে পার্টি দেয়া একটি অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে কেটের। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এসব পার্টি অলংকৃত করতে আসেন। এবং পার্টি করে কেট সবসময়ই লাভবান হয়। এবারের পার্টিটি আরও জাঁকজমকভাবে করার ইচ্ছে তার। তবে পার্টিতে টনির উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু টনি আসবে কিনা জানে না সে। গত এক বছরে খুব কম পার্টিতেই যোগ দিয়েছে টনি, আর কর্তব্যের খাতিরে অনিচ্ছাসত্ত্বে এলেও চেহারাটা দেখিয়েই আবার চলে গেছে। তবে এবারে টনিকে শুধু আসলেই হবে না, পার্টিতে তাকে সময়ও দিতে হবে।

পার্টির কথা টনিকে বললে সে নীরস গলায় বলল, 'আ-আমি আসতে পারব না। আমি সোমবার কা-কানাডা যাব। যাবার আগে অনেক কাজ সারতে হবে।'

'তোমার উপস্থিতি খুবই জরুরি,' কেট বলল তাকে। চার্লি উইয়াট এবং কাউন্ট হফম্যান আসছেন পার্টিতে।'

'আর তাঁরা–'

'আমি ওদেরকে চিনি,' বাধা দিল টনি। 'আমি ব্রাড রজার্সের সঙ্গে ক-কথা বলেছি। ওদের কোনো কো-কোম্পানিই আমাদের পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই।'

'আমি একটু চেষ্টা করে দেখতে চাই।'

মায়ের দিকে তাকাল টনি। 'কো-কোন্ কোম্পানির ব্যাপারে তোমার আগ্রহ বেশি?'

'উইয়াট অয়েল অ্যান্ড টুল। এ কোম্পানি আমাদের লাভের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে পনেরো শতাংশ, কিংবা তারচেয়েও বেশি। আরব দেশগুলো যখন উপলব্ধি করবে পৃথিবীর সমস্ত দেশ তাদের দিকে তাকিয়ে আছে, তারা একটি কার্টেল তৈরি করবে এবং তেলের দাম হয়ে উঠবে আকাশচুম্বি, তেল পরিণত হবে তরল সোনায়।'

'কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল টে-টেকনোলজি?'

কাঁধ ঝাঁকাল কেট। 'এটাও ভালো কোম্পানি। তবে লোভনীয় হলো উইয়াট অয়েল অ্যান্ড টুল। আমাদের জন্য পারফেক্ট অ্যাকুইজিশন। তোমাকে আমার ওখানে দরকার, টনি। কানাডায় কয়েকদিন পরে যেয়ো।'

পার্টি-ফার্টি একদমই পছন্দ নয় টনির। পার্টির লোকজনের বিরক্তিকর, আজাইরা প্যাঁচাল এবং অহংকারী ভাবভঙ্গি তার দু'চক্ষের বিষ। কিন্তু এটা হলো ব্যবসা। কাজেই... 'ঠিক আছে। আমি থাকব তোমার পার্টিতে।'

ব্যস, খাপে খাপ সব মিলে গেল।

কোম্পানির সেসনা প্লেনে উইয়াটদেরকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো মেইন শহরে, সেখান থেকে লিমুজিনে ফেরি পার হয়ে সোজা সেডার হিল হাউজ। কেট স্বয়ং ওদেরকে দোরগোড়ায় অভ্যর্থনা জানাল। ব্রাড রজার্স ঠিকই বলেছিল চার্লি উইয়াটের মেয়ে লুসি সম্পর্কে। রুদ্ধশ্বাস সুন্দরী। বেশ লম্বা মেয়েটি, কালো চুল, বাদামী চোখে সোনালি

ফুটকি, মেদহীন সুঠাম ফিগার। শরীর কামড়ে থাকা গালালোস ড্রেসটি তার যৌবনের দীপ্তি ঘোষণা করছে। ব্রাডের কাছে শুনেছে কেট বছর দুই আগে এক ইটালিয়ান প্লেবয়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে লুসির। লুসির সঙ্গে টনির পরিচয় করিয়ে দিল কেট প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য। কিন্তু প্রতিক্রিয়া চোখে পড়ল না। সে উইয়াট পরিবারের উভয়কে সমান সৌজন্য দেখিয়ে বার-এ নিয়ে গেল। ওখানে ড্রিংক পরিবেশনের জন্য অপেক্ষা করছিল বারটেন্ডার।

'ঘরটা ভারী সুন্দর,' বলল লুসি। তার গলার স্বর নরম এবং সুরেলা, টেক্সাস উচ্চারণ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

'আপনি কি এখানেই বেশিরভাগ সময় থাকেন?'

'না।'

টনি আর কিছু বলছে না দেখে যোগ করল লুসি।

'আপনার বেড়ে ওঠা কি এ বাড়িতে?'

'খানিকটা।'

টনির নীরবতা পুষিয়ে দিতে নিপুণ দক্ষতায় আলাপ চালিয়ে নিতে এগিয়ে এল কেট। 'এ বড়িতে টনির জীবনের সেরা কিছু সময় কেটেছে। কিন্তু বেচারা কাজে এমন ব্যস্ত থাকে যে এখানে আসার সময়ই করতে পারে না, তাই না, টনি?'

মা'র দিকে শীতল দৃষ্টি নিক্ষেপ করল টনি। বলল, 'ঠিক তা নয়। আসলে আমার কা-কানাডা যাওয়ার কথা ছিল–'

'কিন্তু আপনাদেরকে সঙ্গ দেয়ার জন্য ও কানাডা সফর স্থগিত করেছে,' চার্লি উইয়াটকে বলল কেট।

'বাহ, শুনে খুব সম্মানিত বোধ করছি,' বলল চার্লি উইয়াট।

'আমি তোমার অনেক প্রশংসা শুনেছি, বেটা।' হাসল সে। 'তুমি কি আমার সঙ্গে কাজ করবে?'

'আমার মা ম-মনে হয় না রাজি হবেন, মি. উইয়াট।'

আবার হাসল চার্লি উইয়াট। 'জানি আমি।' কেটের দিকে ফিরল। 'তোমার মা একজন মহিয়সী নারী। হোয়াইট হাউসের মিটিংয়ে যদি তুমি ওঁকে দেখতে–' থেমে গেল সে ফ্রেডেরিক হফম্যান এবং তার মেয়ে মারিয়ানকে ঘরে ঢুকতে দেখে। মারিয়ান হফম্যান তার বাবার মতো চেহারা পেয়েছে। সেই অভিজাত মুখমণ্ডল, কোমর ছাপানো লম্বা, সোনালি চুল। তার পরনে অফ-হোয়াইট শিফন ড্রেস। লুসির পাশে মারিয়ানকে একেবারেই ম্লান লাগছে।

'আমার মেয়ে মারিয়ানকে পরিচয় করিয়ে দিই?' বলল কাউন্ট হফম্যান। 'দুঃখিত আমাদের দেরি হয়ে গেল,' ক্ষমাপ্রার্থনা করল সে। 'লা গুয়ারডিয়ায় লেট করেছে প্লেন।'

'না না, ঠিক আছে,' বলল কেট। টনি জানে তার মা ইচ্ছে করেই এ দেরিটা করিয়েছে। সে উইয়াট এবং হফম্যানদেরকে আলাদা আলাদা প্লেনে মেইনে নিয়ে আসার

ব্যবস্থা করেছে। কেট চেয়েছিল উইয়াটরা আগে আসুক, হফম্যানরা পরে। এবং তা-ই হয়েছে। কেট বলল, 'আমরা মাত্রই ড্রিংক নিচ্ছিলাম। কী খাবেন বলুন?'

'স্কচ, প্লিজ,' বলল কাউন্ট হফম্যান।

মারিয়ানের দিকে ফিরল কেট। 'আর তুমি, মাই ডিয়ার?'

'কিছু না, ধন্যবাদ।'

কিছুক্ষণ পরে অন্যান্য অতিথিরা আসতে শুরু করলেন। টনি হাসিমুখ করে হোস্ট হিসেবে তাদেরকে সঙ্গ দিতে লাগল। কেট ছাড়া কেউ জানে না টনি এ ধরনের পার্টি কী অপছন্দ করে। মানুষজনের প্রতি তার ছেলে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে, এ ব্যাপারটি প্রায়ই শংকিত করে তোলে কেটকে।

বিরাট ডাইনিং রুমে দুটো টেবিল ফেলা হয়েছে। কেট মারিয়ান হফম্যানকে একটি টেবিলে সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারক এবং এক সিনেটরের মাঝখানে বসিয়েছে, নিজে অপর টেবিলে বসেছে লুসি আর টনিকে দু'পাশে নিয়ে। ঘরের সকল পুরুষ বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত, কেউই লুসির ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। কেট শুনল লুসি টনির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করছে। সন্দেহ নেই টনিকে তার খুবই পছন্দ হয়েছে। মৃদু হাসল কেট। শুরুটা মন্দ হয়নি।

পরদিন শনিবার, সকালে নাশতার টেবিলে বসে চার্লি উইয়াট কেটকে বলল, 'আপনার একটা ইয়ট দেখতে পেলাম জেটিতে নোঙর করে আছে। ওটা কতবড়?'

'ঠিক জানি না আমি।' কেট তার ছেলের দিকে ফিরল। 'টনি, কর্সএয়ারের দৈর্ঘ কত?'

ইয়টের দৈর্ঘ কত মা ঠিকই জানে, তবু টনি বিনীত স্বরে বলল, 'আ-আশি ফুট।'

'টেক্সাসে অতবড় বোট আমাদের নেই। অবশ্য আমরা খুব ব্যস্ত থাকি বলে প্লেনেই বেশিরভাগ সময় যাতায়াত করতে হয়।' ঠা ঠা করে হেসে উঠল উইয়াট। 'ভাবছি আপনার ইয়টে উঠে একটু পা ভেজালে কেমন হয়।'

হাসল কেট। 'নিশ্চয়। চলুন কাল আমরা বোটে চড়ে দ্বীপটা ঘুরে দেখে আসি।'

চার্লি উইয়াট বলল, 'দ্যাটস মাইটি কাইন্ড অব য়্যু, মিসেস ব্লাকওয়েল।'

ওদের দু'জনকে নীরবে লক্ষ করছিল টনি কিন্তু কোনো মন্তব্য করছিল না। সে ভাবছিল চার্লি উইয়াট কি বুঝতে পারেনি তার মা প্রথম পদক্ষেপটি নিয়ে ফেলেছে। হয়তো বুঝতে পারেনি। লোকটা চতুর ব্যবসায়ী কিন্তু কেট ব্ল্যাকওয়েল কী জিনিস সে জানে না।

কেট ফিরল টনি এবং লুসির দিকে। 'আজকের দিনটাতো খুব সুন্দর। যাওনা দু'জনে মিলে বোটে চলে ঘুরে এসো।'

টনি যাবে না বলার আগেই লুসি বলে উঠল, 'ওহ্, তাহলে তো দারুণ হয়।'

'আ-আমি দুঃখিত,' কাঠখোট্টা গলায় বলল টনি। 'বিদেশ থেকে আমার কতগুলো ফোন আসবে,' মা যে তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে তা ওদিকে না ফিরেও

অনুভব করল সে।

কেট মারিয়ান হফম্যানকে বলল, 'তোমার বাবাকে যে আজ সকালে দেখলাম না।'

'উনি দ্বীপ ঘুরতে বেরিয়েছেন। বাবা খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠেন।'

শুনলাম তুমি নাকি ঘোড়ায় চড়তে ভালোবাস। আমাদের এখানে খুব ভালো একটি আস্তাবল আছে।'

'ধন্যবাদ, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। আপনি কিছু মনে না করলে আমি একটু এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াতে চাই।'

'নিশ্চয়,' কেট ফিরল টনির দিকে। 'তুমি কি সত্যি মিস উইয়াটকে নিয়ে বোট ভ্রমণে যেতে পারবে না?' তার কণ্ঠে ইস্পাত-কাঠিন্য।

'স-সত্যি পারব না,' জবাব দিল টনি।

এটি, একটি ছোট্ট বিজয় হলেও বিজয় তো! লড়াই শুরু হয়ে গেছে এবং এ লড়াইয়ে হারতে চায় না টনি। অন্তত এবারে নয়। তার মা আর তার সঙ্গে প্রতারণা করতে পারবে না। সে টনিকে একবার দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করেছে, আবারও যে সে চেষ্টা করছে সে ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন টনি। তবে এবারে মাকে ব্যর্থ হতে হবে। মা উইয়াট অয়েল অ্যান্ড টুল কোম্পানি হাতাতে চায়। যদিও কোম্পানি বিক্রি করা বা কারও সঙ্গে যৌথভাবে ব্যবসা করার কোনো ইচ্ছেই চার্লি উইয়াটের নেই। তবে প্রতিটি পুরুষেরই কোনো না কোনো দুর্বলতা থাকে। আর কেট চার্লির দুর্বলতা জেনে ফেলেছে– তার মেয়ে। লুসির যদি ব্ল্যাকওয়েল পরিবারের সঙ্গে বিয়ে হয়, চার্লির কোম্পানিকে নিজের কোম্পানির সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত করে নেবে কেট। ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসা তার মায়ের দিকে তাকাল টনি। খুব ঘৃণা হলো। মহিলা ফাঁদখানা পেতেছে ভালোই। লুসি শুধু সুন্দরীই নয়, সে বুদ্ধিমতী এবং সহজেই যে কাউকে আকৃষ্ট করতে পারে। তবে এ খেলায় সে-ও টনির মতোই দাবার বোড়ে, যদিও টনি পৃথিবীর কোনো কিছুর বিনিময়েই লুসির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবে না। এ লড়াই শুধু তার সঙ্গে তার মায়ের।

নাশতা শেষ করে সিধে হলো কেট। 'টনি, তোমার ফোন আসার আগে একবার মিস উইয়াটকে বাগান থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে এসো।'

এবারে আর আপত্তি করার সুযোগ পেল না টনি। 'ঠিক আছে।' সে দ্রুত বাগান ঘুরিয়ে দেখাবে কেটকে।

কেট চার্লি উইয়াটকে জিজ্ঞেস করল, 'দুর্লভ বই-পুস্তকের প্রতি আপনার আগ্রহ আছে? আমার লাইব্রেরিতে এ ধরনের বইয়ের অভাব নেই।'

'আপনি যা দেখাতে চাইবেন তাতেই আমি আগ্রহবোধ করব,' বলল টেক্সান।

চিন্তা করার ভান করে কেট মারিয়ানের কাছে জানতে চাইল, 'তোমার একা একা খারাপ লাগবে না তো, বেটি?'

'আরে নাহ্। ধন্যবাদ, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। আমাকে নিয়ে একদম চিন্তা করবেন না।'

'আচ্ছা, চিন্তা করব না,' বলল কেট।

মায়ের এ কথার অর্থ কী জানে টনি। কেটের কাছে মিস হফম্যানের কোনো গুরুত্বই নেই তাই সে মেয়েটির ব্যাপারে কোনো আগ্রহও দেখাচ্ছে না। মা হাসিমুখে কথাটি বললেও আসলে তার নিচে লুকিয়ে আছে নিষ্ঠুরতা। আর এটাই টনির খুব খারাপ লাগছিল।

লুসি ওর দিকে তাকিয়েছিল। 'তুমি রেডি, টনি?'

'হুঁ।'

ওরা দু'জনে দরজায় পা বাড়াল। এমন সময় টনি শুনতে পেল তার মা বলছে, 'দু'টিতে দারুণ মানিয়েছে, তাই না?'

প্রকাণ্ড বাগান ধরে জেটির দিকে এগিয়ে চলল ওরা। ওখানে নোঙর করে রয়েছে কর্সএয়ার। কয়েক একর জুড়ে বাগানে ফুটে থাকা রঙবেরঙের ফুল; গ্রীষ্মের বাতাসে ছড়াচ্ছে সৌরভ।

'ভারী সুন্দর জায়গা,' মন্তব্য করল লুসি।

'হুঁ।'

'টেক্সাসে এরকম ফুলের বাগান আমাদের নেই।'

'আচ্ছা?'

'কী যে শান্ত আর সমাহিত জায়গাটা।'

'হুঁ।'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল লুসি। ঘুরল টনির দিকে।

লুসির চেহারায় রাগ। 'আমি কি তোমাকে অপমানজনক কোনো কথা বললাম?' জিজ্ঞেস করল টনি।

'তুমি কিছু বলছ না বলেই আমি অপমানবোধ করছি। তুমি আমার সমস্ত প্রশ্নের জবাব শুধু হুঁ হা দিয়ে সারছ। তোমার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে আমি যেন, আমি যেন তোমাকে ধাওয়া করেছি।'

'করেছ কি?'

খিলখিল হাসল লুসি। 'হ্যাঁ। তোমাকে যদি কথা বলানো শেখাতে পারতাম তাহলে যদি কাজ হতো?'

মুচকি হাসল টনি।

'কী ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল লুসি।

'কিছু না।'

সে তার মা'র কথা ভাবছিল। মা হেরে যেতে মোটেই ভালোবাসে না।

ওক প্যানেলের বিশাল লাইব্রেরিটি চার্লি উইয়াটকে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল কেট। বইয়ের তাকে রয়েছে অলিভার গোল্ডস্মিথ, লরেন্স স্টার্ন, টোরিয়াস স্মোলেট এবং জন ডানের

লেখা বইগুলোর প্রথম সংস্করণ। এ ছাড়াও বহু বিখ্যাত লেখকের দুর্লভ সব কপি রয়েছে শেলফগুলোতে। চার্লি উইয়াট মুগ্ধ চোখে বইগুলো দেখছিল। সে জন কিটসের চমৎকার বাঁধাই করা Endynmion এর সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'এটিতো রোজারবার্গ কপি,' বলল সে।

বিস্মিত চোখে তার দিকে তাকাল কেট। 'হ্যাঁ। মাত্র দুটো কপিই আছে।'

'আমার কাছে বাকি কপিটি আছে,' জানাল উইয়াট।

'বাহ, চমৎকার। আচ্ছা, আপনি কোথায় পড়াশোনা করেছেন?'

'কলোরাডো স্কুল অব মাইনিং-এ তারপর রোডস স্কলারশিপ নিয়ে অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করি।' একটু থেমে সে যোগ করল, 'শুনেছি আপনার দৌলতেই নাকি হোয়াইট হাউজ কনফারেন্সে আমার দাওয়াতটা পেয়েছিলাম।'

কাঁধ ঝাঁকাল কেট। 'ও কিছু না। ওরা আপনাকে পেয়ে খুশিই হয়েছিল।'

'সে আপনার দয়া, কেট। আমরা দু'জনে এখন একা, আপনার মনে ঠিক কী আছে বলে ফেলুনতো শুনি?'

বিয়াল্লিশ

নিজের প্রাইভেট স্টাডিতে বসে কাজ করছিল টনি। এটি নিচতলার মূল হলওয়ের পাশের একটি কক্ষ। গভীর একটি আরামকেদারায় বসেছিল টনি এমন সময় দরজা খোলার শব্দ শুনল। কেউ ঘরে ঢুকেছে। ঘুরে দেখল সে। মারিয়ান হফম্যান। টনি কিছু বলার আগেই মেয়েটি হাঁপিয়ে ওঠার মতো একটি শব্দ করে উঠল।

দেয়ালের ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে মারিয়ান। ওগুলো সব টনির আঁকা– প্যারিস থেকে আসার সময় কিছু ছবি সে নিয়ে এসেছিল। এ ঘরে টাঙিয়ে রেখেছে। মারিয়ান দেয়ালের প্রতিটি ছবি খুঁটিয়ে দেখল।

'আই ডোন্ট বিলিভ ইট,' বিড়বিড় করল মারিয়ান।

টনির হঠাৎ খুব রাগ হলো। সে জানে তার ছবিগুলো অতটা খারাপ নয়। চেয়ার ছেড়ে সিধে হওয়ার সময় ক্যাঁচকোঁচ শব্দে সচকিত হলো মারিয়ান। পাঁই করে ঘুরল সে।

'ওহ্, আয়াম সরি,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল সে। 'আমি জানতাম না এখানে কেউ আছেন।'

টনি রূঢ় কণ্ঠে বলল, 'ঠিক আছে।' কাজের সময় মেয়েটির অনুপ্রবেশে সে বেজায় বিরক্ত। 'আপনি কি কিছু খুঁজছেন?'

'না। এ-এমনি একটু ঘুরে দেখছিলাম। আপনার ছবির কালেকশন তো মিউজিয়ামে রাখার মতো।'

'কিন্তু এ ছবিগুলো নয়।'

টনির কণ্ঠের রুক্ষতা বিস্মিত করল মেয়েটিকে। আবার পরখ করল ছবিগুলো। ছবির গায়ে সই নজর কাড়ল।

'আপনি এঁকেছেন ছবিগুলো?'

'আপনার ভালো না লাগলে দুঃখিত।'

'খুবই সুন্দর হয়েছে ছবিগুলো।' টনির দিকে এগিয়ে এল সে।

'একটা কথা বুঝতে পারছি না, এত সুন্দর যে ছবি আঁকতে পারে তার অন্য কাজ করার দরকার কী? আপনি অসাধারণ। আপনি শুধু ভালো চিত্রকরই নন, অসাধারণ একজন আর্টিস্ট।'

টনি জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল। মেয়েটির কথায় পাত্তা দিচ্ছে না শুধু চাইছে ও যেন এখান থেকে চলে যায়।

'জানেন আমিও পেইন্টার হতে চেয়েছিলাম,' বলল মারিয়ান।

'অস্কার কোকোস্কার সঙ্গে একবছর কাজও করেছিলাম। কিন্তু পরে পেইন্টিং ছেড়ে দিই কারণ জানতাম খুব ভালো চিত্রকর হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু আপনি!' আবার ছবিগুলোর দিকে ফিরল সে। 'আপনি প্যারিসে পড়াশোনা করেছেন নিশ্চয়?'

মেয়েটিকে ভাগানোর জন্য তার প্রশ্নের জবাব দিল টনি। 'হুঁ।'

'কিন্তু হুট করে ছেড়ে চলে এসেছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'খুব খারাপ করেছেন আপনি—'

'তুমি এখানে!'

ওরা দু'জনেই ঘুরল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে কেট। ওদের ওপর এক ঝলক নজর বুলিয়ে মারিয়ানের কাছে হেঁটে এল সে। 'তোমাকে সারা বাড়ি খুঁজছিলাম, মারিয়ান। তোমার বাবা বললেন অর্কিড নাকি তোমার খুব পছন্দের বিষয়। তাহলে আমাদের গ্রিন হাউজটা একবার ঘুরে এসো।'

'ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করল মারিয়ান। 'আমি—'

কেট ফিরল টনির দিকে, 'টনি, তোমার উচিত ছিল অন্যান্য অতিথিদের একটু খোঁজখবর নেয়া।' তার কণ্ঠে পরিষ্কার অসন্তোষ।

সে মারিয়ানের হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মা মানুষকে কী দারুণ পটাতে পারে এটাও দেখার মতো জিনিস। আর মায়ের কোনো কৌশলই কখনও বিফলে যায় না। উইয়াটদের আগে আগমন আর হফম্যানদের বিলম্ব উপস্থিতি থেকে মা'র কৌশলের শুরু। খাবার টেবিলে সবসময় টনির পাশে জায়গা হয় লুসির। তারপর চার্লি উইয়াটের সঙ্গে মা'র গোপন শলাপরামর্শ। টনির কাছে ব্যাপারটা জলবৎ তরলং যে সে এ খেলার চাবিকাঠি। মা কী বলছে, তার উদ্দেশ্য কী সবই টনির কাছে পরিষ্কার। লুসি উইয়াট খুব সুন্দরী। যে কোনো পুরুষের উপযুক্ত স্ত্রী হওয়ার যোগ্য। তবে টনির তাকে বিয়ে করার কোনো ইচ্ছেই নেই। টনি এবারে কোনোভাবেই তার মায়ের নির্দয়, হিসেবী খেলার উপকরণ হবে না। তবে সে ভাবছিল মা'র পরবর্তী পদক্ষেপটি কী হবে।

অবশ্য এ জন্য খুব বেশি অপেক্ষা তাকে করতে হলো না।

ওরা টেরাসে বসে ককটেল পান করছিল। টনিকে কেট বলল, 'মি. উইয়াট আগামী সাপ্তাহিক ছুটিতে তার র‍্যাঞ্চ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আমাদেরকে। চমৎকার ব্যাপার না?' তার মুখ খুশিতে ঝলমল করছে। 'আমি কখনও টেক্সাস র‍্যাঞ্চ দেখিনি।'

টেক্সাসে ক্রুগার-ব্রেন্টের একটি র‍্যাঞ্চ আছে এবং সেটি উইয়াটদের খামার বাড়ির চেয়ে আয়তনে বড় বৈ ছোট হবে না।

'তুমি আসছ তো, টনি?' জিজ্ঞেস করল চার্লি উইয়াট।

লুসির অনুরোধ, 'তোমাকে যেতেই হবে, প্লিজ।'

ওরা সবাই একত্রে জোট বেধেছে। এটা একট চ্যালেঞ্জ। চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিল টনি। 'আ-আচ্ছা, যাব।'

'গুড,' লুসির মুখ খুশিতে উদ্ভাসিত। কেটেরও।

লুসি যদি আমাকে প্রলোভিত করতে চায়, ভাবছে টনি, তাহলে বেহুদা সময় নষ্ট করছে সে। তার মা এবং ডোমিনিক মিলে তাকে যে কষ্ট দিয়েছে, আঘাত করেছে, গোটা নারীকূলের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা এসে গেছে টনির। সে এখন উচ্চমূল্যের বেশ্যা ছাড়া অন্য কোনো নারীর সঙ্গে সময় কাটায় না। তার চোখে নারীকূলের মধ্যে এরাই সবচেয়ে সৎ। এরা শুধু টাকার বিনিময়ে শরীর বিকোয়, ভালোবাসার ভান করে না। তুমি ওদেরকে টাকা দাও, বিনিময়ে শারীরিক সুখ কিনে নাও। এর মধ্যে কোনো জটিলতা নেই, কোনো অশ্রুপাত নেই, নেই প্রতারণার ভয়।

লুসি উইয়াট ওর কাছ থেকে একটা ধাক্কা খাবে।

রোববার বেশ ভোরে টনি সুইমিং পুলে গেল সাঁতার কাটতে। মারিয়ান হফম্যান সাদা রঙের একটি বিকিনি পরে সাঁতার কাটছিল। তার ফিগারটা বেশ সুন্দর, লম্বা, ছিপছিপে, দীর্ঘাঙ্গিনী। চমৎকার নিয়মিত ছন্দে মারিয়ান দু'হাতে পানি কাটছে। টনিকে দেখতে পেয়ে সে ওর দিকে সাঁতার কেটে এগিয়ে এল।

'গুড মর্নিং।'

'মর্নিং। আপনি তো বেশ ভালো সাঁতার জানেন,' বলল টনি। হাসল মারিয়ান। 'আমি খেলাধুলা খুব পছন্দ করি। এ অভ্যাসটাই পেয়েছি আমার বাবার কাছ থেকে। সে পুলের ধারে উঠে বসল। তাকে একটি তোয়ালে ধরিয়ে দিল টনি। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে তোয়ালে দিয়ে চুল মুছতে লাগল মারিয়ান।

'নাশতা করেছেন?' জানতে চাইল টনি।

'না। এত সকালে বাবুর্চি পাব না ভেবে আর নাশতা করা হয়নি।'

'এটা একটা হোটেল। এখানে চব্বিশ ঘণ্টা সেবার ব্যবস্থা রয়েছে।'

টনির দিকে তাকিয়ে হাসল মারিয়ান। 'বাহ্ ভালো তো।'

'আপনার বাড়ি কোথায়?'

'মিউনিক। আমরা শহরের বাইরে একটা পুরনো শ্লস মানে প্রাসাদে থাকি।'

'আপনি বড় হয়েছেন কোথায়?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মারিয়ান। 'সে এক দীর্ঘ কাহিনী। যুদ্ধের সময় আমাকে সুইটজারল্যান্ডের স্কুলে ভর্তি করা হয়। তারপর অক্সফোর্ডে যাই, পড়াশোনা করি সরবোনে, কয়েক বছর লন্ডনে ছিলাম।' টনির চোখে চোখ রাখল সে। 'আর আপনি?'

'আমি নানান জায়গায় থেকে বড় হয়েছি। নিউইয়র্ক, মেইন, সুইটজারল্যান্ড, আফ্রিকা, যুদ্ধের সময় কিছুদিন ছিলাম সাউথ প্যাসিফিকে, প্যারিস...' আচমকা থেমে গেল টনি, যেন অনেক কথা বলে ফেলেছে।

'অনধিকার চর্চা করে থাকলে ক্ষমা করবেন কিন্তু আমি সত্যি বুঝতে পারছি না আপনি ছবি আঁকা কেন ছেড়ে দিলেন।'

'ওটা জানা কোনো জরুরি বিষয় নয়,' কর্কশ সুরে বলল টনি।

'চলুন, নাশতা করি।'

বে-র ঝলমলে জলরাশির দিকে মুখ করা টেরাসে বসে ওরা নাশতা সারল। মারিয়ানের সঙ্গে কথা বলে আরামে আছে। মেয়েটির ব্যক্তিত্ব, ভদ্রতাবোধ ভালো লাগল টনির। এ মেয়ে তোষামোদী করে কিছু বলে না, আজাইরা প্যাঁচাল পাড়ে না। তবে টনির প্রতি তার আগ্রহ অকৃত্রিম বলেই মনে হচ্ছিল। টনি শান্ত স্বভাবের, সুশ্রী এ নারীটির প্রতি আকর্ষণবোধ করতে লাগল। মারিয়ানের প্রতি সে আগ্রহ বোধ করছে জানলে মা কীরকম শকড হবে ভেবে আমোদ পেল টনি।

'জার্মানিতে ফিরছেন কবে?'

'আগামী সপ্তাহে,' জবাব দিল মারিয়ান। 'আমি বিয়ে করছি।'

মারিয়ানের কথা শুনে চমকে গেল টনি। 'ওহ্,' শুকনো শোনাল তার কণ্ঠ। 'খুব ভালো খবর। তা পাত্রটি কে?'

'সে পেশায় ডাক্তার। অনেকদিন ধরে ওর সঙ্গে আমার জানাশোনা।' *শেষের কথাটা বলতে গেল কেন মারিয়ান? এর কি কোনো দরকার ছিল?'*

আবেগের চোটেই বোধহয় টনি প্রস্তাব দিয়ে বসল, 'আমার সঙ্গে নিউইয়র্কে ডিনার করবেন?'

ওকে যেন একটু পরখ করে নিল মারিয়ান, কী জবাব দেবে হয়তো ভাবছিল। 'আমার আপত্তি নেই।'

খুশি হয়ে হাসল টনি। 'ইটস আ ডেট।'

লং আইল্যান্ডে সমুদ্র তীরবর্তী ছোট একটি রেস্টুরেন্টে ওরা ডিনার করল। টনি চায়নি তার মা এ ডিনারের কথা জানুক। জানতে পারলে সে এর মধ্যে কোনো না কোনোভাবে বিষ ঢোকানোর চেষ্টা করত। আজ শুধু মারিয়ানের সঙ্গে খানিকটা একান্ত সময় কাটাতে চেয়েছে টনি। সে মারিয়ানের সঙ্গ চমৎকার উপভোগ করছিল। মেয়েটির চকিত লাজমাখা রসবোধ খুব ভালো। প্যারিস ত্যাগ করার পরে এই প্রথম প্রাণখুলে হাসল টনি। মারিয়ানের সঙ্গ ওর বুকটাকে হালকা করে দিয়েছে।

জার্মানিতে ফিরছেন কবে?

আগামী সপ্তাহে... আমি বিয়ে করছি।

পরের পাঁচদিন মারিয়ানের সঙ্গে টনির ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি পেল। সে কানাডা সফর

বাতিল করল, তবে নিজেও জানে না কেন। হতে পারে তার মায়ের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এটি একটি প্রতিবাদ, একটি ছোট্ট প্রতিশোধ। তবে শুরুতে ব্যাপারটা ঘটলে হয়তো সত্যি ছিল, এখন আর ওটা সত্যি নয়। টনি লক্ষ করেছে মারিয়ানের প্রতি তার আকর্ষণ বেড়েই চলেছে। মেয়েটির সততা সে খুব পছন্দ করে। এ গুণ কোনো মেয়ে মানুষের মধ্যে আছে বলে এতদিন সে বিশ্বাসই করেনি।

নিউইয়র্কে এই প্রথম এসেছে মারিয়ান। তাকে শহর ঘুরিয়ে দেখাল টনি। ওরা স্ট্যাচু অব লিবার্টিতে চড়ল, ফেরিতে চেপে গেল স্টাটেন আইল্যান্ড, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের মাথায় গেল দু'জনে, লাঞ্চ করল চায়না টাউনে। পুরো একটা দিন কাটিয়ে দিল মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম অব আর্টে, বিকেলে গেল ফ্রিক কালেকশন দেখতে। ওদের দু'জনের রুচিতে অপূর্ব মিল। দু'জনেই সতর্কতার সঙ্গে ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকল, যদিও উভয়ে সচেতন একে অন্যের প্রতি শারীরিক আকর্ষণের তীব্র স্রোত সম্পর্কে। শুক্রবার এল। আজ উইয়াটদের র‍্যাঞ্চ ঘুরতে যাওয়ার কথা টনির।

'তুমি জার্মানি যাচ্ছ কবে?' মারিয়ানকে জিজ্ঞেস করল টনি।

'সোমবার সকালে,' তার কণ্ঠ নিষ্প্রাণ শোনাল।

বিকেলে হাউস্টনের উদ্দেশে রওনা হলো টনি। সে তার মা'র সঙ্গে কোম্পানির বিমানে চড়ে যেতে পারত, কিন্তু দু'জনে একত্রে থাকলে আবার কোনো জটিলতা তৈরি হয় এ ভয়েই টনি গেল না। টনি খুব ভালো করেই জানে তার মা পুরোপুরি একজন ব্যবসায়ী নারী, বুদ্ধিমতী, প্রভাবশালী, কুটিল এবং বিপজ্জনক।

হাউস্টনের উইলিয়াম পি. হবি এয়ারপোর্টে টনির জন্য একটি রোলস রয়েস অপেক্ষা করছিল। লিভাই'স জিন্স আর রঙ ঝলমলে স্পোর্ট শার্ট পরা এক শোফার টনিকে নিয়ে র‍্যাঞ্চ অভিমুখে রওনা দিল।

'অনেকেই সরাসরি প্লেনে চড়ে খামারে চলে আসেন,' টনিকে জানাল ড্রাইভার। 'ওখানে মি. উইয়াট বেশ বড়সড় একটি ল্যান্ডিং স্ট্রিপ তৈরি করেছেন। এয়ারপোর্ট থেকে গাড়িতে ফটক পর্যন্ত পৌঁছাতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে, তারপর আরও আধঘণ্টা লাগবে মূল বাড়িতে পৌঁছাতে।'

টনি ভেবেছিল ব্যাটা চাপা মারছে। কিন্তু ড্রাইভার সত্যি কথাই বলেছে। খামার না বলে ওটাকে ছোটখাট একটা শহর বলাই ভালো। ওরা গাড়ি নিয়ে মেইন গেট হয়ে একটি প্রাইভেট রোডে ঢুকল, ত্রিশ মিনিট পরে একের পর এক পার হতে লাগল বিদ্যুৎ উৎপাদন ভবন, গোলাবাড়ি, অশ্ব প্রজনন ও প্রতিপালন কেন্দ্র, গেস্ট হাউস এবং সার্ভেন্ট বাংলো। মূল বাড়িটি একতলা এবং এতই বড় যে, টনির মনে হলো এর বুঝি কোনো সীমা পরিসীমা নেই। তবে বিশাল বাড়িটি টনিকে খুব একটা আকৃষ্ট করতে পারেনি।

কেট আগেই চলে এসেছে। সে আর চার্লি উইয়াট টেরাসে বসে আছে। টেরাসের

সামনে ছোটখাট লেক সাইজের প্রকাণ্ড এক সুইমিং পুল। টনি এসে দেখে দু'জনে গভীর আলাপে মগ্ন। টনিকে দেখে মাঝপথেই আলোচনায় ব্রেক কষল চার্লি। টনি অনুমান করল ওদের দু'জনের আলোচনার বিষয় ছিল সে।

'এই যে আমাদের ছেলে এসে গেছে! আসতে কোনো সমস্যা হয়নি তো, টনি?'

'না-না। ধন্যবাদ।'

'লুসি আশা করেছিল তুমি আরও আগে আসবে,' বলল কেট।

মায়ের দিকে ফিরল টনি। 'তা-তাই নাকি?'

চার্লি উইয়াট টনির কাঁধ চাপড়ে বলল, 'তোমার আর কেটের সম্মানে আমরা আজ বিশেষ বারবিকিউ'র আয়োজন করেছি। সবাই সে ক্ষণটির জন্য অপেক্ষা করছে।'

'শু-শুনে খুশি হলাম,' বলল টনি।

সাদা শার্ট আর শরীর কামড়ে থাকা, কয়েক জায়গায় ছেঁড়া একটা জিন্স প্যান্ট পরে হাজির হলো লুসি। টনি মনে মনে স্বীকার করল এ পোশাকে মেয়েটাকে দারুণ সেক্সি লাগছে।

লুসি এসেই টনিকে জড়িয়ে ধরল। 'টনি! তোমার দেরি দেখে আমি তো তোমার আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম।'

'দে-দেরী হওয়ার জন্য আমি দুঃখিত,' বলল টনি। 'আমার কিছু ব্য-ব্যবসায়িক কাজ ছিল।'

ওকে উষ্ণ হাসি উপহার দিল লুসি। 'আচ্ছা, ঠিক আছে। তবু তো তুমি এসেছ। আজ বিকেলে কী করছ?'

'তুমি কী করতে বলো?'

লুসি ওর চোখে চোখ রাখল, 'তুমি যা চাইবে তা-ই,' ভীষণ নরম শোনাল তার কণ্ঠ।

হাসি ফুটল কেট ব্ল্যাকওয়েল আর চার্লি উইয়াটের মুখে।

বারবিকিউ অনুষ্ঠানটি সত্যি বিশেষ ছিল। ব্যক্তিগত বিমানে, মার্সিডিস এবং রোলসরয়েসে চড়ে প্রায় দুশো অতিথি উপস্থিত হলেন। দুটো ব্যান্ড ক্রমাগত মিউজিক বাজিয়ে চলছিল। আধডজন বারটেন্ডার সদা ব্যস্ত রইল শ্যাম্পেন, হুইস্কি, সফট ড্রিংকস এবং বিয়ার পরিবেশনে, ওদিকে চারজন শেফ তখন মাঠে আগুন জ্বালিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করছে। বারবিকিউ করা গরুর মাংস, ভেড়া, স্টেক, মুরগি এবং হাঁসের মাংস পরিবেশন করা হলো। সে সঙ্গে থাকল মাটির পাত্র বোঝাই চিলি, গোটা গলদা চিংড়ি, কাঁকড়া এবং রাজহাঁস। আরও থাকল বেকড পটেটো, ইয়ার (গাছ আলু), তাজা মটর, ছয় রকমের সালাদ, বাড়িতে তৈরি গরম গরম বিস্কিট এবং মধু ও জ্যাম মেশানো কর্ন ব্রেড। চারটে ডেজার্ট টেবিল বোঝাই হয়ে রইল সদ্য তৈরি পাই কেক, পুডিং ও একডজন ফ্লেভারের হোমডে আইসক্রিমে। খাদ্যের এমন বিপুল অপচয় জীবনে দেখেনি টনি। এ আসলে টাকার গরিমা প্রদর্শন।

দামী দামী গাউন আর চোখ ধাঁধানো গহনা পরে এসেছে মহিলারা। টনি একপাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল আমন্ত্রিত অতিথিরা হৈ হল্লা করছেন, উচ্চস্বরে একজন অপরজনকে ডাকাডাকি করছেন। ওয়েটার বেলুগা ক্যাভিয়ার এবং শ্যাম্পেন ভর্তি গ্লাস নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। টনি অনুমান করল যতজন অতিথি এসেছেন, তাদের খেদমতকারী ভৃত্যদের সংখ্যাও প্রায় সমান।

লুসি এসে দাঁড়াল টনির পাশে। 'তুমি দেখছি কিছুই খাচ্ছ না,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ করছিল সে। 'কোনো সমস্যা টনি?'

'না, সব ঠিক আছে। তোমার বাবা একখান পার্টি-ই দিয়েছেন বটে।'

হাসল লুসি। 'এখনো তো কিছুই দেখনি। আতশবাজির খেলা শুরু হোক দেখবে ওটা কী জিনিস।'

'আতশবাজির খেলা?'

'হুহ্,' টনির বাহু স্পর্শ করল লুসি। 'এত হুল্লোড় হয়তো তোমার ভাল্লাগছে না। বাবা সাধারণত এতবড় পার্টি দেনও না। তোমার মাকে মুগ্ধ করতে এত কিছুর আয়োজন করেছেন তিনি।' হাসল সে। 'কাল ওরা সবাই চলে যাবেন।'

'আমিও,' গম্ভীর মুখে ভাবল টনি। ওর এখানে আসাই উচিত হয়নি। উইয়াট অয়েল অ্যান্ড টুল কোম্পানিকে মা'র যদি এত প্রয়োজনই হয়, অন্য কোনোভাবেও তো এটা পাবার ব্যবস্থা করতে পারত। তার চোখ ভিড়ের মধ্যে মাকে খুঁজল। একদল লোক ঘিরে রেখেছে কেটকে। মা'র বয়স ষাট কিন্তু দেখায় পঞ্চাশ। মা এখনও যথেষ্ট সুন্দরী। তার মুখে বয়সের বলিরেখাই নেই, ছিপছিপে শরীর মেদহীন। নিয়মিত ব্যায়াম আর ম্যাসেজ করে এ বয়সেও এমন শরীর ধরে রেখেছে কেট। দেখে মনে হচ্ছে পার্টিটি সে খুব উপভোগ করছে। অতিথিদের সঙ্গে গল্প করছে, হাসছে, ঠাট্টা তামাশা করছে। হঠাৎ মারিয়ানের কথা মনে পড়ে গেল টনির। মারিয়ান এসব পার্টি ফার্টি একদমই সহ্য করতে পারে না। মারিয়ানের কথা ভাবতেই বুকের মধ্যে কেমন ব্যথা শুরু হয়ে গেল টনির।

আধঘণ্টা পরে লুসি এসেছে টনির খোঁজে, সে ততক্ষণে নিউইয়র্কের পথে উড়াল দিয়েছে।

এয়ারপোর্টের টেলিফোন বুথ থেকে মারিয়ানকে ফোন করল টনি। 'আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

ও প্রান্তে সঙ্গে সঙ্গে সম্মতির আশ্বাস। 'আচ্ছা।'

মারিয়ান হফম্যানের কথা কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারছিল না টনি। সে দীর্ঘদিন একা থাকলেও কখনও একাকীত্ব অনুভব করেনি। কিন্তু মারিয়ানের কাছ থেকে দূরে থাকলে কেমন একটা হাহাকার আর শূন্যতা তৈরি হয় বুকের মধ্যে, মনে হয় কী যেন একটা নেই ওর কাছে। মারিয়ানের সঙ্গে থাকলে জীবন মধুময় লাগে, উষ্ণতা অনুভব করে। টনির ভেতরে কেন জানি একটা ভয় ঢুকে গেছে ও যদি মারিয়ানকে দেশে

যেতে দেয়, তাকে সে চিরজীবনের জন্য হারিয়ে ফেলবে। মারিয়ানকে ও চায়, ভীষণভাবে চাইছে। এতটা আকুলতা এর আগে কারও জন্য অনুভব করেনি টনি।

টনির অ্যাপার্টমেন্টে ওর সঙ্গে দেখা করতে এল মারিয়ান। মারিয়ান ঘরে ঢুকতেই তীব্র একটা ক্ষিদে জেগে উঠল টনির মধ্যে, যে ক্ষিদেটা ও ভেবেছিল মরে গেছে। মারিয়ানের দিকে তাকিয়ে টনি বুঝতে পারল একইরকম আগ্রাসী ক্ষিদে অনুভব করছে মারিয়ান। তারপর মিরাকলসের মতো যা ঘটল তাতে কোনো শব্দ প্রয়োগের বাহুল্য রইল না।

সোজা টনির আলিঙ্গনের মাঝে সেঁধিয়ে গেল মারিয়ান, খরস্রোতা জোয়ারের মতো আবেগ ওদের দু'জনকেই ভাসিয়ে নিয়ে গেল, ঘটল এক আশ্চর্য বিস্ফোরণ। ওরা ভাসতে লাগল তীব্র সুখের নদীতে, একে অন্যের জাদুর মাঝে হারিয়ে গেল। মিলন শেষে ওরা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইল, মারিয়ানের নরম চুলের ছোঁয়া টনির মুখে।

'আমি তোমাকে বিয়ে করব, মারিয়ান।'

দু'হাতের চেটোতে টনির মুখ বন্দী করল মারিয়ান।

ওর চোখে কী যেন খুঁজল। 'তুমি ভেবে বলছ তো, টনি?' মারিয়ানের কণ্ঠ নরম। 'তুমি তো জানোই একটা সমস্যা আছে, ডার্লিং।'

'তোমার এনগেজমেন্ট?'

'না। আমি ওটা ভেঙে দিতে পারব। আমার চিন্তা তোমার মাকে নিয়ে।'

'এর সঙ্গে মায়ের কোনো সম্পর্ক–'

'না, শোনো। তিনি লুসি উইয়াটের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেয়ার প্ল্যান করেছেন।'

'সেটা তো তার প্ল্যান,' মারিয়ানকে আবার জড়িয়ে ধরল টনি। 'আমার প্ল্যান তো তোমাকে বললামই।'

'উনি আমাকে মেনে নিতে পারবেন না, টনি। আর আমি সেটা চাইও না।'

'তুমি কি জান আমি কী চাই?' ফিসফিস করল টনি।

আবার শুরু হলো সেই মিরাকল।

আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে টনির হদিশ পেল কেট ব্ল্যাকওয়েল। টনি কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ করে উইয়াট খামার বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যায়। চার্লি উইয়াট তো হতভম্ব আর লুসি রেগে আগুন। কেট দু'জনের কাছেই ক্ষমা চেয়ে সে রাতেই কোম্পানির প্লেনে ফিরে এল নিউইয়র্কে। বাড়ি পৌঁছেই টনির অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করল। কোনো সাড়া নেই। পরদিনও কোনো খোঁজ নেই টনির।

কেট তার অফিসে বসে কাজ করছে, বেজে উঠল ব্যক্তিগত ফোন। জবাব দেয়ার আগেই বুঝতে পারল কে ফোন করেছে।

'টনি, তুমি ঠিক আছ তো?'

'আমি ভা-ভালো আছি, মা।'

'কোথায় তুমি?'

'হা-হানিমুনে। গতকাল আমি আর মারিয়ান হফম্যান বিয়ে করেছি।' দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল। 'আ-আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, ম-মা?'

'হ্যাঁ, শুনছি।'

'তুমি অ-অভিনন্দন জানাবে না কিংবা আমাদের সু-সুখ-সমৃদ্ধির জন্য দোয়া করবে না?'

কেট বলল, 'অবশ্যই করব, তোমরা সুখি হও, বেটা।'

'ধন্যবাদ, ম্-মা।' লাইন কেটে গেল।'

কেট রিসিভার রেখে ইন্টারকমের বোতাম টিপল।

'একবার আমার ঘরে এসো, ব্রাড।'

ব্রাড রজার্স কেটের অফিসে ঢুকতেই কেট বলল, 'এইমাত্র ফোন করেছিল টনি।'

ব্রাড বলল, 'তুমি নিশ্চয় বলবে না যা চেয়েছিলে পেয়ে গেছ।'

হাসল কেট। 'আমি তা-ই বলব। হফম্যান সাম্রাজ্য এখন আমাদের হাতের মুঠোয়।'

একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল ব্রাড। 'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। টনিকে তো আমি চিনি। যা জিদ্দি! মারিয়ান হফম্যানের সঙ্গে ওর বিয়ে দিলে কী করে?'

'খুব সহজে,' ফোঁস করে শ্বাস ফেলল কেট। 'ওকে আমি উল্টোদিকে ঠেলে দিয়েছিলাম।'

কিন্তু কেট মনে মনে জানে সে ঠিক দিকেই তার ছেলেকে ঠেলে দিয়েছে। টনির জন্য যথার্থ স্ত্রী হবে মারিয়ান। টনির ভেতরের অন্ধকার সে দূর করতে পারবে।

লুসির জরায়ু অপারেশন করে ফেলে দেয়া হয়েছে।

মারিয়ান কেটকে একটি পুত্রসন্তান উপহার দেবে।

তেতাল্লিশ

টনি এবং মারিয়ানের বিয়ের ছয়মাস পরে হফম্যান কোম্পানি ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেডের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেল। চুক্তির ফরমাল সইপত্র হলো মিউনিকে বসে। ফ্রেডেরিক হফম্যান জার্মানীতে বসে সাবসিডিয়ারি হিসেবে কোম্পানি চালাবে। মা যে তাদের বিয়েটা কোনোরকম হৈ চৈ ছাড়াই মেনে নেবে, কল্পনাও করেনি টনি। বাহামা থেকে হানিমুন করে ফিরে আসার পর নববধূকে হাসিমুখেই বরণ করেছিল কেট। টনিকে বলেছে এ বিয়েতে সে খুব খুশি হয়েছে। টনির কাছে সবচেয়ে অবাক লেগেছে মা'র আবেগ প্রকাশের ধরনটা মোটেই কৃত্রিম ছিল না। ব্যাপারটা কেটের চরিত্রের সঙ্গে ঠিক মেলে না। এত দ্রুত কি কোনো মানুষ বদলে যেতে পারে? শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে টনি ভাবল আসলে সে তার মাকে এখনও চিনতে পারেনি।

বিয়ের পরে টনির মধ্যে বিপুল পরিবর্তন এল। কেট বিষয়টি লক্ষ করে সবচেয়ে খুশি হলো। টনি যখন বিজনেস ট্রিপে কোথাও যায়, তাকে সঙ্গ দেয় মারিয়ান। তারা একসঙ্গে খেলে, হাসে, পরস্পরের সঙ্গ দারুণ উপভোগ করে। ওদেরকে দেখতে দেখতে তৃপ্ত হাসি ফুটে ওঠে কেটের মুখে। ভাবে, *আমি আমার ছেলের জন্য যা করেছি ভালোই করেছি।*

মা-ছেলের ভেতরকার দূরত্ব ঘুচিয়ে দিতে বিরাট ভূমিকা রাখল মারিয়ান। হানিমুন থেকে ফিরে এসে সে একদিন টনিকে বলল, 'আমি তোমার মাকে ডিনারে দাওয়াত দিতে চাই।'

'না। তুমি তাকে চেন না, মারিয়ান। সে–'

'আমি তাকে চিনতে চাই, প্লিজ, টনি।'

মাকে ডিনারে দাওয়াত দিতে কোনোমতেই রাজি হচ্ছিল না টনি। মারিয়ানের পীড়াপীড়িতে শেষে রাজি হতেই হলো। সে ভেবেছিল ডিনারের সন্ধ্যাটা কাটবে খুবই বাজে, প্রাণহীন। কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ্য করল কেট ডিনারে এসে প্রাণখুলে তার বউমার সঙ্গে গল্প করছে। পরের সপ্তাহে কেট তাদেরকে তার বাড়িতে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানাল। এরপর দু'টি পরিবারে ডিনারের দাওয়াত সাপ্তাহিক অভ্যাসে যেন পরিণত হলো।

কেট এবং মারিয়ান বন্ধু হয়ে গেছে। তারা প্রতি সপ্তাহে টেলিফোনে বহুবার একে অন্যের সঙ্গে কথা বলে, সপ্তাহে অন্তত একদিন একসঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন করা চাই-ই।'

একদিন লুটেসেতে লাঞ্চ করার কথা শাশুড়ি-বউয়ের, মারিয়ান রেস্টুরেন্টে ঢোকামাত্র তার চেহারা দেখে কেট বুঝতে পারল কিছু একটা ভজকট হয়েছে।

'আমাকে একটা ডাবল হুইস্কি দাও,' ওয়েটারকে বলল মারিয়ান। 'বরফ মিশিয়ে।'

অথচ মারিয়ান শুধু ওয়াইন পান করে।

'কী হয়েছে, মারিয়ান?'

'আমি ডা. হার্লির কাছে গিয়েছিলাম।'

বুকটা ধক করে উঠল কেটের। 'তোমার কোনো অসুখ করেনি তো?'

'না। আমি ঠিক আছি। শুধু.... হড়বড় করে সব কথা বলে ফেলল মারিয়ান।

ঘটনার শুরু কয়েকদিন আগে। মারিয়ানের শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। সে জন হার্লির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিল...

'আপনাকে তো দিব্যি সুস্থ দেখাচ্ছে,' বলে হাসল ডা. হার্লি। 'আপনার বয়স কত, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল?'

'তেইশ।'

'আপনার পরিবারের কারও হৃদরোগ আছে?'

'না।'

নোট নিচ্ছিল ডাক্তার। 'ক্যান্সার?'

'জ্বি না।'

'আপনার বাবা-মা বেঁচে আছেন?'

'বাবা আছেন। মা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন।'

'আপনার কখনও মামপস হয়েছিল?'

'না।'

'হাম?'

'জ্বী। তখন আমার বয়স দশ।'

'হুপিং কাশি?'

'না।'

'কখনও কোনো অপারেশন করিয়েছেন?'

'নয় বছর বয়সে আমার টনসিল অপারেশন করা হয়।'

'এছাড়া আর কখনও আপনাকে হাসপাতালে যেতে হয়েছে?'

'না। ও, হ্যাঁ– একবার। অল্প ক'দিনের জন্য।'

'কী হয়েছিল?'

'আমি স্কুলের হকি টিমে খেলতাম। একদিন খেলতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাই। পরে জ্ঞান ফিরে দেখি আমি হাসপাতালে। সেবার দুই/তিন দিন ছিলাম ওখানে।'

'খেলতে গিয়ে কোনো আঘাত পেয়েছিলেন?'

'না। আ-আমি স্রেফ অজ্ঞান হয়ে যাই।'

'তখন আপনার বয়স কত?'

'ষোলো। ডাক্তার বলেছিলেন ওটা সম্ভবত এক ধরনের অ্যাডোনসেন্ট গ্লান্ডুলার আপসেট।'

চেয়ারের সামনে ঝুঁকে এল ডাক্তার। 'জ্ঞান ফেরার পরে শরীরের দু'পাশের কোথাও কি দুর্বল অনুভব করেছিলেন?'

একটু ভেবে জবাব দিল মারিয়ান। 'হ্যাঁ। শরীরের ডানপাশটা কেমন অবশ অবশ লাগছিল। তবে কয়েকদিন পরে অবশ ভাবটা চলে যায়। তারপর আর কোনো সমস্যা হয়নি।'

'আপনার কি কখনও মাথা ধরেছে? চোখে ঝাপসা দেখেছেন?'

'জ্বী। কিন্তু ওগুলোও পরে ঠিক হয়ে গেছে।' মারিয়ানের বুকে ধুকুরপুকুর শুরু হয়ে গেছে। 'আমার কোনো সমস্যা হয়েছে, ডা. হার্লি?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আপনার কয়েকটা টেস্ট করাব।'

'কী ধরনের টেস্ট?'

'সেরেব্রাল এনজিওগ্রাম। তবে এতে ভয় পাবার কিছু নেই। টেস্টটা এক্ষুনি করিয়ে ফেলব।'

তিনদিন পরে ডা. হার্লির নার্স মারিয়ানকে ফোন করে ডাক্তারের চেম্বারে আসতে বলল। জন হার্লি তার অফিসে অপেক্ষা করছিল মারিয়ানের জন্য।

'আমরা রহস্যের সমাধান পেয়ে গেছি।'

'খারাপ কিছু?'

'না, খারাপ কিছু নয়। এনজিওগ্রাম বলছে আপনার ছোটখাট একটি স্ট্রোক হয়েছিল, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। চিকিৎসা শাস্ত্রের ভাষায় একে বলে berry aneurysm, মেয়েদের এটা হামেশাই হয়ে থাকে– বিশেষ করে কিশোরীদের। মস্তিষ্কে ছোট্ট একটি রক্তের শিরা ছিঁড়ে গিয়ে অল্প কিছু রক্তপাত ঘটিয়েছে। প্রেসারের কারণে আপনার মাথা ধরত এবং চোখে ঝাপসা দেখতেন। তবে এগুলো নিজে থেকেই সেরে যায়।'

মারিয়াম বসে ডাক্তারের কথা শুনছে, বুক ঢিবঢিব করছে ভয়ে। 'এটা আসলে কী রোগ? এরকম কি আবার ঘটতে পারে?'

'না ঘটারই সম্ভাবনা বেশি,' হাসল হার্লি। যদি আবার হকি টিমে খেলতে না যান তাহলে একদম স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবেন।

'টনি এবং আমি মাঝে মাঝে টেনিস খেলি। এতে কি–?'

'অতিরিক্ত কোনো কিছু না করলে কোনোই ক্ষতির আশংকা নেই। সে টেনিস হোক আর সেক্সই হোক।'

স্বস্তির হাসি হাসল মারিয়ান। 'থ্যাংক গড।'

ও উঠতে যাচ্ছে, জন হার্লি বলল, 'একটা কথা, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। আপনি আর টনি যদি সন্তান নেয়ার কথা ভেবে থাকেন, আমি উপদেশ দেব দত্তক নিতে।'

পাথর হয়ে গেল মারিয়ান। 'আপনি না বললেন আমি সম্পূর্ণ নরমাল আছি।'

'তা আছেন। তবে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো প্রেগন্যান্সি খুব দ্রুত হারে ভাসকুলার ভল্যুম বৃদ্ধি করে। গর্ভাবস্থার শেষ ছয় থেকে আট সপ্তাহ রক্তচাপও আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পায়। aneurysm-এর ইতিহাস বলে, এসময় রিস্ক ফ্যাক্টর বা ঝুঁকি থাকে অবিশ্বাস্যরকম বেশি। এটা শুধু বিপজ্জনকই নয়–,এর পরিণতি হতে পারে ভয়ংকর। আজকাল তো সন্তান দত্তক নেয়া খুবই সহজ। আপনারা চাইলে আমি–'

ডাক্তারের কথা আর শুনতে পাচ্ছিল না মারিয়ান। তার কানে বাজছিল টনির কণ্ঠ, *আমি চাই আমাদের একটি বাচ্চা হবে। ছোট্ট একটি মেয়ে যে দেখতে হবে অবিকল তোমার মতো।*

'...আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না,' কেটকে বলল মারিয়ান। 'তাই আমি ডাক্তারের চেম্বার থেকে ছুটে পালিয়ে সোজা এখানে চলে আসি।'

মনের ভেতর কী ঝড় বয়ে যাচ্ছে তা চেহারায় প্রকাশ না করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছিল কেট। এ খবরটা তাকে প্রচণ্ড একটা আঘাত হেনেছে। তবে কোনো রাস্তা নিশ্চয় আছে। রাস্তা থাকতেই হবে।

সে জোর করে মুখে হাসি ফোটাল। 'আমি তো তোমার চেহারা দেখে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছি না জানি কী খারাপ খবর নিয়ে এসেছ।'

'কিন্তু, মা। টনি আর আমি একটি সন্তান চাই। খুব চাই।'

'মারিয়ান, ডা. হার্লি হলো একজন সংশয়বাদী। ঈশান কোণে সামান্য কালো মেঘ দেখলেও ভাবে ঝড় আসবে। কয়েক বছর আগে তোমার সামান্য একটা সমস্যা হয়েছে আর সেটাকেই সে ফুলিয়ে তাল বানিয়েছে। ডাক্তাররা কেমন স্বভাবের হয় তাতো তুমি জানোই।,'

সে মারিয়ানের একটা হাত ধরল। 'তোমার শরীর তো ঠিক আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, তবে–'

'তোমার কি আর মাথা ঘোরে কিংবা অজ্ঞান হওয়ার অবস্থা হয়েছে?'

'না।'

'তার মানে তুমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। ডাক্তার তো বলল ওগুলো নিজেরাই সেরে যায়।'

'ডাক্তার বলেছে ঝুঁকি–'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কেট। 'মারিয়ান, নারী যখনই গর্ভবতী হয় তখনই সে ঝুঁকির মধ্যে থাকে। জীবনটাই তো ঝুঁকিতে ভরা। আসল কথা হলো কোন্ ঝুঁকি বেশি বা কম তা

ভেবে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমার কথার সঙ্গে কি তুমি একমত?'

'হ্যাঁ,' মারিয়ান দ্রুত চিন্তা করছিল। শেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। 'আপনি ঠিকই বলেছেন, টনিকে এ ব্যাপারে কিছু না জানানোই ভালো হবে। জানলে বেচারি খামোখা দুশ্চিন্তা করবে। আমরা কথাটা গোপন রাখব।'

কেট ভাবছিল, *মারিয়ানকে ভয় দেখানোর জন্য জন হার্লি হারামজাদাকে খুন করা উচিত।* সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সে।' ঠিকই বলেছ তুমি। কথাটা আমরা গোপন রাখব।'

তিন মাস পরে গর্ভবতী হলো কেট। টনি খবর জেনে মহাখুশি। কেট তো আরও। কিন্তু খবরটা শুনে জন হার্লি মোটেও খুশি হতে পারল না। সে আতংক বোধ করল।

'আমি ইমিডিয়েট অ্যাবরশনের ব্যবস্থা করছি,' সে বলল মারিয়ানকে।

'না, ডা. হার্লি, আমি ঠিক আছি। আমি সন্তানের জন্ম দেব।'

মারিয়ান শাশুড়িকে ডাক্তারের কথা জানালে সে রাগে অগ্নিশর্মা হলো। জন হার্লির অফিসে ঢুকে হুংকার ছাড়ল, 'তোমার কতবড় সাহস আমার বউমাকে গর্ভপাত করাতে বলো!'

'কেট, আমি ওকে বলেছি সন্তান জন্ম দিতে গেলে ও মারাও যেতে পারে।'

'কে বাঁচবে কে মরবে তুমি তার কী জানো? ওর কিছু হবে না। আবার যদি আমার বউমাকে ভয় দেখিয়েছ!' চোখ পাকাল কেট।

চুয়াল্লিশ

আটমাস পরে, ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের এক দিনে, ভোর চারটার দিকে নির্ধারিত সময়ের আগেই লেবার পেইন শুরু হয়ে গেল মারিয়ানের। তার গোঙানির শব্দে ঘুম থেকে জেগে গেল টনি।

দ্রুত কাপড় পরতে শুরু করল সে। 'চিন্তা কোরো না, ডার্লিং, আমি তোমাকে এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি।'

ব্যথাটা ছিড়েখুড়ে ফেলছে শরীর। অসহ্য। 'জলদি করো।'

মারিয়ান ভাবছিল ডা. হার্লির সঙ্গে ওর কথোপকথনের বিষয়টি টনিকে বলে দেবে কিনা। না, বলবে না। ঈশ্বর নিশ্চয় ওর কোনো ক্ষতি হতে দেবেন না।

মারিয়ান এবং টনি হাসপাতালে পৌঁছে দেখল সবকিছু রেডি করাই আছে। টনিকে ওয়েটিং রুমে নিয়ে যাওয়া হলো। মারিয়ান এক্সামাইনিং কক্ষে। ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ ডা. ম্যাটসন ওর রক্তচাপ মাপল। তার ভুরু কুঁচকে উঠল। আবারও ব্লাডপ্রেশার চেক করল সে। তারপর নার্সের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওকে অপারেটিং রুমে নিয়ে যাও– এক্ষুনি।'

হাসপাতালের করিডরে হাঁটাহাঁটি করছিল টনি, এমন সময় পেছন থেকে ভেসে এল একটি কণ্ঠ। 'বেশ, বেশ এ যে দেখছি সেই রেমব্রানডট।' ঘুরল টনি। লোকটাকে দেখেই চিনতে পারল। ডোমিনিকের সঙ্গে একে ওর অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে দেখেছিল টনি। কী যেন নাম? ও হ্যাঁ, বেন।

টনির দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে লোকটা। চেহারায় তীব্র বিদ্বেষ। লোকটা কি তাকে ঈর্ষা করে? টনি সম্পর্কে এ লোককে কী বলেছে ডোমিনিক? এমন সময় অকুস্থলে উদয় হলো ডোমিনিক। বেনকে বলল, 'নার্স বলল মিশেলিনকে ইনটেনসিভ কেয়ারে নিয়ে গেছে। আমরা–'

টনিকে দেখে ফেলল সে। থেমে গেল।

'টনি! তুমি এখানে কী করছ?'

'আমার বউর বাচ্চা হবে।'

'ব্যবস্থাটা কি তোমার মা করেছেন?' জিজ্ঞেস করল বেন।

'মানে?'

'ডোমিনিক আমাকে বলেছে তোমার মা নাকি তোমার সবকিছু ব্যবস্থা করে দেন।'

'আহ্, বেন, কী হচ্ছে? চুপ করো।'

'কেন? এটাই তো সত্যি কথা, তাই না? তুমি কীভাবে হাগুমুতু করবে তা-ও তোমার মা বলে দেন।'

টনি ঘুরল ডোমিনিকের দিকে। 'এ লোক এসব কী আজেবাজে বকছে?'

'ওর কথায় পাত্তা দিও না তো,' দ্রুত বলল ডোমিনিক। 'বেন, চলো যাই।'

বেন টনিকে রাগিয়ে দিয়ে খুব মজা পাচ্ছিল। 'আহা, তোমার মতো যদি একটা মা আমার থাকত, দোস্তো। ঘুমানোর জন্য সুন্দরী একজন মডেল দরকার তোমার, তিনি তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। প্যারিসে এক্সিবিশন করবে, সে ব্যবস্থাও তিনি করছেন। তুমি–'

'লোকটা পাগল নাকি?'

'আমি পাগল?' বেন ফিরল ডোমিনিকের দিকে। 'ও কি কিছুই জানে না?'

'আমি কী জানি না?' গর্জে উঠল টনি।

'কিছু না, টনি।'

ও বলল 'আমার মা নাকি প্যারিসে আমার জন্য এক্সিবিশনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কথাটা মিথ্যা, তাই না?' ডোমিনিকের চেহারা দেখে দমে গেল টনি। 'কথাটা মিথ্যা না?'

'না,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিল ডোমিনিক।

'তার মানে আমার মা জর্জকে টাকা দিয়ে আমার ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিল?'

'টনি, জর্জ কিন্তু সত্যি তোমার ছবিগুলো পছন্দ করেছিল।'

'শিল্প সমালোচকের কথাটা ওকে বলো না?' খোঁচা দিল বেন।

'যথেষ্ট হয়েছে বেন!' ডোমিনিক চলে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, ঝট করে ওর হাত খামচে ধরল টনি। দাঁড়াও! দাঁড়াও! মশিউ দেসিউর ব্যাপারটা কী? আমার মা কি তাঁকেও ভাড়া করেছিল এক্সিবিশনে আসার জন্য?'

'হ্যাঁ,' ডোমিনিকের গলার স্বর ক্ষীণ শোনাল।

'কিন্তু উনি তো আমার ছবি নিয়ে যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করেছেন।'

কণ্ঠে বেদনা নিয়ে ডোমিনিক বলল, 'না, টনি। উনি আসলে ছবিগুলো পছন্দ করেছিলেন। মশিউ দেসিউ তোমার মাকে বলেছিলেন তুমি একদিন বড় আর্টিস্ট হবে।'

অবিশ্বাস ফুটল টনির চেহারায়। 'আমাকে ধ্বংস করার জন্য মা দেসিউকে দিয়ে পত্রিকায় ওসব লিখিয়েছিলেন?'

'তোমাকে ধ্বংস করার জন্য নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন তিনি যা করছেন সবই তোমার মঙ্গলের জন্য।'

মা তাকে যা বলেছে সবই তাহলে মিথ্যা। সে কোনোদিনই চায়নি টনি স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করুক। আর আন্দ্রে দেসিউ! তাঁর মতো একটা মানুষ টাকা খেয়ে এরকম একটা কাজ কী করে করতে পারলেন? মা যা করেছে সবই কোম্পানির জন্য। আর কোম্পানি মানেই কেট ব্ল্যাকওয়েল। ঘুরল টনি। করিডোর ধরে এগোল অন্ধের মতো।

অপারেশন রুমে ডাক্তাররা মারিয়ানের জীবন রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। তার রক্তচাপ বিপজ্জনক মাত্রায় নেমে গেছে, হার্টবিট হয়ে পড়েছে অনিয়ন্ত্রিত। তাকে অক্সিজেন এবং ব্লাড ট্রান্সফিউশন দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছে না। সেরিব্রাল হেমোরেজে অজ্ঞান অবস্থাতেই মারিয়ান প্রথম বাচ্চাটির জন্ম দিল তার দ্বিতীয় যমজ সন্তানের জন্মের তিন মিনিট পরে সে মারা গেল।

টনি শুনল তাকে কেউ ডাকছে। 'মি. ব্ল্যাকওয়েল।' ঘুরল সে।

ডা. ম্যাটসন।

'আপনি দুটি চমৎকার স্বাস্থ্যবতী যমজ কন্যার বাবা হয়েছেন, মি. ব্ল্যাকওয়েল।'

ডাক্তারের চেহারা দেখে ধ্বক করে উঠল টনির বুক।

'আর মারিয়ান? ও ঠিক আছে তো?'

গভীর দম নিল ডা. ম্যাটসন। 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমরা সব রকমের চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তিনি মারা–'

'ও কী করেছে?' চিৎকার দিল টনি। খামচে ধরল ডা. ম্যাটসনের কোটের ল্যাপেল। ধরে ঝাঁকাতে লাগল।

'আপনি মিথ্যা কথা বলছেন! ও মারা যায়নি।'

'মি. ব্ল্যাকওয়েল–'

'ও কোথায়? আমি ওকে দেখব।'

'এখন ওখানে যেতে পারবেন না। ওরা লাশ নিয়ে–'

হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল টনি। 'আপনারা ওকে মেরে ফেলেছেন। ইউ বাস্টার্ড! আপনারা ওকে খুন করেছেন।' সে মারতে শুরু করল ডাক্তারকে। দুই ইন্টার্নি ছুটে এসে থামাল টনিকে।

'শান্ত হোন, মি. ব্ল্যাকওয়েল।'

পাগলের মতো ধস্তাধস্তি করতে লাগল টনি ইন্টার্নিদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে। 'আমি আমার স্ত্রীকে দেখতে চাই।'

ছুটে এল ডা. জন হার্লি। 'ওকে ছেড়ে দাও।' হুকুম করল সে।

'তোমরা সবাই চলে যাও।'

ডা. ম্যাটসন তার সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে চলে গেল। টনি হু হু করে কাঁদছে। 'জন, ওরা মারিয়ানকে খু-খুন করেছে।'

'ও মারা গেছে, টনি। আমি এজন্য অত্যন্ত দুঃখিত। তবে তাকে কেউ খুন করেনি। আমি অনেক আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম মারিয়ান সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা যেতে পারে।'

কথাগুলো বুঝতে সময় লাগল টনির। 'কী বলছ তুমি!'

'কেন, মারিয়াম তোমাকে বলেনি?' তোমার মা তোমাকে কিছু বলেন নি?'

টনি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডাক্তারের দিকে।

'আমার মা?'

'তোমার মা বলতেন আমি নাকি শংকাবাদী, সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরাই। তিনিই মারিয়ানকে সন্তান জন্ম দিতে উৎসাহিত করেন। আমি সত্যি দুঃখিত, টনি। যমজ বাচ্চা দুটিকে দেখছি আমি। খুবই সুন্দর হয়েছে দেখতে। তুমি ওদেরকে একটিবার–?'

টনি তো ওখানে নেই। চলে গেছে।

কেটের বাটলার খুলে দিল দরজা।

'গুড মর্নিং, মি. ব্ল্যাকওয়েল।'

'গুড মর্নিং, লেস্টার।'

টনির বিধ্বস্ত চেহারা দেখে বাটলার শংকিত বোধ করল।

'সবকিছু ঠিক আছে তো, স্যার?'

'সবকিছু ঠিক আছে। আমাকে এক কাপ কফি খাওয়াবে, লেস্টার?'

'নিশ্চয়, স্যার।'

বাটলার কিচেনে পা বাড়াল। *এখন, টনি,* কেউ মস্তিষ্কের ভেতর থেকে আদেশ করল ওকে।

হ্যাঁ, এখন। টনি ঘুরল। ঢুকল ট্রফি রুমে। যে কেবিনেটে আগ্নেয়াস্ত্র রাখা হয় সেখানে গেল। মৃত্যু দানবগুলোর আলো ঠিকরানো শরীরের দিকে একঠায় তাকিয়ে রইল।

কেবিনেট খোলো, টনি।

কেবিনেট খুলল টনি, গান র‍্যাক থেকে একটি রিভলভার নামিয়ে চেক করে দেখল ওতে গুলি ভরা আছে কি না।

তাকে ওপরতলায় পাবে, টনি।

টনি সিড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে লাগল। টনি এখন জানে তার মা যেসব দুস্কর্ম করেছে সেজন্য সে দায়ী নয়। তাকে আসলে ভূতে পেয়েছে। আর তার কাঁধ থেকে ভূত নামানোর ব্যবস্থা করবে টনি। কোম্পানিই তার মায়ের আত্মাটা খেয়ে ফেলেছে। কেট যা করেছে সেজন্য তাকে দায়ী করা যায় না। তার মা এবং কোম্পানি মিলে একটি সত্তায় পরিণত হয়েছে। মাকে খুন করলে কোম্পানিও মারা যাবে।

কেটের বেডরুমের দরজায় চলে এল টনি।

দরজা খোলো। মাথার ভেতরের কণ্ঠটির আদেশ এল।

দরজা খুলল টনি। কেট আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাপড় পরছিল এমন সময় দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল।

'টনি! কী ব্যাপার–'

মায়ের দিকে গুলিভরা অস্ত্রটি তাক করল টনি, ট্রিগারে চেপে বসল আঙুল।

পঁয়তাল্লিশ

সবাই এ ব্যাপারে একমত যে ব্ল্যাকওয়েলদের যমজ দু'সন্তানের মতো সুন্দর বাচ্চা খুব কমই দেখা যায়। ওরা দেখতে এতই সুন্দর হাসপাতালের নার্সরা কোনো না কোনো অজুহাতে নার্সারী রুমে ঢুকে বাচ্চাগুলোকে এক পলক দেখে আসছে। যমজদের পরিবার নিয়ে নানান কানাঘুষা শোনা যাচ্ছে। সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেছে তাদের মা, ঃবার কোনো খোঁজ-খবর নেই। শোনা যায় যমজ কন্যাদের বাবা নাকি তাদের দাদীকে ন করতে গিয়েছিল। তবে এ বিষয়ে পরিষ্কার করে কিছু জানা যায়নি। এ খবর কোনো কাগজে ছাপা হয়নি, শুধু জানা গেছে স্ত্রীর মৃত্যুতে নার্ভাস ব্রেক-ডাউনের শিকার হয়ে টনি ব্ল্যাকওয়েল নির্বাসনে চলে গেছে। সাংবাদিকরা ডা. হার্লিকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি 'নো কমেন্ট,' বলে এড়িয়ে যান।

প্রথম ক'টা দিন নরক নেমে এসেছিল জন হার্লির জীবনে। যতদিন বাঁচবে হার্লির মনে থাকবে বাটলারের ভয়চকিত ফোন পেয়ে সে কেট ব্ল্যাকওয়েলদের বাড়িতে গিয়ে দেখেছিল কেট অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে মেঝেয়। গুলি লেগেছে তার ঘাড়ে এবং বুকে, ক্ষতস্থান থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ে লাল করে দিয়েছে সাদা কার্পেট। টনি তার মা'র ক্লজিট খুলে কাঁচি দিয়ে কুচিকুচি করে কাটছিল কেটের জামাকাপড়।

ডা. হার্লি কেটকে একনজর দেখেই হাসপাতালে ফোন করল অ্যাম্বুলেন্সের জন্য। তারপর কেটের পাশে বসে তার নাড়ি পরীক্ষা করল। খুবই দুর্বল পালস। কেটের মুখ নীল হয়ে যাচ্ছিল। হার্লি দ্রুত তাকে অ্যাড্রেনালিন এবং সোডিয়াম বাই কার্বোনেট ইনজেকশন দিল।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল ডা. হার্লি।

ঘেমে গোসল হয়ে গেছে বাটলার। 'আ-আমি ঠিক জানি না। মি. ব্ল্যাকওয়েল আমাকে কফি বানাতে বললেন। আমি রান্নাঘরে ছিলাম। এমন সময় শুনি গুলির শব্দ। ছুটে দোতলায় এসে দেখি মিসেস ব্ল্যাকওয়েল এভাবে পড়ে আছেন। মি. ব্ল্যাকওয়েল তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে বলছিলেন, 'এটা তোমাকে আর আঘাত করতে পারবে না, মা। কারণ আমি এটাকে মেরে ফেলেছি।' তারপর তিনি ক্লজিট খুলে মিসেস ব্ল্যাকওয়েলের জামাকাপড় কাঁচি দিয়ে কাটতে আরম্ভ করেন।'

ডা. হার্লি ফিরল টনির দিকে। 'তুমি কী করছ, টনি?'

কেটের একটা ড্রেস পড়পড় করে ছিঁড়ে ফেলল টনি।

'আমি আমার মাকে সাহায্য করছি। আমি কোম্পানিটিকে ধ্বংস করছি। ওটা মারিয়ানকে মেরে ফেলেছে, আপনি তো জানেনই।' সে কেটের জামাকাপড় একটার পর একটা ছিঁড়তেই লাগল।

ক্রুগার-ব্রেন্টের মালিকানাধীন একটি প্রাইভেট হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যাওয়া হলো কেটকে। অপারেশন করে বুলেট বের করার সময় তাকে চার ব্যাগ রক্ত দিতে হলো।

তিনজন পুরুষ নার্স মিলে বহু কষ্টে টনিকে একটি অ্যাম্বুলেন্সে তুলল। ডা. হার্লি একটা ইনজেকশন দিতেই টনির উন্মত্ত হাত-পা ছোড়াছুড়ি বন্ধ হয়ে গেল। পুলিশও এসে পড়েছিল। ডা. হার্লি পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্রাড রজার্সকে ফোন করল। তবে প্রেসকে গুলিগোলার খবর কেন জানানো হলো না বুঝতে পারল না হার্লি।

সে হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ারে গেল কেটকে দেখতে। কেট ফিসফিসিয়ে প্রথমেই জানতে চাইল, 'আমার ছেলে কোথায়?'

'সে ভালো আছে, কেট। ওকে নিয়ে চিন্তা কোরো না।'

টনিকে কানেক্টিকাটের একটি প্রাইভেট স্যানিটারিয়ামে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

'জন, ও আমাকে খুন করতে চাইল কেন? কেন?' তীব্র বেদনা আর হাহাকার কেটের কণ্ঠে।

'মারিয়ানার মৃত্যুর জন্য সে তোমাকে দায়ী করেছে।'

'ও পাগল নাকি!'

জন হার্লি কোনো মন্তব্য করল না।

ডাক্তার চলে যাওয়ার পরে তার বলা কথা নিয়ে ভাবছিল কেট। সে মারিয়ানকে ভালোবাসত কারণ মারিয়ান টনিকে সুখী করেছিল। আমি যা করেছি সবই তো তোর জন্য, খোকা। আমার সমস্ত স্বপ্ন ছিল শুধু তোকেই ঘিরে। কিন্তু তুই কেন তা বুঝতে পারলি না? টনি তাকে এতই ঘৃণা করত যে তাকে খুন করতে চেয়েছিল। ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল কেটের। মরে যেতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু ও মরবে না। সে যা করেছে ঠিকই করেছে। ওরাই বরং ভুল ছিল। টনি ছিল একটা দুর্বল মানুষ। ওরা সবাই-ই ছিল দুর্বল। কিন্তু আমি দুর্বল নই, ভাবছিল কেট। আমি সমস্ত প্রতিকূলতার মুখোমুখি হওয়ার সাহস রাখি। আমি যে কোনো বিপদ সামাল দিতে জানি। আমি বেঁচে যাব। আমি টিকে থাকব। আমার কোম্পানিও টিকে থাকবে।

পঞ্চম খণ্ড

ইভ ও আলেকজান্দ্রা

১৯৫০-১৯৭৫

ছেচল্লিশ

সুস্থ হওয়ার জন্য ডার্ক হারবারে এসেছে কেট। টনিকে রাখা হয়েছে একটি প্রাইভেট অ্যাসাইলামে। ওখানে তার চিকিৎসা চলছে। প্যারিস, ভিয়েনা এবং বার্লিন থেকে মনোবিজ্ঞানী নিয়ে এসেছিল কেট। টনির সবরকম পরীক্ষা এবং টেস্ট করানো হয়েছে। কিন্তু ফলাফল সবসময় একই এসেছে; তার ছেলে হোমিসাইডাল সিজোফ্রেনিক এবং প্যারানোইয়াক।

'কোনো ওষুধ বা সাইকিয়াট্রিক ট্রিটমেন্টেই কাজ হচ্ছে না। সে সবসময় হিংস্র হয়ে থাকছে। ওকে একটা প্যাডেড সেলে রেখেছি আমরা। বেশিরভাগ সময় স্ট্রেইটজ্যাকেট পরিয়ে রাখতে হচ্ছে।'

'এটার কি প্রয়োজন ছিল?'

'স্ট্রেইটজ্যাকেট পরানো না থাকলে ওর কাছে যে-ই যেত তাকেই সে খুন করে ফেলত।'

গভীর দুঃখে দুচোখ বুঝে ফেলল কেট। ওরা তার সেই মিষ্টি, ভদ্র টনিকে নিয়ে কথা বলছে না। ওরা অচেনা, এক উন্মাদকে নিয়ে কথা বলছে। চোখ খুলল কেট। 'ওর জন্য কি করার কিছুই নেই?'

'ওর মনের ভেতর ঢুকতে না পারা পর্যন্ত কিছুই করার নেই। আমরা ওকে ওষুধ দিচ্ছি কিন্তু ওষুধের প্রভাব কেটে যাওয়া মাত্র সে উন্মাদে পরিণত হচ্ছে। চিরকাল এভাবে ট্রিটমেন্ট করতে পারব না আমরা।'

কেট শিরদাঁড়া টানটান করল। 'আপনার পরামর্শ কী, ডাক্তার?'

'এসব ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত যা করে থাকি তা হলো মস্তিষ্কের ছোট্ট একটি অংশ অপারেশন করে সরিয়ে ফেলি।'

ঢোক গিলল কেট। 'লোকোটমি?'

'জ্বী। অপারেশনটা করার পরে আপনার ছেলে সবরকম সাধারণ আচরণ করবে, আর পাগলামী করবে না। তবে তার ভেতরে আর কোনো আবেগ-অনুভূতিও থাকবে না।'

শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল কেটের। মেনিংগার মিউনিক থেকে আসা তরুণ ডাক্তার ডা. মরিস নীরবতা ভেঙে বলল, 'জানি ব্যাপারটা আপনার জন্য কতটা কষ্টদায়ক, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। তবে–'

'ওর যন্ত্রণা আর কষ্টের অবসান ঘটানোর ওটাই যদি একমাত্র উপায় হয়,' বলল কেট, 'তাহলে তা-ই করুন।'

ফ্রেডরিক হফম্যান তার নাতনীদের জার্মানীতে নিয়ে যেতে চাইল। মেয়ের মৃত্যু রাতারাতি তার বয়স যেন বাড়িয়ে দিয়েছে কুড়ি বছর। লোকটার জন্য মায়া হচ্ছিল কেটের কিন্তু সে টনির বাচ্চাদের কোথাও পাঠাবে না। 'ওদের একজন মহিলার আদর যত্ন দরকার, ফ্রেডেরিক। মারিয়ান বেঁচে থাকলে ওদেরকে এখানেই মানুষ করত। আপনার যখন ইচ্ছে আপনার নাতনীদের এসে দেখে যাবেন।'

শেষে হাল ছেড়ে দিল ফ্রেডেরিক হফম্যান।

নিজের বাড়িতে যমজদেরকে নিয়ে এল কেট। তাদের জন্য একটি নার্সারি সুইটের ব্যবস্থা করা হলো। গভর্নেসদের সাক্ষাতকার নিল কেট। তারপর সোলাঙ্গি ডুনাস নামে এক তরুণী ফরাসীকে নাতনীদের দেখাশোনার জন্য সে নিয়োগ দিল।

যমজ দুই বাচ্চার মধ্যে আগে যেটি জন্মেছে কেট তার নাম রাখল ইভ আর তিন মিনিট পরে জন্মানো ছোট বোনটির নাম দিল আলেকজান্দ্রা। ওরা আইডেন্টিকাল টুইন। দেখে বোঝা অসম্ভব কে ইভ আর কে আলেকজান্দ্রা। একসঙ্গে দেখলে মনে হয় যেন আয়নায় প্রতিচ্ছবি দেখছি। যমজ নাতনী পেয়ে কেট মহাখুশি। দুটি বাচ্চাই বুদ্ধিমতী, চালাক চতুর এবং দ্রুত সাড়া দেয়। তবে কিছুদিন পরে বোঝা গেল ইভ আলেকজান্দ্রার চেয়ে একটু বেশি পরিপক্ক। ইভই প্রথম হামাগুড়ি দিল, কথা বলল এবং হাঁটল। আলেকজান্দ্রাও দ্রুত তার বোনের পদাংক অনুসরণ করল বটে কিন্তু প্রথম থেকেই বোঝা যাচ্ছিল নেতৃত্বটা ইভই দেবে। আলেকজান্দ্রা তার বোনকে ছাড়া কিছু বোঝে না এবং বড় বোন যা করে তা-ই সে অনুসরণ করে। কেট যতটা সম্ভব তার নাতনীদের সঙ্গে সময় কাটায়। ওদেরকে দেখলে মনে হয় নিজের বয়সটা কমে যাচ্ছে। আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে কেট। *একদিন আমি যখন বুড়ো হয়ে যাব এবং অবসর নেবো...*

যমজদের প্রথম জন্মদিনে পার্টি দিল কেট। দু'জনের জন্য একই রকম জন্মদিনের কেক আনা হলো। দুই বোন কেটের বন্ধুবান্ধব, কর্মকর্তা এবং বাড়ির কাজের লোকদের কাছ থেকে নানান উপহার পেল। ওদের দ্বিতীয় জন্মদিনও দেখতে দেখতে চলে এল। কী যে দ্রুত সময় যায়, যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না কেটের। দুই বোন দ্রুত বড় হয়ে উঠছে। ওদেরকে এখন আগের চেয়ে সহজে আলাদা করতে পারে কেট। ইভ হয়েছে বিচ্ছু স্বভাবের আর আলেকজান্দ্রার আচরণ খুবই নরম, সে বড়বোনের কর্তৃত্ব সন্তুষ্টচিত্তে মেনে চলে। ওদের বাবা-মা নেই, ভাবছিল কেট, *তবে আমার সৌভাগ্য ওরা একজন আরেকজনকে খুব ভালোবাসে।*

পঞ্চম জন্মদিনের আগের রাতে ইভ আলেকজান্দ্রাকে খুন করার চেষ্টা করল।

ইভ তার ছোট বোনকে ভয়ানক ঘৃণা করে। কেউ আলেকজান্দ্রাকে কোলে নিলে, আদর করলে কিংবা কোনো উপহার দিলে মনেমনে রাগে ফুঁসতে থাকে ইভ। মনে হয় তাকে ঠকানো হয়েছে। সে একাই সবকিছু পেতে চায়– চায় সবাই শুধু তাকে ভালোবাসবে এবং তাকেই উপহার দেবে। সে একা একা নিজের জন্মদিনটা পর্যন্ত পালন করতে পারে না। তাতেও ভাগ বসায় আলেকজান্দ্রা। সে আলেকজান্দ্রাকে ঘৃণা করে কারণ আলেকজান্দ্রা তার মতো দেখতে, তার মতো পোশাক পরে এবং দাদীর ভালোবাসায় ভাগ বসায়। আলেকজান্দ্রা তাকে ভালোবাসে বলে আরও বিরক্ত ইভা। আলেকজান্দ্রা তার সমস্ত খেলনা, পুতুল ইত্যাদি বড়বোনকে দিয়ে দেয়ার মহত্ব দেখায় বলে ইভ আরও রেগে যায়। ইভ কোনো কিছু শেয়ার করতে রাজি না। তার যা আছে, সবই আলের্কজান্দ্রার আছে। কিন্তু আলেকজান্দ্রার সবকিছু একা ভোগ করতে চায় ইভ। রাতের বেলা সোলাঙ্গি ডুনাসের সামনে বসে দুইবোনকে জোরে জোরে প্রার্থনা স্ত্রোত্র পাঠ করতে হয়। তবে ইভ নীরবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে ঈশ্বর যেন আলেকজান্দ্রাকে মেরে ফেলেন। কিন্তু ঈশ্বর ইভের প্রার্থনায় সাড়া না দেয়ায় সে সিদ্ধান্ত নিল এ কাজ নিজেই করবে। ওদের পঞ্চম জন্মবার্ষিকীর আর অল্প ক'দিন বাকি। আবারও একটা পার্টি আলেজান্দ্রার সঙ্গে ভাগ করতে হবে ভাবলেই রাগে গা জ্বলে যায় ইভের। পার্টিতে যারা আসে তারা শুধু ইভের বন্ধু, আর তাদের দেয়া উপহারগুলো আলেকজান্দ্রা ইভের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। নাহ্, আর সহ্য করা যায় না।

আলেকজান্দ্রাকে তার শীঘ্রি হত্যা করতে হবে।

ওদের জন্মদিনের আগের রাত। বিছানায় শুয়ে আছে ইভ কিন্তু ঘুমায়নি। যখন বুঝতে পারল বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, সে আলেকজান্দ্রার বিছানায় গিয়ে তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল। 'অ্যালেক্স,' ফিসফিস করল ইভ। 'চলো নিচে কিচেনে গিয়ে আমাদের জন্মদিনের কেকটা দেখে আসি।'

ঘুম জড়ানো গলায় আলেকজান্দ্রা বলল, 'সবাইতো ঘুমাচ্ছে।'

'আমরা কাউকে জাগাব না।'

'মাদামোয়াজেল ডুনাস শুনলে রাগ করবে। কাল সকালে দেখি?'

'না, এখনই দেখব। তুমি যাবে কি যাবে না?'

চোখ ঘষে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা করল আলেকজান্দ্রা। জন্মদিনের কেক দেখার কোনো আগ্রহ তার নেই। কিন্তু বোনের মন খারাপ করতে চায় না বলে বলল, 'আচ্ছা চলো।'

বিছানা থেকে নামল আলেকজান্দ্রা, পা গলাল চটিতে। দু'জনেরই পরনে গোলাপি নাইলনের নাইটগাউন।

'এসো,' বলল ইভ। 'তবে খবরদার কোনো শব্দ যেন না হয়।'

'শব্দ করব না,' তাকে আশ্বস্ত করল আলেকজান্দ্রা।

পা টিপে টিপে ওদের বেডরুম থেকে বেরিয়ে এল দুবোন, লম্বা করিডোর পার হলো, মাদমোয়াজ্জেল ডুনাসের ঘরের বন্ধ দরজার সামনে দিয়ে এসে পেছনের সিঁড়ি বেয়ে চলে এল কিচেনে। প্রকাণ্ড রান্নাঘর। দুটি বিরাট গ্যাসের চুল্লি। দুটি ওভেন, তিনটা রেফ্রিজারেটর আর একটা ওয়াক-ইন ফ্রিজার।

রেফ্রিজারেটর খুলে ওদের বাবুর্চি মিসেস টাইলারের বানানো বার্থ ডে কেক দুটির দিকে তাকাল ইভ। একটি কেকে লেখা হ্যাপি বার্থ ডে আলেকজান্দ্রা। অপর কেকে লেখা হ্যাপি বার্থ ডে ইভ।

আগামী বছর, খুশি খুশি মনে ভাবল ইভ, *শুধু একটা কেকে হ্যাপি বার্থ ডে লেখা থাকবে।*

রেফ্রিজারেটর খুলে আলেকজান্দ্রার কেকটি বের করল ইভ। কিচেনের মাঝখানের কাঠের চপিং ব্লকের ওপর রাখল। একটি ড্রয়ার খুলে এক প্যাকেট রঙিন মোমবাতি বের করল ও।

'কী করছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল আলেকজান্দ্রা।

'সবগুলো মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলে কেমন দেখায় দেখব,' কেকের গায়ে মোমবাতিগুলো বসাতে শুরু করল ইভ।

'কাজটা ঠিক হচ্ছে না, ইভ। কেকটা তুমি নষ্ট করে ফেলবে। মিসেস টাইলার কিন্তু খুব রাগ করবেন।'

'করবে না,' আরেকটা ড্রয়ার খুলে দুটো দেশলাইর বাক্স বের করল ইভ। 'এসো, হাত লাগাও।'

'আমি ঘুমাতে যাব।'

রেগে গেল ইভ। 'ঠিক আছে। তাহলে ঘুমাতেই যাও, ভীতুর ডিম। আমি একাই সবকিছু করতে পারব।'

ইতস্তত গলায় জানতে চাইল আলেকজান্দ্রা, 'আমাকে কী করতে হবে?'

ওর হাতে দেশলাইয়ের একটি বাক্স দিল ইভ। 'মোমগুলো জ্বালিয়ে দাও।'

আগুনে খুব ভয় আলেকজান্দ্রার। দুটি মেয়েকেই বহুবার সাবধান করে দেয়া হয়েছে তারা যেন কক্ষনো আগুন নিয়ে খেলা না করে। যেসব বাচ্চা বড়দের উপদেশ শোনেনি তারা কীভাবে আগুনে পুড়ে মারা গেছে সেসব গল্পও ওরা জানে। তবে ইভকে হতাশ করতে মন চাইছিল না আলেকজান্দ্রার। সে বাধ্য মেয়ের মতো মোমবাতিতে আগুন ধরাতে লাগল।

ইভ বলল, 'ওই পাশের মোমগুলোয় আগুন ধরেনি, বোকা মেয়ে।'

কেকের দূর প্রান্তের মোমগুলোয় আগুন ধরাতে সামনে ঝুঁকল আলেকজান্দ্রা। ইভের দিকে সে পেছন ফিরে আছে। ইভ ঝট করে একটা কাঠি জ্বালিয়ে হাতে ধরা দেশলাইয়ের বাক্সের বাকি কাঠিগুলোয় আগুন ধরিয়ে ফেলল। তারপর বাক্সটা ফেলে

দিল আলেকজান্দ্রার পায়ের কাছে যাতে আলেকজান্দ্রার নাইটগাউনে আগুন ধরে যায়। ঘটনা ঘটল সেকেন্ডের মধ্যে এবং কী ঘটছে তা আলেকজান্দ্রা বুঝতে পারার আগেই তীব্র বেদনা অনুভব করল পায়ে। সে নিচে তাকিয়ে দেখে তার নাইটগাউনে আগুন ধরে গেছে। ভয়ে যন্ত্রণায় চিৎকার দিল আলেকজান্দ্রা, 'বাঁচাও! বাঁচাও! আগুন।'

জ্বলন্ত নাইটগাউনের দিকে সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে আছে ইভ, নিজের সাফল্যে ভীষণ খুশি। আলেকজান্দ্রা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে জমে গেছে।

'নোড়ো না,' বলল ইভ। 'আমি এক বালতি পানি নিয়ে আসি।' সে বাটলারের প্যান্ট্রির দিকে পা বাড়াল, বুকের ভেতরে ভয় মিশ্রিত আনন্দ।

একটি হরর মুভি বাঁচিয়ে দিল আলেকজান্দ্রার জীবন। ব্ল্যাকওয়েলদের রাঁধুনী মিসেস টাইলারকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল এক পুলিশ সার্জেন্ট। রিচার্ড ডোহার্টি নামের এ পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে মাঝে মাঝে বিছানায় যায় মিসেস টাইলার। আজকের ছবিটিতে মৃত মানুষ আর ছিন্নভিন্ন দেহের বীভৎসতা এতটাই প্রকট যে আর সহ্য করতে পারছিল না সে। ছবির মাঝপথে পুলিশ সার্জেন্টকে বলল, 'আমার আর এ ছবি দেখতে ভাল্লাগছে না, রিচার্ড। আমি গেলাম।'

বাধ্য হয়ে মিসেস টাইলারের পেছন পেছন প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে এল রিচার্ড ডোহার্টি।

যখন বাড়ি ফেরার কথা তার এক ঘণ্টা আগেই ব্ল্যাকওয়েল ম্যানসনে চলে এল ওরা। মিসেস টাইলার খিড়কির দরজা খুলেছে মাত্র কিচেন থেকে ভেসে এল আলেকজান্দ্রার চিৎকার। মিসেস টাইলার এবং সার্জেন্ট ডোহার্টি এক ছুটে চলে এল কিচেনে। ভীতিকর দৃশ্যটা একবার দেখেই অ্যাকশনে নেমে পড়ল সার্জেন্ট। এক লাফে এগিয়ে গেল সে আলেকজান্দ্রার দিকে। টান মেরে ছিড়ে ফেলল জ্বলন্ত নাইটগাউন। আলেকজান্দ্রার পা এবং নিতম্বে ফোস্কা পড়ে গেছে তবে আগুনের ক্ষুধার্ত জিভ ওর চুল কিংবা শরীরের সামনের অংশ স্পর্শ করতে পারেনি। জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল আলেকজান্দ্রা। মিসেস টাইলার একটি বালতিতে পানি ভরে এনে মেঝেয় জ্বলতে থাকা আগুনের ওপর ছুড়ে মারল।

'অ্যাম্বুলেন্সে খবর দাও,' হুকুম করল সার্জেন্ট ডোহার্টি।

'মিসেস ব্ল্যাকওয়েল কি বাড়ি আছেন?'

'বোধহয় ওপর তলায় ঘুমাচ্ছেন।

'ওঁকে জানাও।'

মিসেস টাইলার অ্যাম্বুলেন্স পাঠানোর জন্য ফোন করা শেষ করেছে, বাটলারের প্যান্ট্রিতে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল। দেখল হাতে পানির বালতি নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে ইভ। কাঁদছে অঝোরে।

'আলেকজান্দ্রা কি মারা গেছে?' চিৎকার দিল ইভ। 'ওকি মারা গেছে?'

মিসেস টাইলার ওকে কোলে তুলে নিল। 'না, সোনা। ও ঠিক আছে।'

'দোষটা আমার,' ফোঁপাচ্ছে ইভ। 'ও ওর জন্মদিনের কেকে মোমবাতি জ্বালাতে চেয়েছিল। আমার ওকে কাজটা করতে দেয়া মোটেই উচিত হয়নি।'

মিসেস টাইলার ইভের পিঠে হাত বুলিয়ে দিল। 'সব ঠিক আছে। এতে তোমার কোনো দোষ নেই।'

'আ-আমার হাত থেকে দে-দেশলাই কাঠি পড়ে গিয়েছিল। তারপরই অ্যালেক্সের জামায় আগুন ধরে যায়। কী ভ-ভয়ংকর।'

সার্জেন্ট ডোহার্টি সহানুভূতি নিয়ে তাকাল ইভের দিকে।

'বেচারী।'

'আলেকজান্দ্রার পা এবং পিঠ পুড়ে গেছে,' ডা. হার্লি জানাল কেটকে। 'তবে মারাত্মক কিছু নয়। ও সুস্থ হয়ে যাবে। আজকাল আগুনে পোড়া রোগীদের আমরা সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলতে পারি। ওর গায়ে দাগ পর্যন্ত থাকবে না। তবে অবস্থা আরও খারাপ হতে পারত।'

'জানি আমি,' বলল কেট। আলেকজান্দ্রার আহত শরীর দেখে শিউরে উঠেছিল সে। একটু ইতস্তত করে যোগ করল, 'জন, আমি ইভকে নিয়ে খুব চিন্তায় আছি।'

'ইভও আহত হয়েছে নাকি?'

'না, তা নয়। তবে দুর্ঘটনার জন্য বেচারি নিজেকে দায়ী করছে। রাতে দুঃস্বপ্ন দেখছে। গত তিন রাত ধরে ওকে আমার ঘুম পাড়িয়ে দিতে হচ্ছে। ইভ খুব সেনসিটিভ।'

'বাচ্চারা এসব দ্রুত সামলে ওঠে, কেট। তবে কোনো সমস্যা হলে আমাকে জানিয়ো। আমি ওকে চাইল্ড থেরাপিস্টের কাছে নিয়ে যাবখন।'

'ধন্যবাদ,' কৃতজ্ঞ সুরে বলল কেট।

ইভের মন ভীষণ খারাপ। জন্মদিনের পার্টি বাতিল। *আলেকজান্দ্রার জন্য পার্টিটা হলো না,* দাঁত কিড়মিড় করে ভাবছিল ইভ।

আলেকজান্দ্রা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। গায়ে কোনো পোড়া দাগ নেই। ইভকে ওর দাদীমা বলেছে, 'যে কারও জীবনেই অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে পারে, সোনা, এজন্য তোমার নিজেকে দোষারোপ করতে হবে না।'

নিজেকে দোষারোপ করছেও না ইভ। সে মনে মনে দোষ দিচ্ছে মিসেস টাইলারকে। মহিলা কেন ওই সময় বাড়ি ফিরে সবকিছু ভণ্ডুল করে দিল? কী দারুণ একটা প্ল্যান করেছিল ইভ!

কানেক্টিকাট-এ যে স্যানিটারিয়ামে টনিকে রাখা হয়েছে সে জায়গাটি খুব নির্জন,

চারপাশ জঙ্গলে ঘেরা। প্রতিমাসে একবার ছেলেকে দেখতে যায় কেট। লোবোটমি অপারেশন সফল। টনির মধ্যে এখন হিংস্রতার ছিটাফোঁটাও নেই। সে কেটকে চিনতে পারে এবং নরম গলায় ইভ ও আলেকজান্দ্রার কথা জিজ্ঞেস করে। তবে ওদেরকে দেখার ব্যাপারে কখনও আগ্রহ দেখায় না। কোনো বিষয়ের প্রতিই তার আগ্রহ নেই। তাকে দেখে মনে হয় সে সুখেই আছে।

কেট অ্যাসাইলামের সুপারিনটেন্ডেন্ট মি. বার্গারকে জিজ্ঞেস করল 'আমার ছেলে সারাদিন কি কিছুই করে না?'

'ও হ্যাঁ, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল, করে তো। ঘন্টার পর ঘন্টা বসে ছবি আঁকে।'

তার ছেলে, যে সারা পৃথিবীর অধীশ্বর হতে পারত, সে এখন বসে বসে সারাদিন ছবি আঁকে। 'কী আঁকে?'

মি. বার্গারকে বিব্রত দেখাল। 'সেসব ছবির কোনো মাথামুণ্ডু নাই, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল।'

সাতচল্লিশ

পরবর্তী দুই বছরে আলেকজান্দ্রাকে নিয়ে চিন্তা আরও বেড়ে গেল কেটের। এ মেয়েটি হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট কন্যা। একটার পর একটা দুর্ঘটনা তার জীবনে ঘটেই চলেছে। বাহামায় দুই নাতনীকে নিয়ে গরমের ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিল কেট, সুইমিং পুলে খেলতে গিয়ে আলেকজান্দ্রার ডুবে মরার দশা। এক মালী ঘটনাস্থলে ছিল বলে রক্ষা। সে-ই পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে উদ্ধার করেছে আলেকজান্দ্রাকে। পরের বছর দুই বোন প্যালিসেডসে পিকনিক করতে গেছে, আলেকজান্দ্রা কীভাবে যেন পাহাড়ের খাদে পা ফস্কে পড়ে গিয়েছিল। খাড়া পাহাড়ের বুক চিরে বেরিয়ে আসা ঝোপের সঙ্গে ঝুলে ছিল বলে ও যাত্রায় প্রাণে বেঁচেছে আলেকজান্দ্রা।

'বোনের ওপর সবসময় খেয়াল রেখো,' কেট বলল ইভকে। 'দেখছই তো মেয়েটা কেমন ক্যাবলা ধরনের হয়েছে। নিজেকে সামলে চলতে জানে না।'

'জানি আমি,' গম্ভীর মুখে বলল ইভ। 'আমি ওর ওপর লক্ষ রাখব, দিদা।'

কেট তার দুই নাতনীকেই খুব ভালোবাসে। ওদের বয়স এখন সাত, হুবহু একরকম দেখতে, দু'জনেরই মাথায় লম্বা, কোমল স্বর্ণকেশ রাজি, পাতলা ছিপছিপে এবং বংশানুক্রমে ম্যাকগ্রেগরদের মতো চোখ পেয়েছে তারা। তারা দেখতে একরকম হলেও দু'জনের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ আলাদা। আলেকজান্দ্রার কোমল, বিনয়ী আচরণ টনির কথা মনে করিয়ে দেয় কেটকে, ওদিকে ইভ হয়েছে তার মতো, জিদ্দি, একগুঁয়ে এবং স্বনির্ভর।

একজন শোফার পারিবারিক রোলস রয়েসে দু'বোনকে স্কুলে দিয়ে আসে। এত দামী গাড়ি চড়ে স্কুলে যেতে লজ্জা পায় আলেকজান্দ্রা, কিন্তু ইভ ব্যাপারটা খুব উপভোগ করে। কেট দু'বোনকেই সাপ্তাহিক একটা হাত খরচ দেয়। টাকাটা কীভাবে খরচ করা হলো তা দিদাকে জানানোর ব্যাপারে নির্দেশ রয়েছে। সপ্তাহ শেষ না হতেই ইভের সমস্ত টাকা খরচ হয়ে যায়, আলেকজান্দ্রার কাছ থেকে সে ধার করে। দিদা যেন ব্যাপারটা জানতে না পারে তার চেষ্টা করে ইভ। কিন্তু কেট সব খবরই জানে। আদরের নাতনীর বয়স মাত্র সাত অথচ এ বয়সেই সে দক্ষ অ্যাকাউন্ট্যান্টের মতো হিসেবের গড়মিল ঢাকা দিতে ওস্তাদ, ভাবলেই হাসি পায় কেটের।

প্রথম প্রথম কেট খুব আশা করত টনি আবার ভালো হয়ে উঠবে, সুস্থ হবে। পাগলাগারদ ছেড়ে চলে আসবে ক্রুগার-ব্রেন্টে। কিন্তু সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তার

স্বপ্নের রঙ ফিকে হতে শুরু করেছে। কেট বুঝতে পেরেছে টনি আর কোনোদিনই সুস্থ হবে না।

সালটা ১৯৬২, ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেডের আয়তন দিনদিন বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে, এখন নতুন নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেট তার সত্তরতম জন্মদিন পালন করেছে। তার চুল পেকে সাদা হয়ে গেলেও এখনও ঋজু ও শক্ত তার শরীর। সময়ের ক্ষয় যে তাকে গ্রাস করবে এ ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন কেট। তাকে প্রস্তুত হতে হবে। পরিবারের জন্য সেফগার্ড হবে কোম্পানি। ব্রাড রজার্স ম্যানেজার হিসেবে খুব ভালো, তার ওপর অনেক বিষয়ে চোখ বুজে ভরসা করা যায় কিন্তু সে তো ব্ল্যাকওয়েল পরিবারের কেউ নয়। *আমার নাতনীরা বড় না হওয়া পর্যন্ত আমাকে বেঁচে থাকতে হবে,* ভাবে কেট। সেসিল রোডসের বলা শেষ কথাগুলো মনে পড়ে যায় তার– কত কম কাজ করা হয়েছে– অথচ এখনও কত কাজ বাকি।

যমজ বোনেরা বারোতে পা দিয়েছে, কৈশোরের দোরগোড়ায় তারা উপস্থিত। কেট যতটা সম্ভব সময় দিত তার নাতনীদের। কিন্তু এখন আরও বেশি মনোযোগী সে ওদের প্রতি। তাকে যে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ইস্টার উইকে কেট এবং যমজ বোনেরা কোম্পানির প্লেনে ডার্ক হারবার চলে আসে। জোহানেসবার্গ ছাড়া পারিবারিক যত এস্টেট আছে সব জায়গাতেই গেছে দু' বোন। তবে তাদের সবচেয়ে ভালো লেগেছে ডার্ক হারবার। এখানে এলে নিজেদেরকে দারুণ স্বাধীন মনে হয়। ওরা নৌকায় চড়া, সাঁতার কাটা এবং ওয়াটার স্কি করতে খুব পছন্দ করে। আর ডার্ক হারবারে এ সব আনন্দের উপকরণ রয়েছে। ইভ এর আগে তার স্কুলের বন্ধুদের নিয়ে এসেছিল ডার্ক হারবারে। এবারেও নিয়ে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু মানা করে দিয়েছে কেট। সে তার নাতনীদের সঙ্গে একান্তে সময় কাটাতে চায়। দুই বোন বুঝতে পারছিল এবারে ভিন্ন কিছু ঘটছে। তাদের দিদা প্রতিদিন তাদের সঙ্গে একত্রে বসে খানা খায়, ওদেরকে নিয়ে নৌকা ভ্রমণে যায়, সাঁতার কাটা, এমনকী একসঙ্গে ঘোড়াতেও চড়ে।

দুই বোন আশ্চর্যরকম একরকম দেখতে, দু'জনেই অসম্ভব রূপবতী। বারান্দায় বসে দু'বোনকে টেনিস খেলতে দেখছিল কেট। সে ওদেরকে নিয়ে মনে মনে একটা হিসাব কষছিল। ইভ হলো ওস্তাদ, আলেকজান্দ্রা তার সাগরেদ। ইভ একরোখা, আলেকজান্দ্রা খুবই নমনীয়। ইভ একজন ন্যাচারাল অ্যাথলেট। আর আলেকজান্দ্রা তার জীবনে দুর্ঘটনা যেন সঙ্গী করেই রেখেছে। এই তো মাত্র কয়েকদিন আগে দুই বোন ছোট একটি সেইল বোটে সাগর ভ্রমণে গিয়েছিল, ইভ হাল নিয়ে ব্যস্ত, হঠাৎ বাতাসের ধাক্কায় ঘুরে যায় পাল, আলেকজান্দ্রার মাথায় আছড়ে পড়ে। আলেকজান্দ্রা সময় মতো সরে দাঁড়াতে পারেনি বলে পালের আঘাতে পানিতে পড়ে যায়। ডুবেই মারা যেত যদি না কাছেই থাকা আরেকটি বোটের মানুষজন সাগরে নেমে ওকে উদ্ধার না করত। কেট অবাক হয়ে ভাবছিল আলেকজান্দ্রার জীবনে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটছে এর কারণ কী এই যে

ইভের তিন মিনিট পরে পৃথিবীতে এসেছে। তবে কারণ যা-ই হোক তাতে কিছু আসে যায় না। কেট সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। তার মনে আর কোনো প্রশ্ন নেই। সে তার টাকা বিনিয়োগ করবে ইভের ওপর আর এর পরিমাণ দশ বিলিয়ন ডলার। সে ইভের জন্য খুব ভালো একটি পাত্র খুঁজে এনে বিয়ে দেবে। কেট অবসর নেয়ার পরে ইভই চালাবে ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেড। আলেকজান্দ্রাকেও প্রচুর টাকা দেবে কেট, সে-ও সম্পদশালী জীবন যাপন করবে। কেট যেসব চ্যারিটি গঠন করেছে ওগুলোর ভাগ দেবে আলেকজান্দ্রাকে। হ্যাঁ, এসব কাজ বেশ ভালো পারবে আলেকজান্দ্রা। কারণ ভারী মিষ্টি আর দরদী হয়েছে তার ছোট নাতনীটি।

কেটের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ হলো ইভকে ভালো স্কুলে ভর্তি করা। ব্রিয়ারক্রেস্ট স্কুলটি তার পছন্দ হলো। দক্ষিণ ক্যারোলাইনার খুব নামকরা স্কুল। নতুন স্কুলে ভর্তি হয়ে দু'জনেই খুব খুশি বিশেষ করে ইভ। বাড়ি থেকে দূরে এসে স্বাধীনতা সে খুব উপভোগ করছিল। যদিও এ স্কুলে অনেক কড়াকড়ি তবে ইভ পাত্তা দিল না। কারণ দিদার বাড়িতে নানান শৃঙ্খলা মেনে নিয়েই তাকে বড় হতে হয়েছে। তাকে যে জিনিসটা বিরক্ত করে তা হলো আলেকজান্দ্রাকেও একই স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। ব্রিয়ারক্রেস্টে ভর্তি করা হবে শুনে ইভ দিদাকে অনুনয় করে বলেছিল, 'আমি একা যাই, প্লিজ, দিদা?'

কেট বলেছিল, 'না, ডার্লিং। আলেকজান্দ্রা তোমার সঙ্গে পড়বে।'

বিরক্তিটা বাধ্য হয়ে চেপে রাখতে হয়েছে ইভকে। 'ঠিক আছে তুমি যা বলো।'

দিদার সামনে ইভ হলো ভেজা মাছটি উল্টে খেতে না জানা বেড়াল। সে জানে ক্ষমতাটা কার কাছে কেন্দ্রীভূত। তাদের পাগল বাবাকে আটকে রাখা হয়েছে পাগলাগারদে। তাদের মা নেই। দিদাই সবকিছু দেখাশোনা করছে। কোম্পানির সমস্ত টাকা-পয়সার মালিক সে-ই। ইভ জানে তারা বড়লোক। তবে তাদের কত টাকা আছে তা জানে না। অনুমান করতে পারে অনেক টাকা, যা দিয়ে সে যা চাইবে তা-ই কিনতে পারবে। আর সুন্দর সুন্দর জিনিস কিনতে খুব পছন্দ করে ইভ। শুধু সমস্যা একটাই–আলেকজান্দ্রা।

ব্রিয়ারক্রেস্ট স্কুলে দু'বোনেরই সবচেয়ে প্রিয় হলো সকালবেলাকার ঘোড়ায় চড়ার ক্লাস। বেশিরভাগ মেয়েরই নিজেদের ঘোড়া আছে, কেট দু'বোনকেই তাদের দ্বাদশ জন্মবার্ষিকীতে দুটি ঘোড়া উপহার দিয়েছে। স্কুলের রাইডিং ইন্সট্রাক্টর জেরোমি ডেভিস লক্ষ্য করেন কীভাবে তার ছাত্রীরা ঘোড়া চালাচ্ছে। ঘোড়ায় চড়ে প্রথম এক ফুট উঁচু একটি প্রাচীর বা বেড়া লাফ মেরে পার হতে হয়, তারপর দুই ফুট উঁচু প্রাচীর, সবশেষে চার ফুট উঁচু প্রাচীর। দেশের অন্যতম সেরা রাইডিং টিচার ডেভিস। তার বহু সাবেক ছাত্র সোনার মেডেল জিতেছে, মানুষ দেখলেই বুঝতে পারেন কে ন্যাচারাল বর্ন

রাইডার। স্কুলের নতুন ছাত্র ইভ ব্ল্যাকওয়েল হলো তেমনই একজন। কী করতে যাচ্ছে তা নিয়ে ভাবতে হয় না ইভকে। কীভাবে লাগাম অথবা স্যাডল সামলাবে তা নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন পড়ে না তার। সে এবং তার ঘোড়া যখন হার্ডলগুলো পার হয় মনে হয় দু'জনে মিলে একটি মাত্র ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। বাতাসে ইভের সোনালি চুল উড়তে থাকে, শ্বাসরুদ্ধকর একটি দৃশ্য। *ওই মেয়েটিকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না*, ভাবেন মি. ডেভিস।

তরুণ সহিস টমি আবার পছন্দ করে আলেকজান্দ্রাকে। আলেকজান্দ্রা এবং ইভ তাদের স্লিভে আলাদা রঙের ফিতে বাঁধে যাতে মি. ডেভিস বুঝতে পারেন কে কোন্‌জন। ইভ আজ আলেকজান্দ্রাকে তার ঘোড়ার স্যাডল বাঁধতে সাহায্য করছিল, টমি ব্যস্ত ছিল আরেকজন ছাত্রী নিয়ে। এমন সময় ডেভিসের একটি টেলিফোন এল মেইন বিল্ডিং থেকে। তিনি ফোন ধরতে গেলেন। তারপর কী ঘটল কেউ বলতে পারে না।

আলেকজান্দ্রা তার ঘোড়ায় চড়েছিল, ঘোড়াটি একবার রিং ঘুরে প্রথম প্রাচীরটি লাফ মেরে ডিঙানোর জন্য এগিয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ করে জানোয়ারটি উন্মাদের মতো আচরণ শুরু করে এবং ধাক্কা মেরে একটা দেয়ালে ফেলে দেয় আলেকজান্দ্রাকে। অজ্ঞান হয়ে যায় সে, অল্পের জন্য ঘোড়ার খুর থেকে রক্ষা পায় তার মুখ। টমি আলেকজান্দ্রাকে কোলে করে স্কুল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ডাক্তার আলেকজান্দ্রাকে পরীক্ষা করে দেখেন।

'ওর শরীরের কোনো হাড় ভাঙেনি, মারাত্মক কোনো ক্ষতিও হয়নি,' ঘোষণা করেন তিনি। 'কাল সকাল নাগাদ ও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে আবার ঘোড়ায় চড়তে পারবে।'

'কিন্তু ওতো মারা যেতে পারত।' চেঁচিয়ে ওঠে ইভ।

ইভ সেদিন সারাদিন ছোট বোনের কাছ ছাড়া হলো না। হেড মিস্ট্রেস মিসেস চ্যান্ডলার মুগ্ধ হয়ে ভাবলেন বোনের প্রতি বোনের এমন মমতা সত্যি বিরল।

মি. ডেভিস আলেকজান্দ্রার ঘোড়াটিকে বহু কষ্টে শান্ত করার পরে দেখতে পেলেন ওটার স্যাডল ব্লাংকেট রক্তে ভেজা। তিনি ব্ল্যাংকেট তুললেন। বিয়ারের ক্যানের একটা ভাঙা অংশ ঘোড়ার পিঠের মাংসে এখনও গেঁথে রয়েছে। স্যাডলের চাপে ওটা ঘোড়ার শরীরে ঢুকে যাচ্ছিল আর তা-ই প্রচণ্ড ব্যথায় উন্মাদের মতো আচরণ করছিল আবোধ প্রাণীটি। ডেভিসের কাছ থেকে রিপোর্ট পেয়ে তাৎক্ষণিক তদন্তের আদেশ দিলেন মিসেস চ্যান্ডলার। ওইসময় যেসব মেয়ে আস্তাবলের কাছে-পিঠে ছিল তাদের সকলকে তলব করা হলো।

'ধাবত টুকরোটা যে-ই ঘোড়ার স্যাডলের নিচে রাখুক না কেন,' বললেন মিসেস চ্যান্ডলার, 'সে হয়তো মজা করতেই কাজটা করেছিল। কিন্তু এ নির্দোষ মজার কারণে মারাত্মক কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। আমি জানতে চাই কে এ কাজ করেছে।'

কেউ ব্যাপারটা স্বীকার করছে না দেখে তাদেরকে এক এক করে নিজের অফিসে ডেকে পাঠালেন হেড মিস্ট্রেস। সবার সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বললেন। কিন্তু সবাই

বলল তারা এ ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানে না। ইভের পালা এলে তাকে প্রশ্ন করা হলে তার মুখটা কেমন শুকিয়ে যায়।

'তোমার বোনের এ অবস্থার জন্য কে দায়ী বলে তোমার কোনো ধারণা আছে?' জিজ্ঞেস করলেন চ্যান্ডলার।

ইভ মেঝেয় তাকিয়ে বিড়বিড় করে জবাব দিল, 'আমি বলতে পারব না।'

'তার মানে তুমি কিছু দেখেছ?'

'প্লিজ, মিসেস চ্যান্ডলার...'

'ইভ, আলেকজান্দ্রা মারাত্মক আহত হতে পারত। যে মেয়ে এ কাজ করেছে তার অবশ্যই শাস্তি হওয়া উচিত যাতে ভবিষ্যতে সে আর এমন কাজ করার সাহস না পায়।'

'কোন মেয়ে কিছু করেনি।'

'মানে?'

'টমি করেছে।'

'আমাদের সহিস টমি?'

'জ্বী, ম্যাম। আমি ওকে ঘোড়ার কাছে দেখেছি। ভেবেছি স্যাডল টাইট করে বাঁধছে। ও হয়তো আলেকজান্দ্রার কোনো ক্ষতি করতে চায়নি। আলেকজান্দ্রা ওর ওপর খুব খবরদারী করে বলে টমি হয়তো ওকে একটা শিক্ষা দিতে চেয়েছিল। ওহ্, মিসেস চ্যান্ডলার, কথাগুলো বলা আমার একদমই উচিত হয়নি। আমি চাই না কেউ বিপদে পড়ুক।' প্রায় কেঁদে ফেলার জোগাড় ইভের।

মিসেস চ্যান্ডলার ডেস্ক ছেড়ে ওর কাছে গেলেন। কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'ইটস অলরাইট, ইভ। তুমি আমাকে সত্যি কথাটা বলে দিয়ে ভালোই করেছ। এ নিয়ে তোমাকে আর ভাবতে হবে না। আমি দেখছি কী করা যায়।

পরের দিন সকালে মেয়েরা আস্তাবলে গিয়ে দেখল টমি নেই। তাদের জন্য নতুন সহিস রাখা হয়েছে।

কয়েকমাস পরে স্কুলে আরেকটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল। বেশ কয়েকটি মেয়ে ধরা পড়ল মারিজুয়ানা সেবন করতে গিয়ে। তাদের একজন জানাল ইভ তাদেরকে এ জিনিস সরবরাহ এবং বিক্রি করে। ইভ সক্রোধে অস্বীকার করল অভিযোগ। মিসেস চ্যান্ডলার তল্লাশী চালালেন। আলেকজান্দ্রার লকারে পাওয়া গেল লুকানো মারিজুয়ানা।

'ও এমন কাজ করতে পারে আমি বিশ্বাস করি না,' চেঁচামেচি শুরু করে দিল ইভ। 'কেউ নিশ্চয় ওকে ফাঁসানোর জন্য ওসব ওখানে লুকিয়েছে।'

এ খবর হেড মিস্ট্রেস কেটকে জানিয়ে দিলেন। ছোট বোনকে বটবৃক্ষের মতো ছায়া দিয়ে রাখছে বলে ইভের ওপর খুবই প্রীত হলো কেট। এই না হলে ম্যাকগ্রেগরের বংশধর।

যমজদের পঞ্চদশ জন্মদিনে কেট ওদেরকে সাউথ ক্যারোলাইনার বাড়িতে নিয়ে

গিয়ে জম্পেস এক পার্টি দিল। জন্মদিনে অনেক তরুণ ছেলে আমন্ত্রিক হয়ে এল। কেট এদেরকে দাওয়াত দিয়েছে দেখতে হয়তো এদের মাঝ থেকে ইভ তার ভবিষ্যত বেছে নিতে পারবে, যে হবে ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেডের ভবিষ্যত।

পার্টি ফার্টি পছন্দ করে না আলেকজান্দ্রা। তবে দাদীমাকে হতাশ করতে চায় না বলে মুখে হাসি ফুটিয়ে ভান করে সে পার্টি খুব উপভোগ করছে। ইভ তার উল্টো। পার্টি তার খুবই পছন্দের জিনিস। সে সুন্দর সুন্দর ড্রেস পরে লোকের প্রশংসা শুনতে ভালোবাসে। আর আলেকজান্দ্রা ভালোবাসে বই পড়তে এবং পেইন্টিং দেখতে। সে ডার্ক হারবারের বাড়িতে বাবার আঁকা ছবিগুলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আফসোস হয় বাবা অসুস্থ হওয়ার আগে যদি বাবার কাছে থাকা যেত। ওদের বাবা ছুটির দিনগুলোতে বাড়ি আসে। সঙ্গে থাকে কোনো পুরুষ নার্স। কিন্তু এ বাবা যে তার সম্পূর্ণ অচেনা। সে মেয়েদের সঙ্গে কোনো কথা বলে না। দাদু ফ্রেডেরিক হফম্যানের সঙ্গেও যমজ নাতনীদের খুব কম দেখা সাক্ষাৎ হয়। দাদু থাকে জার্মানীতে। অসুস্থ।

স্কুলে দ্বিতীয় বছরে, গর্ভবতী হয়ে পড়ল ইভ। সে শুকিয়ে যাচ্ছিল, চেহারা হয়ে উঠছিল ম্লান। অসুস্থতার কারণে সকালবেলার কয়েকটি ক্লাসও মিস করল। পরপর কয়েকদিন বমি করার কারণে তাকে স্কুলের ডাক্তার দেখানো হলো। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করার পরপরই হেডমিস্ট্রেসকে খবর দিলেন।

'ইভ প্রেগন্যান্ট,' বললেন ডাক্তার।

'কিন্তু– এ অসম্ভব! এ কী করে ঘটল?'

'যেভাবে ঘটার সেভাবেই ঘটেছে।'

'কিন্তু ওতো বাচ্চা মাত্র।'

'কিন্তু এ বাচ্চাটিই মা হতে চলেছে।'

ইভ কীভাবে গর্ভবতী হলো তা বলতে চাইল না। শুধু বলল, 'আমি কাউকে ঝামেলায় ফেলতে চাই না।'

ইভের কাছ থেকে এরকম জবাবই আশা করেছিলেন মিসেস চ্যান্ডলার।

'ইভ, ডিয়ার, আমাকে বলো কে তোমার এ সর্বনাশ করল।'

অবশেষে ভেঙে পড়ল ইভ। 'আমাকে ধর্ষণ করেছে,' কাঁদতে কাঁদতে বলল সে।

এ কথা শুনে দারুণ চমকে গেলেন মিসেস চ্যাণ্ডলার। তিনি ইভের কম্পমান শরীর নিজের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'শয়তানটা কে বলো?'

'মি. পারকিনসন।'

ওদের ইংরেজি শিক্ষক।

ইভ না হয়ে অন্য কেউ হলে কথাটা বিশ্বাস করতেন না চ্যান্ডলার। জোসেফ পারকিনসন নিতান্তই গোবেচারা টাইপের মানুষ। তার স্ত্রী আছে, তিন সন্তান আছে। ব্রিয়ারক্রেস্ট স্কুলে গত আটবছর ধরে পড়াচ্ছেন তিনি। এ লোক এমন কাণ্ড করতে

পারেন হেড মিস্ট্রেসের কল্পনাতেও ছিল না। তিনি মি. পারকিনসনকে নিজের অফিসে তলব করলেন। ইংরেজির শিক্ষকের চেহারা দেখেই বুঝে ফেললেন ইভের অভিযোগ সত্যি। মি. পারকিনসন প্রধান শিক্ষিকার সামনে জড়োসড়ো হয়ে বসলেন। তার মুখের পেশী তিরতির করে কাঁপছে।

'আপনি নিশ্চই জানেন কেন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি, মি. পারকিনসন?'

'ম-মনে হয় জানি।'

'বিষয়টি ইভকে নিয়ে।'

'জ্বী। তা-তা বুঝতে পারছি।'

'সে বলেছে আপনি তাকে রেপ করেছেন।'

বিস্ময়ে মুখ হাঁ হয়ে গেল পারকিনসনের। 'ওকে রেপ করেছি? মাই গড! কেউ যদি রেপড হয়ে থাকে তো সে আমি!'

মিসেস চ্যান্ডলার ঘৃণাভরে বললেন, 'আপনি জানেন আপনি কী বলছেন? বাচ্চাটা–'

'ও বাচ্চা নয়,' পারকিনসনের কণ্ঠে বিষ। 'ও একটা দানবী।' হাতের চেটো দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন।

'পুরো সেমিস্টার সে আমার ক্লাসে সামনের সারিতে বসে থাকত উরুর কাপড় বের করে। ক্লাস শেষে আমার ঘরে এসে উদ্ভট সব প্রশ্ন করত আর আমার গায়ে গা ঘষত। আমি ব্যাপারটা অবশ্য পাত্তা দিতাম না। তারপর মাস দেড়েক আগে, এক বিকেলে সে আমার বাড়িতে আসে। তখন বাড়িতে আমি ছিলাম একা। বউ আর বাচ্চারা বেড়াতে গিয়েছিল–' তাঁর গলার স্বর ঘরঘরে শোনাল। 'ওহ, জেসাস, আমি নিজেকে সামলাতে পারিনি।' অশ্রুসজল হয়ে উঠল চোখ।

ইভকে নিয়ে আসা হলো অফিসে। তার চেহারা শান্ত। সে মি. পারকিনসনের চোখে চোখ রাখল। পারকিনসন মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকালেন। ঘরে মিসেস চ্যান্ডলার ছাড়াও আছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিন্সিপাল এবং ছোট্ট শহরটির পুলিশ প্রধান।

চিফ অব পুলিশ নরম গলায় বললেন, 'কী ঘটেছিল আমাদেরকে বলবে, ইভ?'

'জ্বী স্যার, বলব,' ইভের কণ্ঠ শান্ত। 'মি. পারকিনসন বলেছিলেন তিনি আমাদের ইংরেজি পড়া বুঝিয়ে দেবেন। এক রোববারের বিকেলে তিনি আমাকে তাঁর বাসায় যেতে বলেন। বাড়িতে তিনি একা ছিলেন। উনি বললেন বেডরুমে যেতে, কী যেন দেখাবেন। আমি তার সঙ্গে দোতলায় উঠে যাই। তারপর তিনি আমাকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে ফেলে–'

'মিথ্যা কথা!' চিৎকার দিলেন পারকিনসন। 'ওভাবে কিছু হয়নি। ওরকমভাবে ঘটনা ঘটেনি। ও মিথ্যা কথা বলছে...'

কেটকে খবর দেয়া হলো। পুরো ঘটনা তাকে বলা হলো। শেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো লোক জানাজানি যাতে না হয় সেজন্য এ নিয়ে আর কোনো বাড়াবাড়ি নয়। স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়া হলো মি. পারকিনসনকে।

আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় পেলেন তিনি এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য। ইভের গর্ভপাত ঘটানো হলো।

কেট স্কুলটি কিনে ফেলল। তারপর ওটা বন্ধ করে দিল। ইভ খবর শুনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'আমার খুব খারাপ লাগছে, দিদা। ওই স্কুলটা খুব ভালো লাগত আমার।'

কিছুদিন পরে ইভ অপারেশনের ধকল কাটিয়ে উঠলে তাকে এবং আলেকজান্ড্রাকে সুসানের কাছে লিনস্টাট ফার্নিউড নামে একটি সুইস ফিনিশিং স্কুলে ভর্তি করে দিল কেট।

আটচল্লিশ

ইভের ভেতরে আগুন জ্বলছে দাউদাউ। এ আগুন নেভানোর ক্ষমতা তার নেই। এ শুধু কামনার আগুন নয়, এ হলো বেঁচে থাকার জন্য ক্রোধ, সবকিছু পাবার, সবকিছু হওয়ার তীব্র বাসনা। জীবন ইভের কাছে প্রেমিকের মতো এবং এ জীবনের ওপর কর্তৃত্ব করতে মরিয়া হয়ে আছে সে। সে সবাইকে ঈর্ষা করে। সে ব্যালে নাচ দেখতে যায়। এবং ব্যালেরিনাকে ঘৃণা করে কারণ সে নিজে তো মঞ্চে উঠে নাচতে পারছে না, দর্শকদের হাততালিও পাচ্ছে না। সে হতে চায় বিজ্ঞানী, গায়িকা, শল্যবিদ, পাইলট, অভিনেত্রী। সে সব কিছু করতে চায় এবং সবার চেয়ে ভালোভাবে করতে চায় যা করার কথা কেউ কোনোদিন কল্পনাও করেনি। সবকিছু চায় বলেই কোনোকিছুর জন্য আর তর সইছিল না ইভের।

লিনস্টান ফার্নউডের পাশেই ছেলেদের সামরিক স্কুল। ইভ মাত্র সতেরোতে পা দিয়েছে, ইতিমধ্যে মিলিটারি স্কুলের প্রায় প্রতিটি ছাত্র এবং ইনস্ট্রাক্টরদের অর্ধেকেরও বেশির সঙ্গে তার শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে। সে যার তার সঙ্গে মাখামাখি করে, শয্যাসঙ্গী বাছাইয়ে কোনো বাছ-বিছার নেই, তবে এবারে সে সাবধানেই এসব কাজ করছে। কারণ আবারও গর্ভবতী হয়ে পড়ার শখ নেই ইভের। সেক্স উপভোগ করে ইভ কারণ সেক্সের মাধ্যমে নিজের ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারে সে। সেক্সের সময় সে-ই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। ছেলেরা তার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে এ ব্যাপারটা খুব উপভোগ করে ইভ। এদেরকে সে বড়শিতে গাঁথা মাছের মতো খেলায়, দেখে ওরা যৌন ক্ষিদেয় কী রকম ছটফট করছে। এরা বলে এরা ইভের জন্য জান কোরবান করতে পারে। ইভ জানে মিথ্যা কথা কিন্তু এ মিথ্যা কথাটা শুনতে মজা লাগে তার। সে স্রেফ চুম্বন করে যে কোনো পুরুষকে উত্তেজিত করে তুলতে পারে। এদেরকে ইভের প্রয়োজন নেই, ওদেরই বরং ইভের প্রয়োজন। সে যে ওদেরকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করছে, এটাই ইভকে চরম সুখ দেয়। কয়েক মিনিটের মধ্যে সে একজন পুরুষের শক্তি এবং দুর্বলতা চিনে নিতে পারে। তার চোখে পৃথিবীর সকল পুরুষই হাঁদারাম।

ইভ সুন্দরী, বুদ্ধিমতী এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ একটি প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকারী, তাকে বিয়ে করার যে কত প্রস্তাব আসে। তবে এসবে কোনো উৎসাহ নেই ইভের। সে শুধু আগ্রহ বোধকরে আলেকজান্দ্রা যাদেরকে পছন্দ করে, তাদের প্রতি।

একবার শনিবার রাতের স্কুল ড্যান্সে রেনে ম্যালো নামে এক তরুণ ফরাসী ছাত্রের

সঙ্গে পরিচয় হলো আলেকজান্দ্রার। ছেলেটি দেখতে তেমন সুদর্শন নয় তবে সে বুদ্ধিমান এবং সংবেদনশীল। আলেকজান্দ্রার তাকে খুব ভালো লেগে গেল। ঠিক হলো পরের শনিবার তারা শহরে সাক্ষাৎ করবে।

'সাতটার সময়,' বলল রেনে।

'আমি অপেক্ষা করব।'

সে রাতে রুমে বসে ইভকে নতুন বন্ধুর গল্প বলল আলেকজান্দ্রা।

'ও অন্যদের মতো নয়। ও খুব লাজুক এবং মিষ্টি। আমরা শনিবারে একসঙ্গে থিয়েটারে যাব।'

'ওকে তোমার খুব মনে ধরেছে তাই না, ছোট্ট বোনটি আমার?' ইয়ার্কির সুরে বলল ইভ।

ব্লাশ করল আলেকজান্দ্রা। 'মাত্রই তো পরিচয় হলো, তবে ওকে আমার মনে হয়েছে– ওয়েল, ইউ নো।'

হাতের ওপর মাথা রেখে বিছানায় শুয়ে ছিল ইভ। বলল, 'না, আমি জানি না। ও তোমার সঙ্গে শুতে চায় নি?'

'ইভ! বললাম না ও ওরকম ছেলেই নয়। ও...ও খুব লাজুক।'

'বেশ। বেশ। আমার ছোট্ট বোনটি প্রেমে পড়েছে।'

'অবশ্যই আমি প্রেমে পড়িনি। তোমাকে আসলে কথাটা বলাই উচিত হয়নি।'

'বলেছ বলে খুশি হয়েছি,' গম্ভীর গলায় বলল ইভ।

পরের শনিবার আলেকজান্দ্রা থিয়েটারের সামনে এসে দেখল রেনের টিকিটিরও চিহ্ন নেই। ও ঠায় একঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকল রাস্তায় পথচারীদের তেরছা চাউনি উপেক্ষা করে। নিজেকে বোকা বোকা লাগছিল ওর। শেষ পর্যন্ত ছোট একটি ক্যাফেতে একা একা নিরানন্দ ডিনার সেরে সে ফিরে এল স্কুলে। দারুণ মন খারাপ নিয়ে। ঘরে ইভকে পেল না। রাত দুটোর সময় চোরের মতো ঘরে ঢুকল ইভ।

'তোমাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করছিলাম আমি,' ফিসফিস করল আলেকজান্দ্রা।

'কয়েকজন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তোমার সন্ধ্যা কেমন কাটল। নিশ্চয় খুব ভালো?'

'একদম পচা,' জবাব দিল আলেকজান্দ্রা। 'ও আসেই নি।'

'খুবই দুঃখের কথা,' কণ্ঠে সহানুভূতি ফোটাল ইভ। 'তোমার আসলে কোনো পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস করা উচিত হবে না।'

'ওর কিছু হয়নি তো?'

'আরে না, অ্যালেক্স। খোঁজ নিয়ে দেখো ও হয়তো অন্য কোনো সুন্দরী সঙ্গিনীতে মজেছে।

তা-ই হবে নিশ্চয়, ভাবছে আলেকজান্দ্রা। এ ঘটনায় সে অবাক হয়নি মোটেই। আলেকজান্দ্রা মোটেই রূপসচেতন নয়। জানে না ও আসলে কতটা সুন্দরী।

সে শৈশব থেকে বড় বোনের ছায়ায় বড় হয়ে উঠেছে। ইভ ছাড়া সে কিছুই বোঝে না, ছেলেরা যে ইভের প্রতি আকৃষ্ট হয় এতে তার একটুও হিংসে হয় না। বরং এটাই খুব স্বাভাবিক মনে হয় তার কাছে। বেচারির কল্পনাতেও নেই তার বড়বোন তাকে কী প্রচণ্ড ঘৃণা করে।

এ রকম ঘটনা আরও বার কয়েক ঘটল। যেসব ছেলে আলেকজান্দ্রার প্রতি আগ্রহ দেখাল, আলেকজান্দ্রা খুশি মনে ডেটিং-এ যেতে রাজি হলো, কিন্তু ডেটিং-এর দিন এদের টিকিটিরও খোঁজ মিলল না। এক সাপ্তাহিক ছুটির দিনে লুসানের রাস্তায় রেনের সঙ্গে অকস্মাৎ দেখা হয়ে গেল আলেকজান্দ্রার। সে পা চালিয়ে এসে আলেকজান্দ্রাকে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার? তোমার না আমাকে ফোন করার কথা ছিল?'

'তোমাকে ফোন করার কথা ছিল? কি বলছ তুমি?'

পিছিয়ে গেল রেনে, অপ্রস্তুত। 'ইভ...?'

'না, আলেকজান্দ্রা।'

রাঙা হয়ে গেল রেনের মুখ। 'আ-আমি দুঃখিত আমি যাই।' সে প্রায় ছুটে পালাল। তার দিকে হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইল আলেকজান্দ্রা। সেদিন রাতে আলেকজান্দ্রা ইভকে ঘটনাটা বলেছে, ইভ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ও একটা ফাউল। ওকে তোমার ভুলে যাওয়া উচিত, অ্যালেক্স।'

মিলিটারি স্কুলের ছেলেরা প্রায়ই ইভকে নিয়ে সপ্রশংস আলোচনা করে।

'যখন কাজ শেষ হয়ে গেল, আমি আর নড়াচড়া করতেই পারছিলাম না...

'অমন পাছা জীবনে দেখি নাইরে, ভাই....'

'ওর পুসি যেন কথা বলে...'

'গড, বিছানায় যেন ও এক বাঘিনী।'

ইভের যৌনশক্তি নিয়ে যখন কমপক্ষে দু'ডজন ছাত্র আর হাফ ডজন শিক্ষক প্রশংসা করতে লাগল, গোপন এ ব্যাপারটি আর গোপন রইল না। মিলিটারি স্কুলের একজন ইন্সট্রাক্টর এ গসিপের গল্প করছিল লিসটাট ফার্নউডের এক শিক্ষকের কাছে। সে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মিসেস কলিন্সের কাছে সব ফাঁস করে দিল। গোপনে তদন্ত চলল এবং তার ফলাফল হিসেবে হেডমিস্ট্রেস এবং ইভের মধ্যে মিটিং হলো।

'তুমি স্কুল ছেড়ে চলে গেলে এ স্কুলের সুনাম বজায় থাকবে।'

ইভ মিসেস কলিন্সের দৃষ্টিতে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল যেন উনি প্রলাপ বকছেন। 'আপনি কী বলছেন?'

'তুমি মিলিটারি একাডেমির অর্ধেক মানুষকে যে সেবা দিয়ে চলেছ তার কথা বলছি আমি। বাকি অর্ধেক অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে সেবা পাবার জন্য লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

'এমন বিশ্রী মিথ্যা কথা জীবনে শুনিনি আমি,' তীব্র ঘৃণায় কাঁপছে ইভের গলা। 'আমি অবশ্যই আমার দাদিকে এ নিয়ে নালিশ জানাবো। উনি যখন ব্যাপারটা

জানবেন–'

'তোমাকে আর সে কাজটুকু করতে হবে না,' বাধা দিলেন প্রধান শিক্ষিকা। 'আমি লিনস্টাট ফার্নউডকে কলংকিত হতে দেব না। তুমি যদি এক্ষুনি স্কুল ছেড়ে চলে না যাও, যাদের তুমি শয্যাসঙ্গী করেছ তাদের একটা তালিকা তোমার দিদাকে পাঠিয়ে দেব।'

'আমি তালিকাটি একবার দেখতে চাই।'

বিনা বাক্যব্যয়ে কাগজের টুকরোটা ইভকে হস্তান্তর করলেন মিসেস কলিন্স। দীর্ঘ তালিকা। ইভ ওতে চোখ বুলিয়ে বুঝতে পারল অন্ততঃ সাতটি নাম তালিকায় নেই। সে চুপচাপ বসে ভাবতে লাগল। তারপর মুখ তুলে উদ্ধত গলায় বলল, 'এটা নিঃসন্দেহে আমার পরিবারের সম্মানের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র। কেউ আমাকে ব্যবহার করে আমার দিদাকে বিব্রত করতে চাইছে। তবে দিদা যেন বিব্রত না হন সে জন্যই আমি স্কুল ছেড়ে দেব ভাবছি।'

'খুবই বুদ্ধিমতীর মতো সিদ্ধান্ত,' খড়খড়ে গলায় বললেন মিসেস কলিন্স। 'তোমাকে কাল সকালে স্কুলের গাড়ি বিমানবন্দরে পৌঁছে দেবে। আমি তোমার দিদাকে কেব্‌ল করে জানিয়ে দেব যে তুমি যাচ্ছ। ইউ আর ডিসমিসড।'

ঘুরল ইভ, পা বাড়াল দরজায়। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে থমকে দাঁড়াল। ফিরে বলল, 'আর আমার বোনের কী হবে?'

'আলেকজান্দ্রা এখানে থাকছে।'

ক্লাস শেষে ডরমিটরিতে ফিরে আলেকজান্দ্রাকে দেখে জিনিসপত্র বাঁধাছাদা করছে ইভ। 'করছ কী তুমি?'

'বাড়ি যাচ্ছি।'

'বাড়ি? টার্মের মাঝখানে?'

ইভ তার বোনের দিকে ফিরল। 'অ্যালেক্স তোমার কি কখনও মনে হয়নি এ স্কুলটি একদমই বাজে? এখানে কিছুই শিখতে পারছি না। বেহুদা সময় নষ্ট।'

বিস্মিত আলেকজান্দ্রা। 'স্কুলটা তোমার বাজে লেগেছে এরকমতো কখনোই আমার কাছে মনে হয়নি, ইভ।'

'প্রতিটি দিন এখানে বিশ্রী লেগেছে আমার। এখানে এতদিন তবু লেগেছিলাম শুধুমাত্র তোমার জন্য। মনে হতো স্কুলটা খুব পছন্দ তোমার।'

'তা অবশ্য ঠিক। তবে–'

'আমি দুঃখিত, অ্যালেক্স। এ স্কুল আর সহ্য হচ্ছে না আমার। আমি নিউইয়র্কে ফিরে যাব। আমি বাড়ি ফিরতে চাই।'

'মিসেস কলিন্সকে বলেছ এ কথা?'

'কিছুক্ষণ আগে।'

'তাঁর প্রতিক্রিয়া কী?'

'তাঁর প্রতিক্রিয়া আবার কী হবে? শুনে তিনি দুঃখ পেয়েছেন ভয় পেয়েছেন ভেবে এতে না আবার তাঁর স্কুলের বদনাম হয়। আমি যেন থেকে যাই এজন্য তিনি আমার হাত-পা ধরেন এমন অবস্থা।'

বিছানার কিনারে বসল আলেকজান্দ্রা। 'কী যে বলব বুঝতে পারছি না।'

'তোমাকে কিছু বলতে হবে না। এর সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'অবশ্যই আছে। তোমার যদি এখানে ভালো না লাগে–'

থেমে গেল সে। 'ঠিকই বলেছ তুমি। বেহুদা সময় নষ্ট করছি আমরা এখানে। ল্যাটিন ক্রিয়াপদ শিখে হবেটা কী?

'ঠিক। হ্যানিবাল আর তার ভাই হ্যাসড্রুবালের ইতিহাস জেনে আমাদের লাভ কী?'

ক্লজিটে হেঁটে গেল আলেকজান্দ্রা। নিজের সুটকেস নিয়ে বিছানার ওপর রাখল।'

হাসল ইভ। 'আমি কিন্তু তোমাকে এখান থেকে চলে যেতে বলিনি, অ্যালেক্স। তবে একসঙ্গে দুবোন বাড়ি যাচ্ছি বলে আমার খুব খুশি লাগছে।'

বোনের হাতে মৃদু চাপ দিল আলেকজান্দ্রা। 'আমারও।'

ইভ উদাস গলায় বলল, 'ভালো কথা, তুমি একটু ফোন করে দিদাকে জানিয়ে দাও আমরা প্লেনে করে কাল আসছি। বোলো এ জায়গাটা আমাদের আর ভাল্লাগছে না। বলতে পারবে?'

'পারব,' ইতস্ততঃ গলায় বলল অ্যালেকজান্দ্রা। 'তবে দিদা বোধহয় খুশি হবেন না।'

'বুড়ো মানুষটিকে নিয়ে তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না,' বলল ইভ। 'ও আমি সামলে নেব।'

এতে অবশ্য আলেকজান্দ্রার কোনো সন্দেহ নেই। কারণ ইভ দিদাকে যে কোনো পরিস্থিতিতে খুব সুন্দর সামাল দিতে পারে। আর ইভকে কে কবে প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছে?

আলেকজান্দ্রা গেল ফোন করতে।

বড় বড় জায়গায় কেট ব্ল্যাকওয়েলের বন্ধু, শত্রু এবং বিজনেস অ্যাসোসিয়েটেরা আছে। গত কয়েক মাস ধরে কিছু বিশ্রী গুজব শুনতে পাচ্ছিল সে এদের কাছ থেকে। শত্রুরা ঈর্ষাবশত এসব দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে ভেবে প্রথম প্রথম ব্যাপারটা পাত্তা দেয়নি সে। কিন্তু ক্রমাগত গুজব শোনাই যাচ্ছিল। শোনা যাচ্ছিল ইভ সুইটজাল্যান্ডের একটি মিলিটারি স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে নাকি খুব ঢলাঢলি করছে। তার অ্যাবরশন হয়েছে। ইভকে ওখানে সামাজিক ব্যাধি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

নাতনীরা বাড়ি আসছে শুনে খুশিই হয়েছে কেট। এইবারে সে এ দুর্গন্ধের সত্য-মিথ্যা জানতে পারবে।

দুই নাতনীর জন্য অপেক্ষা করছিল কেট। ওরা বাড়ি আসার পরে ইভকে নিয়ে বসার

ঘরে চলে এল কেট। 'কিছু বাজে কথা শুনেছি আমি,' বলল সে। 'তোমাদেরকে স্কুল থেকে কেন তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে?' নাতনীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল কেট।

'আমাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয়নি,' জবাব দিল কেট। আমি আর অ্যালেক্স ইচ্ছে করে স্কুল ছেড়েছি।'

'ছেলেদের সঙ্গে ঘটনা ঘটানোর কারণে?

ইভ বলল, 'প্লিজ, দাদি মা, আমি এ নিয়ে কোনো কথা বলতে চাই না।'

'কিন্তু বলতে তোমাকে হবেই। তোমরা ওখানে কী করেছ?'

'আমি কিছু করিনি। অ্যালেক্স–' থেমে গেল ইভ।

'হ্যাঁ, বলো, অ্যালেক্স কী করেছে?' নিষ্ঠুরের মতো শোনাল কেটের কণ্ঠ।

'প্লিজ, ওকে যেন বকাবকি কোরো না,' দ্রুত বলল ইভ। 'ও আসলে মজা করতে গিয়েছিল। ও আমার ছদ্মবেশ নিয়ে বাচ্চাদের মতো এ খেলাটা খেলেছে। ও কী করছে ঠিক বুঝতে পারছিলাম না আমি। তবে হঠাৎ করেই মেয়েরা গুজব ছড়াতে শুরু করে। শুনতে পাই ও নাকি অনেক ছেলের সঙ্গে–' মুখটুখ লাল করে বিরতি দিল ইভ।

'তোমার ছদ্মবেশ নিয়েছিল?' বিমূঢ় কেট। 'তুমি বাধা দাওনি কেন?'

'চেষ্টা করেছিলাম,' করুণ গলায় বলল ইভ। 'কিন্তু ও আত্মহত্যা করার ভয় দেখাল। ওহ্, দিদা আমার মনে হয় আলেকজান্দ্রা একটু–' যেন জোর করে শব্দটা উচ্চারণ করল। 'সে– অস্থিরমতি হয়ে উঠেছে। তুমি যেন আবার এ ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে যেয়ো না।' অশ্রুসজল চোখে আকুতি করল ইভ। 'তাহলে আবার হিতে বিপরীত কী ঘটে যায়।'

বোনের জন্য ইভের ভালোবাসা দেখে মায়া লাগল কেটের। 'থাক, ইভ, কাঁদে না। আমি আলেকজান্দ্রাকে কিছুই বলব না। আজকের আলোচনা তুমি আর আমি ছাড়া কেউ জানবে না।'

'আ-আমি এসব কথা এ জন্যেই বলতে চাইনি, দিদা,' ফোঁপাচ্ছে ইভ। 'জানতাম তো তুমি খুব কষ্ট পাবে।'

পরে, চা পান করার সময় আলেকজান্দ্রার দিকে তাকিয়ে কেট ভাবছিল ওর বাইরেটা কী সরল অথচ ভেতরটা বোঝাই গরল। আলেকজান্দ্রা ওইসব নোংরামো করেছে, ভাবা যায়? তাও আবার নিজে করে দোষ চাপিয়েছে বড় বোনের ওপর। শিউরে উঠল কেট।

পরের দুটি বছর দুই বোন মিস পর্টারের স্কুলে পড়াশোনা করল। ইভ খুব সাবধানী ছিল। সে এ দু'বছর কোনো পুরুষ মানুষের সঙ্গে জড়াল না। দাদীমার সঙ্গে কোনোভাবেই যেন সম্পর্কের অবনতি না ঘটে সেদিকে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি ছিল ইভের। বুড়ির বয়স উনআশি চলছে। বেশিদিন আর বাঁচবে না। তারপর তো বিশাল এ সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী হবে ইভ!

উনপঞ্চাশ

কন্যাদ্বয়ের একুশতম জন্মদিনে ইভ তার নাতনীদেরকে প্যারিসে নিয়ে গিয়ে কোকো চ্যানেল থেকে তাদের জন্য নতুন ওয়াড্রোব কিনে দিল।

লো পোজিত বেদুইনে, ছোট্ট ডিনার পার্টিতে ইভ ও আলেকজান্দ্রার সঙ্গে কাউন্ট আলফ্রেড মরিয়ের এবং তার স্ত্রী কাউন্টেস ভিভিয়েনের পরিচয় হলো। কাউন্টের বয়স পঞ্চাশ, বেশ অভিজাত চেহারা, মাথায় মরচে রঙা ধূসর চুল, শরীরটা অ্যাথলেটদের মতো সুগঠিত। তার স্ত্রী সুদর্শনা, ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেস হিসেবে তার সুখ্যাতি রয়েছে।

ইভ দু'জনের কারও প্রতি মনোযোগ দিত না যদি না কাউন্টেসের উদ্দেশে বলা একজনের মন্তব্য শুনে ফেলত।

'তোমাকে আর আলফ্রেডকে দেখলে আমার ঈর্ষা হয়। তোমরা খুবই সুখী দম্পতি জানি আমি। তোমাদের বিয়ের কত বছর হলো? পঁচিশ?'

'আগামী মাসে ছাব্বিশ হবে,' স্ত্রীর হয়ে জবাব দিলেন আলফ্রেড। 'আর ইতিহাসে আমিই সম্ভবত একমাত্র ফরাসী যে সারাজীবন স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছে।'

এ কথায় সবাই হেসে উঠল ইভ ছাড়া। ডিনারের বাকি সময়টা সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করল কাউন্ড মরিয়ের এবং তার স্ত্রীকে। এই মোটকু, থলথলে শরীরের ঘাড়ে গর্দানে এক মধ্যবয়সী মহিলার মধ্যে কাউন্ট এমন কী পেয়েছেন বুঝে পেল না সে। সত্যিকারের লাভ মেকিং কী জিনিস কাউন্ট হয়তো কোনোদিন তার স্বাদ উপভোগ করতে পারেন নি। কাউন্টের অহংকারী উচ্চারণ ইভ একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিল।

পরদিন ইভ মরিয়েরের অফিসে ফোন করল। 'আমার নাম ইভ ব্ল্যাকওয়েল। আমাকে হয়তো আপনার মনে নেই–'

'আরে, তোমাকে মনে নেই মানে! তুমি আমার বন্ধু কেটের অপূর্ব সুন্দরী দুই নাতনীর একজন।'

'আমাকে মনে রেখেছেন বলে আত্মশ্লাঘা অনুভব করছি, কাউন্ট। আপনাকে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা করবেন। শুনেছি ওয়াইনের বিষয়ে আপনি একজন এক্সপার্ট।' অনুতাপের ভঙ্গিতে হাসল সে। 'আমি দিদার জন্য একটা সারপ্রাইজ ডিনার পার্টি দেব। কিন্তু কী মদ পরিবেশন করব তা-ই বুঝতে পারছি না। আপনি যদি এ ব্যাপারে একটু

পরামর্শ দিতেন।'

'নিশ্চয় দেব,' খুশি হলেন কাউন্ট। 'তবে বিষয়টি নির্ভর করবে ডিনারে তুমি কী খাওয়াচ্ছ তার ওপর। যদি মাছ দিয়ে শুরু করো তাহলে হালকা শ্যাবিলিস–'

'ওহ্ আমার বোধহয় মদের নামটাম মনে থাকবে না। আমি কি বিষয়টি নিয়ে সামনাসামনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি? আপনি যদি আজ লাঞ্চের সময় ফ্রি থাকেন–'

'এক পুরনো বন্ধুর বাড়িতে দাওয়াত ছিল অবশ্য। সে আমি ম্যানেজ করে নেবখন।

'বাহ, তাহলে তো খুবই ভালো হয়।' ধীরে ধীরে রিসিভার নামিয়ে রাখল ইভ। এ লাঞ্চের কথা কাউন্টের সারাজীবন মনে থাকবে।

লাসেরিতে সাক্ষাৎ করল দু'জনে। মদ নিয়ে আলোচনা হলো সংক্ষিপ্ত। মরিয়েরের বিরক্তিকর বক্তৃতা অধৈর্য হয়ে শুনল ইভ, তারপর হঠাৎ করে কথার মাঝে বলে বসল, 'আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি, আলফ্রেড।'

খাবি খেলেন কাউন্ট। 'কী বললে?'

'বললাম আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি।'

এক ঢোক ওয়াইন গিললেন কাউন্ট। 'আ ভিনটেজ ইয়ার।' তিনি ইভের হাত চাপড়ে দিয়ে হাসলেন। 'সকল ভালো বন্ধুরই উচিত একে অপরকে ভালোবাসা।'

'আমি ওরকম ভালোবাসার কথা বলছি না, আলফ্রেড।'

কাউন্ট ইভের চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন কী ধরনের ভালোবাসার কথা বলছে ইভ। তিনি খুবই নার্ভাস বোধ করলেন। মেয়েটির বয়স মাত্র একুশ আর তিনি মধ্যবয়স্ক, বিবাহিত একজন সুখী পুরুষ। আজকালকার তরুণী মেয়েগুলোকে মোটেই বুঝতে পারেন না কাউন্ট। তিনি এই অসম্ভব রূপবতী যুবতীটির সামনে বসে থাকতে খুব অস্বস্তি বোধ করছিলেন। ইভ হলুদ রঙের স্কার্ট আর সবুজ সোয়েটার পরেছে। সোয়েটার ভেদ করে তার ভারাট দুই বুক যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। 'ও ভেতরে নিশ্চয় ব্রা পরেনি,' অনুমান করলেন কাউন্ট কারণ দৃঢ়, বর্তুলাকার স্তনদ্বয়ের পরিষ্কার আভাস টের পাওয়া যাচ্ছে। অত্যন্ত সরল, মিষ্টি মুখখানার দিকে তাকিয়ে কথার খেই হারিয়ে ফেললেন কাউন্ট। 'তুমি তুমি তো আমাকে ভালো করে চেনোই না।'

'তোমাকে কাল রাতে ডিনারে দেখার পর থেকে তোমার ওপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও সরিয়ে নিতে পারিনি চোখ। তারপর থেকে শুধু তোমার কথাই ভেবেছি। একটুও ঘুমাতে পারিনি। এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারছি না তোমাকে।' এ কথাটি অবশ্য মোটামুটি সত্যি।

'আ-আমি কী বলব বুঝতে পারছি না, ইভ। আমি একজন বিবাহিত পুরুষ। আমি–'

'ওহ্, তোমার স্ত্রীকে আমি যে কী হিংসা করি। সে পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবতী নারী। জানি না ব্যাপারটা সে উপলব্ধি করতে পারে কিনা।'

'অবশ্যই পারে। আমি তো ওকে সবসময়ই কথাটি মনে করিয়ে দিই।' নার্ভাস

ভঙ্গিতে হাসলেন তিনি, কীভাবে প্রসঙ্গটি বদলানো যায় ভাবছেন।

'সে কি সত্যি তোমার মর্যাদা বুঝতে পারে? সে কি জানে তুমি কতটা সংবেদশীল? তোমার সুখ-দুঃখ নিয়ে সে কি চিন্তা করে?'

কাউন্টের অস্বস্তি ক্রমে বেড়েই চলেছে। 'তুমি খুব সুন্দরী একটি মেয়ে,' বললেন তিনি। 'একদিন তুমি তোমার পছন্দের পুরুষটিকে খুঁজে পাবে এবং–'

'আমি তাকে পেয়ে গেছি এবং আমি তার সঙ্গে বিছানায় যেতে চাই।'

দ্রুত চারপাশটা একবার দেখে নিলেন কাউন্ট, কেউ আবার কথাটা শুনে ফেলল নাতো! 'ইভ! প্লিজ!'

সামনে ঝুঁকে এল ইভ। 'আমার আর কিছু চাই না। এ স্মৃতি আমি সারাজীবন আমার মনের মনিকোঠায় রেখে দেব।

দৃঢ় গলায় বললেন কাউন্ট, 'এ অসম্ভব। তুমি আমাকে খুবই অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছ। তরুণী মেয়েদের উচিত নয় শিকার ধরার জন্য যাকে তাকে প্রস্তাব দেয়া।'

চোখে জল এসে গেল ইভের। 'আমার সম্পর্কে তোমার তা-ই ধারণা হলো? আমি শিকার ধরে বেড়াই? জীবনে একজনেরই প্রেমে পড়েছিলাম আমি। আমাদের বিয়ে হওয়ারও কথা ছিল।' সে চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে দিল। 'খুব ভালো, বিনয়ী আর ভদ্র ছিল সে। কিন্তু পাহাড়ে চড়তে গিয়ে দুর্ঘটনায় মারা গেছে সে। আমার চোখের সামনেই ঘটেছিল ঘটনা। কী যে ভয়ংকর সে দৃশ্য।'

কাউন্ট মরিয়ের ইভের হাতে হাত রাখলেন। 'আমি সত্যি খুব দুঃখিত।'

'তোমাকে দেখে তার কথা খুব মনে পড়ছিল আমার। দু'জনের চেহারায় এত মিল! তোমাকে দেখে মনে হচ্ছিল আমার বিল বুঝি আবার ফিরে এসেছে আমার কাছে। আমাকে শুধু একটা ঘণ্টা তোমার সঙ্গে একান্তে কাটানোর সুযোগ দাও। কথা দিচ্ছি আর কোনোদিন তোমাকে বিরক্ত করব না। আর কখনও তুমি আমার চেহারাও দেখবে না। প্লিজ, আলফ্রেড।'

কাউন্ট অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ইভের দিকে। কী করবেন ভাবছেন।

রু সেইন্ট অ্যানের ছোট একটি হোটেলে দুপুরটা কাটাল ওরা। বিয়ের আগে-পরে যৌন মিলনে এতটা সুখ পাননি কাউন্ট মরিয়ের যতটা সুখ আজ তাকে দিয়েছে ইভ। এক হারিকেন ঝড়, এক কামুকী, এক দানবীর নাম ইভ। মিলন শেষে বিছানায় চিৎপাত হয়ে পড়ে রইলেন কাউন্ট। তাঁর সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত।

কাপড় পরতে পরতে ইভ জিজ্ঞেস করল, 'আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে, ডার্লিং?'

'আমি তোমাকে ফোন করব,' বললেন মরিয়ের।

এ মেয়েটির সঙ্গে আবার দেখা করার কোনো ইচ্ছেই তাঁর নেই। এর মধ্যে ভীতিকর কিছু একটা আছে। এর সঙ্গে জড়ানো মানে কোনো কেচ্ছাকেলেংকারির জন্ম দেয়া।

কাজেই একে আর কোনোদিনই ফোন করবেন না কাউন্ট।

ঘটনার পরিসমাপ্তি এখানেই ঘটতে পারত যদি ওরা একসঙ্গে হোটেল থেকে বেরিয়ে না আসত এবং এলিসিয়া ভ্যান্ডারলেকের চোখে পড়ে যেত। এলিসিয়া গত বছর কেট ব্ল্যাকওয়েলের একটি চ্যারিটি কমিটিতে কাজ করেছেন। গসিপ বা স্ক্যান্ডাল রটনায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। আর এ মুহূর্তে চোখের সামনে যাদেরকে দেখছেন তাদেরকে তিনি খুব ভালোই চেনেন। কাউন্ট মরিয়ের এবং তাঁর স্ত্রীর ছবি তিনি খবরের কাগজে দেখেছেন তবে কাউন্টের সঙ্গিনী মিসেস ব্ল্যাকওয়েলের কোন্ নাতনীটি সে ব্যাপারে নিশ্চিত নন মিসেস ভ্যান্ডারলেক। অবশ্য তাতে কিছু আসে যায় না। তিনি তাঁর কর্তব্যকর্ম করার তাগিদে ব্যক্তিগত টেলিফোন নোটবুক খুঁজে কেট ব্ল্যাকওয়েলের বাসায় ফোন করলেন।

ফোনে সাড়া দিল বাটলার। 'Bonjour'

'আমি মিসেস ব্ল্যাকওয়েলের সেঙ্গ কথা বলতে চাই, প্লিজ।'

'কে বলছেন জানতে পারি?'

'আমি মিসেস ভ্যান্ডারলেক। বিষয়টি ব্যক্তিগত।'

এক মিনিট পরে মিসেস ব্ল্যাকওয়েলের সাড়া মিলল ফোনে।

'কে বলছেন?

'আমি এলিসিয়া ভ্যান্ডারলেক, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। আমার কথা আপনার নিশ্চয় মনে আছে। গত বছর আমরা একসঙ্গে একটি কমিটিতে কাজ করেছিলাম এবং–'

'যদি চাঁদাফাদার দরকার হয় তাহলে আমার–'

'না, না,' দ্রুত বললেন মিসেস ভ্যান্ডারলেক। 'বিষয়টি ব্যক্তিগত। আপনার নাতনীকে নিয়ে।'

কেট ব্ল্যাকওয়েল নিশ্চয় তাঁকে চায়ের দাওয়াত দেবেন বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য। তারপর দু'জনের একটি উষ্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

কেট বলল, 'তার সম্পর্কে কী?

বিষয়টি নিয়ে ফোনে আলাপ করার কোনো ইচ্ছেই ছিল না মিসেস ভ্যান্ডারলেকের কিন্তু কেট ব্ল্যাকওয়েলের নিরুত্তাপ কণ্ঠ তাঁকে আগে বাড়তে বাধ্য করল। 'ভাবলাম এটা আমার কর্তব্য আপনাকে বলা যে কিছুক্ষণ আগে আপনার নাতনীকে একটি হোটেল থেকে কাউন্ট মরিয়েরের সঙ্গে চুপিসারে বেরুতে দেখেছি। নিশ্চয় এটা কোনো গোপন অভিসার ছিল।'

কেটের কণ্ঠ বরফ শীতল শোনাল। 'কথাটা বিশ্বাস করা কষ্ট। তবু জানতে চাইছি আমার কোন্ নাতনীটি আপনি দেখেছেন?'

হে হে করে হাসলেন মিসেস ভ্যান্ডারলেক। 'আ-ঠিক বলতে পারব না। ওদেরকে তো আলাদা করা শক্ত। কেউ বোধহয় আলাদাভাবে চিনতেও পারে না, তাই না?'

'খবরের জন্য ধন্যবাদ,' লাইন কেটে দিল কেট।

এইমাত্র শোনা সংবাদটা হজম করার চেষ্টা করল সে। মাত্র গতকাল রাতে ওরা

একসঙ্গে ডিনার করেছে। আলফ্রেড মরিয়েরকে পনেরো বছর ধরে চেনে কেট। তার চরিত্রের সঙ্গে এসব একদমই যায় না। তবু পুরুষ মানুষ তো! আলেকজান্দ্রা যদি আলফ্রেডকে বিছানায় নিয়ে যেতে প্রলোভিত করে...

কেট ফোন তুলে অপারেটরকে বলল, 'সুইজাল্যান্ডে লাইন দিন। লুসানের লিনস্টাট ফার্নউড স্কুল।'

সন্তুষ্টি এবং তৃপ্তি নিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরল ইভ। সে তৃপ্ত কারণ কাউন্টের সঙ্গে সেক্স খুব উপভোগ করেছে ইভ আর সন্তুষ্ট লোকটাকে এক হাত নেয়া গেছে। *একে যখন এত সহজে বোকা বানাতে পেরেছি, ভাবছে ইভ, যে কাউকেই আমি এখন চাইলেই পেয়ে যাব। পুরো পৃথিবীটাই হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে পারি আমি।* সে লাইব্রেরিতে ঢুকতেই দেখতে পেল তার দাদীমাকে।

'হ্যালো, দিদা, কেমন কাটল সারাদিন?'

কেট তার সুন্দরী, প্রিয় নাতনীকে লক্ষ্য করছে। 'ভালো না। তোমার কী খবর?'

'আমি একটু শপিংয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু কেনার মতো তেমন কিছুই পাইনি। তুমি তো আমাকে সবকিছুই কিনে দিয়েছ। তুমি সবসময়ই–'

'দরজাটা বন্ধ করো, ইভ।'

কেটের গলার স্বরে বুকটা ধড়াস করে উঠল ইভের। সে ওক কাঠের বিরাট দরজাটা বন্ধ করে দিল।

'বসো।'

'কোনো সমস্যা, দিদা?'

'তোমার কাছ থেকে সে ব্যাপারটাই জানতে চাইছি। ভেবেছিলাম আলফ্রেড মরিয়েরকে এখানে ডাকব কিন্তু লজ্জাজনক ঘটনাটা দশকান করতে চাইনি।'

ইভের মাথাটা ঘুরে উঠল বোঁ করে। এ অসম্ভব! ওকে আর আলফ্রেড মরিয়েরকে কেউ দেখেনি। মাত্র এক ঘণ্টা আগে সে ওখান থেকে এসেছে। 'তু-তুমি কী বলছ বুঝতে পারলাম না।'

'তাহলে পরিষ্কার ভাষায় বলতেই হচ্ছে। তুমি আজ বিকেলে কাউন্ট মরিয়েরের সঙ্গে বিছানায় গিয়েছিলে।'

ইভের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। 'কি-কিন্তু এতে আমার কোনো দোষ নেই,' গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে সে। 'সে আমাকে ফোন করে লাঞ্চের দাওয়াত দিয়েছিল। সে মদ খেয়ে মাতাল হয় তারপর–'

'চোপ!' চাবুকের মতো ঝলসে উঠল কেটের গলার স্বর। তীব্র ঘৃণায় জ্বলজ্বল করছে চোখ। 'তুমি একটা নোংরা মেয়ে।'

নাতনীর অপকর্মের কথা জেনে কেট কী যে কষ্ট পেয়েছে। তার কানে এখনও বাজছে হেড মিস্ট্রেসের কণ্ঠ, *মিসেস ব্ল্যাকওয়েল তরুণী মেয়েরা প্রেম করবে করুক।*

তাতে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু ইভ বাছবিচারহীনভাবে যে কাণ্ড করেছে তাতে আমার স্কুলের সুনাম...

অথচ ইভ কিনা আলেকজান্দ্রার ওপরে দোষ চাপিয়ে দিয়েছিল।

দুর্ঘটনাগুলোর কথা স্মরণ করল কেট। আগুনে পুড়ে আলেকাজান্দ্রা প্রায় মরতে বসেছিল। পাহাড় থেকে পড়ে গিয়েছিল আলেকজান্দ্রা। ইভ নৌকা চালানোর সময় বোট থেকে ছিটকে সাগরে পড়ে যায় আলেকজান্দ্রা। ইভ তার ইংরেজির শিক্ষকের ওপর ধর্ষণের অপবাদ দিয়েছিল। কেটের মনে পড়ছে ব্রিয়ারক্রেস্ট স্কুলে ইভকে মারিজুয়ানা বিক্রির অপরাধে অভিযুক্ত করা হয় অথচ দোষটা চাপানো হয়েছিল আলেকজান্দ্রার ওপর। ইভ আলেকজান্দ্রাকে দোষ দেয়নি, তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল। ওটাই ইভের কৌশল– সে নিজে খলনায়িকা হয়েও নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছিল। ওহ্, কী বিচ্ছু মেয়ে!

পরীর মতো চেহারার নাতনীটির অতিশয় সরল মুখটির দিকে তাকিয়ে কেট ভাবছিল *অথচ তোমাকে নিয়ে আমি আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করেছিলাম। ভেবেছিলাম একদিন তোমার হাতে ক্রুগার-ব্রেন্টের নিয়ন্ত্রণ তুলে দেব। তোমাকেই কিনা আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতাম।*

কেট বলল, 'তুমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, আমি আর তোমার মুখ দর্শন করতে চাই না।'

রক্ত সরে গিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল ইভের মুখ।

'তুমি একটা বেশ্যা। তবে শুধু বেশ্যা হলেও হয়তো তোমাকে আমি সহ্য করতে পারতাম। কিন্তু তুমি ভয়ংকর এক প্রতারক, অসম্ভব ধূর্ত এবং ভয়ানক মিথ্যাবাদী। আমি এতসব সহ্য করতে পারব না।'

সবকিছু অত্যন্ত দ্রুত ঘটে যাচ্ছিল। ইভ মরিয়া হয়ে বলল, 'দিদা, আলেকজান্দ্রা তোমার কাছে আমার সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলেছে–'

'আলেকজান্দ্রা এসবের কিছুই জানে না। আমি শুধু মিসেস কলিন্সের সঙ্গে কথা বলেছি।'

'ব্যস এটুকুই?' জোর করে গলায় স্বস্তির সুর ফোটাল ইভ। 'মিসেস কলিন্স আমাকে ঘৃণা করেন কারণ–'

কেট বলল, 'যতই সাফাই গাওনা কেন কোনো লাভ হবে না, ইভ। ইটস ওভার। আমি আমার উকিলকে খবর দিয়েছি। আমার সম্পত্তির কোনো ভাগ তুমি পাচ্ছ না।'

ইভের পৃথিবীটা যেন টুকরো হয়ে গেল। 'তুমি এটা পারো না। তাহলে– তাহলে আমার চলবে কী করে?'

'তোমাকে সামান্য কিছু হাত খরচ দেয়া হবে। এখন থেকে নিজেই রোজগার করতে শেখো। তোমার যা খুশি করতে পার।' কঠোর হলো কেটের কণ্ঠ। 'তবে তোমার সম্পর্কে কোনো বাজে কথা যদি আমার কানে আসে কিংবা কোনো স্ক্যান্ডাল খবরের

কাগজে পড়ি, তুমি যদি কোনোভাবে ব্ল্যাকওয়েলদের নামটাকে অসম্মান করেছ, তোমার হাত-খরচা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?'

ইভ তার দাদীমার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছে এবার সে আর ক্ষমা পাচ্ছে না। ডজনখানেক যুক্তি দেখানোর কথা ভাবছিল সে কিন্তু ওগুলো ঠোঁট পর্যন্ত এসে আটকে রইল, রা হয়ে ফুটল না।

কেট চেয়ার ছাড়ল, কম্পিত গলায় বলল, 'হয়তো এসব তোমার কাছে কিছুই না তবে আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজটা আজ আমাকে করতে হলো।'

ঘুরল কেট। আড়ষ্ঠ পিঠ নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অন্ধকার শয়নকক্ষে একাকী বসে কেট ভাবছিল সবকিছু কেন এমন উল্টোপাল্টা ঘটল।

ডেভিড যদি মারা না যেত এবং টনি যদি তার বাবা.: আদরে বড় হতে পারত...

টনি যদি আর্টিস্ট হতে না চাইত...

যদি মারিয়ান মারা না যেত...

তাহলে হয়তো এসব কিছুই ঘটত না।

কেট ভাবছিল আমি যাকেই ভালোবাসি সবাই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। টনি। মারিয়ান। ইভ...

কেট যখন তীব্র মনোকষ্টে ভুগছে ওই সময় সুটকেস গোছাতে গোছাতে প্রচণ্ড রাগে ফুঁসছিল ইভ। সে মাত্র দু'এক ঘণ্টা বিছানায় কাটিয়েছে কিন্তু দিদা এমন ভাব করল যেন ইভ ক্ষমার অযোগ্য একটা অপরাধ করে ফেলেছে। বুড়িটা আসলে একটা পাগলি। ইভ একজন ভালো উকিল ভাড়া করবে তারপর দেখবে কে কীভাবে তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে। ক্রুগার-ব্রেন্ট তার কোম্পানি। দাদী কতবার বলেছে একদিন সে-ই এ কোম্পানির মালিক হবে। আলেকজান্দ্রা নিশ্চয় তার দাদীর কানে কানপড়া দিয়েছে, ইভের বিরুদ্ধে আজেবাজে কথা বলে বুড়ির মন বিষিয়ে দিয়েছে। কোম্পানির মালিক হতে চেয়েছে আলেকজান্দ্রা। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হলো এখন হয়তো সত্যি সে কোম্পানির মালিক হয়ে যাবে নাহ, ইভের তা কিছুতেই সহ্য হবে না। *এ আমি কিছুতেই ঘটতে দেব না। ওকে আমার বাধা দিতেই হবে। কোনো একটা রাস্তা খুঁজে বের করতেই হবে।* ইভ ঠাস করে সুটকেস বন্ধ করে তার বোনের খোঁজে গেল।

বাগানে বসে বই পড়ছিল আলেকজান্দ্রা। ইভকে দেখে মুখ তুলে তাকাল।

'অ্যালেক্স, আমি নিউইয়র্ক ফিরে যাচ্ছি।'

খুবই অবাক হলো আলেকজান্দ্রা। 'এখন? দিদা বলল আগামী সপ্তাহে আমাদের নিয়ে ডালমাশিয়ান কোস্টে সমুদ্রভ্রমণে যাবে। তুমি–'

'আরে রাখো তোমার ডালমাশিয়ান কোস্ট। আমি এতদিন এ সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলাম। এখন আমার নিজের অ্যাপার্টমেন্ট হবে।' হাসল সে। 'আমি এখন

বড় হয়ে গেছি। কাজেই সুন্দর একটি বাড়ি ভাড়া করে থাকার অধিকার আমার আছে।'

উদ্বেগ নিয়ে বোনকে লক্ষ্য করছিল আলেকজান্দ্রা। 'দিদা জানে ব্যাপারটা?'

'জানে। প্রথমে রাজি হতে চায়নি পরে বুঝতে পেরে সম্মতি দিয়েছে। বলেছিলাম চাকরি করব কিন্তু দিদা খরচ দেবে বলেছে।'

আলেকজান্দ্রা জানতে চাইল, 'আমাকে সঙ্গে নেবে?'

শয়তানী কোথাকার, মনে মনে বলল ইভ। *তোর জন্যই তো আজ আমাকে বাড়ি ছাড়তে হচ্ছে। তবে তোকে আর তোর দাদীমাকে আমি ছাড়ব না। সময় এলে টের পাবি আমাকে বাড়ি থেকে তাড়ানোর শাস্তি কী ভয়ানক।*

আলেকজান্দ্রাকে সঙ্গে নেয়ার কোনো ইচ্ছেই নেই ইভের। কারণ সে প্ল্যান করেছে যতখুশি পুরুষদেরকে সে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে দাওয়াত দেবে, তাদের সঙ্গে মৌজ-মাস্তি করবে। জীবনে এই প্রথম সত্যিকারের স্বাধীনতা উপভোগ করবে ইভ। ভাবতেই তো মজা লাগছে।

ইভ বলল, 'এই মুহূর্তে তোমাকে আমার সঙ্গে নিতে পারছি না, অ্যালেক্স। কিছুদিন আমি একা থাকতে চাই।'

ইভ তাকে নিয়ে যাবে না শুনে খুবই মর্মাহত হলো আলেকজান্দ্রা। তার মনে হ কী যেন বিরাট কিছু সে হারিয়ে ফেলছে। এই প্রথম বোনকে ছাড়া আলাদা থাকবে সে। 'কিন্তু মাঝেমধ্যেই তো আমাদের দেখা হবে, নাকি?'

'তাতো বটেই,' কথা দিল ইভ। 'প্রায়ই আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হবে।'

পঞ্চাশ

নিউইয়র্কে এসে একটি মাঝারী মানের হোটেলে উঠল ইভ। ঘণ্টাখানেক পরে ব্রাড রজার্স তাকে ফোন করল। সে জানে ইভ এ হোটেলেই উঠেছে।'

'তোমার দাদীমা প্যারিস থেকে ফোন করেছিলেন, ইভ। তোমাদের মধ্যে বোধকরি কোন সমস্যা চলছে।

'ঠিক তা নয়,' হেসে উঠল ইভ। 'এই একটু পারিবারিক–' বলতে গিয়েও মুখের লাগাম কষল সে। এখন থেকে খুব ভেবেচিন্তে কথা বলতে হবে ওকে। কারণ এমন কিছু বলা যাবে না যা শুনলে দিদা রেগে যান এবং ওর হাত খরচা বন্ধ করে দেন। হাত খরচ বন্ধ হয়ে গেলে ইভ মরেছে। সে জীবনে এই প্রথম ভয় পেল।

'উনি বললেন নতুন উইল নাকি করছেন।' জিজ্ঞেস করল ব্রাড।

'হুঁ। দিদা এরকম একটা কথাই বলেছিল,' নিজেকে শান্ত রাখল ইভ।

'বিষয়টি নিয়ে তোমার সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলা দরকার। সোমবার বিকেল তিনটা।'

'কোন সমস্যা নেই, ব্রাড।'

'আমার অফিসে চলে এসো, কেমন?'

'আসব।'

তিনটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেড ভবনে প্রবেশ করল ইভ। ওকে সম্ভ্রমের সঙ্গে স্বাগত জানাল নিরাপত্তা প্রহরী, এলিভেটর অপারেটর সসম্মানে খুলে দিল এলিভেটরের গেট। *সবাই আমাকে চেনে,* অহংকার নিয়ে ভাবছিল ইভ। *কারণ আমি একজন ব্ল্যাকওয়েল।* এলিভেটরে ওকে এক্সিকিউটিভ ফ্লোরে পৌঁছে দিল। কয়েক মুহূর্ত পরে ব্রাড রজার্সের অফিসে প্রবেশ করল ইভ।

উইল থেকে ইভের নাম বাদ দিতে চায় কেট, ফোন পেয়ে যারপরনাই বিস্মিত হয়েছিল ব্রাড। কারণ সে জানত কেট তার এ নাতনীটিকে সবচেয়ে ভালোবাসে এবং একেই সে কোম্পানির ভবিষ্যৎ মালিক করার পরিকল্পনা করেছিল। হঠাৎ করে কী এমন ঘটল যে সবকিছু উল্টোপাল্টা হয়ে গেল। অবশ্য এসবে ব্রাডের নাক গলানোর কোনো অধিকার নেই। কেট বিষয়টি নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে, ব্যস। ব্রাডের কাজ হলো কেটের হুকুম তামিল করা। সামনে বসা মিষ্টি মেয়েটার জন্য ওর মায়াই লাগছিল।

কেটের সঙ্গে যখন ব্রাডের প্রথম পরিচয় হয় তখন কেটের বয়স এরকমই ছিল। ব্রাডেরও বয়স ছিল কম। এখন তো ব্রাডের চুলটুল পেকে গেছে। সে কেটের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল বহু আগে। কিন্তু মনের কথাটি খুলে বলতে পারেনি। ব্রাডের মনে গোপন আশা একদিন হয়তো কেট ব্ল্যাকওয়েল বুঝতে পারবে। একদিন সে তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসবে।

ইভকে ব্রাড বলল, 'তোমার জন্য কিছু কাগজপত্র রেডি করেছি। সই করতে হবে। তুমি যদি পড়ে দেখতে চাও–'

'তার দরকার হবে না।'

'ইভ, তোমার দাদীমা তাঁর উইলে তোমার জন্য একটি ট্রাস্ট ফান্ডে পাঁচ মিলিয়ন ডলার রেখেছেন। তোমার দাদী ওই ফান্ডের এক্সিকিউটিভ। টাকাটা তোমার বয়স একুশ থেকে পঁয়ত্রিশ– এ বয়সের যে কোনো সময়ে তুলতে পারবে।' গলা খাঁকাড়ি দিল ব্রাড।

'তবে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তোমার বয়স পঁয়ত্রিশ বছর না হওয়া পর্যন্ত এ টাকা তুমি ব্যাংক থেকে তুলতে পারবে না।'

খবরটা যেন ঠাস করে চড় বসিয়ে দিল ইভের গালে।

'আর আজ থেকে তুমি সাপ্তাহিক আড়াইশো ডলার করে পাবে হাতখরচ।'

এ অসম্ভব! একটা ভালো ড্রেসের দাম এরচেয়ে অনেক বেশি। সপ্তাহে মাত্র আড়াইশো ডলার দিয়ে কিছুতেই চলতে পারবে না ইভ। এ কাজটা করা হয়েছে স্রেফ ওকে অপমান করার জন্য। এ হারামজাদাটা হয়তো তার দিদার সঙ্গে যোগসাজশে এমন কাজ করেছে। আর এখন প্রকাণ্ড ডেস্কের পেছনে বসে ইভের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসছে। যেন ইভকে গ্যাঁড়াকলে ফেলে খুব আমোদ পাচ্ছে। ইভের ইচ্ছা করছিল ব্রোঞ্জের ভারী পেপারওয়েটটা তুলে নিয়ে লোকটির মাথাটা ফাটিয়ে দেয়।

ব্রাড বলে চলল, 'তোমার কোনো চার্জ অ্যাকাউন্ট থাকবে না। কোনো দোকানে গিয়ে ব্ল্যাকওয়েলদের নাম তুমি ব্যবহার করতে পারবে না। যা-ই হোক না কেন, নগদ টাকা দিয়ে কিনতে হবে।

দুঃস্বপ্নটার মাত্রা বেড়েই চলেছে।

'আরও আছে। তোমাকে নিয়ে যদি কোনো গসিপ ছড়ায় স্থানীয় কিংবা বিদেশী কোনো পত্রিকায়– তোমার সাপ্তাহিক হাত খরচ সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছ?

'হুঁ।' ফিসফিস করল ইভ।

'তোমার এবং তোমার বোন আলেকাজান্দ্রার পাঁচ মিলিয়ন ডলারের একটি লাইফ ইনসিওরেন্স পলিসি করা হয়েছিল। তোমাদের দাদীর নামে। আজ সকালে পলিসি থেকে তোমার নাম বাদ দেয়া হয়েছে। আর এক বছর পরে তোমার দাদী যদি তোমার আচার-ব্যবহারে সন্তুষ্ট হন, তোমার সাপ্তাহিক হাত-খরচার পরিমাণ দ্বিগুণ করে দেয়া হবে। একটু ইতস্তত করে যোগ করল ব্রাড। 'আরেকটা কথা।'

'বলো?'

বিব্রত দেখাচ্ছে ব্রাডকে। 'তোমার দাদীমা আর কোনোদিন তোমার চেহারা দর্শন করতে চান না, ইভ।'

কিন্তু তোমার চেহারা আমি অন্তত আরেকবার দেখতে চাই, বুড়ি। দেখতে চাই যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে তুমি মারা যাচ্ছ। মনে মনে বলল ইভ। তবে মুখে কিছু বলল না।'

'তোমার কোনো সমস্যা হলে আমাকে ফোন কোরো। উনি তোমাকে এ ভবনে আর পা দিতে মানা করেছেন। কোনো ফ্যামিলি এস্টেটে যাওয়াও তোমার নিষেধ আছে।'

কেট যখন ইভের ওপর এরকম নিষেধাজ্ঞা জারির কথা বলেছিল, আপত্তি জানিয়েছিল ব্রাড। 'মাই গড, কেট। ও তোমার নাতনী। তোমার বংশধর। অথচ ওর সঙ্গে তুমি কুষ্ঠরোগীর মতো আচরণ করছ।'

'ও একটা কুষ্ঠরোগীই।'

আলোচনার অবসান হল ওখানেই।

ব্রাড অদ্ভুত গলায় বলল, 'আশা করি সব তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পেরেছি। তোমার কোনো প্রশ্ন আছে, ইভ?'

'না,' প্রচণ্ড শক পেয়েছে ইভ। কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

'তাহলে এ কাগজগুলোয় একটু সই করে দাও।'

দশ মিনিট পরে আবার রাস্তায় নেমে এল ইভ। পকেটে সম্বল মাত্র ২৫০ ডলার।

পরদিন সকালে একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে ফোন করল ইভ অ্যাপার্টমেন্টের খোঁজে। সে সেন্ট্রাল পার্কের পাশে সুন্দর কোনো পেন্থহাউসের স্বপ্ন দেখছিল। পেন্থহাউজটির ঘরগুলো হবে ধবধবে সাদা, আধুনিক আসবাবে সজ্জিত, থাকবে একটি টেরাস যেখানে সে অতিথিদের অ্যাপায়ন করবে। কিন্তু বাস্তবতা এক ধাক্কায় ওকে মাটিতে শুইয়ে দিল। ২৫০ ডলার সাপ্তাহিক হাতখরচে পার্ক এভিন্যুতে পেন্থহাউজ মিলবে না। এই স্বল্প টাকায় বড়জোর লিটল ইটানি এলাকায় এককক্ষবিশিষ্ট একট স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া পাওয়া যেতে পারে। ঘরটিতে একটি কাউচ আছে যেটিকে বিছানায় রূপান্তর করা চলে। একটি অতি ক্ষুদ্র রান্নাঘর আর আরও ক্ষুদ্রকায় নোংরা টাইলসের বাথরুম আছে এ অ্যাপার্টমেন্টে।

'এরচেয়ে ভালো কিছু মিলল না?' রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে জিজ্ঞেস করল ইভ।

'আমার সন্ধানে বিশ কক্ষবিশিষ্ট টাউন হাউজ আছে সাটন প্লেসে। কিন্তু ওটার ভাড়া পড়বে পাঁচ লাখ ডলার, রক্ষণাবেক্ষণ খরচ আবার আলাদা।'

ইউ বাস্টার্ড! মনে মনে গালি দিল ইভ।

পরদিন বিকেলে সত্যিকারের হতাশা গ্রাস করল ইভকে তার নতুন ভাড়া করা

বাড়িতে ঢুকে। এ স্রেফ একটা কারাগার। ওর বাড়ির ড্রেসিং রুমটিও গোটা অ্যাপার্টমেন্টের চেয়ে আয়তনে বড়। ফিফথ এভিন্যুতে আলেকজান্দ্রা কি আরামে আছে ভাবতেই ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে গেল ইভ। *ঈশ্বর, সেদিন আলেকজান্দ্রা কেন আগুনে পুড়ে মরেনি? প্রায় মরতেই তো বসেছিল।* সেদিন আলেকজান্দ্রা যদি মারা যেত আর ইভ একমাত্র উত্তরাধিকারী থাকত, পরিস্থিতি এখন অন্যরকম হতো। তার দাদি ওকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার সাহস পেত না।

কিন্তু কেট ব্ল্যাকওয়েল যদি ভেবে থাকে ইভ তার অধিকার এত সহজে ছেড়ে দেবে তাহলে রীতিমতো বোকার স্বর্গে বাস করছে সে। বুড়ি এখনও তার নাতনীকে চেনেনি। প্রয়োজনে ইভ কত ভয়ংকর হতে পারে সে তা দেখিয়ে ছাড়বে।

হতভম্ব হয়ে আছে আলেকজান্দ্রা। সে এতদিন জেনে এসেছে ইভকেই বেশি পছন্দ করে ওদের দাদী। কিন্তু রাতারাতি এমন কী ঘটল যে সবকিছু বদলে গেল। দাদী এবং ইভের মধ্যে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে অনুমান করতে পারে আলেকজান্দ্রা, কিন্তু ব্যাপারটা যে কী তা-ই বুঝতে পারছে না।

আলেকজান্দ্রা যখনই বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চেয়েছে, এড়িয়ে গেছে দাদী। শুধু বলেছে, 'এ নিয়ে কথা বলার কিছু নেই। ইভ তার নিজের মতো করে জীবন বেছে নিয়েছে।'

কেট ব্ল্যাকওয়েল আলেকজান্দ্রাকে বেশি বেশি করে সময় দিতে লাগল। তবে আলেকজান্দ্রাকে বোঝা একটু মুশকিল। কারণ সে খুবই চুপচাপ স্বভাবের মেয়ে। একা একা থাকতে ভালোবাসে। আলেকজান্দ্রা অনেক আগে থেকেই অনেক জায়গা থেকে পার্টি, ডিনার এবং থিয়েটারে যাওয়ার দাওয়াত পেত। কিন্তু কেট এখন থেকে ঠিক করে দেয় কোন কোন দাওয়াতে আলেকজান্দ্রা যেতে পারবে। আসলে কেট তার নাতনীর জন্য একজন উপযুক্ত বর খুঁজতে চেয়েছিল, যে কেটের সাম্রাজ্য পরিচালনায় আলেকজান্দ্রাকে সাহায্য করতে পারবে। তবে মাঝে মাঝে যখন অনেক রাতেও ঘুম আসে না কেটের তখন সে ইভের কথা ভাবে।

ইভ কিন্তু ভালোই আছে। দাদীর দেয়া অপ্রত্যাশিত ধাক্কাটা সামলে উঠতে সে কয়েকদিন সময় নিল। তারপর নেমে পড়ল পুরুষ শিকারে। নিজের অ্যাপার্টমেন্টে আসার পরে প্রথম পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়ে সে ছয়জন পুরুষকে নিজের ফোন নাম্বার দিল। এদের চারজন বিবাহিত। ছয়জনই তাকে ফোন করল। তারপর থেকে আর টাকা পয়সা নিয়ে ভাবতে হলো না ইভকে। তার রূপপিয়াসী প্রেমিকরা তাকে উপহারের বন্যায় ভাসিয়ে দিতে লাগল। এসব উপহারের মধ্যে রয়েছে দামী গহনা, পেইন্টিং– এবং বেশিরভাগ সময় নগদ অর্থ।

ইভ বলে, 'আমি নতুন একটা গহনার অর্ডার দিয়েছি। কিন্তু আমার হাত খরচের

টাকাটা এখনও পাইনি। তুমি কি আমাকে কিছু টাকা দিতে পারবে, ডার্লিং?'

ইভের যৌবন সাগরে স্নান করা পুরুষরা অতি আনন্দের সঙ্গে তাকে টাকা দেয়।

ইভ যখন বাইরে যায়, জনসমক্ষে কখনোই কোনো বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে ঢলাঢলি করে না। তাকে নিয়ে যাতে কোনোরকম গসিপ তৈরি হতে না পারে সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ নজর থাকে তার। গসিপ তৈরি হলেই হাত খরচার টাকাটা বন্ধ হয়ে যাবে, এ ভয়ে নয়, সে দেখতে চায় একদিন তার দাদীমা হামাগুড়ি দিয়ে তার কাছে আসছে। ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেডের দায়িত্বভার নিতে একজন উত্তরাধিকারীর দরকার হবে কেট ব্ল্যাকওয়েলের। আর আলেকজান্দ্রার স্রেফ গৃহবধূ হওয়া ছাড়া আর কোনো গুণ নেই।

একদিন বিকেলে টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি পত্রিকার নতুন সংখ্যার পাতা ওল্টাতে গিয়ে এক সুদর্শন পুরুষের সঙ্গে আলেকজান্দ্রার নাচের ছবি নজর কাড়ল ইভের। আলেকজান্দ্রা নয়, সে তাকিয়ে ছিল লোকটির দিকে। ইভ বুঝতে পারছিল আলেকজান্দ্রা যদি বিয়ে করে এবং পুত্রসন্তানের জননী হয় তাহলে তা ইভের সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল করে দেবে।

ছবিটির দিকে অনেকক্ষণ পলকহীন তাকিয়ে রইল সে।

গত এক বছরে আলেকজান্দ্রা নিয়মিত ফোন করেছে ইভকে, খোঁজ-খবর নিয়েছে, তার সঙ্গে লাঞ্চ কিংবা ডিনার করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। কিন্তু প্রতিবারই কোনো না কোনো অজুহাতে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে ইভ। এখন সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোনের সঙ্গে সম্পর্কটি ঝালাই করে নিতে হবে। সে আলেকজান্দ্রাকে তার অ্যাপার্টমেন্টে দাওয়াত দিল।

আলেকজান্দ্রা এর আগে ইভের বাসায় আসেনি। তবে ছোট বাসা দেখেও ভুরু কোঁচকাল না আলেকজান্দ্রা বা নেতিবাচক কোনো মন্তব্য করল না। বরং বলল, 'বাসাটা বেশ সুন্দর হয়েছে, ইভ!'

ইভ হেসে বলল, 'হ্যাঁ, চলে যাচ্ছে একরকম' তারপর একটু থেমে জানতে চাইল, দিদা কেমন আছে?'

'ভালো,' জবাব দিল আলেকজান্দ্রা। তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, 'ইভ, আমি জানি না তোমাদের দু'জনের মধ্যে কী হয়েছে। তবে আমি যদি কোনো সাহায্য করতে পারি–'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইভ। 'দিদা বলেনি তোমাকে কিছু?'

'না। কিছু জিজ্ঞেস করলেই এড়িয়ে যায়।'

'এজন্য দিদাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। বেচারি বোধহয় খুব অপরাধবোধে ভুগছে। এক তরুণ ডাক্তারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। আমরা বিয়ে করব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমরা একসঙ্গে বিছানায় যাই। দিদা ব্যাপারটা জেনে ফেলে। তক্ষুনি আমাকে বাসা থেকে বের হয়ে যেতে বলে। বলে আমার চেহারাও আর কোনোদিন দেখবে না। আমাদের দাদীমাটি এখনও সেকেলে সংস্কার ধারণ করে আছেন,

অ্যালেক্স।'

কথাটা শুনে বেশ শক পেল আলেকজান্দ্রা।

'সেকী কথা! তোমাদের দু'জনের অবশ্যই দিদার কাছে যাওয়া উচিত। আমি শিওর সে–'

'ও বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছে।'

'ওহ্, ইভ! এসব কথা তুমি আমাকে আগে বলোনি কেন?'

'লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল বলে এ ঘটনা আমি কাউকেই বলিনি।' বোনের হাত ধরল সে, 'অথচ তোমার কাছে কোনোদিন কিছু লুকাইনি আমি।'

'আমি দিদার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলব। বুঝিয়ে বলব–'

'না! একাজ করলে আমার মাথা খাবে তুমি। আমি আমার আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে পারব না। কথা দাও বিষয়টি নিয়ে কোনোদিন তুমি দিদার সঙ্গে কোনো কথা বলবে না।'

'কিন্তু আমি নিশ্চিত দিদা–'

'কথা দাও!'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল আলেকজান্দ্রা। 'আচ্ছা, বলব না।'

ইভ ছোটবোনকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমার কথা এখন থাক। তোমার কথা শুনি। কেমন চলছে দিনকাল? স্বপ্নের রাজকুমারের দেখা পেয়েছ?'

'না।'

ইভ তার বোনকে লক্ষ্য করছিল। আয়নায় ফুটে থাকা অবিকল প্রতিমূর্তি যেন। এ প্রতিমূর্তি ইভকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। 'নিশ্চয় পাবে, ডার্লিং।'

'আমার কোনো তাড়া নেই। আমি এখন চাকরিবাকরি করব ভাবছি। দিদার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথাও বলেছি। দিদা বলল তাদের বার্কলি অ্যান্ড ম্যাথিউস অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিতে নাকি কপিরাইটারের পদ খালি আছে। ওখানে শীঘ্রি ঢুকিয়ে দেবে আমাকে।'

ইভের বাসার কাছের ছোট একটি রেস্টুরেন্টে দুবোন লাঞ্চ করল। তারপর বিদায় নেয়ার সময় আলেকজান্দ্রা বলল, 'ইভ, তোমার যদি টাকা-পয়সার দরকার হয়–'

'বোকার মতো কথা বলো না তো। আমার কাছে টাকা আছে।'

আলেকজান্দ্রা বলল, 'তবে টাকা পয়সার টানাটানিতে পড়লে আমাকে কিন্তু অবশ্যই বলবে।'

বোনের চোখে চোখ রাখল ইভ। 'আচ্ছা, বলব,' হাসল সে।

'আমার সত্যি টাকার দরকার নেই, অ্যালেক্স।' ইভ অল্প নয়, পুরোটাই পেতে চায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো কীভাবে পাবে?

একান্ন

নাসাউতে উইকএন্ড পার্টি হচ্ছে।

'তোমাকে ছাড়া পার্টির কথা কল্পনাই করতে পারি না, ইভ। তোমার সব বন্ধুই থাকবে এখানে।'

যে ফোন করেছে তার নাম নিটা লুদভিন। ইভের সুইটজারল্যান্ডের স্কুলের বান্ধবী।

পার্টিতে নতুন কিছু লোকের সঙ্গে পরিচয় হবে। বর্তমান সঙ্গীটিকে বিরক্তিকর লাগছে ইভের কাছে।

'বুঝতেই পারছি খুব মজা হবে,' বলল ইভ। 'আমি আসছি।'

বিকেলে এমারেল্ডের একটি ব্রেসলেট বন্ধক রেখে সে টাকা দিয়ে লর্ড অ্যান্ড টেলর থেকে নতুন একটি সামার ড্রেস কিনল ও। এ ব্রেসলেটটা সপ্তাহখানেক আগে তিন সন্তানের জনক বিবাহিত এক ইনসিওরেন্স এক্সিকিউটিভ উপহার দিয়েছিল ইভকে। ইভ পরদিন সকালে প্লেনে চড়ে রওনা হয়ে গেল নাসাউর উদ্দেশে।

সৈকতের ধারে বিশাল এবং মনোরম একটি ম্যানসন লুদভিগ এস্টেট। মূল বাড়িতে কক্ষসংখ্যা ত্রিশ, সবচেয়ে ছোট ঘরটিও ইভের গোটা অ্যাপার্টমেন্টের তুলনায় বড়। ইউনিফর্ম পরা এক মেইড পথ দেখিয়ে ইভকে তার ঘরে নিয়ে গেল। ইভ হাত মুখ ধুয়ে, ফ্রেশ হয়ে নিচতলায় গেল অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে।

ড্রইংরুমে অতিথির সংখ্যা ষোল। একটি বিষয়ে সবার সঙ্গে মিল রয়েছে, এরা সকলেই ধনবান। এরা পৃথিবীর সেরা বোর্ডিং স্কুল এবং কলেজে পড়াশোনা করেছে

তারা প্রত্যেকেই বিলাসবহুল এসেট, ইয়ট এবং প্রাইভেট জেট বিমানের মালিক। আর এরা সকলেই ট্যাক্সজনিত সমস্যায় জর্জরিত। একজন কলামিস্ট এদেরকে 'জেট সেট' বলে অভিহিত করেছেন। এরা এই উপাধিটি বেশ উপভোগ করে। তারা সব পেয়েছির দল। তারা মনে করে টাকা দিয়ে সবকিছু কেনা যায়। টাকা তাদের সৌন্দর্য, ভালোবাসা, বিলাসব্যাসন দিয়েছে এবং স্বর্গেও জায়গা রেখেছে। কিন্তু এই বিত্ত-বৈভব থেকে এখন সম্পূর্ণই বঞ্চিত ইভ। আর তাকে সমস্ত বিলাসিতার সুখ থেকে বঞ্চিত করেছে নিচু মনের এক বুড়ি। *তবে বেশিদিনের জন্য নয়,* মনে মনে বলল ইভ।

ইভ ড্রইংরুমে প্রবেশ করতেই ঘরের কলগুঞ্জন থেমে গেল। ঘরে সুন্দরীদের অভাব নেই কিন্তু ইভের রূপ তাদের সবাইকে ছাপিয়ে গেছে। নিটা ইভকে তার নতুন বন্ধুদের

সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। পুরনোরা ইভকে স্বাগত জানাল। ইভ খুব আমুদে এবং মজার, প্রতিটি পুরুষকে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করল। তার টার্গেট খুঁজছে। পার্টির বেশির ভাগ পুরুষ বয়সে পৌঢ় এবং বিবাহিত। তবে এতে টার্গেট বাছাই করতে ইভের সহজ হবে।

এক টাকমাথা লোক, পরনে হাওয়াইয়ান স্পোর্ট শার্ট, ইভের দিকে এগিয়ে এল। 'তুমি সুন্দরী, লোকের মুখে বারবার এ কথাটি শুনে শুনে নিশ্চয় তোমার বিরক্তি ধরে গেছে, না?'

মুখে উষ্ণ হাসি ফোটাল ইভ। 'ও কথাটি শুনতে আমার কখনও বিরক্তি লাগে না, মি.–'

'পিটারসন। আমাকে ড্যান বলে ডাকবে। 'তোমার তো হলিউডের তারকা হওয়ার কথা।'

'অভিনয়ের ট্যালেন্টই আমার নেই।'

'আমি নিশ্চিত অন্য সব ট্যালেন্ট নিশ্চয় আছে।'

রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসল ইভ। 'চেষ্টা না করা পর্যন্ত সেটা তো তুমি জানতে পারছ না, তাই না, ড্যান?'

লোকটা জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল। 'তুমি এখানে একা এসেছ?'

'হ্যাঁ।'

'বে-তে আমার ইয়ট নোঙর করা আছে। চলো না তুমি আর আমি কাল একটু সাগরে বেড়িয়ে আসি?'

'আমার আপত্তি নেই,' বলল ইভ।

খ্যা খ্যা করে হাসল ড্যান। 'তোমার সঙ্গে আরও আগে কেন যে পরিচয় হলো না আমার। তোমার দাদীমা কেটকে আমি অনেকদিন ধরে চিনি।'

মুখে হাসিটা ধরে রাখতে বেশ কসরত করতে হলো ইভকে। 'আমার দিদা দারুণ একজন মানুষ,' বলল ও। 'আমি একটু অন্যদের সঙ্গে কথা বলে আসি।'

'শিওর, হানি,' চোখ টিপল বুড়ো। 'কালকের কথা মনে থাকে যেন।'

তবে এরপর থেকে ড্যান আর একা পেল না ইভকে। লাঞ্চের সময় তাকে এড়িয়ে গেল ইভ, লাঞ্চ শেষে অতিথিদের জন্য গ্যারেজে রাখা একটি গাড়ি নিয়ে শহরে চলে এল ও। ব্ল্যাকবিয়ার্ডস টাওয়ার, রঙিন ফ্লেমিঙ্গোদের বিচরণক্ষেত্র আরডাস্ট্রা গার্ডেন দেখে ওয়াটার ফ্রন্টের সামনে গাড়ি থামাল ইভ। দেখল নৌকা থেকে মাঝিরা বিরাট বিরাট কচ্ছপ, গলদা চিংড়ি, মাছ, শঙ্খ ইত্যাদি নামিয়ে রাখছে জেটিতে।

শঙ্খগুলো পালিশ করে ট্যুরিস্টদের কাছে বিক্রি করা হবে।

বে-টা ভারী সুন্দর, সাগরের পানি হিরের মতো ঝলমল করছে। পানির ওপাশে প্যারাডাইস আইল্যান্ড বিচের অর্ধচন্দ্রাকৃতি বাঁক দেখতে পেল ইভ। বিচের ডক ছেড়ে

চলে যাচ্ছে একটি মোটরবোট, ওটার গতি বাড়ছে, অকস্মাৎ একটি পুরুষালী কাঠামো ভেসে উঠল আকাশে, বোটের পেছনে ট্রেইল করে আসছে। দারুণ একটি দৃশ্য। বোটের নীল পালের সঙ্গে একটি ধাতব খণ্ডের সাথে লোকটি যেন ঝুলে আছে। তার দীর্ঘ, ছিপছিপে শরীরে হুহু করে আছড়ে পড়ছে বাতাস। হার্বারের দিকে গর্জন ছেড়ে এগিয়ে চলেছে মোটরবোট, প্রায় বাতাসে ভেসে থাকা মানুষটা কাছিয়ে এল। মুগ্ধ চোখে তাকে দেখছে ইভ। মোটরবোট জেটির উদ্দেশে একটা তীক্ষ্ণ বাঁক নিল, এক লহমার জন্যে রোদে পোড়া দারুণ সুদর্শন মুখখানা দেখতে পেল ইভ। তারপর লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘণ্টা পাঁচেক পরে নিটা লুদভিগের ড্রইংরুমে উদয় হলো সে। মনে মনে তাকে আশা করছিল ইভ। সামনাসামনি লোকটিকে আরও বেশি হ্যান্ডসাম লাগছে। লম্বা কমপক্ষে ছয় ফুট তিন ইঞ্চি, দারুণ সুগঠিত শরীর, কালো চোখ। হাসল সে। ঝকঝকে মসৃণ তার দাঁত। নিটা তার সঙ্গে ইভের পরিচয় করিয়ে দিল।

'এ হলো জর্জ মেলিস। আর ও ইভ ব্ল্যাকওয়েল।'

'মাই গড, আপনার তো ল্যুভর মিউজিয়ামে থাকা উচিত,' বলল জর্জ। তার কণ্ঠ ভরাট এবং খসখসে।

'চলো, ডার্লিং,' বলল নিটা। 'তোমার সঙ্গে অন্য অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দিই।'

ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে জর্জ বলল, 'দরকার নেই। সবার সঙ্গে মাত্রই কথা বলেছি আমি।'

ওদের দু'জনকে এক পলক দেখে নিয়ে নিটা বলল, 'ও আচ্ছা। আমাকে কোনো দরকার হলে ডেকো।' চলে গেল সে।

'কথাটা ওভাবে না বললেও পারতে,' বলল ইভ।

হাসল জর্জ। 'এ মুহূর্তে আমার মাথার ঠিক নেই। কী বলছি না বলছি জানি না। কারণ আমি প্রেমে পড়েছি।'

হেসে উঠল ইভ।

'সত্যি বলছি। তোমার মতো সুন্দর মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি।'

'তোমাকেও আমি একই কথা বলব ভাবছিলাম।'

এ লোকটির টাকা আছে কী নেই তা নিয়ে মোটেই ভাবছে না ইভ। এ যুবক তাকে সম্মোহন করেছে। এর ভেতরে চুম্বকের মতো কী যেন আছে, একটা শক্তি যা উত্তেজিত করে তুলছে ওকে। কোনো পুরুষকে দেখে এর আগে এতটা উত্তেজনা বোধ করেনি সে। 'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল ইভ।

'নিটা তোমাকে আমার নাম বলেছে। জর্জ মেলিস।'

'কে তুমি?' প্রশ্নটি পুনরাবৃত্তি করল ইভ।

'ওহ্, ফিলসফিকাল সেন্সে তুমি জানতে চাইছ আমি কে। সত্যিকারের আমি।

আসলে নিজের সম্পর্কে বলার মতো কিছু নেই আমার। আমি জাতিতে গ্রিক। আমার পরিবার জলপাই চাষ করে সঙ্গে আরও কিছু খাবারদাবার তৈরি করে।'

এ তাহলে সেই মেলিস পরিবারের সন্তান! আমেরিকার প্রতিটি সুপারমার্কেট এবং মুদি দোকানে 'মেলিস ফুড' পাওয়া যায়।

'তুমি কি বিবাহিত?' জানতে চাইল ইভ।

হাসল জর্জ। 'তুমি সবাইকে এভাবেই প্রশ্ন কর নাকি?'

'না।'

'আমি বিবাহিত নই।'

জবাবটা অনির্বচনীয় আনন্দে ভরিয়ে দিল ইভের মন। ওকে দেখামাত্র তার মনে হয়েছে এ তার, একে তার চাই।

জর্জ মেলিস ইভের হাত ধরল। 'তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। তোমাকে আমি ভালোবাসি। সত্যি খুব ভালোবাসি।' জর্জের স্পর্শে শিউরে উঠল ইভ।

সারাটা সন্ধ্যা ইভের পাশে পাশে রইল জর্জ মেলিস। পারিপার্শ্বিকতা সব ভুলে ওর প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিল। ইভের জন্য সে ড্রিংক এনে দিল, সিগারেট ধরিয়ে দিল, গোপনে স্পর্শ করল ওর শরীর। ওর প্রতিটি স্পর্শ কামনার আগুন জ্বালিয়ে দিল ইভের গায়ে। ওর সঙ্গে একাকী হওয়ার জন্য আর তর সইছিল না ইভের।

মাঝরাতের পরে অতিথিরা যে যার ঘরে যেতে শুরু করেছে। জর্জ জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বেডরুম কোনটি?'

'উত্তর হল– এর শেষ মাথায়।'

মাথা ঝাঁকাল জর্জ, লম্বা পাপড়িযুক্ত তার চোখের চাউনি যেন ভেদ করে গেল ইভকে।

কাপড় ছেড়ে গোসল করল ইভ। তারপর শরীর কামড়ে ধরা ফিনফিনে কালো একটি নেগলিজি গায়ে চড়াল। রাত একটার দিকে ওর দরজায় টোকা পড়ল। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল ইভ। ভেতরে ঢুকল জর্জ মেলিস।

ইভকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখল জর্জ। 'Matia mou' তোমার কাছে ভেনাস ডি মিনোকে মনে হবে ফকিরনীর মেয়ে।'

ইভ দু'হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরল। টেনে নিল নিজের কাছে। জর্জের চুম্বন ইভের ভেতরে কী যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিল। ওর ঠোঁট নিষ্ঠুরের মতো চেপে বসে রইল ইভের অধরে, পাগলের মতো চুষছে জিভ।

'ওহ্ মাই গড!' গুঙিয়ে উঠল ইভ।

নিজের জ্যাকেট খুলতে শুরু করল জর্জ। তাকে সাহায্য করল ইভ। ট্রাউজার্স এবং ফ্রেঞ্চ শর্টস মুক্ত হয়ে নগ্ন হয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকল জর্জ। এমন ব্যায়ামপুষ্ট,

সুগঠিত শরীর খুব কমই দেখেছে ইভ। জর্জের পুরুষাঙ্গ ভীষণ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

'জলদি,' বলল ইভ। 'আমার সঙ্গে প্রেম করো।'

সে বিছানায় পা বাড়াল, শরীরে আগুন জ্বলছে।

হুকুম করল জর্জ। 'ঘোরো। আমার দিকে পাছাটা দাও।'

জর্জের দিকে তাকাল ইভ। 'আ-আমি পারব না-'

ওর মুখে মারল জর্জ। হতভম্ব হয়ে গেল ইভ।

'ঘোরো।'

'না।'

আবার আঘাত করল জর্জ। আরও জোরে। ইভের চোখের সামনে বনবন করে ঘুরতে শুরু করল ঘর।

'প্লিজ, নো।'

আবারও মারল জর্জ। অনেক জোরে। তারপর ওকে হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে হাঁটার ওপর ভর করে উপুড় করিয়ে দিল।

'ফর গডস শেক,' আঁতকে উঠল ইভ। 'থামো! নইলে কিন্তু আমি চিৎকার দেব।'

ইভের ঘাড়ের পেছনে দড়াম করে আছড়ে পড়ল জর্জের শক্ত হাত। ইভ জ্ঞান হারাতে শুরু করল। আবছা টের পেল ওর পাছাদুটো ধরে ওপর দিকে তোলা হচ্ছে। জর্জ ওর মাংসল নিতম্ব জোড়া দু'হাতে টেনে ফাঁক করল। তারপর পুরুষাঙ্গ ঠেসে ধরল ওখানটায়। তারপরই প্রচণ্ড এক ধাক্কায় ঢুকে গেল ভেতরে। ভয়াবহ যন্ত্রণায় বিকট চিৎকার দিতে গিয়েও দিল না ইভ, ভয়ে জর্জ যদি আরও ভয়ংকর কিছু করে বসে।

সে কেঁদে ফেলে বলর, 'ওহ প্লিজ, তুমি আমাকে ব্যথা দিচ্ছ...'

জর্জকে গায়ের ওপর থেকে ঠেলে সরিয়ে দিতেও ব্যর্থ হলো ইভ। শক্ত হাতে ওর নিতম্ব চেপে ধরে রেখেছে জর্জ, কোমর দিয়ে বারবার ধাক্কা মারছে, ভীমের গদার মতো মাংসের লৌহসম মুষলটা দিয়ে ইভের ভেতরটা ছিড়েখুড়ে ফর্দাফাই করে ফেলছে। ভয়াবহ এ ব্যথার সঙ্গে কোনো কিছুর তুলনা করা যায় না।

'ওহ্, গড, নো!' ফিসফিস করল ইভ। 'স্টপ ইট। প্লিজ, স্টপ ইট।'

কিন্তু ওর অনুনয়ে কান দিল না জর্জ, তার কোমর চালনা আরও দ্রুত হয়ে উঠল, ইভের গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করছে সে, জ্ঞান হারানোর পূর্ব মুহূর্তে ইভ শুনতে পেল কামোত্তেজিত গোঁ গোঁ শব্দ করছে জর্জ। তার শীৎকার ইভের কানে বিস্ফোরণের মতো বাজল। তারপর আর কিছু মনে নেই ওর।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে ইভ দেখে ফুলবাবু সেজে চেয়ারে বসে সিগারেট ফুঁকছে জর্জ মেলিস। ইভকে চোখ মেলে তাকাতে দেখে সে চেয়ার ছেড়ে বিছানায় এসে বসল। ইভের কপালে একটা হাত রাখল। তার স্পর্শে কুঁকড়ে গেল ইভ।

'কেমন বোধ করছ, ডার্লিং?'

উঠে বসার চেষ্টা করল ইভ কিন্তু ব্যথার চোটে পারল না। ওকে যেন ছিড়ে টুকরো

টুকরো করে ফেলা হয়েছে। 'হারামজাদা জানোয়ার...' বিকৃত, ফ্যাসফেসে শোনাল কণ্ঠ।

হেসে উঠল জর্জ। 'আমি তো তোমাকে ব্যথাই দিইনি।'

অবিশ্বাস নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল ইভ।

হাসছে জর্জ। 'মাঝে মাঝে আমি খুব নির্মম হয়ে উঠি।'

ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিল। 'কিন্তু তোমাকে ভালোবাসি বলে তোমার সঙ্গে রাফ হতে পারিনি। তবে একসময় তুমি এতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। প্রমিজ।'

হাতে কোনো অস্ত্র থাকলে এক্ষুনি জর্জকে মেরে ফেলত ইভ।

'তুমি একটা উন্মাদ!'

জর্জের চোখ ভয়ানক জ্বলে উঠল, মুঠো পাকাল সে। সঙ্গে সঙ্গে ইভ তীব্র আতংক নিয়ে উপলব্ধি করল জর্জ সত্যি একটা উন্মাদ।

ইভ দ্রুত বলল, 'না, না। আমি ঠিক তা বলতে চাইনি। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। আ-আসলে এরকম অভিজ্ঞতা এর আগে কখনও হয়নিতো। প্লিজ। আমি এখন ঘুমাব। আমাকে একটু ঘুমাতে দাও।'

ইভের দিকে অনেকক্ষণ নিষ্পলক তাকিয়ে রইল জর্জ মেলিস। তারপর তার শরীরের পেশীতে ঢিল পড়ল। সে উঠে ড্রেসিং টেবিলের কাছে গেল। এখানে ইভ তার গহনা রেখেছে। প্লাটিনামের একটি ব্রেসলেট আর একটি দামী হিরের হার রয়েছে এখানে। নেকলেসটা তুলে নিয়ে পরখ করল জর্জ। তারপর চোখ দিল পকেটে। 'ছোট্ট একটা স্যুভেনির হিসেবে আমি এটি নিলাম।'

ভয়ে মানা করতে পারল না ইভ।

'গুড নাইট, ডার্লিং।' বিছানার কাছে এসে ঝুঁকল জর্জ, আলতো করে চুমু খেল ইভের ঠোঁটে।

জর্জ চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ইভ। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে নামল বিছানা থেকে। ব্যথায় জ্বলছে শরীর। প্রতিটি পদক্ষেপে আগুন ধরে যাচ্ছে গায়ে। বেডরুমের দরজা বন্ধ করার পরে নিজেকে নিরাপদ মনে হলো ওর। বাথরুমে যেতে পারবে কিনা সন্দেহ হচ্ছিল ইভের। বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। ব্যথাটা একটু কমুক। প্রচণ্ড রাগে শরীর জ্বলে যাচ্ছে। জর্জ ওর সঙ্গে পায়ুকাম করেছে– নিতান্তই জানোয়ারের মতো।

বিছানায় অনেকক্ষণ শুয়ে থাকার পরে অবশেষে শরীরটাকে টেনে হিচড়ে নিয়ে এল বাথরুমে। তাকাল আয়নায় এবং আতংকে জমে গেল। যেখানে মেরেছে জর্জ, মুখের সে জায়গাটা নীল হয়ে গেছে, একটা চোখ ফুলে গিয়ে প্রায় বন্ধ হয়ে আছে। বাথটাবে গরম পানি ঢেলে আহত প্রাণীর মতো ওখানে শুয়ে পড়ল ইভ। পানিটা ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত শুয়ে থাকল। তারপর নেমে এল বাথটাব থেকে। ব্যথা একটু কমেছে তবে বটে জ্বলুনির তীব্রতা হ্রাস পায়নি মোটেই। বাকি রাতটা জেগে রইল সে ভয়ে যদি আবার ফিরে আসে জর্জ।

সকালে উঠে ইভ দেখে রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে বিছনার চাদর। এর শোধ ইভ নেবে। সে সাবধানে হেঁটে বাথরুমে ঢুকল। আবার গরম পানিতে গোসল করল। ওর মুখখানা আরও ফুলেছে, আঘাতের দাগগুলো ফুটে আছে প্রকটভাবে। ঠাণ্ডা পানিতে কাপড় ভিজিয়ে নিয়ে গাল এবং চোখে বারকয়েক চেপে ধরল। তারপর শুয়ে পড়ল বাথটাবে। জর্জ মেলিসের কথা ভাবছে। ওর নিষ্ঠুরতার সঙ্গে কী যেন একটা ব্যাপার ঠিক মেলানো যাচ্ছে না। কী সেটা? হঠাৎ কথাটা মনে পড়ল ওর। নেকলেস। ওটা কেন নিয়ে গেল জর্জ?

বায়ান্ন

দুই ঘণ্টা পরে ইভ নিচে নেমে এল নাশতা খেতে। যদিও ওর খিদে মরে গেছে। নিটা লুদভিনের সঙ্গে কথা বলা খুব জরুরি বলে এসেছে।

'মাই গড। তোমার মুখের এ হাল হলো কী করে?' জিজ্ঞেস করল নিটা।

কষ্টার্জিত হাসি হাসল ইভ। 'মধ্যরাতে ঘুম চোখে লেট্রিনে গিয়েছিলাম, আলো জ্বালিনি। সোজা দরজায় গিয়ে বাড়ি খেয়েছি।'

'ডাক্তার ডাকি?'

'আরে না। এ নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না,' বান্ধবীকে আশ্বস্ত করল ইভ। 'একটু ছড়ে গেছে কেবল। ও ঠিক হয়ে যাবে,' চারপাশে চোখ বুলাল। 'জর্জ মেলিস কোথায়?'

'টেনিস খেলছে। খুব ভালো টেনিস খেলে সে, বলল তোমার সঙ্গে লাঞ্চের সময় দেখা করবে। ওর বোধহয় তোমাকে খুব পছন্দ হয়েছে, ডার্লিং।'

'ওর কথা বলো শুনি,' ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে বলল ইভ। 'ওর ব্যাকগ্রাউন্ড কী?'

'জর্জ? ও খুব ধনী এক গ্রিক পরিবারের সন্তান। বাপের বড় ছেলে। বাপ হুলস্থুল রকমের বড়লোক। জর্জ হ্যানসন অ্যান্ড হ্যানসন নামে নিউইর্কের একটি ব্রোকারেজ ফার্মে চাকরি করে।'

পারিবারিক ব্যবসায় যায়নি সে?'

'না। জলপাই তেলের ব্যবসা বোধহয় তার পছন্দ নয়। অবশ্য ওদের যা টাকা তাতে তো ওর চাকরি করার দরকারই নেই। আমার মনে হয় স্রেফ দিনের সময়টা কাটাতে চাকরিটা করে জর্জ।' হাসল নিটা। 'রাতের বেলা ও ভয়ানক ব্যস্ত থাকে।'

'আচ্ছা?'

'ডার্লিং, জর্জ মেলিস এখানকার সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত ব্যাচেলর। মেয়েরা তার জন্য প্যান্টি খুলতে সবসময় উন্মুখ হয়ে থাকে। সবাই মিসেস মেলিস হওয়ার স্বপ্ন দেখে। আমার স্বামী ঈর্ষাকাতর না হলে আমিও হয়তো জর্জের পিছু নিতাম। ওকে দেখতে সুন্দর জানোয়ারের মতো লাগে না?'

'তা লাগে বৈকি,' বলল ইভ।

জর্জ মেলিস টেরাসে ঢুকে দেখল একা বসে আছে ইভ। ওকে দেখামাত্র ভয়ের শিহরণ জাগল ইভের শরীরে।

ওর কাছে এসে জর্জ বলল, 'গুড মর্নিং, ইভ। তুমি ঠিক আছ তো?' তার চেহারায় অকৃত্রিম উৎকণ্ঠা। কালশিটে পড়া গাল স্পর্শ করল আলতো হাতে। 'মাই ডার্লিং, ইউ আর সো বিউটিফুল।' একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ওর মুখোমুখি বসল। রৌদ্রকরোজ্জ্বল ঝিলমিলে সাগরের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল, 'এমন সুন্দর দৃশ্য দেখেছ কখনও?'

এমনভাবে কথা বলছে জর্জ যেন গতরাতে কিছুই ঘটেনি। কথা বলছে ও, লোকটার মধ্যে তীব্র আকর্ষণীয় সেই চৌম্বক শক্তিটি আবার টের পেল ইভ। গত রাতের ভয়ংকর ঘটনাটির পরেও তার এরকম অনুভূতি হচ্ছিল। ওকে দেখতে লাগছে গ্রিক দেবতার মতো। ওকে জাদুঘরে রাখা উচিত। ওর জায়গা হওয়া উচিত পাগলা গারদে।

'আমি আজ রাতে নিউইয়র্কে ফিরছি,' বলল জর্জ। 'তোমাকে কোথায় ফোন করব?'

'আমি মাত্রই বাসা বদলেছি,' দ্রুত বলল ইভ।

'নতুন বাসায় এখনও টেলিফোন লাগেনি। আমিই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

'ঠিক আছে, ডার্লিং,' হাসছে জর্জ। 'কাল রাতটা খুব উপভোগ করেছ, না?'

কথাটা শুনেও নিজের কানকে বিশ্বাস হতে চাইল না ইভের।

'তোমাকে এখনও অনেক কিছু আমার শেখানো বাকি, ইভ,' নিচু গলায় বলল জর্জ।

আর আমিও তোমাকে কিছু জিনিস শিখিয়ে দেব, মি. মেলিস, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল ইভ।

বাড়ি ফিরেই ডরোথি হলিস্টারকে ফোন করল ও। ডরোথি খবরের কাগজে কাজ করে। পেশায় গসিপ কলামিস্ট। কেউ যদি জর্জ মেলিস সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য দিতে পারে তো সে ডরোথি। ডরোথি ইভের বেশ ভালো বন্ধু। তাকে বিশ্বাস করে ইভ। কারণ ডরোথি প্রয়োজনে মুখ বন্ধ রাখতে পারে। ওকে লা পিরামিডে লাঞ্চের দাওয়াত দিল ইভ।

ডরোথি হলিস্টার দোহারা গড়নের, মাংসল মুখ, চুলে লাল রং করেছে, উঁচু, কর্কশ গলায় কথা বলে, হাসি শুনলে মনে হয় ব্যা ব্যা করে ডাকছে কোনো গর্দভ। তার গা ভর্তি গহনা– সবই নকল।

খাবারের অর্ডার দিয়ে ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে ইভ বলল, 'গত হপ্তায় বাহামা গিয়েছিলাম। খুব সুন্দর জায়গা।'

'জানি আমি,' বলল ডরোথি। 'আমার কাছে নিটা লুদভিগের অতিথি তালিকাটা আছে। পার্টি কেমন হলো?'

কাঁধ ঝাঁকাল ইভ। 'পুরনো অনেক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো। এক ইন্টারেস্টিং লোকের সঙ্গে পরিচয় হলো–'

ভুরু কুঁচকে নাম মনে করার ভান করল– 'জর্জ মিলার না কী যেন, গ্রিক।'

গাধার গলায় ঠা ঠা করে হেসে উঠল ডরোথি। ঘর যেন কেঁপে উঠল হাসির দমকে 'মেলিস, ডিয়ার। জর্জ মেলিস।

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ। মেলিস। চেন নাকি ওকে?'

'দেখেছি। গড, কী যে হ্যান্ডসাম!'

'ওর ব্যাকগ্রাউন্ডটা কী, ডরোথি?'

চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সামনে ঝুঁকে এল ডরোথি। 'কথাটা কেউ জানে না কাজেই খবরটা গোপন রেখো। জর্জ হলো তাদের পরিবারের সবচেয়ে অপদার্থ সন্তান। ওদের পরিবার হোলসেল ফুড বিজনেসে জড়িত। ভীষণ ধনী। ব্যবসার ভার জর্জেরই নেয়ার কথা ছিল কিন্তু সে ছেলে, মেয়ে আর ছাগল নিয়ে কিছু যৌন কেলেংকারীতে জড়িয়ে যায়। যদ্দুর জানি, তার বাবা এবং ভাইয়েরা তার ওপর এমনই বিরক্ত হয় যে শেষে তাকে দেশছাড়া করে।'

প্রতিটি শব্দ গিলছে ইভ।

'তারা জর্জকে একটি কানাকড়িও ছোঁয়ায়নি। ফলে নিজের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা জর্জের নিজেকেই করতে হয়েছে।'

অ, এ জন্যেই জর্জ সেদিন নেকলেসটা নিয়ে গিয়েছিল!

'তবে জর্জের চিন্তা কী? তাকে বিয়ে করার জন্য অনেক ধনীর দুলালীই এক পায়ে খাড়া।' ইভের দিকে তাকাল ডরোথি।'তুমি আগ্রহী সুইটি?'

'একদমই না।'

ইভের আগ্রহ জর্জ মেলিসকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে। সে যে প্ল্যান করেছে ত জর্জ চাবি হিসেবে কাজ করতে পারবে। কোটি কোটি টাকার মালিক হওয়ার চাবি।

জর্জ মেলিস যে ব্রোকারেজ ফার্মে চাকরি করে পরদিন সকালে সেখানে ফোন করল ইভ। তার কণ্ঠ সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল জর্জ। 'তোমার ফোনের জন্য পাগলের মতো অপেক্ষা করছিলাম আমি। এসো আজ রাতে একসঙ্গে ডিনার করি তারপর–'

'না, লাঞ্চ। কাল।'

বিস্মিত শোনাল জর্জের গলা। 'ঠিক আছে।'

'কাল আমার অ্যাপার্টমেন্টে এসো,' ওকে বাড়ির ঠিকানা দিল ইভ। 'কাল দুপুর সাড়ে বারোটায়।'

'আসব,' সন্তুষ্ট শোনাল জর্জের কণ্ঠ।

জর্জ মেলিসের জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে।

ত্রিশ মিনিট দেরি করে পৌঁছাল জর্জ। ইভ বুঝতে পারল এটা ওর অভ্যাস। মানুষকে অপেক্ষায় রেখে আনন্দ পায়। দারুণ সুদর্শন চেহারার কারণে জর্জ ভাবে দুনিয়াটা তার কেনা গোলাম। কিন্তু তার একটি দুর্বল দিক আছে। সে গরীব।

ছোট অ্যাপার্টমেন্টটির চারপাশে সপ্রশংস চোখ বুলাল জর্জ। মূল্যবান আসবাবে সাজানো ঘর।

দু'হাত বাড়িয়ে ইভের দিকে এগিয়ে গেল জর্জ। 'প্রতিটি মিনিট তোমার কথা ভেবেছি আমি।'

তার আলিঙ্গন এড়িয়ে গেল ইভ। 'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে, জর্জ।'

ওর চোখে চোখ রাখল জর্জ। 'কথা পরে হবে।'

'না, আমরা এখনই কথা বলব,' ধীরে তবে প্রতিটি শব্দ জোর দিয়ে উচ্চারণ করল ইভ। 'আমাকে যদি আবার ওভাবে স্পর্শ করার চেষ্টা করো তোমাকে আমি খুন করে ফেলব।'

কৌতুকের ভঙ্গিতে ঠোঁট বেঁকে গেল জর্জের। 'এটা কী ধরনের ঠাট্টা?'

'এটা কোনো ঠাট্টা নয়। সত্যি বলছি। তোমার জন্য একটা ব্যবসায়িক প্রস্তাব আছে।'

অবাক হলো জর্জ। 'তুমি আমার সঙ্গে ব্যবসায়িক কথা বলতে এখানে ডেকে এনেছ?'

'হ্যাঁ। জানি না বুড়ি মহিলাদের বোকা বানিয়ে তাদের টাকা দিয়ে কী পরিমাণ স্টক কিংবা বন্ড তুমি কিনতে পার তবে ধারণা করি অংকটা খুব বেশি নয়।'

রাগে কালো হয়ে গেল জর্জের মুখ। 'তুমি কি পাগল? আমার পরিবার–'

'তোমার পরিবার ধনী– তুমি নও। আমার পরিবার বড়লোক কিন্তু আমি নই। আমরা একই ভাঙ্গা নৌকার যাত্রী, জর্জ। তবে নৌকাটাকে ইয়টে রূপান্তরিত করার ...া আমার জানা আছে।' ইভ দাঁড়িয়ে লক্ষ করছে জর্জের রাগ ছাপিয়ে উঁকি দিচ্ছে কৌতূহল।

'কি বলছ সোজা ভাষায় বলো।'

'সোজা ভাষাতেই বলছি। আমাকে কয়েকশো কোটি টাকার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আমার বোন আলেকজান্দ্রাকে করা হয়নি।'

'এর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?

'তুমি যদি আলেকজান্দ্রাকে বিয়ে করো তাহলে ওই বিপুল বিত্ত বৈভবের মালিক হবে তুমি– আমরা দু'জন।'

'দুঃখিত। কারও আঁচলে বাধা পড়ার খায়েশ আমার নেই।'

'তোমাকে আঁচলে বাঁধা পড়তে হবে না,' বলল ইভ। 'কারণ আমার বোন দুর্ঘটনা-কন্যা। সব সময় কোনো না কোনো দুর্ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে।'

তেপ্পান্ন

ছোটবেলা থেকে মানুষকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার ব্যাপারে সচেতন ছিল ইভ ব্ল্যাকওয়েল। আগে বিষয়টি তার কাছে ছিল খেলার মতো, এখন এটা ভয়ানক সিরিয়াস হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার সঙ্গে অত্যন্ত অন্যায় আচরণ করা হয়েছে, যে সম্পত্তির ওপর তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে তা থেকে তাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এ কাজটা সুপরিকল্পিতভাবে করেছে তার বোন এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ দাদী-মা।

ইভের সঙ্গে তারা যা করেছে এজন্য তাদেরকে চরম খেসারত দিতে হবে। এ ভাবনা এতটাই পুলকিত করে তুলল ওকে যে যৌনসুখের মতো আনন্দ পেল সে। ওদের দু'জনের জীবন এখন তার হাতের মুঠোয়।

অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে এবং সাবধানে একটা প্ল্যান করেছে ইভ। বারবার উল্টেপাল্টে দেখল প্ল্যানটাতে কোথাও কোনো খুঁত আছে কিনা। না, নেই। শুরুতে অবশ্য ইভের পরিকল্পনায় সাড়া দিতে চায়নি জর্জ মেলিস।'

'ক্রাইস্ট, কাজটা তো খুবই বিপজ্জনক। আমি এসবের মধ্যে নিজেকে জড়াতে চাই না। আমার প্রয়োজনমতো টাকা তো পেয়েই যাচ্ছি।'

'কীভাবে?' তীব্র বিদ্রুপের সুরে বলল ইভ। 'মুটকি মহিলাগুলোকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে? বাকি জীবনটা তুমি এভাবেই কাটিয়ে দিতে চাও? যখন বয়স বাড়বে, শরীরে মেদ জমবে, মুখে বলিরেখা পড়বে তখন কী হবে? না, জর্জ, এরকম সুযোগ দ্বিতীয়বার আসবে না তোমার জীবনে। আমার কথা মতো কাজ করলে আমরা দু'জনে মিলে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কোম্পানির মালিক হতে পারব।'

'তুমি কী করে জানো তোমার পরিকল্পনা সফল হবে?

'কারণ আমার দাদীমা এবং বোনকে আমার চেয়ে ভালো পৃথিবীতে আর কেউ চেনে না, বিশ্বাস করো, আমার পরিকল্পনা সফল হবেই।'

ইভ নিজের ব্যাপারে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। সে জানে নিজের কাজটুকু সে খুব ভালোভাবেই করতে পারবে কিন্তু জর্জ কি তার ভূমিকায় উতরে যেতে পারবে? ওতো দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে। আর এ পরিকল্পনায় ভুলের কোনো জায়গা নেই। একটা ভুল করলেই গোটা পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে।

ইভ জর্জকে জিজ্ঞেস করল, 'মন ঠিক করে বলো তুমি আমার সঙ্গে থাকছ নাকি থাকছ না?'

অনেকক্ষণ ইভের দিকে তাকিয়ে থাকল জর্জ। তারপর বলল, 'আমি থাকছি।' সে ইভের সামনে এসে দাঁড়াল। কাঁধে হাত বুলাচ্ছে। কথা বলার সময় ঘরঘরে শোনাল কণ্ঠ।

'আমি তোমার ভেতরে ঢুকতে চাই।'

তীব্র যৌন উত্তেজনার স্রোত বয়ে গেল ইভের দেহে।

'ঠিক আছে,' ফিসফিস করে সায় দিল সে, 'তবে আমার মতো করে।'

ওরা দু'জনে বিছানায় শুয়ে আছে। নগ্ন। জর্জের মতো সুন্দর জানোয়ার দ্বিতীয়টি দেখেনি ইভ। এবং বিপজ্জনক। তবে জর্জকে নিয়ন্ত্রণ করার অস্ত্র সে পেয়ে গেছে। ইভ জর্জের গায়ে হাত বুলাচ্ছে, গায়ে ছোট ছোট কামড় দিচ্ছে, মুখটা ক্রমে নেমে এল কুচকিতে। ইভের মিষ্টি মধুর কামড় জর্জের পুরুষাঙ্গ দৃঢ় এবং উদ্ধত করে তুলল।

'ফাক মি, জর্জ,' বলল ইভ।

'উপুর হয়ে শোও।' বলল জর্জ।

'না। বললাম না আমার মতো করে করব।'

'আমি ওতে মজা পাই না।'

'জানি। তুমি আমাকে বালক ভেবে পায়ুকাম করেছিলে তাই না, ডার্লিং। কিন্তু আমি বালক নই। আমি একজন নারী। আমার ওপরে উঠে এসো।'

ইভের গায়ে উঠে এল জর্জ, স্ফীত পুরুষাঙ্গ ঢুকিয়ে দিল ওর ভেতর। 'এভাবে আমার তৃপ্তি আসে না, ইভ।'

হেসে উঠল ইভ। 'তাতে আমার কিছু আসে যায় না, সুইটহার্ট। আমি তৃপ্তি পাই।'

নিজের নিতম্ব নাড়তে শুরু করল ইভ, কোমরটা বারবার ওপরে তুলে দিচ্ছে, টের পাচ্ছে জর্জ ওর শরীরের গভীর থেকে গভীরে ঢুকে যাচ্ছে। একের পর এক রেতপাত হতে লাগল ইভের আর দেখছে বিরস চেহারা নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে জর্জ। জর্জের ইচ্ছে করছে ইভকে ব্যথা দিতে যাতে তার অবস্থা ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচির মতো হয়। কিন্তু সাহস পেল না।

'আবার!' হুকুম করল ইভ। আবার জোরে জোরে ইভকে ধাক্কা দিতে লাগল জর্জ। ইভ গভীর আশ্লেষে গুঙিয়ে না ওঠা পর্যন্ত থামল না। 'আ-হ-হ-হ... ঠিক আছে। আর দরকার নেই।'

ইভকে ছেড়ে ওর পাশে শুয়ে পড়ল জর্জ। ওর বুকের দিকে হাত বাড়াল। 'এখন আমার–'

কাঠখোট্টা গলায় ইভ বলল, 'জামাকাপড় পরো।'

রাগ এবং হতাশা নিয়ে বিছানা ছাড়ল জর্জ। ইভ বিছানায় শুয়ে শুয়ে ওকে কাপড় পরতে দেখল। কঠিন এক টুকরো হাসি ঠোঁটে। বলল, 'তুমি সুবোধ বালকের মতো আমার আদেশ পালন করেছ, জর্জ। এর পুরস্কার তুমি পাবে। আমি আলেকজান্দ্রাকে

তোমার হাতে তুলে দেব।'

শুক্রবার সকালে ইভ আলেকজান্দ্রাকে ফোন করে লাঞ্চের দাওয়াত দিল। 'একটা নতুন ফরাসী রেস্টুরেন্ট খুলেছে। শুনেছি ওখানকার খাবারটা নাকি দারুণ।'

বোনের ফোন পেয়ে খুব খুশি হলো আলেকজান্দ্রা। কিছুদিন আগে সে বার্কলি অ্যান্ড ম্যাথিউস অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিতে কপি রাইটার হিসেবে যোগ দিয়েছে। এটি ক্রুগার ব্রেন্ট লিমিটেডের একটি সহ-প্রতিষ্ঠান। অ্যাকাউন্ট এক্সিকিউটিভ, কপিরাইটার, ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর, ফটোগ্রাফার, আর্টিস্ট, মিডিয়া এক্সপার্টসহ পঁচাত্তরজন লোক কাজ করে এখানে। আলেকজান্দ্রা ইচ্ছে করলেই যে কোনো বড় পদে ঢুকতে পারত। কিন্তু কপিরাইটারের কাজ করতেই ওর আগ্রহ। কেট ব্ল্যাকওয়েলের নাতনী বলে কথা! একজন কপি রাইটারকে হঠিয়ে সে জায়গায় আলেকজান্দ্রাকে বসিয়ে দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। বলাবাহুল্য ব্যাপারটা মোটেই ভালো চোখে দেখেনি আলেকজান্দ্রার কলিগরা। শুরুতে ওরা ওকে একরকম এড়িয়েই যেত। কিন্তু আলেকজান্দ্রা নিজের ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, কাজের দক্ষতা এবং আন্তরিকতা দিয়ে অল্প দিনের মধ্যে সবার মন জয় করে নিয়েছে। এখন সবাই ওকে খুব পছন্দ করে।

প্রতিদিন সকালে অফিসে আসে আলেকজান্দ্রা। যদিও জানে সারাজীবন কপিরাইটারের কাজ সে করবে না। তবে এ মুহূর্তে সময় কাটাতেই মূলত চাকরিটা করছে সে। ভবিষ্যতে কী করবে সে ব্যাপারে এখনও কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি আলেকজান্দ্রা। তাকে বিয়ে করার বেশ কিছু প্রস্তাব এসেছে। দু'একজনকে পছন্দও হয়েছিল। কিন্তু ব্যাটে-বলে কেন যে মিলল না জানে না ও। সঠিক পুরুষটির এখনও খোঁজ পায়নি সে।

ইভের কথা খুব ভাবে আলেকজান্দ্রা। বোনকে সপ্তাহে দুই/তিন দিন ফোন করে খোঁজ-খবর নেয়। কিন্তু ইভ এতই ব্যস্ত থাকে যে ছোট বোনের সঙ্গে দেখা করার ফুরসতই মেলে না। তাই, দুপুরে কাজ থাকা সত্ত্বেও সে ইভের দাওয়াত কবুল করল সানন্দে, তার সঙ্গে দেখা হবে বলে। বলল, 'আমি আসছি।'

রেস্টুরেন্টটি জমকালো এবং দামী। খদ্দেরে ভর্তি। তবে টেবিল পেতে অসুবিধে হয়নি ইভের। দাদীমার নাম বলতেই পেয়ে গেছে রিজার্ভেশন। ইভ আগেই চলে এসেছে রেস্টুরেন্টে। কিছুক্ষণ পরে আবির্ভাব ঘটল আলেকজান্দ্রার। মেইতর ডি ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল টেবিলে।

ইভ বোনের গালে চুম্বন করে তাকে অভ্যর্থনা জানাল। 'তোমাকে দুর্দান্ত লাগছে, অ্যালেক্স।'

ওরা বসল। তারপর খাবারের অর্ডার দিল।

'কাজ কেমন চলছে?' জানতে চাইল ইভ।

শুরুতে কর্মক্ষেত্রের কলিগরা যে ওকে পছন্দ করত না এবং পরে কীভাবে তাদের মন জয় করেছে সে ঘটনা সোৎসাহে বর্ণনা শুরু করে দিল আলেকজান্দ্রা। গল্পের মাঝখানে ইভ মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে তাদের টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে জর্জ মেলিস। ওদেরকে বিভ্রান্ত চোখে পালা করে দেখছে। *মাই গড*, মনে মনে বলল ইভ, *ও তো বুঝতেই পারছে না কোনজন আমি।*

'জর্জ!' ডাকল ইভ।

স্বস্তি নিয়ে ঘুরল জর্জ। 'ইভ!'

ইভ বলল, 'হোয়াট আ প্লেজান্ট, সারপ্রাইজ। আলেকজান্দ্রার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমার বোনের সঙ্গে তোমার নিশ্চয় পরিচয় হয়নি। অ্যালেক্স, এ হলো জর্জ মেলিস।'

জর্জ আলেকজান্দ্রার হাত নিজের মুঠিতে পুরে নিয়ে বলল, 'অপূর্ব! ইভ বলেছিল তারা যমজ বোন কিন্তু ওরা যে আইডেন্টিকাল টুইন তা বলেনি।'

আলেকজান্দ্রা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিল জর্জের দিকে।

ইভ বলল, 'এসো, আমাদের সঙ্গে যোগ দাও।'

'দিতে পারলে খুব ভালো লাগত। কিন্তু আমার একটা জরুরি কাজ আছে। ইতিমধ্যে দেরি করে ফেলেছি। পরে কোনো একদিন আড্ডা দেয়া যাবে।' সে তাকাল আলেকজান্দ্রার দিকে। 'আশা করি শীঘ্রি।'

ওকে ওরা চলে যেতে দেখল। 'গুড হেভেনস!' বলল আলেকজান্দ্রা। 'কে ও?'

'ওহ্, ও হলো নিটা লুদভিগের একজন বন্ধু। নিটার বাড়িতে ওর সঙ্গে আমার পরিচয়।

'আমি কি চোখে ভুল দেখলাম নাকি ও সত্যি দেখতে অমন হ্যান্ডসাম।'

হি হি করে হাসল ইভ। 'ও ঠিক আমার পছন্দের টাইপ নয় তবে মহিলারা ওকে খুব আকর্ষণীয় মনে করে।'

'তাতো করবেই! ও কি বিবাহিত?'

'না। জর্জ খুব ধনী মানুষের সন্তান।' এরপর প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল ইভ।

বিল দেয়ার সময় জানা গেল জর্জ মেলিস আগেই ওদের খাবারের বিল পরিশোধ করে গেছে।

জর্জ মেলিসের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না আলেকজান্দ্রা।

সোমবার বিকেলে ইভ ফোন করল আলেকজান্দ্রাকে। 'মনে হচ্ছে তুমি একজনের মাথা গোলমাল করে দিয়েছ, ডার্লিং। জর্জ মেলিস আমার কাছে তোমার ফোন নাম্বার চেয়েছে। দেব ওকে?'

আলেকজান্দ্রা হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি যদি সত্যি ওর ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে না থাক–'

'তোমাকে তো বলেইছি, অ্যালেক্স, ওর সঙ্গে আমার মিলবে না।

'তাহলে তুমি ওকে আমার নাম্বার দিতে পারো।'

আরও কিছুক্ষণ দুবোন গল্প করার পরে ফোন ছেড়ে দিল ইভ। ওর পাশে বিছানায় নগ্ন হয়ে শুয়ে থাকা জর্জের দিকে এগিয়ে বলল, 'লেডিটি হ্যাঁ বলল।'

'কবে ফোন করব?'

'যখন বলব তোমায়।'

জর্জ মেলিস ওকে ফোন করবে এ কথাটা ভুলে থাকার চেষ্টা করছে আলেকজান্দ্রা। কিন্তু ওকে যতই মনের বাইরে রাখার চেষ্টা করছে ততই হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করছে জর্জ। কখনও খুব সুদর্শন কোনো পুরুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেনি আলেকজান্দ্রা কারণ যে ওরা খুব আত্মকেন্দ্রিক স্বভাবের হয়। কিন্তু জর্জ মেলিসকে এদের থেকে আলাদা লেগেছে। মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে। সে যখন আলেকজান্দ্রার সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, শিহরণ বয়ে গিয়েছিল ওর দেহে। *তুমি আসলে একটা পাগল,* নিজেকে বলল আলেকজান্দ্রা। *মাত্র দু'মিনিটের জন্য ওকে দেখেছ তুমি।*

সে সপ্তাহে আলেকজান্দ্রাকে ফোন করল না জর্জ। আলেকজান্দ্রা প্রথমে অধৈর্য হয়ে উঠল, তারপর হতাশ শেষে তার খুব রাগ হতে লাগল। *জাহান্নামে যাক ও,* ভাবছিল আলেকজান্দ্রা। *ও নিশ্চয় কোনো মেয়ের প্রেমে মজেছে। মরুকগে!*

পরের সপ্তাহে যখন জর্জ মেলিসের ফোন এল এবং তার খসখসে, ভারী কণ্ঠস্বরটা শুনতে পেল আলেকজান্দ্রা, নিমিষে বাষ্পের মতো উবে গেল সমস্ত রাগ।

'আমি জর্জ মেলিস,' নিজের পরিচয় দিল সে। 'তোমার সঙ্গে আমার কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখা হয়েছিল তুমি আর তোমার বোন তখন লাঞ্চ করছিলে। ইভ অভয় দিল তোমাকে ফোন করলে তুমি নাকি মাইন্ড করবে না।'

'ও বলেছিল তুমি আমাকে ফোন করতে পার,' গলায় উদাস স্বর ফোটাল আলেকজান্দ্রা। 'সে যাক গে, লাঞ্চের জন্য ধন্যবাদ।'

'তোমার সম্মানে ভোজ দেয়া উচিত। ইউ ডিজার্ভ আ মনুমেন্ট।'

জর্জের ফ্লাটারিটুকু বেশ উপভোগ করল আলেকজান্দ্রা। হেসে উঠল প্রাণ খুলে।

'আমার সঙ্গে একদিন সন্ধ্যায় ডিনার করবে?'

'আ–ইয়ে–আচ্ছা, ঠিক আছে।'

'চমৎকার। তুমি না বললে আমি আত্মহত্যা করতাম।'

'না, না। আত্মহত্যা কোরোনা, প্লিজ।' বলল আলেকজান্দ্রা। 'একা একা খেতে আমার মোটেই ভাল্লাগে না।'

'আমারও। মালবেরি স্ট্রিটে ছোট একটি রেস্টুরেন্ট চিনি আমি ম্যাটুনস। খুব নামীদামী রেস্টুরেস্ট নয় তবে খাবারটা–'

'ম্যাটুনস! আই লাভ ইট!' চেঁচিয়ে উঠল আলেকজান্দ্রা। 'ওদের রান্না খুবই ভালো।

আমার ফেবারিট।'

'তুমি গিয়েছ ওখানে?' বিস্মিত শোনাল জর্জের কণ্ঠ।

'অবশ্যই।'

ইভের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল জর্জ। আলেকজান্দ্রার পছন্দ-অপছন্দ সব তথ্যই জর্জকে দিয়েছে সে। আলেকজান্দ্রা সম্পর্কে সব কিছুই জানে এখন জর্জ।

জর্জ ফোন নামিয়ে রাখার পর ইভ মনে মনে বলল, *শুরু হয়ে গেল খেলা।*

চুয়ান্ন

আলেকজান্দ্রার জীবনের সবচেয়ে মোহনীয় সন্ধ্যা ছিল ওটা। জর্জ মেলিস পৌঁছাবার অন্তত ঘণ্টাখানেক আগে এক ডজন গোলাপ রঙের বেলুন চলে আসে আলেকজান্দ্রার কাছে। বেলুনগুলোর সঙ্গে একটি অর্কিডও বাঁধা ছিল। আলেকজান্দ্রা ভয় পাচ্ছিল ভেবে সে হয়তো খুব বেশি কল্পনার ফানুস ওড়াচ্ছে। তবে জর্জ মেলিসকে দেখামাত্র তার সমস্ত আশংকা দূর হয়ে যায়। জর্জের সেই তীব্র চৌম্বকীয় শক্তি আবার অনুভব করে সে।

ওরা বাড়িতে ড্রিংক শেষে রেস্টুরেন্টে গেছে।

'মেনু দেখবে নাকি আমি তোমার জন্য অর্ডার দেব?' জিজ্ঞেস করল জর্জ।

আলেকজান্দ্রার প্রিয় খাবারগুলো সবই আছে মেনুতে তবু জর্জকে খুশি করার জন্য বলল, 'তুমিই অর্ডার দাও।'

আলেকজান্দ্রার প্রতিটি প্রিয় খাবার আনতে বলল জর্জ ওয়েটারকে। আলেকজান্দ্রার মনে হচ্ছিল জর্জ বুঝি তার মনের ভেতরটা পড়তে পারছে। ওরা ডিনার করল স্টাফড আর্টিচোক, রেস্টুরেন্টের স্পেশাল ডিশ ভিল মেটুন এবং সুস্বাদু পাস্তা অ্যাঞ্জেল হেয়ার দিয়ে। সালাদও ছিল সঙ্গে। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সালাদ মেশাল জর্জ।

'তুমি রান্না করতে পার?' জানতে চাইল আলেকজান্দ্রা।

'রান্না আমার সবচেয়ে বড় শখ। আমার মা আমাকে শিখিয়েছিল। তিনি দারুণ রাঁধুনী।'

'পরিবারের সঙ্গে কি তোমার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ, জর্জ?'

হাসল সে, আলেকজান্দ্রা ভাবল এত সুন্দর করে একজন মানুষ হাসে কী করে?

'আমি একজন গ্রিক,' সরল গলায় বলল জর্জ। 'তিন ভাই, দু'বোনের মধ্যে আমি সবার বড়। তবে আমরা সবাই মিলে একজন।' চেহারায় বিষাদ ফুটল জর্জের। 'ওদেরকে ছেড়ে আসা ছিল আমার জীবনের কঠিনতম কাজ। আমার বাবা এবং ভাইয়েরা আমাকে ছাড়তেই চাইছিল না। আমাদের খুব বড় ব্যবসা আছে। ব্যবসা দেখাশোনার জন্য আমাকে ওদের প্রয়োজন ছিল।'

'কিন্তু তুমি থাকলে না কেন?'

'আমার কথা শুনলে তোমার মনে হতে পারে আমি একটা বোকা তবে আমি নিজের চেষ্টায় বড় হতে চেয়েছি। আমি কখনও কারো কাছ থেকে কোনো উপহার নিইনি। আর পারিবারিক ব্যবসাটা আমার দাদুর তরফ থেকে আমার বাবার জন্য ছিল একটা উপহার।

না, আমি আমার বাবার কাছ থেকে কিছু নেব না। আমি আমার সম্পত্তির ভাগ আমার ভাইদেরকে দিয়ে দিয়েছি।'

আলেকজান্দ্রা জর্জের ঔদার্যে রীতিমতো মুগ্ধ।

তাছাড়া, নরম গলায় যোগ করল জর্জ, 'আমি যদি গ্রিসে থাকতাম তাহলে কোনোদিনই তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হতো না।'

লাজে রাঙা হলো আলেকজান্দ্রা। 'তুমি বিয়ে করনি?'

'না।' সে সামনে ঝুঁকে এল, কণ্ঠে আর্তভাব ফুটিয়ে বলল, 'সুন্দরীতমা আলেকজান্দ্রা, আমাকে তোমার খুব সেকেলে মনে হতে পারে, তবে আমি যদি বিয়ে করি ওটাই হবে আমার জীবনের প্রথম এবং শেষ বিবাহ। আমার জন্য একজন নারীই যথেষ্ট তবে তাকে হতে হবে সঠিক নারী।'

'বাহ্, চমৎকার!' বিড়বিড় করল আলেকজান্দ্রা।

'আর তুমি?' প্রশ্ন করল জর্জ মেলিস। 'তুমি কখনও প্রেমে পড়নি?

'না।'

'কারও কারও জন্য এটাই খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়,' মন্তব্য করল জর্জ। 'তবে কেউ কেউ খুবই সৌভাগ্যবান হবে যদি সে–'

ওয়েটার ডেজার্ট নিয়ে হাজির হলো বলে বাক্যটি আর শেষ করতে পারল না জর্জ। আলেকজান্দ্রার খুব ইচ্ছে করছিল জর্জকে বলে বাক্যটি যেন সে শেষ করে। কিন্তু লজ্জায় বলতে পারল না।

কারও সঙ্গ এমন চমৎকারভাবে কোনোদিন উপভোগ করেনি আলেকজান্দ্রা। জর্জ মেলিসের সঙ্গে সে খুব সহজে মিশে যেতে পেরেছে। মেলিসের আচরণে মনে হয়েছে সে আলেকজান্দ্রার ব্যাপারে সত্যি খুব আগ্রহী। সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইল আলেকজান্দ্রার শৈশব, কৈশোর, জীবন, তার নানান অভিজ্ঞতা সম্পর্কে।

মেয়েদের ব্যাপারে নিজেকে একজন এক্সপার্ট বলে দাবি এবং গর্ব করে জর্জ মেলিস। সে জানে সুন্দরী মেয়েরা বেশিরভাগ নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, পুরুষরা তাদের রূপ আর চেহারার প্রশংসা করে বলে নিজেদেরকে কোনো মহার্ঘ বস্তু বলে মনে হয় তাদের। কিন্তু জর্জ যখন কোনো সুন্দরীর সঙ্গে কথা বলে, সে মেয়েটির বাহ্যিক রূপ নিয়ে কখনও কথা বলে না। মেয়েটিকে সে বুঝিয়ে দেয় সে তার মন, আবেগ অনুভূতি ইত্যাদি বিষয়গুলো জানতে আগ্রহী। এতে মেয়েটির মনে হয় জর্জ যেন তার আত্মার আত্মীয়, তার স্বপ্নগুলো শেয়ার করছে। আলেকজান্দ্রারও ঠিক তেমনই মনে হচ্ছিল। তাই সে জর্জকে গড়গড় করে বলে দিল কেট এবং ইভের কথা।

'তোমার বোন তোমার এবং তোমার দাদীর সঙ্গে থাকে না?'

'না। সে– ইভ একা একা বাসা ভাড়া করে থাকে।'

আলেকজান্দ্রার মাথায় ঢোকে না জর্জ মেলিসের মতো মানুষ কেন তার বোনকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। সে কারণ যা-ই থাক, বোনের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ করছিল

আলেকজান্দ্রা। ডিনার খাওয়ার সময় সে লক্ষ করেছে রেস্টুরেন্টের প্রতিটি নারী জর্জের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেও সে কোনো মেয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেনি পর্যন্ত।

কফি পান করতে করতে জর্জ বলল, 'আমি জানি না তুমি জ্যাজ পছন্দ করো কিনা, তবে সেন্ট মার্কস প্রেসে ফাইভ স্পট নামে একটি ক্লাব আছে...'

'যেখানে সেলিন টেলর বাজান?'

বিস্মিত চোখে আলেকজান্দ্রাকে দেখল জর্জ। 'তুমি ওখানে গিয়েছ নাকি?'

'প্রায়ই যাই,' হাসছে আলেকজান্দ্রা। 'আই লাভ হিম! লক্ষ করেছ তোমার আর আমার রুচিতে কী মিল?'

মৃদু গলায় জর্জ বলল, 'এ হলো মিরাকল।'

ওরা একসঙ্গে সেসিল টেলরের মনোমুগ্ধকর পিয়ানো বাদন শুনল। তারপর ব্লিকার স্ট্রিটের একটি বার-এ গেল। ওখানে খদ্দেররা মদ আর পপকর্ন খেতে খেতে বোর্ডের দিকে ক্ষুদে বর্শা ছুঁড়ে মারে এবং গান শোনে। জর্জ বর্শা ছোড়ার খেলা খেলল। যদিও জিততে পারল না। যদিও এমনভাবে খেলল যেন এর ওপর তার জীবন-মরণ নির্ভর করছে।

রাত দুটোর দিকে বার থেকে বেরিয়ে এল ওরা। সন্ধ্যাটা এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল বলে মন খারাপ লাগছিল আলেকজান্দ্রার।

জর্জের ভাড়া করা, শোফার চালিত রোলস রয়েসে ওরা দু'জন পাশাপাশি বসল। জর্জ চুপ করে আছে। শুধু দেখছে আলেকজান্দ্রাকে। দুবোনের চেহারায় এমন আজব মিল! এদের দু'জনের শরীরও নিশ্চয় একই রকম।

কল্পনায় দেখতে পেল আলেকজান্দ্রাকে সে বিছানায় নিয়েছে। প্রচণ্ড ব্যথায় মেয়েটা চিৎকার করছে, কাঁদছে, মোচড় খাচ্ছে।

'কী ভাবছ? জিজ্ঞেস করল আলেকজান্দ্রা।

অন্যদিকে তাকাল জর্জ যাতে ওর চোখের দৃষ্টি দেখতে না পায় আলেকজান্দ্রা। 'শুনলে তুমি হাসবে।'

'হাসব না। প্রমিজ।'

'হাসলেও তোমাকে দোষ দেব না। নিজেকে আমি প্লেবয় বলে ভাবি। এ জীবন কেমন হয় তুমি তো জানোই– ইয়ট ভ্রমণ, পার্টি ইত্যাদি ইত্যাদি।'

'হুঁ...

গভীর কালো চোখ আলেকজান্দ্রার চোখে রাখল জর্জ।

'আমার ধারণা তুমি সেই নারী যে আমার এই ছন্নছাড়া জীবনটাকে আমূল বদলে দিতে পার। চিরদিনের জন্য।'

হার্টবিট বেড়ে গেল আলেকজান্দ্রার। 'আ-আমি কী বলব বুঝতে পারছি না।'

'থাক। কিছু বলতে হবে না।' জর্জের ঠোঁট আলেকজান্দ্রার মুখের খুব কাছে চলে এল। আলেকজান্দ্রা রেডি। কিন্তু আর এগোল না জর্জ। *দুম করে এগোবে না,* ইভ ওকে

সতর্ক করে দিয়েছে। *প্রথম রাতে তো নয়ই। এগোলে ওকে আর পাবে না। ও যেন নিজে থেকে এগোয়।*

তাই জর্জ গন্তব্যে পৌঁছা পর্যন্ত আলেকজান্দ্রার হাতটি শুধু ধরে রইল। ব্ল্যাকওয়েল ম্যানসনে থামল গাড়ি। জর্জ আলেকজান্দ্রাকে সদর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল। আলেকজান্দ্রা ওর দিকে ফিরে বলল, 'সন্ধ্যাটা খুব ভালো কেটেছে তোমার সঙ্গে।'

'আমার জন্য এটা ছিল একটা জাদু।'

আলেকজান্দ্রার মিষ্টি হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রাস্তা। 'গুড নাইট, জর্জ।' ফিসফিস করল সে। পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘরের ভেতর।

মিনিট পনেরো পরে আলেকজান্দ্রাকে ফোন করল জর্জ। 'জানো, আমি কী করেছি? আমার পরিবারকে ফোন করেছি। আজ রাতে যে অসাধারণ নারীটির সঙ্গে আমি ছিলাম তার কথা বলেছি ওদেরকে। স্লিপ ওয়েল, লাভলী আলেকজান্দ্রা।

ফোন রেখে জর্জ মেলিস ভাবল, *বিয়ের পরে আমি আমার পরিবারকে ফোন করব এবং ওদের সবাইকে জাহান্নামের চৌরাস্তায় যেতে বলব।*

পঞ্চান্ন

জর্জ মেলিস আর ফোন করল না আলেকজান্দ্রাকে। সেদিন না, তার পরের দিন না, সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতেও নয়। যতবার ফোন বাজল, ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলল ও এবং প্রতিবারই হতাশ হলো। জর্জ কেন ফোন করছে না বুঝতে পারছে না আলেকজান্দ্রা। অবশ্য ফোন না করার নানান কারণ থাকতে পারে। কারণগুলো এক এক করে সাজালো আলেকজান্দ্রা।

সে হয়তো না বুঝেই জর্জকে কোনো কারণে মনে ব্যথা দিয়েছে।

জর্জ হয়তো ওকে খুব বেশি পছন্দ করে ফেলেছিল, ওকে ভালোবাসার কথা বলতে ভয় পাচ্ছিল বলে শেষে সিদ্ধান্ত নেয় আর সাক্ষাত করবে না আলেকজান্দ্রার সঙ্গে।

জর্জ হয়তো ভেবেছে আলেকজান্দ্রা ঠিক তার পছন্দের ক্যাটাগরিতে পড়ে না।

ও হয়তো ভয়ংকর অ্যাক্সিডেন্টে কোনো হাসপাতালে অসহায়ের মতো শুয়ে আছে।

হয়তো মারা গেছে জর্জ।

আর যখন সইতে পারল না আলেকজান্দ্রা, ফোন করল ইভকে। কিছুক্ষণ কষ্টার্জিত হাবিজাবি কথা বলে তারপর আসল প্রসঙ্গে চলে এল, 'ইভ, জর্জ মেলিসের কোনো খবর জানো তুমি?'

'নাতো! আমি তো ভেবেছি ও তোমাকে ডিনারের দাওয়াত দেবে।'

'দিয়েছিল। আমরা গত সপ্তাহে একসঙ্গে ডিনার করেছি।'

'তারপর থেকে ওর আর কোনো খবর নেই?'

'না।'

'হয়তো ব্যস্ত।'

একজন মানুষ এত ব্যস্ত থাকতে পারে না, ভাবল আলেকজান্দ্রা।

মুখে বলল, 'কী জানি!'

'জর্জ মেলিসের কথা ভুলে যাও, ডার্লিং। একজন খুব হ্যান্ডসাম কানাডিয়ানের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। সে একটা এয়ারলাইনারের মালিক এবং–'

ফোন রেখে হাসতে হাসতে বিছানায় বসে পড়ল ইভ। দিদা যদি জানত কী খাসা একটা পরিকল্পনাই না সে করেছে!

অফিস কলিগ অ্যালিস কোপেল জিজ্ঞেস করল, 'অ্যাই তোমার কি হয়েছে? চেহারা এমন শুকনা কেন?'

'কিছু হয়নি,' মিথ্যা বলল আলেকজান্দ্রা।

দুই সপ্তাহ হয়ে গেছে জর্জ মেলিসের কোনো খবর নেই। খুব রেগে আছে আলেকজান্দ্রা। না, জর্জের ওপর নয়। নিজের ওপর। জর্জকে কিছুতেই ভুলতে পারছে না বলে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। জর্জ তার কে? কেউ না। একদিন সন্ধ্যায় দু'জনে বসে ডিনার করেছে অথচ তারপর থেকে কিনা আলেকজান্দ্রা এমন আচরণ করছে যেন সে আশা করছে জর্জ তাকে বিয়ে করবে। ফর গডস শেক, পৃথিবীর যে কোনো মেয়েকে চাইলেই যখন পেতে পারে জর্জ মেলিস তাকে চাইতে যাবে কোন দুঃখে?'

দাদীমারও চোখে পড়েছে তার আদরের নাতনীর ধ্বস নামা চেহারা। 'তোমার কী হয়েছে, সোনা? এজেন্সিতে কাজের চাপ কি খুব বেশি?

'না, দিদা। অফিস ঠিক আছে। আ-আসলে ক'দিন ধরে আমার ঠিকমতো ঘুম হচ্ছে না।'

ঘুমালেও আলেকজান্দ্রার রক্ষা নেই। জর্জ মেলিসকে নিয়ে সে ইরোটিক স্বপ্ন দেখে। ইস, কেন যে মরতে এ লোকের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল ইভ!

পরদিন বিকেলে অফিসে ফোনটা এল। 'অ্যালেক্স? জর্জ মেলিস।' আলেকজান্দ্রার মনে হলো সে ভুল শুনেছে।

'অ্যালেক্স? সত্যি তুমি?'

'হ্যাঁগো, আমি।' মিশ্র প্রতিক্রিয়া হলো আলেকজান্দ্রার। কাঁদবে না হাসবে বুঝতে পারছে না। ও তো একটা স্বার্থপর। একটা দিনও খবর নেয়নি আলেকজান্দ্রার সে বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে।

'তোমাকে ফোন করব ভেবেছিলাম,' ক্ষমা প্রার্থনার স্বরে বলল জর্জ। 'কিন্তু পারিনি। আমি কিছুক্ষণ আগে ফিরেছি এথেন্স থেকে।'

আলেকজান্দ্রার রাগ গলে গেল। 'তুমি এথেন্সে ছিলে?'

'হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে যেদিন সন্ধ্যায় ডিনার করলাম তার পরদিন সকালেই আমার ভাই স্টিভ আমাকে ফোন করেছিল। আমার বাবার হার্ট-অ্যাটাক হয়েছিল।'

'ওহ্, জর্জ,' ওকে ভুল ভেবেছে ভেবে অপরাধ বোধে আচ্ছন্ন হলো আলেকজান্দ্রা। 'উনি এখন কেমন আছেন?'

'ভালো। তবে তখন অবস্থা খুব খারাপ ছিল। বাবার অসুস্থতায় আমার মাথার ঠিক ছিল না। বাবা আমাকে গ্রিসে ফিরে ব্যবসা-বাণিজ্য বুঝে নিতে বলছেন।'

'তুমি কি যাচ্ছ?' নিঃশ্বাস চেপে রাখল আলেকজান্দ্রা।

'না।'

চেপে রাখা শ্বাস ফেলল আলেকজান্দ্রা।

'আমার জায়গা তো আসলে এখানে। এমন একটা দিন কিংবা ঘণ্টা যায়নি তোমার কথা মনে পড়েছে আমার। তোমার সঙ্গে কখন দেখা হচ্ছে?'

'এখন! আমি আজ সন্ধ্যায় ডিনারের জন্য ফ্রি আছি।'

জর্জ প্রায় আলেকজান্দ্রার পছন্দের একটি রেস্টুরেন্টের নাম বলতে যাচ্ছিল। বদলে বলল, 'বাহ্ চমৎকার। কোথায় ডিনার করবে?'

'যে কোনো জায়গায় করলেই হলো। তুমি কি আমাদের বাড়িতে আসবে ডিনার করতে?'

'না,' এক্ষুনি কেট ব্ল্যাকওয়েলের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত নয় জর্জ। *যাই করো আমার দিদার কাছ থেকে দূরে থেকো। সে তোমার সবচেয়ে বড় বাধা।* 'তোমাকে রাত আটটার দিকে আমি তুলে নেব।'

ফোন নামিয়ে রেখে অ্যালিস কোপেলের গালে চুমু খেল আলেকজান্দ্রা। ওর বাকি দুই সহকর্মী ভিন্স বার্নস এবং মার্টি বার্গহিমারকে বলল, 'আমি হেয়ার ড্রেসারের কাছে যাচ্ছি। কাল দেখা হবে।'

প্রায় ছুটে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল ও।

'হেয়ার ড্রেসার না ছাই,' মন্তব্য করল অ্যালিস। 'ও ওর প্রেমিকের কাছে যাচ্ছে।'

ম্যাক্সওয়েলস প্লুম-এ ডিনার করল ওরা। খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল জর্জ মেলিস, 'আমার কথা মনে পড়েছে তোমার?'

'হ্যাঁ,' সত্যি কথাটাই বলল আলেকজান্দ্রা। কারণ তার মনে হয়েছে এ লোকটির সঙ্গে সৎ থাকা উচিত। কারণ মানুষটি খুব সহজ-সরল। 'তোমার কোনো খবর পাচ্ছিলাম না বলে উল্টোপাল্টা কত কিছু যে ভেবেছি! তোমার খারাপ কিছু হলো কিনা ভেবে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আরেকটা দিন দেরি হলে হয়তো আর সহ্য করতে পারতাম না।'

ফুল মার্কস দেয়া উচিত ইভকে, ভাবছে জর্জ। *চুপচাপ বসে থাকো,* বলেছিল সে ওকে। *আমি বলব কখন তুমি ফোন করবে আলেকজান্দ্রাকে।* এই প্রথম জর্জের মনে হলো প্ল্যানটা কাজে লাগবে। তার কাছে এতদিন এটা স্রেফ একটা খেলা মনে হয়েছিল কিন্তু ওর সামনে বসা আলেকজান্দ্রা, যার চোখে জর্জের জন্য উথলে পড়া প্রেম আর ভালোবাসা, ওকে দেখে এখন আর এটাকে খেলা ভাবার কোনো জো নেই। আলেকজান্দ্রা ওর হয়ে গেছে। এটা ছিল পরিকল্পনার প্রথম পদক্ষেপ। পরের পদক্ষেপগুলো হয়তো বিপজ্জনক হবে তবে ইভের সাহায্যে সেসব সামাল দিতে পারবে সে।

ইভ যদিও বলেছে তারা পার্টনার হিসেবে কাজ করবে কিন্তু পার্টনারশিপে বিশ্বাস করে না জর্জ। আলেকজান্দ্রার ঝামেলা মেটানোর পর সে ইভের ব্যবস্থা করবে। ভাবনাটা তাকে আমোদিত করে তুলল। সে পকেট থেকে একটি গহনার বাক্স বের করল। 'গ্রিস থেকে তোমার জন্য একটা জিনিস এনেছি আমি।'

'ওহ্, জর্জ...

'বাক্সটা খোলো, অ্যালেক্স।'

বাক্সের মধ্যে অত্যন্ত দামী একটি হিরের নেকলেস।

'খুব সুন্দর।'

এ নেকলেসটা ইভের কাছ থেকে নিয়েছে জর্জ।

এটা ওকে দিতে পার, ইভ বলেছিল ওকে, *কারণ এ নেকলেসটা কোনোদিন দেখেনি আমার বোন।*

'বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। সত্যি!'

'আমি চাই এটা তোমার গলায় শোভা পাবে।'

'আমি–' গলা কেঁপে গেল আলেকজান্দ্রার। 'ধন্যবাদ।'

ওর প্লেটে তাকাল জর্জ। 'তুমি দেখছি কিছুই খাওনি।'

'আমার খিদে নেই।'

'তাহলে এখন কী করবে?' জর্জের খসখসে কণ্ঠে আমন্ত্রণ।

আমন্ত্রণটা গ্রহণ করল আলেকজান্দ্রা। খোলাখুলিই বলল, 'তোমার সঙ্গে থাকব।'

নিজের অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে গর্ব করার মতো অনেক কিছুই রয়েছে জর্জ মেলিসের। দারুণ সুন্দরভাবে সাজানো তার বাসা। দেখে খুবই পছন্দ হয়ে গেল আলেকজান্দ্রার।

আলেকজান্দ্রাকে আস্তে করে আলোর দিকে ঘুরিয়ে দিল জর্জ যাতে ঝিকিমিকি করে হিরের নেকলেস। তারপর ওকে চুমু খেল সে। প্রথমে আস্তে তারপর গাঢ় ভাবে। আলেকজান্দ্রা জানেও না জর্জ মেলিস কখন ওকে তার বেডরুমে নিয়ে এসেছে। সে আলেকজান্দ্রার কাপড় খুলতে শুরু করল। মনে পড়ে গেল ইভের সাবধানবাণী *নিজেকে সামলে রেখো। তুমি যদি আলেকজান্দ্রাকে আঘাত করো এবং ও যদি জেনে যায় তুমি একটা আস্ত শুয়োর, ইহজীবনে ওর দেখা পাবে না। নিজের কুৎসিত খিদেটা বেশ্যা আর ছোট ছোট ছেলেগুলোর জন্য রেখে দিও।*

অসামান্য রূপবতী আলেকজান্দ্রা মাথা খারাপ করা একটি ফিগার নিয়ে এ মুহূর্তে জর্জ মেলিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এই সুন্দর দেহলতা কচলে ছিন্নভিন্ন করে দেয়ার তীব্র একটা ইচ্ছা জাগল জর্জের। ইচ্ছে করছে ওকে আঘাত করে, শ্বাসরোধ করে, ওকে চিৎকার দিতে বাধ্য করে। কিন্তু ইভের সাবধানবাণী মনে পড়তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল জর্জ।

সে কাপড় খুলে আলেকজান্দ্রার শরীরের সঙ্গে শরীর মিশিয়ে দাঁড়াল। ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর জর্জ আলেকজান্দ্রাকে আলতো করে শুইয়ে দিল বিছানায়। ওকে আদর করে চুমু খেতে লাগল। তার জিভ এবং আঙুল আলেকজান্দ্রার অপরূপ দেহের প্রতিটি বাঁক আবিষ্কার করে চলল। শেষে আর অপেক্ষা করতে পারল না আলেকজান্দ্রা।

'ওহ্, প্লিজ,' কাতরে উঠল সে। 'এখন, এখন!'

ওর শরীরের ওপর উঠে এল জর্জ, অসহ) এক সুখের জগতে প্রবেশ করল আলেকজান্দ্রা। মিলন শেষে জর্জের বাহুর ওপর মাথা রেখে শুয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে আলেকজান্দ্রা বলল, 'ওহ্, মাই ডার্লিং, তুমিও নিশ্চয় খুব মজা পেয়েছ।'

মিথ্যা জবাব দিল জর্জ, 'হ্যাঁ।'

ওকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করল আলেকজান্দ্রা। কেন কাঁদছে নিজেও জানে না।

প্রতিটি প্রেমের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি, ঈর্ষা, ছোট ছোট আঘাত, মন কষাকষি ইত্যাদি থাকে কিন্তু জর্জ আর আলেকজান্দ্রার রোমান্সে এসব ব্যাপার ছিল না। ইভের সতর্ক নজরদারীতে জর্জ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আলেকজান্দ্রার প্রতিটি আবেগ নিয়ে খেলা করছিল। আলেকজান্দ্রার কীসে ভয়, তার ফ্যান্টাসি, তার প্যাশন, ঘৃণা, পছন্দ-অপছন্দ সবকিছুই এখন জর্জের জানা। আলেকজান্দ্রার যখন যা প্রয়োজন ঠিক তখন তেমন আবেগ ডেলিভারি দিয়ে চলল জর্জ। সে জানে কী বললে আলেকজান্দ্রা হেসে কুটিপাটি হয়, কীসে তার কান্না আসে। জর্জের প্রেমের কায়দাকানুন দারুণভাবে রোমাঞ্চিত করে তোলে আলেকজান্দ্রাকে যদিও ওর সঙ্গে মিলনে কোনোই মজা পায় না জর্জ। যখন সে ওর সঙ্গে বিছানায় থাকে, সুখের আতিশয্যে গোঙাতে থাকে আলেকজান্দ্রা, তার উত্তেজনা জ্বরতপ্ত করে তোলে জর্জকে। তার ইচ্ছে করে বুনো পশুর মতো আলেকজান্দ্রার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মুচড়ে কামড়ে একাকার করে দেয় আলেকজান্দ্রা তার বুনো হামলায় ব্যথা পেয়ে যেন চিৎকার করে কাঁদতে থাকে, তার কাছে দয়া ভিক্ষা করে। তাহলেই কেবল মিলনের স্বর্গসুখ পাবে জর্জ। কিন্তু জানে এটা কখনোই সম্ভব নয়। কারণ এরকম কিছু করতে গেলে পুরো ব্যাপারটাই গুবলেট হয়ে যাবে। তাই তার হতাশা ক্রমে বাড়তে থাকে। সে যত প্রেম করতে থাকে আলেকজান্দ্রার সঙ্গে ততই মেয়েটির প্রতি ঘৃণা জন্মে তার।

বিশেষ কিছু জায়গা আছে যেখানে জর্জ মেলিস তার লালসা চরিতার্থ করতে পারে তবে খুব সাবধানে কাজটা করতে হয় তাকে। গভীর রাতে সে অচেনা, অখ্যাত বার এবং সমকামীদের ডিস্কোতে যায়, এক রাতের সম্পর্ক গড়তে আগ্রহী কোনো একাকী বিধবা হয় তার শিকার কিংবা খুঁজে নেয় মিলনের জন্য তৃষ্ণার্ত সমকামী কোনো তরুণ অথবা অর্থলোভী নিশিকন্যাদের। ওয়েস্ট সাইডের কোনো ঘিঞ্জি হোটেলে গিয়ে তাদেরকে নিয়ে ওঠে জর্জ। তবে একই হোটেলে মনের ভুলেও প্রত্যাবর্তন করে না সে। কারণ জানে দ্বিতীয়বার কেউ তাকে দেখে ফেললে কপালে খারাবী আছে। কারণ তার সেক্সুয়াল পার্টনারদের এসব হোটেলে বেশিরভাগ সময় অজ্ঞান এবং রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাদের শরীরে থাকে জ্বলন্ত সিগারেটের দাগ।

ছোটবেলা থেকেই অশ্লীল সেক্স করে আসছে জর্জ। তার বয়স যখন মাত্র আট বছর, তার বাবা তাকে পড়শীর ছেলের সঙ্গে একত্রে নগ্ন অবস্থায় আবিষ্কার করেছিলেন। তারপর জর্জকে তিনি যে মারটা মেরেছিলেন! মারতে মারতে নাক আর কান দিয়ে রক্ত বের করে দিয়েছিলেন। ছেলে অমন পাপকর্ম যাতে আর কখনও না করে সেজন্য পুরুষাঙ্গে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়েছিলেন। ওই ক্ষত শুকিয়ে গেছে কিন্তু মনের ভেতরের ক্ষতটা আজও রয়ে গেছে। আজও জর্জের মনে পড়ে সে প্রচণ্ড মার খাচ্ছে আর বাবার

কাছে কাকুতি মিনতি করছে তাকে আর প্রহার না করার জন্য। কিন্তু বাবা শুনছেন না। বরং ওর কান্না শুনে ক্ষেপে গিয়ে আরও বেশি মারতে শুরু করেছেন।

হেলেনিক পূর্বপুরুষদের বুনো এবং আবেগী প্রকৃতি পেয়েছে জর্জ মেলিস। কেউ তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে এ কথা কল্পনাই করতে পারে না। ইভ ব্ল্যাকওয়েলের খবরদারী সে আপাতত সহ্য করছে একটাই কারণে– মেয়েটাকে এ মুহূর্তে তার দরকার। যখন ব্ল্যাকওয়েলদের সমস্ত টাকা-পয়সা তার হাতে চলে আসবে, ইভকে ভয়ানক শাস্তি দেবে জর্জ। এমন নির্যাতন চালাবে ইভ কাকুতি করবে তাকে এত অত্যাচার না করে যেন মেরে ফেলা হয়। ইভের সঙ্গে পরিচয় তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সৌভাগ্যের ঘটনা। *আমার জন্য সৌভাগ্য*, ভাবে জর্জ, *কিন্তু ওর জন্য দুর্ভাগ্য।*

আলেকজান্দ্রা অবাক হয়ে ভাবে জর্জ কীভাবে বোঝে কোন ফুল তার পছন্দ, কোন রেকর্ডটি সে ভালোবাসে, কোন ধরনের বই তাকে আনন্দ দেয়। একবার এক জাদুঘরে নিয়ে দেখা গেল সে যে পেইন্টিংগুলো মুগ্ধ হয়ে দেখছে একই চিত্রকর আলেকজান্দ্রারও খুব পছন্দের। দু'জনের রুচিতে এমন মিল ভাবা যায় না! জর্জ মেলিসের দোষত্রুটি খুঁজে বের করার বহু চেষ্টাই করেছে আলেকজান্দ্রা। পায়নি। একদম পারফেক্ট একজন পুরুষ। দাদীমার সঙ্গে প্রেমিকের পরিচয় করিয়ে দিতে তার আর তর সইছিল না।

কিন্তু জর্জ কোনো না কোনো অজুহাত তুলে কেট ব্ল্যাকওয়েলের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার এড়িয়ে যাচ্ছিল।

'কেন, ডার্লিং? দিদাকে তোমার খুবই পছন্দ হবে। আমি ভীষণভাবে চাইছি তার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব।'

'আমি জানি তোমার দিদা একজন মহিয়সী নারী,' চেহারায় রাজ্যের সারল্য ফুটিয়ে বলে জর্জ। 'তবে আমার কেন জানি ভয় হয় তিনি হয়তো আমাকে তোমার পাশে দাঁড়ানোর যোগ্য মনে করবেন না।

'কী বাজে কথা বলছ!' ওর সরলতা স্পর্শ করে আলেকজান্দ্রাকে, 'তোমাকে দাদীর খুবই পছন্দ হবে, দেখো!'

'আচ্ছা, ঠিক আছে,' বলে জর্জ। 'তোমার দাদীর সঙ্গে দেখা করার জন্য আগে যথেষ্ট পরিমাণ সাহস সঞ্চয় করে নিই।'

এক রাতে ইভের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করল জর্জ।

একটু চিন্তা করে ইভ বলল, 'আজ হোক কাল হোক দিদার সঙ্গে তোমার দেখা করতেই হবে। তবে সাবধান প্রতিটি পা ফেলবে বুঝেশুনে। আমার দিদা মহা ধুরন্ধর। ভুলেও তাকে আন্ডার এস্টিমেট করো না। সে যদি কোনো কারণে তোমাকে সন্দেহ করে বসে, তোমার কলিজা কেটে নিয়ে কুকুর দিয়ে খাওয়াবে।'

ছাপ্পান্ন

এর আগে এমন নার্ভাস কখনও লাগেনি আলেকজান্দ্রার। এই প্রথম ওরা তিনজন একসঙ্গে ডিনার করতে চলেছে। সে জর্জ এবং কেট। আলেকজান্দ্রা মনে মনে প্রার্থনা করছে কোথাও যেন কোনোরকম সমস্যা না হয়। সে মনেপ্রাণে চাইছে তার দাদী এবং জর্জ যেন পরস্পরকে পছন্দ করে ফেলে। জর্জ যে কত চমৎকার মানুষ এটা যেন দাদী বুঝতে পারে আর জর্জের যেন ভালো লেগে যায় তার দাদীকে।

নাতনীকে এর আগে এত খুশি দেখেনি কেট ব্ল্যাকওয়েল। কিছু অত্যন্ত যোগ্য তরুণের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আলেকজান্দ্রার কিন্তু তারা কেউই মেয়েটির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেনি। এখন যে লোকটি তার মায়ার ইন্দ্রজালে আলেকজান্দ্রাকে বন্দি করেছে তাকে কাছ থেকে দেখতে চায় কেট। অর্থলোভী মানুষ কেমন হয় দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে তা জানা আছে তার এবং প্রাণপ্রিয় নাতনীকে তাদের কারও গ্রাস হতে দেবে না সে।

মি. জর্জ মেলিসের সঙ্গে সাক্ষাতকারের জন্য মুখিয়ে আছে কেট। তবে লোকটি তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ব্যাপারে কেন জানি দোটানায় ভুগছে এরকম একটি অনুভূতি হচ্ছিল কেটের। কিন্তু জর্জ কেন কেটকে এড়িয়ে যেতে চাইছে?

ফ্রন্ট ডোরবেল বেজে ওঠার শব্দ শুনল কেট, এক মিনিট পরেই আলেকজান্দ্রা ড্রইংরুমে ঢুকল খুব লম্বা, অসম্ভব রূপবান এক যুবকের হাত ধরে।

'দিদা, এ হলো জর্জ মেলিস।'

'অবশেষে,' বলল কেট। 'আমি তো ভাবতে শুরু করেছিলাম আপনি আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছেন, মি. মেলিস।'

'বরং উল্টোটা, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। এ মুহূর্তটির জন্য আমি কী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম তা আপনার ধারণাতেও নেই।' সে প্রায় বলতে যাচ্ছিল, 'অ্যালেক্স আমাকে যা বলেছে আপনি তো তার চেয়েও দেখতে সুন্দরী,' কিন্তু শেষ মুহূর্তে ব্রেক কষল।

সাবধান, জর্জ, কোনোরকম তোষামোদি করতে যেয়ো না। বুড়ি কিন্তু খুব চালাক। বুঝে ফেলবে তোমার কোনো মতলব আছে।

এক বাটলার এসে ড্রিংক পরিবেশন করেই চলে গেল।

'বসুন, মি. মেলিস।'

'ধন্যবাদ।'

জর্জের পাশে, দাদীর মুখোমুখি একটা কাউচে বসল আলেকজান্দ্রা।

'শুনলাম আপনি নাকি আমার নাতনীকে বেশ পছন্দ করেন।'

'জ্বী, আপনি ঠিকই শুনেছেন।'

ধূসর চোখে জর্জকে পরখ করছে কেট। 'আলেকজান্দ্রা বলল আপনি ব্রোকারেজ ফার্মে চাকরি করেন।'

'জ্বী।'

'সত্যি বলতে কী ব্যাপারটা আমার কাছে অদ্ভুতই লেগেছে। অত্যন্ত লাভজনক একটা পারিবারিক ব্যবসায় না গিয়ে আপনি বেতনভুক্ত কর্মচারীর জীবন বেছে নিয়েছেন।'

'দিদা, তোমাকে আমি বললাম না–'

'আমি ব্যাখ্যাটা মি. মেলিসের কাছ থেকে শুনতে চাই, আলেকজান্দ্রা।'

সাবধান, বিনয়ী থাকবে। কোনোরকম দুর্বলতা দেখালেই সে তোমাকে ছিড়ে টুকরো করে ফেলবে।

'মিসেস ব্ল্যাকওয়েল, আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা করতে ঠিক অভ্যস্ত নই,' ইতস্তত করছে জর্জ যেন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কী করবে। 'সে যা হোক মাঝে মাঝে পরিবেশ-পরিস্থিতির চাপে... কেট ব্ল্যাকওয়েলের চোখে চোখ রাখল। 'আমি অত্যন্ত স্বাধীনচেতা একজন মানুষ। আমি কখনও কারও কোনো দান গ্রহণ করি না।' মেলিস অ্যান্ড কোম্পানি যদি আমি প্রতিষ্ঠা করতাম তাহলে ওটা আজ আমিই চালাতাম। কিন্তু ওটার প্রতিষ্ঠাতা আমার দাদু এবং ওটাকে অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায়ে তৈরি করেছেন আমার বাবা। ওখানে আমার প্রয়োজন নেই। আমার তিন ভাই আছে তারা আমাদের ব্যবসা চালিয়ে নিতে অত্যন্ত পটু। আমি যতদিন পর্যন্ত না নিজে কিছু তৈরি করতে পারছি এবং তা নিয়ে গর্ব করতে পারছি ততদিন পর্যন্ত আমি আপনার ভাষায় বেতনভুক কর্মচারী হিসেবেই কাজ করে যাব।'

আস্তে করে মাথা দোলাল কেট। সে যা ভেবেছিল এ যুবক তেমনটি নয়। সে ভেবেছিল জর্জ প্লেবয় টাইপের অর্থলোভী কেউ হবে যে তার নাতনীকে বিয়ে করে বিলিয়ন ডলার সম্পত্তির মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখবে। কিন্তু জর্জকে মোটেই তাদের কাতারে ফেলা যাবে না। তবু কেন যেন একে নিয়ে মনের ভেতরে একটা খচখচানি কিছুতেই দূর হচ্ছে না কেটের। ছেলেটিকে অতিমাত্রায় পারফেক্ট বলে মনে হওয়ার কারণেই কি এরকম খচখচানি?

'শুনেছি আপনার পরিবার খুব ধনী।'

দিদাকে বোঝাতে হবে তোমরা প্রচণ্ড ধনী এবং তুমি অ্যালেক্সকে পাগলের মতো ভালবাসো। হাসিখুশি থাকবে। মেজাজটা সামলে সুমলে রাখবে। তাহলেই দেখবে কোনো সমস্যা হবে না।

'টাকার সবারই দরকার আছে, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। তবে টাকাটা আমার কাছে মুখ্য

নয়।'

কেট মেলিস অ্যান্ড কোম্পানির বিষয়ে খোঁজ-খবর নিয়েছে। এরা ত্রিশ মিলিয়ন ডলারের সম্পত্তির মালিক।

'পরিবারের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন, মি. মেলিস?'

উদ্ভাসিত হলো জর্জ। 'অপূর্ব! খুব ভালো' মুখে এক টুকরো হাসি ফুটতে দিল। 'আমাদের পরিবারে একটা প্রবাদ আছে, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। আমাদের কারও একজনের যদি হাতের একটা আঙুল কেটে যায়, তখন বাকিদের শরীর থেকেও রক্তপাত হয়। আমরা প্রত্যেকে একে অন্যের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত।'

যদিও জর্জ তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে পরিবারের কোনো সদস্যের সঙ্গে বাতচিত করেনি।'

খুশি হয়ে মাথা ঝাঁকাল কেট। 'আমি পারিবারিক বন্ধনে বিশ্বাসী।'

সে আড়চোখে তার নাতনীকে দেখল। আলেকজান্দ্রার চোখমুখে জর্জ মেলিসের জন্য ভালোবাসা চুইয়ে পড়ছে। এক মুহূর্তের জন্য ডেভিড আর নিজের কথা মনে পড়ে গেল কেটের। অনেক দিন আগে সে-ও তো ডেভিডের জন্য এরকমই পাগল ছিল। সে সব স্মৃতি কি ভোলা যায়?

লেস্টার ঢুকল ঘরে। 'ডিনার পরিবেশন করা হয়েছে, ম্যাডাম।'

ডিনারের সময় আলাপচারিতা আরও ক্যাজুয়াল হলেও কেটের প্রশ্নগুলো ছিল উদ্দেশ্যমূলক। সবচেয়ে জরুরি প্রশ্নটির জন্য প্রস্তুত ছিল জর্জ।

'আপনি কি সন্তান পছন্দ করেন, মি. মেলিস?'

দিদা একজন প্রপৌত্রের জন্য পাগল হয়ে আছেন... একটি প্রপৌত্র পেলে তিনি আর কিছু চান না।

জর্জ কেটের প্রশ্নে যারপরনাই বিস্মিত। 'সন্তান-সন্ততি পছন্দ করি কিনা জানতে চাইছেন? ছেলে মেয়ের বাপ হতে না পারলে একজন পুরুষের যথার্থতা কি? বিয়ের পরে আমার স্ত্রীটিকে একের পর এক সন্তান জন্মদানে খুবই ব্যস্ত থাকতে হবে। গ্রিসে একজন পুরুষের পৌরুষ বাছাই করা হয় সে কতজন ছেলেমেয়ের বাপ তার ওপর ভিত্তি করে।'

ওকে তো নির্ভেজালই মনে হচ্ছে, ভাবছে কেট। তবে ওর ব্যাপারে আরেকটু খোঁজ-খবর নিতে হবে। কাল আমি ব্রাড রজার্সকে বলব ওর ব্যক্তিগত সঞ্চয় কীরকম আছে খোঁজ নিতে।

আলেকজান্দ্রা শুতে যাওয়ার আগে ফোন করল ইভকে। ও ইভকে বলেছিল জর্জ মেলিস ওদের বাড়িতে ডিনার করতে আসবে।

'সব খবর জানার জন্য আমি কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না। জর্জ চলে যাওয়া মাত্র তুমি আমাকে ফোন করবে। আমি পূর্ণ বৃত্তান্ত জানতে চাই।'

এখন বৃত্তান্ত জানাচ্ছে আলেকজান্দ্রা। 'আমার মনে হয় ওকে দিদার খুব পছন্দ হয়েছে।'

ইভ হতাশার মৃদু খোঁচা অনুভব করল বুকে। 'কী বলল দিদা?'

'হাজারটা প্রশ্ন করেছে সে জর্জকে। খুব সুন্দরভাবে সামাল দিয়েছে জর্জ।'

'তাহলে তোমরা দু'জনে বিয়ে করতে চলেছ?'

'আ-ও এখনও আমাকে প্রপোজ করেনি, ইভ। তবে মনে হয় করবে।' আলেকজান্দ্রার কণ্ঠে খুশির সুর।

'দিদা কি রাজি হবে?'

'একশো বার রাজি হবে। দিদা জর্জের পার্সোনাল ফিন্যান্স চেক করে দেখবে বলেছে। তবে তাতে কোনো সমস্যা হবে না।'

লাফিয়ে উঠল ইভের কলজে।

আলেকজান্দ্রা বলল, 'তুমি তো জানোই দিদা কেমন সাবধানী মানুষ।'

'হুঁ' ধীর গলায় বলল ইভ। 'জানি আমি।'

ওরা শেষ। দ্রুত কিছু একটা ভেবে বের করতেই হবে।

'আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখো,' বলল ইভ।

'রাখবো। গুড নাইট।'

ইভ ফোন রেখেই জর্জ মেলিসের নাম্বারে ডায়াল করল। এখনও বাড়ি ফেরেনি জর্জ। প্রতি দশ মিনিট অন্তর ও ফোন করে গেল। অবশেষে যখন সাড়া মিলল জর্জের, ইভ বলল, 'তুমি খুব দ্রুত এক মিলিয়ন ডলার যোগাড় করতে পারবে?'

'মানে?'

'দিদা তোমার ফিন্যান্স চেক করবে বলেছে।'

'উনি তো জানেন আমার পরিবারের কীরকম টাকা পয়সা আছে। তিনি–'

'তোমার পরিবারকে নিয়ে আমি কথা বলছি না। বলছি তোমাকে নিয়ে। তোমাকে বলেছিলাম না মহিলা মহা চালাক।'

ও প্রান্তে নীরবতা। 'আমি এ মুহূর্তে এক মিলিয়ন ডলার কোথায় পাবো?'

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে,' বলল ইভ। 'কাজটা বিপজ্জনক। তবে মাথা খাটিয়ে চললে টাকাটা তুমি জোগাড় করতে পারবে।'

কেট পরদিন সকালে অফিসে এসে তার সহকারীকে বলল, 'ব্রাড রজার্সকে বলো জর্জ মেলিসের পার্সোনাল ফিন্যান্সের খোঁজ নিতে। সে হ্যানসন অ্যান্ড হানসনে চাকরি করে।'

'মি রজার্স শহরের বাইরে গেছেন, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। কাল ফিরবেন। কাল পর্যন্ত কি–?'

'ঠিক আছে। আগামীকাল হলেও চলবে।'

ম্যানহাটনের ওয়াল স্ট্রিটে, ব্রোকারেজ ফার্ম হ্যানসন অ্যান্ড হ্যানসনে নিজের অফিসে বসে আছে গভীর চিন্তামগ্ন জর্জ মেলিস। স্টক এক্সচেঞ্জ খোলা, বিশাল অফিসটি কর্মচাঞ্চল্য আর কোলাহলে পূর্ণ। ফার্মের সদর দপ্তরে কর্মচারীর সংখ্যা ২২৫। এদের মধ্যে রয়েছে ব্রোকার, অ্যানালিস্ট, অ্যাকাউনটেন্ট, অপারেটর এবং কাস্টমার রিপ্রেজেন্টেটেটিভ। সবাই পুরোদমে কাজে ব্যস্ত। জর্জ মেলিস ছাড়া। নিজের ডেস্কে আতংকে পাথর হয়ে বসে আছে সে। যে কাজ সে করতে যাচ্ছে, ব্যর্থ হলে হাজতবাস নিশ্চিত। আর সফল হলে পৃথিবীটি চলে আসবে হাতের মুঠোয়।

ইভ ওকে এক মিলিয়ন ডলারের স্টক সার্টিফিকেট চুরি করার বুদ্ধি দিয়েছে। বলেছে শুধু এক রাতের জন্য ওগুলো চুরি করবে জর্জ। পরদিন আবার যেখানকার জিনিস সেখানে রেখে আসবে। কেউ কিচ্ছুটি টের পাবে না।

প্রতিটি স্টক ব্রোকারেজ ফার্মের ভল্টে লাখ লাখ ডলারের স্টক এবং বন্ড থাকে। কিছু স্টক সার্টিফিকেট এর মালিকের নাম লেখা থাকে, তবে বেশিরভাগ স্ট্রিট নেম স্টক, তাতে শুধু কোডেড CUSIP (The Committe on Uniform Security Identification Procedures) নাম্বার আছে– এ কোড নাম্বার হলো এসব বন্ডের মালিকের পরিচয় পত্র। তবে এগুলো ক্যাশ করার কোনো ইচ্ছে নেই জর্জের। তার ভিন্ন একটি পরিকল্পনা রয়েছে। হ্যানসন অ্যান্ড হ্যানসনের স্টকগুলো রাখা হয় সাত তলার প্রকাণ্ড এক ভল্টে। ওখানে গেটের সামনে পাহারা দেয় সশস্ত্র একজন পুলিশম্যান। কোডেড প্লাস্টিক অ্যাকসেস কার্ড ছাড়া সিকিউরড ওই এলাকায় ঢোকা যায় না। জর্জ মেলিসের কাছে এরকম কোনো কার্ড নেই। তবে কার কাছে আছে তা সে জানে।

হেলেন থ্যাচার একজন নিঃসঙ্গ চল্লিশোর্ধ বিধবা। তার মুখশ্রী মন্দ নয়, ফিগারটাও ভালো আর সে রান্না করতে পারে আরও চমৎকার। তেইশ বছরের দাম্পত্য জীবন ছিল তার। স্বামীর মৃত্যু সে জীবনে বিশাল এক শূন্যতা তৈরি করেছে। একজন পুরুষ সঙ্গী দরকার তার যে ওকে ভালোবাসবে। তবে সমস্যা হলো হ্যানসন অ্যান্ড হ্যানসনে যেসব মহিলা কাজ করে তাদের অধিকাংশ বয়সে তরুণী এবং দেখতে হেলেনের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী। এদের প্রতি অফিসের ব্রোকাররা আকৃষ্ট। ফলে আজতক কেউ হেলেনকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়নি।

জর্জ মেলিসের ঠিক ওপরতলায়, অ্যাকাউন্টিং বিভাগে কাজ করে হেলেন থ্যাচার। জর্জকে প্রথম দেখার দিনই হেলেনের মনে হয়েছিল এ লোকটি তার যথার্থ স্বামী হওয়ার উপযুক্ত। সে জর্জকে বেশ কয়েকবার বাড়িতে ডিনারের দাওয়াত দিয়েছিল নিজে রেঁধে খাওয়াবে বলে। ডিনারের সঙ্গে আরও লোভনীয় কিছু পরিবেশনের ইঙ্গিতও সে দিয়েছিল জর্জকে। কিন্তু প্রতিবারই কোনো না কোনো অজুহাতে হেলেনের দাওয়াত এড়িয়ে গেছে জর্জ। আজ সকালে হেলেনের ডেস্কের ফোন বেজে উঠলে সে সাড়া দিয়ে বলল, 'অ্যাকাউন্টিং, মিসেস থ্যাচার।' ফোনে ভেসে এল জর্জ মেলিসের ভরাট ও উষ্ণ কণ্ঠ।

'হেলেন জর্জ বলছি।' তার গলা শুনে শরীরে রোমাঞ্চ জাগল হেলেনের।

'তোমার জন্য কী করতে পারি, জর্জ?'

'তোমার জন্য ছোট্ট একটি সারপ্রাইজ আছে। একবার আমার অফিসে আসতে পারবে?'

'এখন?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এখন কাজ বাদ দিয়ে–'

'খুব বেশি ব্যস্ত থাকলে থাক। পরে হবে'খন।'

'না, না। আ-আমি আসছি এখুনি।'

জর্জ কতগুলো কাগজপত্র নিয়ে এলিভেটরের সারির দিকে কদম বাড়াল। কেউ ওকে লক্ষ করছে না নিশ্চিত হয়ে সে এলিভেটর পার হয়ে পেছনের সিড়ি ব্যবহার করল। ওপরতলায় এসে দেখে নিল হেলেন তার অফিসে আছে কিনা। নেই দেখে ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে অফিসে ঢুকল। সে যেন কাজে এসেছে। যদি ধরা পড়ে যায়– নাহ্, এ মুহূর্তে সে এসব কথা ভাবতে চাইছে না। সে মাঝখানের ড্রয়ারটি খুলল। এখানে হেলেন ভল্টে ঢোকার অ্যাকসেস কার্ড রাখে। আছে। কার্ডটি তুলে পকেটে পুরল জর্জ, অফিস থেকে বেরিয়ে দ্রুত নেমে এল সিড়ি বেয়ে। নিজের ডেস্কে এসে দেখে তার খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে হেলেন।

'সরি,' বলল জর্জ। 'এক মিনিটের জন্য একটু বাইরে যেতে হলো।'

'ঠিক আছে। এখন বলো সারপ্রাইজটা কী,' বলল হেলেন।

'একজন বলল আজ তোমার জন্মদিন,' বলল জর্জ, 'তাই তোমাকে আমি আজ লাঞ্চ খাওয়াতে চাই।' হেলেনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে। আজ মোটেই হেলেনের জন্মদিন নয়। কিন্তু সত্যি কথাটি বলে জর্জের সঙ্গে লাঞ্চ খাওয়ার সুযোগটি হারাতেও মন চাইছে না। একটু দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগে শেষে হেলেন বলল, 'দ্যাটস– ভেরি নাইস অব ইউ। তোমার সঙ্গে লাঞ্চ খেতে আমার ভালোই লাগবে।'

'ঠিক আছে।' হেলেনকে বলল জর্জ। দুপুর একটায় টনিস-এ তোমার সঙ্গে দেখা হবে। এ কথাটি ফোনেও বলা যেত কিন্তু হেলেন এমনই রোমাঞ্চিত যে এ প্রশ্নটি তার মনে উদয় হলেও জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেল। সে উদ্ভাসিত চেহারা নিয়ে চলে গেল।

হেলেন নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজে নেমে পড়ল জর্জ। প্লাস্টিকের কার্ডখানা ফেরত দেয়ার আগে বহু কাজ বাকি পড়ে আছে। সে এলিভেটরে চেপে চলে এল সাততলায়, ঢুকল সিকিউরিটি এলাকায়। ওখানে বন্ধ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে গার্ড। জর্জ প্লাস্টিক কার্ড ঢোকাতেই খুলে গেল গেট। ভেতরে পা রাখতে গার্ড বলল, 'আপনাকে আগে কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

বুকের ধুকপুকুনি বেড়ে গেল জর্জের। মুখে হাসি ফোটাল সে। 'না দেখেননি। কারণ এখানে আমার আসার দরকার পড়ে না। আমার একজন কাস্টমার হঠাৎ বললেন তার

স্টক সার্টিফিকেগুলো দেখতে চান। তাই ওগুলো নিতে এসেছি।'

গার্ড বলল, 'আচ্ছা যান।' ভল্টে ঢুকে গেল জর্জ।

কংক্রিটের তৈরি কক্ষ, ত্রিশ ফুট বাই পনের ফুট। ফায়ারপ্রুফ ফাইল কেবিনেটে পা বাড়াল ও। এখানেই স্টকগুলো রাখা হয়। ইস্পাতের ড্রয়ার খুলল ও। ভেতরে থরে থরে সাজানো শত শত স্টক সার্টিফিকেট। সার্টিফিকেটের গায়ে নিউইয়র্ক এবং আমেরিকান স্টক এক্সচেঞ্জ কোম্পানির ছাপ মারা। একেকটা শেয়ারের একেক রকম দাম। জর্জ খুব দ্রুত এক মিলিয়ন ডলার মূল্যের শেয়ার আলাদা করে ফেলল। কাগজগুলো জ্যাকেটের পকেটে ঢোকাল, বন্ধ করল ড্রয়ার এবং ফিরে এল গার্ডের কাছে।

'এত তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হয়ে গেল?' জিজ্ঞেস করল গার্ড।

মাথা নাড়ল জর্জ। 'কাজ হয়নি। কম্পিউটারে ভুল নাম্বার এসেছে। কাল সকালে এসে সব ঠিক করতে হবে।'

'হারামজাদা কম্পিউটারগুলো কোনো কাজের নয়,' মন্তব্য করল গার্ড। 'আমাদের সবার সময় নষ্ট করে।'

জর্জ ফিরে এল নিজের ডেস্কে। ঘামে জবজবা গা। সে আলেকজান্দ্রাকে ফোন করল, 'ডার্লিং, আজ রাতে তোমার আর তোমার দিদার সঙ্গে একটু দেখা করব।'

'তোমার না আজ রাতে কার সঙ্গে ব্যবসায়িক কাজকর্ম আছে, জর্জ?'

'ছিল তবে ওটা আমি ক্যান্সেল করে দিয়েছি। তোমাদের সঙ্গে খুব জরুরি কথা আছে আমার।'

কাঁটায় কাঁটায় বেলা একটার সময় জর্জ হেলেন থ্যাচারের অফিসে ঢুকল তার অ্যাকসেস কার্ড ফেরত দিতে। সে যখন কার্ডটি ডেস্কের ড্রয়ারে রাখছে ওই সময় হেলেন রেস্টুরেন্টে তার জন্য অপেক্ষা করছে। কার্ডখানা ফেরত দিতে মন চাইছিল না জর্জের, কারণ ওটা আবার প্রয়োজন হবে। কিন্তু ও জানে যে কার্ড রাতে যদি ফেরত দেয়া না হয় সেটি কম্পিউটার কর্তৃক পরদিন সকালে বাতিল হয়ে যায়। বেলা একটা দশে জর্জ রেস্টুরেন্টে এল হেলেন থ্যাচারের সঙ্গে লাঞ্চ করতে।

হেলেনের হাত ধরে জর্জ বলল, 'আমি এখন থেকে তোমার সঙ্গে প্রায়ই লাঞ্চ খাব।' ওর চোখে কী যেন খুঁজল সে।

'কাল লাঞ্চের জন্য ফ্রি আছ তো?'

মুখ ভরে হাসল হেলেন। 'অবশ্যই ফ্রি আছি, জর্জ।'

বিকেল বেলা অফিস ছুটির পরে যখন বেরুল জর্জ মেলিস, তার পকেটে ছিল এক মিলিয়ন ডলার মূল্যের স্টক সার্টিফিকেট।

সাতান্ন

সন্ধ্যা সাতটায় ব্ল্যাকওয়েলদের বাড়িতে হাজির হলো জর্জ মেলিস। তাকে নিয়ে যাওয়া হলো লাইব্রেরিতে। ওখানে তার জন্য কেট এবং আলেকজান্দ্রা অপেক্ষা করছিল।

'গুড ইভনিং,' বলল জর্জ। 'আশাকরি আপনাদেরকে বিরক্ত করছি না। তবে আপনাদের দু'জনের সঙ্গেই কথা বলাটা জরুরি ছিল।' সে কেটের দিকে ফিরল। 'জানি আমার আচরণ আপনার কাছে অত্যন্ত সেকেলে মনে হবে তবু বলছি, আপনার অনুমতি নিয়ে আপনার নাতনীর হাতখানা ধরতে চাই তাকে বিয়ে করার জন্য। আমি আলেকজান্দ্রাকে ভালোবাসি এবং বিশ্বাস করি সে-ও আমাকে ভালোবাসে। তবে আপনার আশীর্বাদ পেলে আরো দু'জনেই সুখী হতে পারব।' জ্যাকেটের পকেট থেকে সে স্টক সার্টিফিকেটগুলো বের করে কেটের সামনের টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দিল। 'আমি ওকে বিবাহের উপহার হিসেবে এক মিলিয়ন ডলার দিলাম। যদিও জানি ওর টাকা পয়সার কোনো দরকার নেই। আমাদের দু'জনেরই শুধু আপনার দোয়া দরকার।'

টেবিলে ছড়ানো স্টক সার্টিফিকেগুলোর দিকে তাকাল কেট, সার্টিফিকেটে লেখা প্রতিটি কোম্পানিই বিখ্যাত। আলেকজান্দ্রা এগিয়ে গেল জর্জের দিকে, তার চোখ ঝকমক করছে 'ওহ্, ডার্লিং।' সে ফিরল তার দাদীমার দিকে, চোখে আকুতি, 'দিদা?'

ওরা দু'জন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, ওদেরকে কেট অস্বীকার করতে পারবে না। এক মুহূর্তের জন্য ওদেরকে ঈর্ষা হলো তার।

'তোমাদের জন্য আমার আশীর্বাদ রইল,' বলল সে।

জর্জ হেসে এগিয়ে গেল কেটের দিকে। তারপর চুম্বন করল তার গণ্ডদেশে।

পরের দুটো ঘণ্টা বিয়ের প্ল্যান করা নিয়ে উত্তেজিত সময় কেটে গেল ওদের। 'আমি ঘটা করে বিয়ে করতে চাই না, দিদা,' বলল আলেকজান্দ্রা। 'তার দরকার নেই, তাই না?'

'হ্যাঁ,' সায় দিল জর্জ। 'ভালোবাসা তো ব্যক্তিগত বিষয়।'

শেষে সিদ্ধান্ত হলো ছোট একটি অনুষ্ঠান হবে, একজন বিচারক ওদের বিয়ে পড়াবেন।

'তোমার বাবা কি আসবেন বিয়েতে?' কেট জিজ্ঞেস করল জর্জকে।

হেসে উঠল জর্জ। 'আমার বাপকে আপনি চাইলেও দূরে ঠেলে রাখতে পারবেন না,

মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। আমার তিন ভাই এবং দুই বোন সবাই আসবে এখানে।'

'আমিও তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাই।'

'ওদেরকে আপনার খুব পছন্দ হবে,' বলল জর্জ।

সন্ধ্যাটি খুব ভালো কাটল কেটের। নাতনীর জন্য রোমাঞ্চ বোধ করছিল সে, খুশি লাগছিল ভেবে অবশেষে এমন একজন পুরুষের দেখা পেয়েছে আলেকজান্দ্রা যে ওকে ভীষণ ভালোবাসে। *ব্রাডকে বলতে হবে জর্জের অর্থনৈতিক বিষয়ে কোনো খোঁজ-খবর নেয়ার প্রয়োজন নেই,* ভাবছিল কেট।

বিদায় নেয়ার আগে জর্জ আলেকজান্দ্রাকে একা পেয়ে বলল, 'এক মিলিয়ন ডলারের জিনিস এভাবে বাড়িতে ফেলে রাখা ঠিক হবে না। আমি ওগুলো নিয়ে যাই। আমার সেফ ডিপোজিট বক্সে রেখে দেব।'

'আচ্ছা,' রাজি হলো আলেকজান্দ্রা।

জর্জ সার্টিফিকেটগুলো গুছিয়ে নিয়ে জ্যাকেটের পকেটে ঢোকাল।

পরদিন সকালে হেলেন থ্যাচারের সঙ্গে আগের দিনের মতোই অভিনয় করল জর্জ। যখন হেলেন নিচে নামছে জর্জের সঙ্গে দেখা করতে ওই সময় জর্জ হেলেনের অফিসে ঢুকে হাপিশ করছে অ্যাকসেস কার্ড। আজ সে হেলেনকে একটি গুচ্চি স্কার্ফ উপহার দিয়ে বলল 'তোমার জন্মদিনের বিলম্বিত উপহার।' দুপুরে একসঙ্গে লাঞ্চ করবে বলল। এবারে ভল্টে ঢুকতে তেমন কসরত করতে হলো না জর্জকে। সে স্টক সার্টিফিকেটগুলো জায়গায় রেখে অ্যাকসেস কার্ডটি ফিরিয়ে দিয়ে হেলেনের সঙ্গে কাছের একটি রেস্টুরেন্টে দেখা করল।

হেলেন জর্জের হাত ধরে বলল, 'জর্জ, চলো না আজ রাতে তুমি আমার বাড়িতে ডিনার করবে।'

জর্জ জবাব দিল, 'তা সম্ভব নয়, হেলেন। কারণ আমি বিয়ে করছি।'

বিয়ের তিনদিন আগে ব্ল্যাকওয়েলদের বাড়িতে বিষাদক্লিষ্ট চেহারা নিয়ে হাজির হলো জর্জ। 'একটা খারাপ খবর আছে,' বলল সে, 'আমার বাবার আবার হার্ট-অ্যাটাক হয়েছে।'

'ওহ, আয়াম সরি,' বলল কেট। 'উনি ঠিক হয়ে যাবেন তো?'

'আমি কাল সাররাত ফোনে আমার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা বলল বাবা হয়তো ধাক্কাটা সামলে উঠতে পারবে কিন্তু বিয়েতে বোধহয় হাজির হতে পারবে না।'

'আমরা হানিমুন করার ফাঁকে এথেন্স ঘুরে আসব। তোমার বাবাকে দেখে আসব,' বলল আলেকজান্দ্রা।

জর্জ ওর গাল নেড়ে দিল। 'আমাদের হানিমুনে অন্য কাউকে আমি জড়াতে চাই না, হানি। শুধু আমরা দু'জন থাকব।'

ব্ল্যাকওয়েল ম্যানসনের ড্রইংরুমে অনুষ্ঠিত হলো বিবাহের অনুষ্ঠান। জনাবারো অতিথি এলেন। এদের মধ্যে আলেকজান্দ্রার সেই তিনজন অফিস কলিগও রয়েছে। আলেকজান্দ্রা তার দাদীকে হাতে পায়ে ধরেছিল ইভকে যেন বিয়েতে দাওয়াত দেয়া হয়। কিন্তু অনড় কেট। 'তোমার বোনের এ বাড়িতে প্রবেশাধিকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।'

আলেকজান্দ্রার চোখে জল এসে গেছে। 'দিদা, এতো নিষ্ঠুর হয়ো না। আমরা দু'জনেই তোমায় ভালোবাসি। ওকে কি তুমি ক্ষমা করে দিতে পার না?'

এক মুহূর্তের জন্য কেটের ইচ্ছে করেছিল ইভের সমস্ত কীর্তি কাহিনী আলেকজান্দ্রাকে বলে দেয়। কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেছে সে। 'আমি যা করছি সকলের ভালোর জন্যেই করছি।

একজন ফটোগ্রাফার বিয়ের ছবি তুলল। কেট শুনল জর্জ ফটোগ্রাফারকে ছবিগুলোর কিছু এক্সট্রা প্রিন্ট করতে বলছে যাতে সে তার পরিবারকে পাঠাতে পারে। *পরিবারের প্রতি কী দরদ ছেলেটির!* ভাবল কেট।

কেক কাটার পরে জর্জ আলেকজান্দ্রার কানে কানে বলল, 'আমি ঘণ্টাখানেকের জন্য একটু অদৃশ্য হয়ে যেতে চাই।'

'কোনো সমস্যা?'

'না। অফিস থেকে মধুচন্দ্রিমার জন্য তড়িঘড়ি ছুটি নিতে পেরেছি আমি এই শর্তে যে ওদের কিছু জরুরি কাজ শেষ করে দিয়ে যাব। আমার বেশি দেরি হবে না। আমাদের প্লেন তো পাঁচটার আগে ছাড়ছে না।'

হাসল আলেকজান্দ্রা। 'জলদি ফিরবে। তোমাকে ছাড়া আমি হানিমুনে যেতে চাই না।'

জর্জ ইভের অ্যাপার্টমেন্টে এসে দেখে সে পাতলা একটা নেগলিজি পরে তার জন্য অপেক্ষা করছে। 'বিয়েটা কেমন হলো, ডার্লিং?'

'ভালো। ছোট অনুষ্ঠান তবে সুন্দর। কোনো ঝামেলা হয়নি।'

'কেন ঝামেলা হয়নি জানো, জর্জ? আমার কারণে। এ কথা কখনও ভুলে যেয়ো না।'

ইভের দিকে তাকিয়ে ধীর গলায় জর্জ বলল, 'ভুলব না।'

'শত হলেও এখন আমরা পার্টনার।'

'তাতো বটেই।'

হাসল ইভ। 'তাহলে আমার ছোট বোনটিকে বিয়ে করে ফেললে তুমি।'

ঘড়ি দেখল জর্জ। 'হুঁ। এখন চলি। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'এখনি কোথাও যাওয়া যাবে না।'

'কেন?'

'কারণ আগে তুমি আমার সঙ্গে প্রেম করবে, ডার্লিং। আই ওয়ান্ট টু ফাক মাই সিস্টার'স হাসবেন্ড।'

আটান্ন

কোথায় ওরা হানিমুনে যাবে সেটা ঠিক করে দিল ইভ। এতে খরচ পড়বে অনেক কিন্তু সে জর্জকে বলল, 'তোমার কিপটেমি করলে চলবে না।'

প্রেমকাতর এক লোকের কাছ থেকে পাওয়া তিনটে গহনা বিক্রি করে সে জর্জকে দিল। জর্জ একটু দোনামোনা করে টাকাটা নিল।

চমৎকার হানিমুন করল ওরা। জ্যামাইকার উত্তরাংশে মন্টেগো বে-র রাউন্ড হিলে উঠল জর্জ এবং আলেকজান্দ্রা। হোটেলের লবিটা একটি ছোট্ট সাদা ভবন, দুই ডজন সুদৃশ্য বাংলোর মাঝখানে অবস্থিত। লবিটির বিস্তৃতি ঘটেছে পাহাড়ের দিকে তারপরই নীল ঝলমলে সাগর। জর্জ একটি ছোট বোট ভাড়া করে সাগরে ঘুরে বেড়াল, মাছ ধরল। ওরা একসঙ্গে সাঁতার কাটল, বই পড়ল, খেলল ব্যাকগেম এবং প্রেম করল। বিছানায় জর্জকে আনন্দ দিতে আলেকজান্দ্রা চেষ্টার ত্রুটি করল না এবং জর্জ যখন যৌন মিলনের চূড়ান্তে এসে গোঙাতে লাগল, আলেকজান্দ্রা রোমাঞ্চিত হয়ে ভাবল সে তার স্বামীকে অনেক সুখ দিতে পেরেছে।

পঞ্চম দিনে জর্জ বলল, 'অ্যালেক্স, আমাকে একটু কিংস্টন যেতে হবে অফিসের কাজে। ফার্মের একটি শাখা অফিস আছে ওখানে। আমাকে একটু খোঁজ-খবর নিতে বলল।'

'বেশতো,' বলল আলেকজান্দ্রা। 'আমিও তোমার সঙ্গে যাই।'

কপালে ভাঁজ ফেলল জর্জ। 'তোমানে নিয়ে যেতে পারলে খুশিই হতাম, ডার্লিং। কিন্তু আমি বিদেশ থেকে একটা ফোন আশা করছি। তুমি ঘরে থাকো। ফোনটা এলে ধরবে।'

হতাশ হলো আলেকজান্দ্রা। 'ডেস্কের লোকজন রিসিভ করলে হয় না?'

'খুব জরুরি ফোন। তাই ওদের ওপর ভরসা রাখতে পারছি না।'

'ঠিক আছে। তাহলে আমি থাকছি।'

জর্জ গাড়ি ভাড়া করে কিংস্টন যাত্রা করল। সন্ধ্যা নাগাদ সে পৌঁছাল গন্তব্যে। রাজধানী শহরটির রাস্তাঘাটে গিজগিজ করছে রঙবেরঙের জামাকাপড় পরা ট্যুরিস্টের দল। এরা এসেছে ক্রুইজ শিপ থেকে, স্ট্র মার্কেট আর ছোট বাজারগুলোতে তারা শপিং করছে। কিংস্টন বাণিজ্যিক শহর, এখানে প্রচুর পরিমাণে রিফাইনারি, ওয়্যারহাউজ এবং

ফিশারিজ রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে দেখার মতো চমৎকার একটি জেটি, পুরনো সুন্দর সুন্দর ভবন, জাদুঘর এবং পাঠাগার।

তবে এসবের কোনোকিছুর প্রতিই আগ্রহ নেই জর্জের। তার ভেতরে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে যে তীব্র খিদেটা জেগে উঠেছে, সে খিদে মেটানোর জন্য সে মরিয়া হয়ে উঠেছে। প্রথম যে বারটি চোখে পড়ল ওখানে ঢুকল জর্জ। কথা বলল বারটেন্ডারের সঙ্গে। পাঁচ মিনিট পরে একটি সস্তা হোটেলে পনেরো বছরের এক পতিতাকে নিয়ে উঠে গেল জর্জ। মেয়েটির সঙ্গে দুই ঘণ্টা সময় কাটাল সে। তারপর একা বেরিয়ে এল হোটেল থেকে, গাড়ি নিয়ে সোজা মন্টেগো বে-তে চলে এলে আলেকজান্দ্রা জানাল জর্জের প্রত্যাশিত জরুরি ফোনকলটি এখনও আসেনি।

পরদিন সকালে কিংস্টন খবরের কাগজে ছাপা হলো এক ট্যুরিস্ট এক পতিতার সঙ্গে মিলিত হয়ে তাকে প্রায় মেরে ফেলার জোগাড় করেছিল।

আলেকজান্দ্রা এবং জর্জ মধুচন্দ্রিমা শেষ করে ফিরে আসার পরে কেট তাদেরকে বলল, 'তোমরা আমার সঙ্গে এসে থাকো। এত বড় বাড়িটা প্রায় খালিই পড়ে আছে।

'তোমরা–'

বাধা দিল জর্জ। 'অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমি আর অ্যালেক্স নিজেদের বাসাতেই থাকতে চাই।'

যে বুড়ি সবসময় তাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করবে তার সঙ্গে একই ছাদের নিচে বসবাস করার কোনোই ইচ্ছে নেই জর্জের।

'ঠিক আছে,' বলল কেট। 'তাহলে তোমাদেরকে একটি বাড়ি কিনে দিই। ওটা তোমাদের জন্য হবে আমার বিয়ের উপহার।'

জর্জ কেটকে আলিঙ্গন করল। 'দ্যাটস ভেরি জেনারাস অব ইউ।' আবেগে তার কণ্ঠস্বর কর্কশ শোনাল। 'আমি এবং অ্যালেক্স সকৃতজ্ঞচিত্তে এ উপহার গ্রহণ করব।'

'ধন্যবাদ, দিদা,' বলল আলেকজান্দ্রা। 'কাছেপিঠেই কোনো বাড়ি আমরা খুঁজে নেব। খুব বেশি দূরে যাব না।'

'ঠিক বলেছ,' সায় দিল জর্জ। 'দিদা, তোমার কাছাকাছি আমরা সবসময় থাকতে চাই তোমাকে চোখে চোখে রাখার জন্য। কারণ তুমি জানো তুমি খুবই সুন্দরী এক মহিলা।'

এক সপ্তাহের মধ্যে ওরা ব্ল্যাকওয়েল ম্যানসন থেকে বারো ব্লক দূরে, পার্কের কাছে একটি পুরনো কিন্তু ভারী সুন্দর পাথরের বাড়ি খুঁজে পেল। পিঙ্গল বেলেপাথরের তৈরি তিনতলা বাড়িটিতে রয়েছে একটি মাস্টার বেডরুম, দুটি গেস্ট বেডরুম, সার্ভেন্টস কোয়ার্টার, প্রকাণ্ড একটি রান্নাঘর, কাঠের প্যানেল করা ডাইনিং রুম, অভিজাত চেহারার একটি লিভিংরুম এবং একটি লাইব্রেরি।'

'বাড়ি সাজানোর ভার তোমার ওপরেই দিলাম, ডার্লিং' জর্জ বলল আলেকজান্ড্রাকে। 'আমি ক্লায়েন্টদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকব।'

তবে সত্য হলো প্রায় বেশিরভাগ সময়ই জর্জ অফিসে থাকে না এবং তার ক্লায়েন্টদেরকে খুব কমই সময় দেয়। তার চাকরিটি অনেক আগেই চলে যেত, যায়নি শুধু হ্যানসন অ্যান্ড হ্যানসনের সিনিয়র পার্টনারদের কারণে। তারা একবার আলোচনায় বসেছিলেন জর্জ মেলিসকে চাকরিচ্যুত করবেন বলে। কিন্তু পরে একজন পার্টনার আশা প্রকাশ করেন যেহেতু জর্জ ব্ল্যাকওয়েল পরিবারে বিয়ে করেছে কাজেই ওরা হয়তো একদিন হ্যানসন অ্যান্ড হ্যানসনে বিনিয়োগ করতে পারে। তখন সিদ্ধান্ত নেয়া হয় কর্তব্যকর্মে গাফিলতি করা সত্ত্বেও জর্জকে চাকরিতে বহাল রাখা হবে।

জর্জ মেলিস ব্যস্ত থাকে তার বিকৃত যৌনক্ষুধা নিরসনে। পুলিশ প্রায়ই পুরুষ এবং মহিলা বেশ্যাসহ একাকী বসবাস করা মহিলাদের কাছ থেকে হামলার শিকার হওয়ার অভিযোগ পাচ্ছিল। এদের সকলের বক্তব্য একরকম সিঙ্গল কোনো বার-এ তারা স্ফূর্তি করতে কিংবা খদ্দেরের খোঁজে গিয়েছিল তখন অত্যন্ত সুদর্শন, বিদেশী এক লোক তাদেরকে তার সঙ্গে সময় কাটাতে প্রলোভিত করে কিংবা প্রস্তাব দেয়। আর তারপর তারা ভয়ংকর যৌন নির্যাতনের শিকার হয়।

ইভ এবং জর্জ ডাউন টাউনের ছোট একটি রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করছিল। এখানে ওদেরকে কেউ চিনে ফেলার ভয় নেই।

'কেটকে না জানিয়ে অ্যালেক্সকে দিয়ে তুমি একটি নতুন উইল করাবে।'

'সেটা কী করে সম্ভব?'

'কীভাবে সম্ভব তা তোমাকে আমি বলছি, ডার্লিং।'

পরদিন সন্ধ্যায় জর্জ এবং আলেকজান্ড্রা ডিনার খেতে গেল নিউইয়র্কের অন্যতম সেরা ফরাসী রেস্তোরাঁ লা প্লেসে। ত্রিশ মিনিট দেরি করে ফেলল জর্জ আসতে।

রেস্তোরাঁ মালিক পিয়েরে জুখদান জর্জকে নিয়ে গেল আলেকজান্ড্রার কাছে। সে টেবিলে বসে অপেক্ষা করছিল।

'মাফ করো, অ্যালেক্স,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল জর্জ। 'আমি আমার উকিলের কাছে গিয়েছিলাম। আর তুমি তো জানো এরা কী রকম হয়। সব কিছুতেই প্যাঁচ কষিয়ে রাখে।'

আলেকজান্ড্রা জানতে চাইল, 'কোনো সমস্যা হয়েছে, জর্জ?'

'না। আমি আমার উইলটা শুধু বদলালাম।' জর্জ স্ত্রীর হাত ধরল। 'আমার যদি কিছু হয়ে যায়, আমার যা কিছু আছে এখন থেকে সব তোমার হলো।'

'ডার্লিং, আমার কিছু দরকার নেই–'

'ব্ল্যাকওয়েলদের অগাধ সম্পত্তির তুলনায় আমার ওটা কিছুই না। তবে তুমি খুব

আরাম আয়েশে জীবন কাটাতে পারবে।'

'তোমার কখনও কোনো বিপদ হবে না। কোনোদিন না।'

'বিপদ আপদের কথা কে বলতে পারে? তাই আগেই এজন্য প্রস্তুত থাকা উচিত, তাই না?'

একটু চিন্তা করে আলেকজান্দ্রা বলল, 'তাহলে আমার উইলটাও বদলে ফেলব।'

'কেন?' বিস্মিত শোনাল জর্জের কণ্ঠ।

'কারণ তুমি আমার স্বামী। আমার সবকিছুই তো তোমার।'

আলেকজান্দ্রার হাতটা ছেড়ে দিল জর্জ। 'অ্যালেক্স তোমার টাকা পয়সার প্রতি আমার কোনো লোভ নেই।'

'সে আমি জানি, জর্জ, তবে ঠিকই বলেছ তুমি। কখন কী বিপদ ঘটে যায় বলা যায় না। তাই আগেই প্রস্তুত থাকা উচিত।' তার চোখে জল। 'জানি বোকার মতো শোনাচ্ছে কথাটা তবু আমাদের কারও কিছু হয়ে গেলে সেটা আমি সইতে পারব না। আমি চাই আমাদের জীবনটা যেন সারাজীবন এভাবে হেসেখেলে চলে যায়।'

'নিশ্চয় যাবে,' বিড়বিড় করল জর্জ।

'আমি আমার উইল বদলানোর ব্যাপারে কাল ব্রাড রজার্সের সঙ্গে কথা বলব।'

কাঁধ ঝাঁকাল জর্জ। সে তোমার ইচ্ছে। তারপর একটু চিন্তা করার ভান করে যোগ করল, 'তবে আমি বলি কী, আমার লইয়ারকে দিয়ে তোমার উইলটা বদলালে ভালো হবে। সে আমার বিষয়-সম্পত্তি সম্পর্কে সবই জানে। সে সবকিছুর চমৎকার সমন্বয় করতে পারবে।'

'ঠিক আছে। তবে দিদা–'

আলেকজান্দ্রার গালে আদর করে হাত বুলাল জর্জ।

'দিদাকে এর মধ্যে টানাটানি না করাই ভালো। তাঁকে আমি খুবই পছন্দ করি। তবে আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ের মধ্যে তাঁকে জড়ানো কি ঠিক হবে?'

'তুমি ঠিকই বলেছ, ডার্লিং। আমি এ ব্যাপারে দিদাকে কিছুই বলব না। তুমি তোমার উকিলের সঙ্গে কাল আমার সাক্ষাত করিয়ে দিতে পারবে?'

'কাল কথাটা মনে করিয়ে দিও। এখন আমার খিদেয় পেট জ্বলছে। চলো, কাঁকড়াটা দিয়েই শুরু করি...

এক সপ্তাহ পরে জর্জ ইভের সঙ্গে তার অ্যাপার্টমেন্টে দেখা করল।

'অ্যালেক্স কি নতুন উইলে সই করেছে?' জানতে চাইল ইভ।

'আজ সকালে। আসছে ২৩তম জন্মদিনে সে তার কোম্পানির শেয়ার পেয়ে যাবে।'

পরের সপ্তাহে কোম্পানির ৪৯ ভাগ শেয়ারের মালিকানা হস্তান্তর করা হলো আলেকজান্দ্রার নামে। জর্জ ইভকে ফোন করে খবরটা দিল। ইভ বলল, 'চমৎকার।

রাতে চলে এসো আমার বাসায়। আমরা সেলিব্রেট করব।'

'পারব না। অ্যালেক্সের জন্মদিন উপলক্ষে পার্টি দিচ্ছে কেট।'

'আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। তোমাকে আসতেই হবে।'

বলে লাইন কেটে দিল ইভ।

মাগী গোল্লায় যাক! এ প্রান্তে ফোন রাখতে রাখতে মনে মনে গালাগাল দিল জর্জ। কিন্তু ইভ যখন তাকে হুকুম করেছে তাকে তো যেতেই হবে। যদিও তার জরুরি কাজ ছিল এক ক্লায়েন্টের সঙ্গে। এর আগেও ওকে একবার বসিয়ে রেখেছে জর্জ। আজও এর সঙ্গে দেখা করা হবে না। কিন্তু জন্মদিনের পার্টি থেকে কীভাবে কাট দেয়া যায়?

একটা বুদ্ধি মাথায় এল ওর।

দরজা খুলে দিল ইভ। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে জর্জ। 'তুমি তাহলে আসতে পারলে?' বলল ইভ। 'কীভাবে ম্যানেজ করেছ?'

'অ্যালেক্সকে বলে এসেছি শীঘ্রি ফিরব। বলেছি আমার এক নির্বোধ পার্টনার সিঙ্গাপুরে রওনা হয়েছে। কিন্তু সে কিছু জরুরি কাগজপত্র ফেলে রেখে গেছে অফিসে। ওগুলো তাকে পৌঁছে দিতে আমাকে এক্ষুনি এয়ারপোর্ট দৌড়াতে হবে। অ্যালেক্সকে অনেক কষ্টে ম্যানেজ করেছি। কাজেই বেশিক্ষণ তোমাকে সঙ্গ দিতে পারব না।'

জর্জের হাত ধরল ইভ। 'এসো, ডার্লিং। তোমার জন্য একটি সারপ্রাইজ আছে।' ছোট ডাইনিং রুমে ঢুকল সে জর্জকে নিয়ে। দু'জনের জন্য সাজানো হয়েছে টেবিল, রূপোলি-সাদা রঙের টেবিল ক্লথ মাঝখানে শোভা পাচ্ছে কতগুলো আলোকিত মোমবাতি।

'এসব কীসের জন্য?'

'আজ আমার জন্মদিন, জর্জ।'

'সে বুঝতে পারছি।' স্খলিত গলায় বলল জর্জ। 'কিন্তু–কিন্তু তোমার জন্য তো কোনো উপহার আনা হলো না।'

জর্জের গালে হাত বুলাল ইভ। 'উপহার তুমি এনেছ, লাভ। ওটা তুমি আমাকে পরে দেবে। বসো।'

'ধন্যবাদ,' বলল জর্জ। 'তবে আমি কিন্তু কিছু খেতে পারব না। একটু আগেই পেট ভরে খেয়ে এসেছি।'

'বসো' ইভের গলার স্বরে কোনো পরিবর্তন নেই।

জর্জ ওর চোখের দিকে একবার তাকাল তারপর বসে পড়ল।

ইভ ডিনারের আয়োজন করেছে Coc&uille sint-jacquer. Cheteaubrid, বিন লেটুস সালাদ, Brie, Cappuccino এবং নিওপলিস্টান আইসক্রিমসহ একটি বার্থ ডে কেক। ঠিক একই খাবারের আয়োজন করেছিল আলেকজান্দ্রা। ইভ জর্জকে ফোন করে জেনে নিয়েছিল তার বোনের জন্মদিনে কী কী খাবার পরিবেশন করা হয়েছে।

একই জিনিস সে-ও নিজের জন্মদিনে জোগাড় করেছে।

ইভ জর্জের সামনা-সামনি বসেছে, দেখছে অনিচ্ছাসত্ত্বেও খাবার খাচ্ছে জর্জ। 'অ্যালেক্স এবং আমি সবসময় সবকিছু একসঙ্গে শেয়ার করে এসেছি,' বলল ইভ। 'আজ রাতেও তার বার্থডে ডিনার আমি শেয়ার করছি। তবে আগামী বছর আমাদের মধ্যে মাত্র একজন তার জন্মদিনের পার্টি উপভোগ করবে। সে সময় সমাগত, ডার্লিং। আমার বোনের অ্যাক্সিডেন্ট করার সময় চলে এসেছে। এ ঘটনার পরে বেচারি দিদা নাতনীর শোকে হয়তো হার্টফেল করেই মারা যাবে। তারপর সবকিছু আমাদের দু'জনের হবে, জর্জ। এখন বেডরুমে চলো। আমাকে আমার জন্মদিনের উপহার দেবে।'

এ মুহূর্তটিকেই ভয় পাচ্ছিল জর্জ। সে একজন শক্তিশালী, সমর্থ পুরুষ অথচ ইভ তার ওপর এমনভাবে কর্তৃত্ব ফলাচ্ছে, নিজেকে পুরুষত্বহীন বলে মনে হয় জর্জের। ইভ ধীরে ধীরে জর্জকে দিয়ে নিজের জামাকাপড় খোলাল। তারপর জর্জকে সে নগ্ন করল এবং দক্ষতার সঙ্গে তাকে উত্তেজিত করে তুলল।

'এবার এসো, ডার্লিং,' জর্জকে নিজের শরীরে প্রবেশ করাল ইভ, মন্থর গতিতে নাড়তে লাগল নিতম্ব। 'আহ্, দারুণ লাগছে.... তোমার বীর্যপাত হয় না, তাই না? বেচারি! কেন হয় না জানো? কারণ তুমি একটা অস্বাভাবিক মানুষ। তুমি মহিলাদেরকে পছন্দ করো না তাই না, জর্জ। তুমি শুধু তাদেরকে ব্যথা দিতে ভালোবাসো। তুমি আমাকেও ব্যথা দিতে চাও, ঠিক না? বলো, আমাকে ব্যথা দিতে চাও কি না।'

'আমি তোমাকে খুন করতে চাই।'

উচ্চস্বরে হেসে উঠল ইভ। 'কিন্তু তুমি আমাকে খুন করতে পারবে না। কারণ আমার মতো তুমিও কোম্পানির মালিক হতে চাও... তুমি আমাকে কখনোই আঘাত করতে পারবে না, জর্জ, কারণ আমার যদি কিছু হয়ে যায়, আমার এক বন্ধুর কাছে একটি চিঠি লিখে রেখেছি, সে ওটা পুলিশের কাছে তুলে দেবে।'

ইভের কথা বিশ্বাস হতে চাইল না জর্জের। 'তুমি ব্লাফ দিচ্ছ।'

জর্জের নগ্ন বুকে লম্বা, ধারালো নখ বসিয়ে দিল ইভ। 'কী, শুনে ভয় খেয়ে গেলে?' ঠাট্টার সুরে বলল সে। জর্জ অকস্মাৎ উপলব্ধি করল সত্যি বলছে ইভ। এই নারীর কবল থেকে সে জীবনেও মুক্তি পাবে না। সবসময় সে জর্জকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করবে, তাকে তার ক্রীতদাস বানিয়ে রাখবে। একটা শয়তান মহিলার দয়ার ওপরে কাটাতে হবে বাকি জীবন এ ভাবনাটি মোটেই সুখকর নয়। সেইসময় জর্জের ভেতরে কিছু একটার বিস্ফোরণ ঘটল। তার চোখের ওপর যেন নেমে এল লাল একটা পর্দা, তারপর সে যে কাণ্ড করল তাতে নিজের ওপর আর নিয়ন্ত্রণ রইল না। জানেও না সে কী করছে। যেন কেউ তাকে বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণ করছিল সবকিছু যেন ঘটল স্লো মোশনে। তার শুধু মনে পড়ে সে ধাক্কা মেরে উপুড় করে ফেলেছিল ইভকে, তার নিতম্ব জোড়া হাত দিয়ে টেনে ফাঁক করে ফেলেছিল এবং ব্যথায় চিৎকার দিয়ে উঠেছিল ইভ। মনে পড়ে সে বারবার কিছু একটাতে প্রবল ধাক্কা মারছিল এবং তাতে তার প্রবল সুখবোধ হচ্ছিল।

একের পর এক তার বীর্যপাত ঘটে চলছিল এবং সে তীব্র সুখের আতিশয্যে আত্মহারা হয়ে ভাবছিল *'ওহ্ গড! আমি এ মুহূর্তটির জন্য কতদিন ধরে অপেক্ষা করেছিলাম।* জর্জ শুনতে পাচ্ছিল দূরে কেউ যেন চিৎকার করছে, আর্তনাদ করছে ব্যথায়, গোঙাচ্ছে। চোখের সামনে লাল পর্দাটা আস্তে আস্তে সরে গেল, নিচের দিকে তাকাল জর্জ। বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে ইভ। সারা গায়ে রক্ত। তার নাকটা ভাঙা, সারা গায়ে অসংখ্য ক্ষতের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকার দগদগে ঘা, চোখ দুটির পাতা ফুলে ঢোল হয়ে ঢেকে ফেলেছে মনি। ইভের চোয়াল ভেঙে চুরচুর হয়ে গেছে, অল্প হাঁ করা মুখ দিয়ে গোঙানি বেরিয়ে আসছে। 'স্টপ ইট, স্টপ ইট, স্টপ ইট...'

নিজের মাথায় জোরে ঝাঁকি দিল জর্জ আচ্ছন্ন ভাবটা দূর করতে। বাস্তব অবস্থাটা অনুধাবন করা মাত্র প্রচণ্ড ভয়ে তার শরীর অবশ হয়ে এল। যে কাণ্ড সে ঘটিয়েছে তার কোনো ব্যাখ্যাই সে দিতে পারবে না। সবকিছুর বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে সে। সবকিছু।

ইভের ওপর ঝুঁকল জর্জ। 'ইভ?'

ফোলা চোখ মেলে তাকাল ইভ। 'ডাক্তার... একজন... ডাক্তার ডাকো... প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করতে তার জান বেরিয়ে গেল। 'হার্লি... জন হার্লিকে... খবর.... দাও...

উনষাট

জর্জ মেলিস ফোনে শুধু বলতে পারল, 'আপনি এখুনি একবার আসতে পারবেন? ইভ ব্ল্যাকওয়েল অ্যাক্সিডেন্ট করেছে।'

ডা. জন হার্লি সাথে সাথে চলে এল ইভের বাসায়। ইভ, রক্তে মাখামাখি বিছানা আর দেয়ালে এক পলক তাকিয়ে সে গুঙিয়ে উঠল, 'ওহ্, মাই গড!' ইভের নাড়ি পরীক্ষা করল। তারপর জর্জের দিকে ফিরে বলল, 'পুলিশে খবর দাও। বলো আমাদের একটা অ্যাম্বুলেন্স লাগবে।'

ভয়াবহ ব্যথার কুয়াশার মাঝে থেকে আচ্ছন্নের গলায় ডাকল ইভ, 'জন...

জন হার্লি তার ওপর ঝুঁকল। 'তুমি ঠিক হয়ে যাবে। আমরা তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাব।'

ইভ হাত বাড়িয়ে অন্ধের মতো হাতড়ে খুঁজে নিল জনের হাত। 'পুলিশ ডেকো না...

'এ ঘটনা তো পুলিশকে জানাতেই হবে। আমি–'

জনের হাতে চাপ বাড়ল। 'না... পুলিশ...'

ইভের থেতলে যাওয়া চোখের নিচের অংশ ভাঙা চোয়াল আর শরীর জুড়ে সিগারেটের ক্ষতে চোখ বুলিয়ে জন হার্লি বলল, 'কথা বোলো না।'

অসহ্য, ভয়াবহ যন্ত্রণা সয়েও টেনে টেনে ইভ বলল, 'প্লিজ.. প্রাইভেট... দিদা আমাকে.... কোনোদিন ক্ষমা...করবে না... পুলিশ... গাড়িতে... অ্যাক্সিডেন্ট...

এখন তর্ক করার সময় নয়। ডা. হার্লি টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেল। ডায়াল করল। 'ডা. হার্লি বলছি, 'সে' ইভের বাড়ির ঠিকানা দিল। 'এক্ষুনি এখানে একটা অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে দিন। ডা. কিথ ওয়েবস্টারকে বলুন আমার সঙ্গে যেন হাসপাতালে দেখা করে। বলবেন ইমার্জেন্সি। সার্জারীর জন্য রুম প্রস্তুত রাখুন।' সে ও প্রান্তের কথা একটু শুনে বলল, এটা একটা কার অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনা। তারপর ঠকাশ করে নামিয়ে রাখল রিসিভার।

'ধন্যবাদ, ডক্টর.' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জর্জ।

ডা. হার্লি আলেকজান্দ্রার স্বামীর দিকে তাকাল। লোকটার চোখে ঘৃণা, দেখে বোঝা যায় তাড়াহুড়ো করে সে পোশাক পরেছে, তার আঙুলের গাঁটে রক্ত জমে আছে, মুখ এবং হাতে রক্ত। 'আমাকে ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নেই। আমি ব্ল্যাকওয়েলদের জন্য এটা করছি। তবে একটা শর্ত আছে– তোমাকে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে হবে।'

'তা কেন–'

'সেক্ষেত্রে আমি পুলিশে ফোন করব, হারামজাদা। তোমাকে স্বাধীনভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেয়া মোটেই উচিত হবে না।' আবার টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল ডাক্তার।

'দাঁড়ান! দাঁড়ান!' জর্জ দাঁড়িয়ে দ্রুত চিন্তা করছিল। সবকিছু ভজকট হতে চলেছিল, অলৌকিকভাবে দ্বিতীয় একটা সুযোগ সে পেয়ে গেছে। 'ঠিক আছে। আমি সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাব।'

দূর থেকে ভেসে এল সাইরেনের আওয়াজ।

অ্যাম্বুলেন্সে তোলার আগে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল ইভ। ওকে হাসপাতালে নিয়ে আসার পরে জ্ঞান ফিরে পেল। দেখল ও একটি সাদা ধবধবে ঘরে, অপারেটিং টেবিলের ওপর শুয়ে আছে।

বেঁটেখাটো, রোগাপাতলা এক লোক, পরনে সবুজ সার্জিক্যাল গাউন, ঝুঁকে আছে তার ওপর। 'আমার নাম কিথ ওয়েবস্টার। আমি আপনার অপারেশন করব।'

'আমি কুৎসিত হতে চাই না,' ফিসফিস করল ইভ।

কথা বলতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। 'আমাকে কুৎসিত হতে... দেবেন না।'

'ও নিয়ে একদম ভাববেন না।' বলল ডা. ওয়েবস্টার। 'আপনাকে এখন ঘুম পাড়িয়ে দেব। জাস্ট রিল্যাক্স।'

অ্যানেসথেসিওলজিস্টকে সে ইশারা করল।

ইভের বাথরুমে ঢুকে গায়ের রক্ত ধুয়ে মুছে মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে নিল জর্জ। তবে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মনে মনে গাল দিল নিজেকে। রাত তিনটা বাজে। আশা করল এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে আলেকজান্দ্রা কিন্তু বাড়ি পৌঁছে লিভিংরুমে এসে দেখে তার জন্য অপেক্ষা করছে মেয়েটা।

'ডার্লিং! তোমার জন্য যা চিন্তা হচ্ছিল! তুমি ঠিক আছ তো?'

'আমি ঠিক আছি, অ্যালেক্স।'

আলেকজান্দ্রা ওকে জড়িয়ে ধরল। 'পুলিশে ফোন করব ভাবছিলাম। ভয় পাচ্ছিলাম খারপ কিছু ঘটল কিনা।'

ঠিকই অনুমান করেছ তুমি, মনে মনে বলল জর্জ।

'তুমি লোকটাকে কাগজপত্রগুলো দিয়ে এসেছ?'

'কাগজপত্র?' হঠাৎ মনে পড়ে গেল। 'ওহ্, ওগুলো। হ্যাঁ, দিয়ে এসেছি।'

'এত দেরি হলো কেন ফিরতে?'

'লোকটার প্লেন ছাড়তে দেরি হচ্ছিল,' দ্রুত বলল জর্জ, 'আমাকে ছাড়তে চাইছিল না। আমি ভাবছিলাম লোকটা যে কোনো সময় বিদায় নেবে। এরকম করতে করতে অনেক দেরি হয়ে গেল। শেষে তোমাকে আর ফোন করা হলো না। আয়াম সরি।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

ইভের কথা মনে পড়ছে জর্জের। যদি ইভ মারা যেত তাহলে কী হতো? খুনের দায়ে ওকে গ্রেপ্তার করত পুলিশ। ইভ বেঁচে থাকলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। সব আবার আগের মতো হয়ে উঠবে। ইভ ওকে ক্ষমা করে দেবে কারণ ওকে ইভের খুব দরকার।

সে রাতে আর দুচোখের পাতা এক করতে পারল না জর্জ। ইভ কীভাবে কান্নাকাটি করছিল আর দয়া ভিক্ষা চাইছিল, চোখের সামনে সে দৃশ্যটি ভেসে উঠছে বারবার। ও যেন টের পেল ওর প্রচণ্ড মুষ্ঠাঘাতে বিশ্রী শব্দে ভেঙে গেছে ইভের চোয়ালের হাড়, ওর গায়ে ঠেসে ধরা সিগারেটের আগুনে মাংস পোড়া গন্ধ আসছে নাকে এবং ঠিক সেই সময় ভীষণভাবে ওকে রমণ করে চলেছে জর্জ।

জন হার্লির মহাভাগ্য বলতে হবে, ঠিক কাজের সময়টিতে সে কিথ ওয়েবস্টারকে পেয়েছিল ইভের চিকিৎসার জন্য। ডা. ওয়েবস্টার বিশ্বের সবচেয়ে খ্যাতিমান প্লাস্টিক সার্জনদের একজন। পার্ক এভিন্যুতে সে প্রাইভেট প্রাকটিস করে, লোয়ার ম্যানহাটনে রয়েছে তার নিজস্ব ক্লিনিক। জন্মগতভাবে বিকৃত চেহারার মানুষদেরকে সে স্বাভাবিক চেহারায় ফিরিয়ে আনার বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। ডা. ওয়েবস্টার অ্যাক্সিডেন্টের অনেক কেস নিয়েছে তবে ইভ ব্ল্যাকওয়েলের ভয়ানক রকম থেতলে যাওয়া, ভাঙাচোরা মুখ দেখে সে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। ইভের ছবি দেখেছে সে পত্রিকায়। অনিন্দ্য সুন্দর মুখশ্রী। সেই অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটির এহেন দশা দেখে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল ওয়েবস্টারের।

'এ অবস্থার জন্য দায়ী কে, জন?'

'এটা একটা হিট অ্যান্ড রান অ্যাক্সিডেন্ট, কিথ।'

নাক দিয়ে ঘোঁত জাতীয় শব্দ করল ওয়েবস্টার। 'তুমি বলতে চাইছ যে গাড়ির ড্রাইভার ওকে গাড়ি চাপা দেয়ার পরে গাড়ি থামিয়ে জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে মিস ইভের পাছায় ছ্যাঁকা দিয়েছে?'

'এ বিষয়টি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে পারব না। তুমি ওর চেহারাটা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারবে?'

'আমার কাজই তো সেটা, জন, মানুষের কদর্য চেহারা সুন্দর করে তোলা।'

দুপুর নাগাদ ডা. ওয়েবস্টার তার সহকারীদেরকে বলল, 'আমাদের কাজ শেষ। ওকে ইনটেনসিভ কেয়ারে নিয়ে যাও। কোনো সমস্যা হলেই আমাকে খবর দেবে।'

অপারেশনটি করতে নয় ঘণ্টা সময় লেগেছে।

আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে ইনটেনসিভ কেয়ার থেকে বের করে নিয়ে আসা হলো ইভকে। জর্জ হাসপাতালে গেল ইভকে দেখতে, তার সঙ্গে কথা বলতে, জানতে যে ইভ তার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক কিছু করার চিন্তা করছে কিনা।

'আমি মিস ব্ল্যাকওয়েলের উকিল,' জর্জ বলল ডিউটিরত নার্সকে। 'উনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। আমি ওনার সঙ্গে অল্পক্ষণ কথা বলব।'

সুদর্শন মানুষটিকে এক নজর দেখে নিয়ে নার্স বলল, 'তার সঙ্গে ভিজিটরদের দেখা করতে দেয়া হচ্ছে না। তবে আপনি যেতে পারেন।'

ইভকে একটি প্রাইভেট রুমে রাখা হয়েছে। বিছানায় পিঠ দিয়ে শুয়ে আছে, ব্যান্ডেজে মোড়া শরীর, গায়ে লাগানো টিউবগুলো অশ্লীল উপাঙ্গের মতো লাগছে দেখতে। তার চোখ আর ঠোঁট কেবল দেখা যাচ্ছে ব্যান্ডেজের ফাঁকে।

'হ্যালো, ইভ...

'জর্জ... খসখসে ফিসফিসে শোনাল ইভের কণ্ঠ। ওর কথা শোনার জন্য সামনে ঝুঁকল জর্জ।

'তুমি.. অ্যালেক্সকে বলোনি তো?'

'প্রশ্নই ওঠে না।' বিছানার ধারে বসল জর্জ। 'আমি এসেছি কারণ–'

'আমি জানি তুমি কেন এসেছ... আমরা... প্ল্যানমাফিক এগিয়ে যাব...

স্বস্তির ফল্গুধারা বইল জর্জের শরীরে। 'আমি এ ঘটনাটির জন্য সত্যি খুব দুঃখিত, ইভ। আমি–'

'কাউকে দিয়ে অ্যালেক্সকে ফোন করাও... বলো আমি বাইরে গেছি... ঘুরতে.. কিছুদিন পরে.. ফিরব...

'আচ্ছা।'

লাল টকটকে দুটো চোখ মেলে জর্জের দিকে তাকাল ইভ।

'জর্জ... আমার একটা ফেভার করো...

'বলো।'

'যন্ত্রণা পেয়ে যেন... তুমি মরো...

ঘুমাচ্ছিল ইভ। ঘুম থেকে জেগে দেখে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ডা. কিথ ওয়েবস্টার।

'এখন কেমন লাগছে?' নরম গলায় জানতে চাইল সে।

'খুব ক্লান্ত লাগছে... আমার.. কী অবস্থা?'

জবাব দিতে ইতস্তত করল ডা. ওয়েবস্টার। এক্স-রে দেখিয়েছে ইভের জাইগোমা ফ্র্যাক্চার হয়েছে। ফলে মুখ খুলতে তার কষ্ট হচ্ছে। তার নাকটা ভেঙেছে, পাঁজরের হাড় ভেঙেছে দুটো, পশ্চাৎদেশ এবং পায়ের প৷তা সিগারেটের আগুনে ক্ষত-বিক্ষত।

ডা. ওয়েবস্টার বলল, 'আপনার চিকবোন ফ্র্যাকচার হয়েছিল। ভেঙে গিয়েছিল নাক। আপনার চোখের ভাঙা হাড় জোড়া লাগানো হয়েছে। আপনার শরীরে সিগারেটের আগুনের ছ্যাঁকার দাগ ছিল তবে সবকিছুই চিকিৎসা করা হয়েছে।'

'আমাকে একটা আয়না দিন,' ফিসফিসিয়ে বলল ইভ।

ইভকে এ মুহূর্তে আয়না দেখতে দেয়াই যাবে না। 'দুঃখিত,' বলল ডাক্তার। 'আমাদের কাছে আয়না নেই।'

পরের প্রশ্নটি ভয়ে ভয়ে করল ইভ। 'আমি–ব্যান্ডেজ খোলার পরে আমাকে দেখতে কেমন লাগবে?'

'দারুণ। অ্যাক্সিডেন্টের আগে আপনার চেহারা যেমন ছিল হুবহু সেরকম।'

'আপনি মিথ্যা বলছেন।'

'ব্যান্ডেজ খোলা হলে নিজেই দেখতে পাবেন। এখন বলুনতো কী হয়েছিল? আমাকে আবার পুলিশ রিপোর্ট লিখতে হবে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল ইভ। তারপর বলল, 'আমি ট্রাক চাপা পড়েছিলাম।'

ডা. কিথের মনে আবার প্রশ্ন জাগল কী করে একজন মানুষ এমন রূপবতী এক নারীর সৌন্দর্য নষ্ট করে দিতে পারে। 'আমাকে নাম লিখতে হবে।' বলল সে।

'কে সে?'

'ম্যাক।'

'পদবী?'

ট্রাক।'

সত্য এড়িয়ে যাওয়ার এ কৌশল আবারও বিস্মিত করল ওয়েবস্টারকে। প্রথমে মিথ্যা কথা বলেছে জন হার্লি এখন বলছে ইভ ব্ল্যাকওয়েল।

'ক্রিমিনাল অ্যাসল্টের ক্ষেত্রে,' ওয়েবস্টার বলল ইভকে, 'আমি আইন অনুযায়ী পুলিশ রিপোর্ট করতে বাধ্য।'

ইভ ডাক্তারের একটা হাত চেপে ধরল জোরে। 'প্লিজ, আমার দাদীমা অথবা বোন যদি ঘটনাটা শোনে ওরা কষ্টেই মারা যাবে। আপনি যদি পুলিশকে বলেন... খবরের কাগজগুলো সবকিছু জেনে ফেলবে। আপনি দয়া করে কাজটা করবেন না....।

'আমি এটাকে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হিসেবে রিপোর্ট করতে পারব না। মহিলারা ন্যাংটো হয়ে রাস্তায় দৌড়ায় না।

'প্লিজ।'

ইভের দিকে তাকিয়ে খুব মায়া লাগল ওয়েবস্টারের। 'আচ্ছা, ধারণা করছি আপনি আপনার বাড়ির দোতলার সিড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলেন।'

ওয়েবস্টারের হাত আরও জোরে চেপে ধরল ইভ। 'জ্বী, জ্বী। ঠিক তা-ই ঘটেছিল।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডাক্তার। 'যা ভেবেছি তা-ই।'

তারপর থেকে ডা. কিথ ওয়েবস্টার প্রতিদিন ইভকে দেখতে আসতে লাগল। মাঝে মাঝে দিনে দুই/তিনবারও আসে। হাসপাতালের গিফট শপ থেকে ফুল এবং ছোট ছোট উপহার কিনে নিয়ে যায়। ইভ প্রতিবারই উদ্বেগ নিয়ে জানতে চায় তার শারীরিক অবস্থা। কিথ তাকে আশ্বস্ত করে বলে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে ইভ। আয়নায় নিজেকে

দেখতে চায় ইভ। কিন্তু কিথ তাকে আয়না দেখতে দেয় না।

ডা. কিথ ওয়েবস্টার ছাড়া আর কেউ আসে না ইভকে দেখতে। ইভ তার প্রতীক্ষায় বসে থাকে। ডাক্তার দেখতে মোটেই সুদর্শন নয়। বেঁটে, রোগা, মাথায় বালুরঙা পাতলা চুল, ছলছলে বাদামী চোখ, ঘনঘন সে চোখের পাতা পড়ে। ইভের সামনে এলেই সে লজ্জায় কেমন গুটিয়ে যায়। ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করে ইভ।

'আপনি বিয়েশাদী করেননি?' একদিন জিজ্ঞেস করল ও।

'না।'

'কেন?'

'আ– ঠিক জানি না। মনে হয় স্বামী হিসেবে খুব ভালো কর্তব্য পালন করতে পারব না। প্রায়ই ইমার্জেন্সি কলে যেতে হয়।'

'কিন্তু আপনার নিশ্চয় কোনো গার্লফ্রেন্ড আছে।'

লজ্জায় লাল টমেটো হয়ে গেল ডাক্তার। 'আ, ইয়ে...

'বলুন না শুনি,' আবদার করল ইভ।

'আমার আসলে কোনো গার্লফ্রেন্ড নেই।'

'নার্সরা নিশ্চয় আপনার ব্যাপারে ক্রেজি।'

'না। আমি ঠিক রোমান্টিক প্রকৃতির নই।'

নার্সরা যখন ইভের শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করে দেখতে আসে, ডাক্তার কিথ ওয়েবস্টারের প্রসঙ্গ উঠলে তারা ভক্তিতে গদগদ হয়ে যায়। তাদের কাছে ডাক্তার দেবতা।

'ওই মানুষটির হাতে অলৌকিক ক্ষমতা আছে,' একজন ইন্টার্নি বলল। 'মানুষের মুখ নিয়ে এমন কিছু নেই যা তিনি করতে পারেন না।'

তবে কিথ ওয়েবস্টার নিজের কাজ নিয়ে কোনো কথাই বলতে চায় না। এতবড় একজন সার্জন অথচ সামান্য অহংকারও নেই। মানুষটাকে দেখতে অবাক লাগে ইভের। এ লোক অর্থ কিংবা যশের জন্য কাজ করে না। তার ভেতরে স্বার্থপরতা ব্যাপারটিই নেই। এমন অদ্ভুত মানুষ জীবনে দেখেনি ইভ। তবে এর ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহ নেই তার। শুধু জানতে আগ্রহ এ লোক তার চেহারাটা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে পারবে কিনা।

হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পনের দিন পরে নিউইয়র্কের একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হলো ইভকে।

'এখানে আপনি আরও বেশি আরামে থাকবেন,' তাকে বলল ওয়েবস্টার।

এতদূরে আসতে ডাক্তারের হয়তো সমস্যা হয় তবু প্রতিদিন সে একবার করে এসে দেখে যায় ইভকে।

'আপনার কি আর কোনো রোগী নেই?' ইভ জানতে চায়।

'আপনার মতো কেউ নেই।'

ক্লিনিকে ভর্তি হওয়ার পাঁচ সপ্তাহ পরে ইভের ব্যান্ডেজ খুলে দিল কিথ ওয়েবস্টার। ওর মাথাটা ডানে-বামে ঘুরিয়ে জানতে চাইল, 'ব্যথা লাগছে?'

'না।'

'আড়ষ্টতা অনুভব করছেন?'

'একদম না।'

ডা. ওয়েবস্টার নার্সকে হুকুম করল, 'মিস ব্ল্যাকওয়েলের জন্য একটি আয়না নিয়ে এসো।'

হঠাৎ ভয় গ্রাস করল ইভকে। দিনের পর দিন সে আয়নায় নিজেকে দেখতে চেয়েছে। এখন সে মুহূর্ত উপস্থিত। আর এখন সে ভয় পাচ্ছে। সে আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখতে চায়, কোনো অচেনা মানুষের মুখ নয়।

ডা. ওয়েবস্টার তার হাতে আয়না দেয়ার পরে, ক্ষীণ গলায় ইভ বলল, 'আমার ভয় লাগছে–'

'আয়নায় নিজেকে দেখুনই না,' মৃদু গলায় বলল ডাক্তার।

ধীরে ধীরে আয়না তুলল ইভ। এ যে অবিশ্বাস্য! একদম কোনো পরিবর্তন নেই, এ তারই মুখ। মুখে ক্ষতচিহ্ন খুঁজল ইভ। নেই। আনন্দে তার চোখে জল এসে গেল।

মুখ তুলে তাকাল সে। 'ধন্যবাদ।' এগিয়ে গেল ডাক্তারকে চুমু খেতে। সংক্ষিপ্ত থ্যাংক ইউ কিস হলেও ইভ টের পেল কিথের ঠোঁট ক্ষুধার্তের মতো তার অধরে চুম্বন করছে।

চুম্বন শেষে কদম পিছাল কিথ ওয়েবস্টার, আকস্মিক বিব্রত। 'আ-আমি আনন্দিত যে আপনি খুশি হয়েছেন।'

শুধু খুশি! 'সবাই ঠিকই বলত। আপনার হাতে অলৌকিক ক্ষমতা আছে,' বলল ইভ।

লাজুক গলায় বলল কিথ। 'না না অলৌকিক ক্ষমতা-টমতা কিছু নেই। লোকের অভ্যাসই সবসময় বাড়িয়ে বলা।'

ষাট

যে অঘটনটা ঘটিয়েছে সেজন্য প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিল জর্জ মেলিস। সে যা চেয়েছিল তা প্রায় ধ্বংস করে দিচ্ছিল। ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেডের মালিক হওয়ার বিষয়টি যে কতটা লোভনীয় আগে উপলব্ধি করতে পারেনি জর্জ। নিঃসঙ্গ নারীদের কাছ থেকে পাওয়া উপহার বিক্রি করে জীবনধারনেই এতদিন সন্তুষ্ট ছিল সে। কিন্তু সে এখন ব্ল্যাকওয়েল পরিবারের জামাতা, তার মুঠোতে রয়েছে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এক কোম্পানি যার কথা তার বাবা কোনোদিন কল্পনাও করেনি। বাপকে সে বিয়েতে আসার দাওয়াত দিয়েছিল। বাপ তার দাওয়াত কবুল দূরে থাক, চিঠির জবাব পর্যন্ত দেয়নি। বাপ তাকে বলেছিল *তোমার চেহারাও আমি কোনোদিন দেখতে চাই না। তুমি আমার কাছে একটা মরা মানুষ, বুঝেছ?* এখন জর্জের ইচ্ছে করছে বাপকে ডেকে বলে, *বাবা, আমি মরা মানুষ নই। তোমার কোম্পানির চেয়ে অনেক বড় একটা কোম্পানির মালিক আমি।* এটা এখন আর খেলা নয়। জর্জ জানে সে যা পেতে চায় তার জন্য হত্যা করতেও দ্বিধা করবে না।

একজন যথার্থ স্বামীর প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠতে আত্মনিয়োগ করেছে জর্জ। বেশিরভাগ সময়টা সে কাটায় আলেকজান্দ্রার সঙ্গে। তারা একসঙ্গে নাশতা করে, আগে বাড়ি ফিরে আসে। সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলো তারা কাটায় লং আইল্যান্ডের ইস্ট হ্যাম্পটনের বীচ হাউজে, কেট ব্ল্যাকওয়েলের সঙ্গে। অথবা কোম্পানির সেসনা ৬২০-এ চড়ে উড়ে চলে যায় ডার্ক হারবারে। ডার্ক হারবারের পুরনো বাড়িটা জর্জের খুব পছন্দ। সে এ বাড়ির সুন্দর সুন্দর অ্যান্টিক আর বহুমূল্য পেইন্টিংগুলোর খুব তারিফ করে। বড় বড় ঘরগুলোতে ঘুরে বেড়ানোর সময় ভাবে শীঘ্রি এসব আমার হবে।

নাতজামাই হিসেবেও যথেষ্ট দায়িত্বশীল জর্জ। কেটের প্রতি তার মনোযোগের অন্ত নেই। কেটের বয়স একাশি চলছে, সে ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেডের চেয়ারম্যান। এ বয়সেও দারুণ চটপটে, শক্তির আধার যেন। জর্জ আলেকজান্দ্রাকে নিয়ে সপ্তাহে একদিন কেটের সঙ্গে অবশ্যই ডিনার করবে আর দু'দিন পরপর ফোনে বৃদ্ধার সাথে কথা বলে। সে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে দায়িত্ববান স্বামী এবং যত্নবান নাতজামাইয়ের একটি ছবি তৈরি করে চলেছে।

কেউ জানে না এমন ভালোবাসার দু'জন মানুষকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে জর্জ মেলিস।

জর্জ মেলিসের সুখের জীবনে ছেদ ঘটাল ডা. জন হার্লির ফোন।

'সাইকিয়াট্রিস্ট ডা. পিটার টেম্পলটনের সঙ্গে তোমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করেছি,' জানাল সে।

গলায় উষ্ণতা ফোটাল জর্জ। 'ওসবের আর দরকার নেই, ডা. হার্লি। আমি মনে করি–'

'তুমি কী মনে করো তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমাদের মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছিল– আমি পুলিশে খবর দেব না এবং তুমি একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে বসবে। তুমি যদি এখন ওই চুক্তিটি ভঙ্গ করতে চাও–'

'না, না।' দ্রুত বলে উঠল জর্জ। 'আপনি যা চাইছেন তা-ই হবে।'

'ডা. টেম্পলটনের ফোন নাম্বার হলো ৫৫৫৩১৬১। সে তোমার ফোনের জন্য অপেক্ষা করবে।' তারপর ঠকাশ করে রিসিভার নামিয়ে রাখল ডাক্তার হার্লি।

হারামজাদা! ডাক্তারকে মনে মনে গাল দিল জর্জ। সে কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে বসে মোটেই সময় নষ্ট করতে চায় না। তবে ডা. হার্লির আদেশ অমান্য করার সাহসও তার নেই। ডা. টেম্পলটনকে তার ফোন করতেই হবে এবং সপ্তাহে দু' একদিন তার সঙ্গে বসতেও হতে পারে।

ইভকে ঘটনাটা জানাল জর্জ। ওর বাসায় এসেছে সে। ইভই ওকে আসতে বলেছে। ইভকে দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস হতে চাইছিল না জর্জের। অবিকল আগের মতোই আছে সে। মুখে কোনো ক্ষত চিহ্নই নেই। ইভ জর্জের কথা শুনে মন্তব্য করল, 'তুমি ওকে বলে দিলেই পারতে যেতে পারবে না। হাতে সময় নেই।'

জর্জ বলল, 'চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে না গেলে ডাক্তার হার্লি ভয় দেখিয়েছে সে ওইদিনের ঘটনা– মানে অ্যাক্সিডেন্টের কথা পুলিশে জানিয়ে দেবে।'

'ধুস্‌শালা!'

দাঁড়িয়েই রইল ইভ। ডুবে গেছে গভীর চিন্তায়। 'কে সে?'

'সাইকিয়াট্রিস্ট কী টেম্পলটন যেন নাম। ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে পিটার টেম্পলটন।

'নাম শুনেছি। বিখ্যাত মানুষ।'

'চিন্তা কোরো না। আমি লোকটার কাউচে মিনিট পঞ্চাশ শুয়েই থাকব শুধু। কিছু বলব না। যদি–'

জর্জের কথা কানে যাচ্ছে না ইভের। একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায় এবং ওটা নিয়েই চিন্তা করছিল সে।

জর্জের দিকে ফিরল ইভ। 'এরচেয়ে ভালো সুযোগ আর হয় না।'

পিটার টেম্পলটনের বয়স মধ্য ত্রিশ, উচ্চতা ছয় ফুটেরও বেশি, দীর্ঘ, প্রশস্ত কাঁধ,

মেদহীন সুঠাম শরীর এবং নীল চোখজোড়া প্রচণ্ড অনুসন্ধানী। ডাক্তার নয়, ফুটবলের কোয়ার্টারব্যাকের মতো তার চেহারা। এ মুহূর্তে সে তার শিডিউলের একটি নোটেশনের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে জর্জ মেলিস– কেট ব্ল্যাকওয়েলের নাতজামাই।

পিটার ধনী মানুষদের চিকিৎসা করে না, শুধু গরীব আর মধ্যবিত্ত ছাড়া। ধনীদের সমস্যাগুলোর সঙ্গে সে একাত্ম হতে পারে না, কারণ তাদের প্রতি তার খুব একটা সহানুভূতি নেই। তবু জর্জ মেলিসকে সে সময় দিয়েছে শুধু ডা. জন হার্লির প্রতি শ্রদ্ধাবোধের কারণে।

খবরের কাগজ এবং পত্রিকায় জর্জ মেলিসের অনেক ছবি দেখেছে ডা. টেম্পলটন। সামনা সামনি তাকে দেখার পর মনে হলো *কারিশমার* নতুন সংজ্ঞা করা যেতে পারে এ লোককে নিয়ে।

ওরা দু'জনে হ্যান্ডশেক করল। পিটার বলল, 'বসুন, মি. মেলিস।'

ডাক্তারের বিপরীতে একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল জর্জ। টেম্পলটনের দিকে তাকিয়ে হাসল।

পিটার তার বিপরীত দিকে বসা লোকটিকে নিরীক্ষণ করছিল। প্রথম যখন কোনো রোগী আসে তার কাছে, নিশ্চিতভাবেই তারা নার্ভাস থাকে। কেউ সাহস দেখিয়ে নার্ভাসনেস চাপা দিতে চায়, কেউ থাকে চুপচাপ, কেউ বেশি কথা বলে কিংবা কেউ নিশ্চুপ হয়ে যায়। কিন্তু সামনে থাকা মানুষটিকে মোটেই নার্ভাস লাগছে না। বরং নিজেকে যেন সে উপভোগ করছে।

ডা. হার্লি বললেন, 'আপনার নাকি কী সমস্যা হয়েছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জর্জ। 'সমস্যা একটা নয়, দুটো।'

'কী সমস্যা শুনি?'

'বলতে লজ্জাই লাগছে। আ-আসলে এ কারণেই আপনার কাছে আমার আগমন।' চেয়ারের সামনে ঝুঁকে এল সে। গলায় আকুতি ফুটিয়ে বলল, 'আমি এমন একটা কাজ করেছি যা আগে কোনোদিন করিনি, ডক্টর। আমি এক মহিলার গায়ে হাত তুলেছি।'

পিটার শুনছে।

'আমাদের মধ্যে ঝগড়া হয়, আমি প্রচণ্ড রেগে যাই, আমার মাথাটা কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। তারপর যখন রাগ পড়ে যায় তখন দেখি আমি... ওকে মেরেছি।' কণ্ঠস্বর সামান্য বিকৃত করে তুলল জর্জ। 'সে এক ভয়ংকর দৃশ্য।'

জর্জ মেলিসের সমস্যাটা কী ধরতে পেরেছে ডা. পিটার টেম্পলটন। এ লোক মহিলাদেরকে পিটিয়ে আনন্দ অনুভব করে।

'আপনার স্ত্রীকে মেরেছেন?'

'আমার জ্যাঠাইসকে মানে আমার ওয়াইফের বড় বোনকে।'

পিটার প্রায়ই সংবাদপত্রে ব্ল্যাকওয়েলদের যমজ বোনদের খবর পড়েছে। এরা চ্যারিটি বা সামাজিক বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে গেলে এদের ছবি ছাপা হয়েছে। পিটারের

মনে পড়ে দুই বোন আইডেন্টিকাল এবং দু'জনেই চোখ ধাঁধানো রূপসী। তাহলে এ লোক তার জ্যাঠাইসের গায়ে হাত তুলেছে। ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং মনে হলো পিটারের কাছে। তার কাছে আরও চিত্তাকর্ষক মনে হবার কারণ জর্জ মেলিস এমনভাবে বলছে যেন সে তার স্ত্রীর বড় বোনকে দু'একটা চড়-থাপ্পর মেরেছে। যদি তা-ই হতো তাহলে জর্জ হার্লি এ লোককে তার কাছে পাঠাত না।

'জ্যাঠাইসকে কি খুব জোরে মেরেছেন?'

'জ্বী। ভীষণ জোরে। বললাম না আমার মাথাটা কেমন আউলা ঝাউলা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা হওয়ার পরে যা ঘটেছে দেখে নিজেরই বিশ্বাস হতে চায়নি।'

'আপনার হঠাৎ অমন রেগে যাওয়ার কারণ?'

'আমি ইদানিং খুব চাপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার বাবা খুব অসুস্থ। বেশ কয়েকবার হার্ট-অ্যাটাক হয়েছে। তাকে নিয়ে খুব চিন্তায় আছি আমি।'

'আপনার বাবা এখানে আছেন?'

'না, তিনি থাকেন গ্রিসে।'

অ, এ তাহলে সেই মেলিস পরিবারের সন্তান। 'আপনি বলেছিলেন আপনার সমস্যা দুটি।'

'জ্বী, আমার স্ত্রী... আলেকজান্দ্রা..' থেমে গেল সে।

'বৈবাহিক সমস্যা?'

'ঠিক তা নয়। আমরা একে অন্যকে খুবই ভালোবাসি। তবে–' একটু ইতস্তত করল জর্জ। 'ইদানিং ঠিক সুস্থ নয় আলেকজান্দ্রা।'

'শারীরিকভাবে?'

'মানসিকভাবে। প্রায়ই হতাশায় ভুগছে। আত্মহত্যার কথা বলছে।'

'কোনো পেশাদারকে দেখান নি?'

ম্লান হাসল জর্জ। 'বলেছিলাম। যেতে চায় না।'

'বিষয়টি নিয়ে ডা. হার্লির সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'না।'

'যেহেতু উনি আপনাদের পরিবারের ডাক্তার কাজেই তার সঙ্গে একবার কথা বলুন। উনি প্রয়োজন বোধ করলে আপনার স্ত্রীকে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে পাঠাবেন।'

নার্ভাস গলায় জর্জ মেলিস বলল, 'না, আমি চাই না অ্যালেকজান্দ্রা জেনে যাক আমি পেছন থেকে সব কলকাঠি নাড়ছি। ডা. হার্লি যদি–'

'ঠিক আছে, মি. মেলিস। আমি ওনাকে ফোন করব।'

'ইভ, ঝামেলা হয়ে গেছে,' খেঁকিয়ে উঠল জর্জ। 'মস্ত ঝামেলা।'

'কী হয়েছে?'

'তোমার কথামতো কাজ করেছি। বলেছি আলেকজান্দ্রাকে নিয়ে খুব চিন্তা আছি।

সে আত্মহত্যার কথা বলছে।'

'তো?'

'হারামজাদা এখন জর্জ হার্লিকে ফোন করে এ নিয়ে কথা বলবে বলেছে।'

'সেরেছে! এটা কিছুতেই হতে দেয়া যাবে না।'

পায়চারি করতে লাগল ইভ। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। 'ঠিক আছে, হার্লিকে আমি সামাল দিচ্ছি। টেম্পলটনের সঙ্গে তোমার আবার কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?'

'আছে।'

'দেখা কোরো।'

পরদিন সকালে ইভ গেল ডা. হার্লির অফিসে তার সঙ্গে দেখা করতে। জন হার্লি ব্ল্যাকওয়েল পরিবারের সদস্যদেরকে খুব পছন্দ করে। সে যমজ দুই বোনকে চোখের সামনে বড় হতে দেখেছে। ইভকে সে দেখামাত্র সোল্লাসে বলে উঠল, 'কিথ ওয়েবস্টার দেখছি দারুণ কাজ দেখিয়েছে। অপারেশনের চিহ্ন বলতে শুধু ইভের কপালে সরু লাল, প্রায় অদৃশ্য একটি দাগ।'

ইভ বলল, 'ডা. ওয়েবস্টার বলেছেন কপালের এ দাগটাও মাসখানেকের মধ্যে তিনি দূর করে দেবেন।'

ডা. হার্লি ইভের বাহুতে চাপড় দিল। 'এ দাগটিতে তোমাকে আরও বেশি সুন্দর লাগছে, ইভ। আমি সত্যি খুব খুশি।' একটা চেয়ার দেখিয়ে ইভকে বসার ইঙ্গিত করল। 'তোমার জন্য কী করতে পারি, বলো?'

'আমি নিজের জন্য আসি নি, জন। এসেছি অ্যালেক্সের বিষয়ে কথা বলতে।'

কপালে ভাঁজ পড়ল হার্লির। 'ওর আবার কী হলো? জর্জকে নিয়ে কোনো সমস্যা?'

'আরে না,' ঝটপট বলল ইভ। 'জর্জ স্বামীর দায়িত্ব খুব ভালোভাবে পালন করছে। আসলে ও-ই অ্যালেক্সকে নিয়ে চিন্তায় আছে। আজকাল অদ্ভুত আচরণ করছে অ্যালেক্স। ভীষণ ডিপ্রেশনে ভুগছে। আত্মহত্যা করার কথা বলছে।'

ডা. হার্লি হালকা গলায় বলল, 'বিশ্বাস হয় না। কারণ আলেকজান্দ্রা তো ওরকম মেয়ে নয়।'

'জানি আমি। সে জন্য আমারও বিশ্বাস হয়নি কথাটা। তাই ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ওর পরিবর্তন দেখে রীতিমতো শকড আমি। ভয়ানক ডিপ্রেশনের মাঝ দিয়ে যাচ্ছে আমার বোন। জনকে নিয়ে এখন আমার চিন্তাই হচ্ছে। দিদার কাছে তো এ বিষয় নিয়ে কথা বলার উপায় নেই তাই তোমার কাছে এসেছি। তুমি কিছু একটা করো।' বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠল তার চোখ। আমি আমার দিদাকে হারিয়েছি। আমার বোনকেও হারাতে পারব না।'

'কবে থেকে এরকম অবস্থা?'

'জানি না। আমি ওকে বলেছিলাম তোমার সঙ্গে যেন কথা বলে। প্রথমে আমার কথা

শুনতে না চাইলেও পরে আমার জেদের কাছে হার মেনেছে। ওকে তোমার সাহায্য করতেই হবে।'

'নিশ্চয় করব। ওকে কাল সকালে আমার এখানে আসতে বলো। আর চিন্তা করো না ইভ। অনেক নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে। ওতে দারুণ কাজ হয়।'

ইভকে অফিসের দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিল ডাক্তার। ভাবল ইভের প্রতি কেটের এতটা নির্দয় হওয়া উচিত হচ্ছে না। মেয়েটা তার বোনের জন্য এত চিন্তা করে!

ইভ নিজের বাসায় ফিরে খুব সাবধানে কোল্ড ক্রিম মেখে কপালের লাল দাগটা ঢেকে ফেলল।

পরদিন সকাল দশটা। ডা. হার্লির রিসেপশনিস্ট ঘোষণা করল, 'মিসেস জর্জ মেলিস আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, ডাক্তার।'

'ওকে পাঠিয়ে দাও।'

মন্থরপায়ে হার্লির অফিসে ঢুকল সে। ম্লান, বিমর্ষ চেহারা, চোখের নিচে গাঢ় কালি।

জন হার্লি তার হাত ধরে বলল, 'তোমাকে দেখে খুব খুশি হলাম, আলেকজান্দ্রা। তোমার কী সমস্যা হয়েছে বলো তো?'

তার কণ্ঠস্বর নিচু। 'তোমাকে খামোকাই বিরক্ত করছি, জন। আমার কিছুই হয়নি। ইভ জোর করে পাঠাল নইলে আমি আসতাম না। আমি শারীরিকভাবে ঠিক আছি।'

'আর মানসিকভাবে?'

একটু ইতস্তত করল সে, 'আমার ভালো ঘুম হয় না।'

'আর কিছু?'

চোখের দৃষ্টি নিচে নামাল মেয়েটা। 'সারাক্ষণ বিষণ্নতায় ভুগতে থাকি। আর খুব ক্লান্ত লাগে। জর্জ আমাকে খুশি করার প্রাণান্ত চেষ্টা করে। নানান জায়গায় নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু কোথাও যেতে ভালো লাগে না আমার। সবকিছু কেমন অর্থহীন মনে হয়।'

ওর প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে ডাক্তার হার্লি।

'আর কিছু'

'আর– আর নিজেকে খুন করে ফেলতে ইচ্ছে করে।' খুবই নিচু গলায় কথা বলছে ও। মুখ তুলে তাকাল। 'আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি?'

মাথা নাড়ল ডাক্তার। 'না, তুমি পাগল হয়ে যাচ্ছ না। তুমি কখনও অ্যানহেডোনিয়ার কথা শুনেছ?'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল ও। শোনেনি।

'এ হলো এক ধরনের বায়োলজিকাল ডিস্টার্বেন্স। এর কারণে তুমি যা বললে সে সকল লক্ষণ তৈরি হয়। এর ওষুধও বেরিয়েছে। সহজেই সুস্থ হয়ে যায় রোগী। এসব ওষুধের কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। আমি তোমাকে পরীক্ষা করে দেখব। যদিও আমার

বিশ্বাস তোমার কিছুই হয়নি।'

পরীক্ষা শেষ হলে ডা. হার্লি বলল, 'তোমাকে ওয়েলবুট্রিন লিখে দিচ্ছি। এটা নতুন ধরনের অ্যান্টি ডিপ্রেশান্ট।'

একটি প্রেসক্রিপশন লিখে দিল সে।

'এক সপ্তাহ পরে আবার এসো। এর মধ্যে যদি কোনো সমস্যা হয় আমাকে ফোন কোরো।' সে ওর হাতে দিল প্রেসক্রিপশন।

'ধন্যবাদ, জন, বলল ও। 'আশা করি এ ওষুধগুলো খেলে আর ওই স্বপ্নটা দেখব না।'

'কী স্বপ্ন?'

'প্রতিরাতেই স্বপ্নটা দেখি আমি। দেখি আমি একটা বোটে, ঝড়ো বাতাস বইছে, সমুদ্র আমাকে ডাকছে। আমি রেইলিং-এর ধারে যাই, তাকাই নিচের দিকে। নিজেকে ওখানে দেখতে পাই আমি। ডুবে যাচ্ছি পানিতে...

ডা. জন হার্লির অফিস থেকে বেরিয়ে এল সে। চলে এল রাস্তায়। একটা ভ[illegible] গায়ে হেলান দিয়ে গভীর দম নিল। *পেরেছি আমি*, মনে মনে বলল উল্লসিত ইভ। *[illegible]কা বানিয়ে এসেছি ডাক্তারকে।* সে প্রেসক্রিপশনটি ছিড়ে উঁড়িয়ে দিল বাতাসে।

একষট্টি

ভীষণ ক্লান্ত লাগছে কেট ব্ল্যাকওয়েলের। অনেকক্ষণ ধরে চলছে মিটিং। সে কনফারেন্স টেবিলে বসা এক্সিকিউটিভ বোর্ডের তিনজন নারী এবং তিনজন পুরুষের দিকে তাকাল। ওদের সবাইকে বেশ তাজা এবং ফুরফুরে দেখাচ্ছে। তার মানে মিটিং বেশিক্ষণ ধরে চলেনি, ভাবল কেট। আমি ভেবেছি অনেকক্ষণ। আসলে বুড়ো হয়ে যাচ্ছি তো। আর ক'দিন পরে বিরাশিতে পা দেব। এ চিন্তাটি হতাশ করে তুলল তাকে। মৃত্যু ভয় নয়, এখনও সে প্রস্তুত নয় বলে। ব্ল্যাকওয়েল পরিবারের কেউ ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেডের দায়িত্ব না নেয়া পর্যন্ত সে মরতে চায় না। ইভের সঙ্গে তিক্ত অভিজ্ঞতার পরে আলেকজান্দ্রাকে নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে চেয়েছিল কেট। কিন্তু আলেকজান্দ্রা বলেছে, 'তোমার জন্য আমি সব করতে রাজি, দিদা, শুধু কোম্পানির সঙ্গে জড়িত হওয়া ছাড়া। এ ব্যাপারে আমার কোনোই আগ্রহ নেই। তবে জর্জ খুব ভালো এক্সিকিউটিভ হতে পারবে...।

'তুমি কি আমাদের সঙ্গে একমত, কেট?' ওকে জিজ্ঞেস করল ব্রাড রজার্স।

স্মৃতিচারণের সুতোর জালটা ছিঁড়ে গেল। ব্রাডের দিকে তাকাল কেট। 'সরি। কী বলছিলে?'

'ডেলেকার একত্রীভূতকরণের ব্যাপারে কথা বলছিলাম,' জবাব দিল ব্রাড। সে কেট ব্ল্যাকওয়েলকে নিয়ে উদ্বিগ্ন। ইদানিং বোর্ড মিটিংয়ে প্রায়ই অন্যমনস্ক থাকতে দেখা যায় তাকে। দিন দিন কেমন উদাসীন হয়ে যাচ্ছে কেট। ওর আসলে বোর্ড থেকে অবসর নেয়া দরকার।

ইভ ব্ল্যাকওয়েলের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না ডা. কিথ ওয়েবস্টার। ইভকে তার মনে হয় পরমাসুন্দরী কোনো দেবী, অপার্থিব, যাকে ছোঁয়া যায় না, ধরা যায় না। ইভ এক অগ্নিগিরি, প্রবল উত্তেজনার আধার আর কিথ হলো লাজুক, ভোঁতা এবং অনাকর্ষণীয়। সে আজতক বিয়ে করেনি কারণ পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় এমন কেনো নারীকে খুঁজে পায়নি। সে বড় হয়েছে প্রচণ্ড কর্তৃত্বপরায়ণ মা আর ব্যক্তিত্বহীন বাবার সংসারে। সে আগে সেক্স নিয়ে তেমন ভাবত না। কিন্তু ইভের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে প্রায় প্রতিরাতেই সে মেয়েটিকে নিয়ে উত্তেজক স্বপ্ন দেখে এবং সকাল বেলা স্বপ্নের কথা মনে পড়লে লজ্জিত হয়। ইভ এখন পুরোপুরি সুস্থ কাজেই কোনো ছুতোয়

তার সঙ্গে দেখা করার উপায় নেই। অথচ দেখা করতে ভীষণ ইচ্ছে করছে।

ইভের বাসায় ফোন করল কিথ। 'ইভ? আমি কিথ ওয়েবস্টার। আশা করি তোমাকে বিরক্ত করছি না। আ-ইয়ে-সেদিন তোমার কথা খুব মনে পড়ল। ভাবলাম ফোন করে একটু খবর নিই কেমন আছ।'

'আমি ভালো আছি, কিথ, ধন্যবাদ। তোমার দিনকাল যাচ্ছে কেমন?' কৌতুকের সুর ইভের কণ্ঠে।

'যাচ্ছে আর কী।' একটু বিরতি দিল কিথ তারপর সাহস সঞ্চয় করে বলেই ফেলল, 'আমার সঙ্গে কি তোমার লাঞ্চ করার সময় হবে, নাকি খুব ব্যস্ত?'

ইভ আপনমনে হাসল। লোকটা এমন ভীতু। এর সঙ্গে লাঞ্চ করতে মজাই লাগবে। 'সময় হবে, কিথ।'

'সত্যি বলছ?' কিথের কণ্ঠে বিস্ময়, যেন শুনেও বিশ্বাস করতে পারছে না। 'কবে?'

'কাল?'

'আচ্ছা।' ইভ না আবার মত বদলে ফেলে সেজন্য দ্রুত বলে উঠল কিথ।

লাঞ্চটা উপভোগ করল কিথ। ডা. কিথ ওয়েবস্টার প্রেমে পড়া স্কুল বালকের মতো আচরণ করছিল। খেতে গিয়ে হাত থেকে ফেলে দিল ন্যাপকিন, ধাক্কা খেয়ে ছলকে পড়ল গ্লাসের মদ, উল্টে ফেলল একটা ফুলদানী। তাকে কৌতুকের চোখে দেখতে দেখতে ইভ ভাবছিল, *কে বলবে এ লোক অসাধারণ একজন সার্জন।*

লাঞ্চ শেষে কিথ ওয়েবস্টার লাজুক গলায় হাসতে চাইল। 'আমরা কি—আমরা কি আবার একসঙ্গে লাঞ্চ করব?'

সিরিয়াস মুখ করে জবাব দিল ইভ। 'তা বোধহয় উচিত হবে না, কিথ। আমি তাহলে তোমার প্রেমে পড়ে যেতে পারি।

লজ্জায় টমেটো রাঙা হলো কিথ, কী বলবে বুঝতে পারছে না।

ইভ তার হাত চাপড়ে দিল। 'তোমাকে আমি কোনোদিন ভুলব না।'

কিথের হাতের ধাক্কায় আবার একটি ফুলদানী উল্টে পড়ল।

অধৈর্য হয়ে উঠছে জর্জ মেলিস। 'টাকাটা ওখানে অপেক্ষা করছে, উইল বদল করা হয়েছে– তাহলে আমরা বসে আছি কী জন্য?'

ইভ লম্বা পা দুটো মুড়ে বসে রয়েছে কাউচে। জর্জের পায়চারি দেখছে।

'আমি দ্রুত এসবের অবসান চাই, ইভ।'

'*ও আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারছে না,* ভাবল ইভ। ওকে লাগছে কুণ্ডুলি পাকানো বিষক্ত সাপের মতো। বিপজ্জনক। একবার ওকে তাড়না দিয়ে মস্ত ভুল করে ফেলেছিল ইভ, ওর জীবন সংশয় তৈরি হয়েছিল। ওই ভুল দ্বিতীয়বার করবে না সে।

'ঠিকই বলেছ তুমি,' ধীরে বলল ইভ। 'এখন সময় হয়েছে।'

পায়চারি থামাল জর্জ। 'কবে?'

'আগামী সপ্তাহে।'

পিটার টেম্পলটনের সঙ্গে জর্জ মেলিসের সেশন প্রায় শেষের দিকে। গত সেশনে সে একবারও তার স্ত্রীর কথা বলেনি। তবে তার সঙ্গে সেশন করে পিটার টেম্পলটন বুঝতে পেরেছিল জর্জ মেলিস প্রচুর মিথ্যা কথা বলে এবং সে ভয়ানক প্রকৃতির একজন মানুষ। ডা. জন হার্লির সঙ্গে পিটার জর্জকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে যখন শুনেছে জর্জ পিটিয়ে ইভ ব্ল্যাকওয়েলকে প্রায় মেরে ফেলার জোগাড় করেছিল, হতবাক হয়ে গেছে সে। আজকের সেশনে সে জর্জকে জিজ্ঞেস করেছিল মহিলাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন। জবাবে জর্জ বলেছিল 'স্বাভাবিক।' বলেছে সে ভায়োলেন্সে বিশ্বাস করে না। পরে পিটারের এক প্রশ্নের জবাবে নিজের এক বন্ধুর গল্প ফেঁদে বসেছে জর্জ। বলেছে তার বন্ধুটি নাকি পতিতাদেরকে নির্মমভাবে পিটিয়ে সুখ পায়। কারণ সে বেশ্যাদেরকে ঘৃণা করে। জর্জের কথার ধরণে এবং আচরণে পিটার বুঝতে পারছিল ওই বন্ধুটি আর কেউ নয়, সে নিজেই। জর্জ একজন সাইকো এবং ভীষণ বিপজ্জনক। সিদ্ধান্ত নিল এ ব্যাপারে যত দ্রুত সম্ভব জন হার্লির সঙ্গে কথা বলবে সে।

হার্ভার্ড ক্লাবে লাঞ্চ করছে ওরা দু'জন। জর্জ মেলিস সম্পর্কে তথ্য পেতে জন হার্লির কাছে এসেছে পিটার টেম্পলটন।

'জর্জ মেলিসের স্ত্রী সম্পর্কে কী জানো তুমি?' হার্লিকে জিজ্ঞেস করল টেম্পলটন।

'আলেকজান্দ্রা? ও খুব ভালো মেয়ে। সেই ছোটবেলা থেকে আমি ওকে আর ওর বোন ইভকে চিনি।' হাসল সে। 'তুমি আইডেন্টিকাল টুইনসের কথা শুনেছ কিন্তু ওদের দুজনকে একত্রে দেখার আগ পর্যন্ত বুঝতেই পারবে না এ আসলে কী জিনিস।'

পিটার জিজ্ঞেস করল, 'ওরা দু'জন আইডেন্টিকাল টুইনস?'

'ওদেরকে আলাদাভাবে চেনা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। ছোট বেলায় আমি নিজেও অনেক সময় চিনতে পারতাম না কে কোনজন।

পিটার বলল, 'তুমি বলেছিলে আলেকজান্দ্রা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তার ডিপ্রেশন নিয়ে কথা বলতে। কী করে বুঝলে ওটা আলেকজান্দ্রা ছিল?'

'এখন ওদেরকে চেনা সহজ,' জবাব দিল হার্লি। 'জর্জ মেলিসের হাতে মার খাওয়ার পরে অপারেশনে ইভের কপালে হালকা লাল একটা দাগ পড়ে গেছে।'

'ও আচ্ছা।'

'মেলিসের খবর কী?'

একটু ইতস্তত করে পিটার বলল, 'ওকে এখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি আমি। মুখোশের আড়ালে যেন লুকিয়ে আছে সে। মুখোশটা খুলে ফেলার চেষ্টা করছি।'

'সাবধান, পিটার। আমার মতামত চাও তো বলি– ওই লোকটা একটা উন্মাদ।

রক্তের পুকুরের মধ্যে শুয়ে থাকা ইভকে মনে পড়ল হার্লির।

'ওরা দুবোনই অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী, তাই না?'

জানতে চাইল পিটার।

এবারে জন হার্লির দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার পালা। 'ওয়েল, এটা তাদের নিতান্তই পারিবারিক বিষয়। তবে জবাবটি হচ্ছে 'না।' ওদের দাদীমা ইভকে সম্পত্তির কোনো ভাগ দেন নি। আলেকজান্দ্রাই সব কিছুর মালিক।'

জর্জ মেলিসের বলা কথাগুলো মনে পড়ে গেল পিটার টেম্পলটনের। *আলেকজান্দ্রাকে নিয়ে আমি খুব দুশ্চিন্তায় আছি, ড. টেম্পলটন। ওর ডিপ্রেশন দিন দিন বেড়েই চলেছে। প্রায়ই সে মরার কথা বলছে। ওর যদি এরকম কিছু হয়ে যায় আমি তা কিছুতেই সইতে পারব না।*

পিটার টেম্পলটনের কাছে মনে হলো হত্যার জন্য এ যেন এক ক্লাসিক সেটআপ– শুধু যদি না জর্জ মেলিস নিজেই বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না হতো। টাকার জন্য সে কেন কাউকে খুন করতে যাবে? *তুমি আসলে খুব বেশি কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠছ,* মনে মনে নিজেকে ভর্ৎসনা করল পিটার টেম্পলটন।

সে রাতে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে গেল পিটার টেম্পলটন। স্বপ্নে দেখেছে শীতল সমুদ্রে এক মহিলা ডুবে যাচ্ছে এবং পিটার তাকে উদ্ধার করতে গিয়েও পারছে না। মহিলা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায় আর প্রকাণ্ড এক হোয়াইট শার্ক এসে হামলা চালায় পিটার টেম্পলটনের ওপর।

পরদিন সকালে সে ফোন করল ডিটেকটিভ লেফটেন্যান্ট নিক পাপাসকে।

ছয় ফুট চার ইঞ্চি দৈর্ঘ আর তিনশো পাউণ্ড ওজন নিয়ে নিক পাপাস একজন মানুষ-পর্বত বিশেষ। তবে শরীরের পুরোটাই মাংস আর পেশীর সমাহার, মেদ নেই একফোঁটা। ম্যানহাটনে হোমিসাইড টাস্ক ফোর্সের দায়িত্বে রয়েছে লেফটেন্যান্ট পাপাস। তার সঙ্গে বেশ কয়েকবছর আগে পিটারের পরিচয়। একটি মার্ডার ট্রায়ালে পিটার সাইকিয়াট্রিক এক্সপার্ট হিসেবে সাক্ষী দিয়েছিল। তখন পাপাস তার বন্ধু হয়ে যায়। পাপাস দাবা খেলতে খুব ভালোবাসে এবং মাসে অন্তত একবার তারা মিলিত হয় খেলার জন্য।

পিটার টেম্পটনের সঙ্গে ফোনে ঘরোয়া আলাপ সেরে নিক পাপাস জানতে চাইল, 'তোমার জন্য কী করতে পারি বলো?'

'আমার কিছু তথ্য দরকার। গ্রিসের সঙ্গে তোমার কোনো যোগাযোগ আছে?'

'আছে?' ঘাউ করে উঠল পাপাস। 'আরে ওখানে আমার শতাধিক আত্মীয় আছে। তাদের শুধু টাকার খাইখাই। সে যাকগে, কী তথ্য দরকার বলো।'

'জর্জ মেলিসের নাম শুনেছ?'

'ফুড ফ্যামিলি?'

'হুঁ।'

'ওই লোক আমার আওতায় নয় তবু চিনি ওকে। ওর ব্যাপারে কী?'

'ওর কোনো টাকা-পয়সা আছে কিনা জানতে চাই আমি।'

'বলছ কী তুমি! ওর পরিবার–'

'ওর নিজের কত টাকা আছে জানা দরকার আমার।'

'আচ্ছা, খবর নিয়ে জানাবখন। কিন্তু এ স্রেফ সময়ের অপচয় হবে, পিটার। মেলিসরা মহাধনী।'

'ভালো কথা, তোমাদের কেউ যদি জর্জ মেলিসের বাবার সঙ্গে কথা বলে, একটু সুবোধ আচরণ করতে বোলো। কারণ মানুষটির বেশ কয়েকবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।'

'আচ্ছা।'

'আর শোনো। তুমি আমাকে ফোন করে খবরটা জানিয়ে দিও প্লিজ।'

'ঠিক আছে।'

পরদিন সকালেই নিক পাপাস ফোন করল পিটার টেম্পলটনকে। বলল, 'শোনো, আমি নিজে ফোনে বুড়ো মেলিসের সঙ্গে কথা বলেছি। প্রথমত, তার জীবনেও কোনোদিন হার্ট অ্যাটাক হয়নি এবং দ্বিতীয়ত সে পরিষ্কার বলে দিয়েছে তার সঙ্গে তার ছেলে জর্জের কোন সম্পর্ক নেই। জর্জ তার কাছে মৃত এবং ছেলেকে সে বহু আগেই ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেছে। একটি পয়সাও দেয়নি। আমি কারণ জানতে চাইলে বুড়ো ফোন রেখে দিয়েছে। তারপর আমি এথেন্সের পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সে আমার পুরনো বন্ধুদেরকে ফোন করি। তারা তোমার জর্জ মেলিস সম্পর্কে যেসব তথ্য দিয়েছে তা রীতিমতো চিত্তাকর্ষক। ওখানকার পুলিশ তার সম্পর্কে খুব ভালোই জানে। সে কিশোর ছেলেমেয়েদেরকে ধর্ষণ করে। পিটিয়ে যৌনসুখ পায়। গ্রিস ত্যাগ করার আগে তার সর্বশেষ শিকার ছিল পনের বছরের এক কিশোর বেশ্যা। কিশোরটিকে মরণাপন্ন অবস্থায় একটি হোটেলে পাওয়া যায়। পুলিশের ধারণা ওটা ছিল জর্জ মেলিসের কাণ্ড। বুড়ো মেলিস ছেলের এসব কুকীর্তির জন্যেই তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছে এবং গ্রিস থেকে চিরদিনের জন্য বিতাড়িত করেছে। কী, এ তথ্যে চলবে নাকি আরও খোঁজ-খবর নিতে হবে?'

এরকম ভয়ংকর তথ্য ভীত করে তুলল পিটার টেম্পলটনকে। সে বলল, 'ধন্যবাদ, নিক। আমার কাছে তোমার ডিনার পাওনা রইল।'

'আরে না, দোস্ত। ডিনার ফিনার খাওয়াতে হবে না। আমি এ ব্যাটাকে হাতে নাতে ধরতে চাই। ব্যাটা যদি আবার এরকম কোনো কাণ্ড ঘটায় এবং তুমি জানতে পার, আমাকে কিন্তু খবর দিও।'

'নিশ্চয় খবর দেব, নিক। টিনাকে আমার ভালোবাসা জানিও।' টিনা পাপাসের বউ।

ফোন নামিয়ে রাখল পিটার। অনেক কিছু ভাবতে হবে ওকে। আজ দুপুরে ওর কাছে আসছে জর্জ মেলিস।

ডা. জন হার্লি রোগী দেখছে, তার রিসেপশনিস্ট বলল, 'মিসেস জর্জ মেলিস আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, ডাক্তার। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসেননি। আমি বলেছি আপনি–'

'ওকে আমার অফিসে পাঠিয়ে দাও।' বলল হার্লি।

ওর চেহারা গতবারের চেয়েও বিমর্ষ, চোখের নিচের কালি আরও গাঢ় হয়েছে। 'এভাবে তোমাকে আমি বিরক্ত করতে চাইনি জন, কিন্তু– '

'ঠিক আছে, আলেকজান্দ্রা। সমস্যাটা কী বলো?'

'সবকিছু নিয়েই সমস্যা। আ-আমার কোনো কিছুই ভাল্লাগছে না।'

'ওয়েলবুট্রিন রেগুলার খাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'তারপরও ডিপ্রেশনে ভুগছ?'

মুঠো পাকাল সে। 'ব্যাপারটা ডিপ্রেশনের চেয়ে খারাপ। আমি আসলে ডেসপারেট হয়ে উঠেছি। মনে হচ্ছে কোনো কিছুর ওপরেই আমার নিয়ন্ত্রণ নেই। নিজেকে আর সহ্য করতে পারছি না। ভয় লাগছে হয়তো ভয়ংকর কিছু একটা ঘটিয়ে ফেলব।'

ডা. হার্লি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'তোমার কোনো শারীরিক সমস্যা নেই। পুরোটাই ইমোশনাল প্রবলেম। তোমাকে আরেকটা ওষুধ দিচ্ছি। নোমিফেনসিন। 'খুবই ভালো ওষুধ। কয়েক দিনের মধ্যেই নিজের মধ্যে একটা পরিবর্তন টের পাবে তুমি।' সে একটা প্রেসক্রিপশন লিখে ওকে দিল। 'শুক্রবারের মধ্যে ভালো বোধ না করলে আমাকে ফোন দিও। তোমাকে তখন একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে পাঠাব।'

ত্রিশ মিনিট বাদে, নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে মুখ থেকে ফাউন্ডেশন ক্রিম তুলে ফেলল ইভ, চোখের নিচের কালো রং ঘষে ঘষে তুলল।

পিটার টেম্পলটনের উল্টোদিকে বসে আছে জর্জ মেলিস।

হাসছে। তাকে বেশ আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে।

'আজ কেমন বোধ করছেন?'

'অনেক ভালো, ডক্টর। আপনার সঙ্গে সেশনগুলো আমার অনেক কাজে লেগেছে।'

'শুনে খুশি হলাম। আপনার স্ত্রী কি ভালো আছেন?'

কপাল কোঁচকাল জর্জ। 'মনে হয় না। সে আবার ডা. হার্লির কাছে গিয়েছিল। কিন্তু ইদানিং আগের চেয়ে অনেক বেশি আত্মহত্যা করার কথা বলছে। ওকে দূরে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাব ভাবছি। ওর একটু হাওয়া বদলানো দরকার।'

'গ্রিসে নিয়ে যেতে পারেন,' কথাচ্ছলে বলল পিটার। 'আপনার পরিবারের সঙ্গে আপনার স্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন?'

'এখনও দিতে পারিনি। তারা অ্যালেক্সের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য অস্থির হয়ে আছে।' হাসল জর্জ। 'সমস্যা হলো বাবার সঙ্গে দেখা হলেই তিনি আমাকে দেশে ফিরে আমাদের পারিবারিক ব্যবসার দেখভাল করতে বলেন।'

ঠিক সেই মুহূর্তে পিটার বুঝতে পারল দারুণ বিপদের মধ্যে রয়েছে আলেকজান্দ্রা মেলিস।

জর্জ মেলিস চলে যাওয়ার পর পিটার টেম্পলটন তার অফিসে বসে কিছুক্ষণ কাজ করল। তারপর ফোন তুলে একটা নাম্বারে ডায়াল করল।

'আমার একটা উপকার করো, জন। বলতে পারবে জর্জ মেলিস তার স্ত্রীকে নিয়ে কোথায় হানিমুনে গিয়েছিল?'

'জ্যামাইকা।'

পিটার টেম্পলটনের মনে পড়ে গেল জর্জ মেলিস পতিতা-বিদ্বেষী তার যে বন্ধুর কথা বলেছিল সে বন্ধুটি জ্যামাইকাতে বসে পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছিল এক পতিতার ওপর।

তবে এতেই প্রমাণ হয় না যে জর্জ মেলিস তার স্ত্রীকে হত্যার পরিকল্পনা করছে। জন হার্লি বলেছে আলেকজান্দ্রা মেলিসের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। *এ নিয়ে আমি এত মাথা ঘামাচ্ছি কেন,* মনে মনে বলল পিটার। *এটা তো আমার সমস্যা নয়,* কিন্তু সে জানে চাইলেও সে মাথা না ঘামিয়ে পারবে না। কারণ একটা তার সমস্যা।

স্কুল জীবন থেকেই কাজ করে নিজের খরচ জোগাতে হয়েছে পিটার টেম্পলটনকে। তার বাবা নেব্রাস্কার ছোট একটি শহরের একটি কলেজের কেয়ারটেয়ার ছিল, স্কলারশিপ পাওয়া সত্ত্বেও পিটার আইভি লিগ মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হওয়ার দুঃসাহস দেখাতে পারেনি। সে নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স করার পরে মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছে। শুরু থেকেই এ বিষয়ে সে সাফল্য দেখাতে শুরু করে। এর রহস্য হলো পিটার সত্যি মানুষ ভালোবাসে; তাদের ব্যথায় ব্যতিথ হয়। আলেকজান্দ্রা মেলিস তার রোগী না হলেও এর সঙ্গে মানসিকভাবে কীভাবে যেন জড়িয়ে গেছে পিটার। ধাঁধার একটি মিসিং পার্ট হলো আলেকজান্দ্রা, তার মুখোমুখি হলে ধাঁধার সমাধান বের করতে পারবে পিটার। সে জর্জ মেলিসের ফাইল ঘেঁটে বাড়ির ফোন নাম্বার বের করে ডায়াল করল আলেকজান্দ্রা মেলিসকে। আলেকজান্দ্রা ফোন ধরলে নিজের পরিচয় দিল সে।

'মিসেস মেলিস, আমার নাম পিটার টেম্পলটন। আমি–'

'আমি আপনাকে চিনি, ডক্টর। জর্জ আপনার কথা আমাকে বলেছে।'

বিস্মিত হলো পিটার। 'আপনার সঙ্গে একটু মুখোমুখি কথা বলতে চাই।'

'লাঞ্চের সময়?'

'জর্জকে নিয়ে? কোনো সমস্যা হয়েছে?'

'না, কোনো সমস্যা হয়নি। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলার ইচ্ছে ছিল।'

'ঠিক আছে, ড. টেম্পলটন।'

পরদিনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট করল ওরা।

লা গ্রেনুইলে কিনারার দিকের একটি টেবিল দখল করে বসেছে ওরা দু'জন। রেস্টুরেন্টে যখন ঢুকল আলেকজান্দ্রা তার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারছিল না পিটার। সাদা স্কার্ট আর ব্লাউজ পরেছে শুধু আলেকজান্দ্রা, গলায় মুক্তার মালা। এতেই অপূর্ব লাগছিল ওকে ডা. হার্লি বলেছিল আলেকজান্দ্রার চেহারায় সবসময় বিষণ্ণতা এবং ক্লান্তি ফুটে থাকে। কই, সেরকম কোনো ছাপই তো নেই চেহারায়। কী স্নিগ্ধ, সুন্দর একখানা মুখ! পিটার ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে লক্ষ্য করলেও আচরণে তা বুঝতে দিল না আলেকজান্দ্রা।

'আমার স্বামী ঠিক আছে তো, ড. টেম্পলটন?'

'হ্যাঁ।' যা ভেবেছিল তার চেয়ে কঠিন হয়ে যাবে পিটারের কাজটা। সে সরু তারের ওপর দিয়ে হাঁটছে। ডাক্তার-রোগীর সম্পর্ক লঙ্ঘন করার অধিকার তার নেই তবু সে আলেকজান্দ্রাকে সাবধান করে দেয়ার একটা তাগিদ অনুভব করছে ভেতর থেকে।

খাবারের অর্ডার দেয়ার পরে পিটার বলল, 'আপনার স্বামী কি আপনাকে বলেছেন তিনি কেন আমার সঙ্গে সেশন করছেন?'

'জ্বী। ও ইদানিং খুব চাপের মাঝ দিয়ে যাচ্ছে। ও যে ব্রোকারেজ ফার্মে কাজ করে সেখানকার বেশিরভাগ দায়িত্ব ওর কাঁধের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। জর্জ খুব বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এতদিনে আপনি নিশ্চয় ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছেন, ডক্টর।'

কী আশ্চর্য, এ মেয়ে দেখছি তার বোনের ওপর হামলার কথা কিছুই জানে না! *কেউ তাকে বলেনি কেন?*

'জর্জ বলেছে ওর সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে বেশ খানিকটা রিলিফ পাচ্ছে।' কৃতজ্ঞ হাসি ফুটল আলেকজান্দ্রার ওষ্ঠে। 'আপনি ওকে সাহায্য করছেন আমি সত্যি খুব খুশি।'

মেয়েটি কী সরল! নিশ্চয় স্বামীকে সে দেবতাজ্ঞান করে। পিটারের কথা শুনলে তো এ মেয়ের স্বামীর প্রতি ভক্তি-ভালোবাসা সব আয়নার কাচের মতো চুরচুর করে ভেঙে যাবে। পিটার কী করে একে বলবে তার স্বামী একজন সাইকোপ্যাথ এবং এক পুরুষ বেশ্যাকে সে হত্যা করেছে এবং পরিবার থেকে তাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং সে পশুর মতো হামলা করেছে তার বড় বোনের ওপর? কিন্তু না বলেও তো উপায় নেই।

'সাইকিয়াট্রিস্ট হিসেবে কাজ করা খুব মজার, না?' বলে চলল আলেকজান্দ্রা। কত

মানুষকে আপনারা সাহায্য করেন।

'কখনও সাহায্য করতে পারি আবার কখনও পারি না।'

পরিবেশিত হলো খাবার। খেতে খেতে কথা বলল ওরা। খুব সহজে একটা বন্ধন তৈরি হয়ে গেল দু'জনের মাঝে। পিটার আলেকজান্দ্রার সৌন্দর্য এবং আচরণে রীতিমত মুগ্ধ। হঠাৎ আবিষ্কার করল সে জর্জ মেলিসকে ঈর্ষা করতে শুরু করেছে। ভাবনাটা তাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিল।

'লাঞ্চটা আমি খুব উপভোগ করছি।' সবশেষে বলল আলেকজান্দ্রা, 'তবে আপনি বলেছিলেন আমার সঙ্গে আপনার কী যেন কথা আছে?'

সত্যের সামনে আসার সময় উপস্থিত।

'জ্বী। আমি–'

থেমে গেল পিটার। তার পরের কথাটাই মেয়েটির জীবন ধ্বংস করে দিতে পারে। সে এখানে আসার আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আলেকজান্দ্রাকে তার স্বামীর ব্যাপারে নিজের সন্দেহের কথা বলবে এবং পরামর্শ দেবে যেন জর্জকে কোনো পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু আলেকজান্দ্রার সঙ্গে মুখোমুখি আলাপের পরে মনে হচ্ছে কাজটা এত সহজ নয়। জর্জ মেলিস বলেছিল আলেকজান্দ্রা খুব বিমর্ষ থাকে। সারাক্ষণ আত্মহত্যার কথা বলে। কিন্তু ঝলমলে চেহারার মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছে সে খুবই সুখী এবং স্বাভাবিক একজন মানুষ। এটা কি ডাক্তার জন হার্লির ওষুধ সেবনের ফল? অন্তত এ বিষয়ে সে খোঁজ খবর নিতে পারে।

'জন হার্লি বলল আপনি নাকি–'

জর্জ মেলিসের কণ্ঠ বিস্ফোরিত হলো। 'এই যে ডার্লিং! আমি বাসায় ফোন করেছিলাম। বলল তুমি এখানে।' পিটারের দিকে ফিরল সে। 'নাইস টু মিট ইউ, ড. টেম্পলটন। আমি কি আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারি?'

উবে গেল সুযোগটি।

'ও কেন অ্যালেক্সের সঙ্গে দেখা করতে গেল?' গর্জন ছাড়ল ইভ।

'সে আমি কী জানি!' বলল জর্জ। 'থ্যাংক গড ও চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিল যে ওকে কোথায় পাওয়া যাবে। ভাগ্যিস আমি আগেই গিয়ে হাজির হয়েছিলাম!'

'ব্যাপারটা আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না।'

'বিশ্বাস করো, কোনো সমস্যা হয়নি। আমি অ্যালেক্সকে পরে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ও বলল পিটার টেম্পলটনের সঙ্গে বিশেষ কোনো বিষয় নিয়ে তার কথা হয়নি।'

'আমাদের প্ল্যান নিয়ে এখন এগোনো উচিত।'

শুনে যৌন রোমাঞ্চ বোধ করল জর্জ। এ মুহূর্তটির জন্যই সে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে আসছে। 'কখন?'

'এখন।'

বাষট্টি

বেশ কিছুদিন ধরেই শরীরটা ভালো যাচ্ছে না কেট ব্ল্যাকওয়েলের। মাথা ঘোরায়, ঝিমঝিম করে। অনেক জরুরি বিষয় মনেও থাকে না। এইতো আজকেই কোম্পানির একটি প্রস্তাব নিয়ে কাজ করছিল সে। হঠাৎ মনে পড়ল এ প্রস্তাবটি দশ বছর আগেই গ্রহণ করেছে কোম্পানি। ব্যাপারটি শংকিত করে তুলল তাকে। ব্রাড রজার্স ঘ্যানঘ্যান করে যাচ্ছিল কেট যেন ডাক্তার দেখায়। অবশেষে রাজি হলো কেট।

ডা. জন হার্লিও অনেকদিন ধরে কেটের পেছনে লেগেছিল তার শরীর ফুল চেকআপের জন্য। আজ কেট নিজেই যোগাযোগ করল তার সঙ্গে। সে নিজের চেম্বারে ফুল চেকআপ করল কেটকে। দেখল ধমনী একটু শক্ত হয়ে গেছে। কেটকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল এ নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। কারণ বুড়ো বয়সে এরকম হতেই পারে।

'আমার যে প্রায়ই মাথা ঘোরে এর একটা ব্যবস্থা করা যায় না?' বলল কেট। 'আমি ঘরসুদ্ধ মানুষের সামনে অজ্ঞান হতে চাই না। ব্যাপারটা খুব খারাপ লাগবে।

জন হার্লি বলল, 'ওটা কোনো সমস্যা হবে না। তুমি কবে অবসর নেবে, কেট?'

'যেদিন আমার প্রপৌত্র আমার ব্যবসার ভার নেবে সেদিন।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কেট। 'আমার জীবনের সবচেয়ে বড় হতাশার নাম কি জানো জন? ইভ। আমি বাচ্চাটাকে সত্যি খুব ভালোবাসতাম। আমি ওর হাতে পৃথিবীটাকে তুলে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ও নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসে না, ভালোবাসতে জানে না।'

'কথাটা ভুল বললে, কেট। ইভ তোমাকে খুব ভালোবাসে।'

'বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু আমি জানি। কিছুদিন আগে–' সাবধানে শব্দ বাছাই করছে ডাক্তার,– 'ওর ভয়ংকর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। প্রায় মারা যেতে বসেছিল তোমার নাতনী।'

ধড়াস করে উঠল কেটের বুক। 'তুমি– তুমি একথা আমাকে আগে বলনি কেন?'

'ইভ বলতে দেয়নি। অ্যাক্সিডেন্টের কথা শুনলে তুমি চিন্তায় পড়বে ভেবে আমাকে মানা করেছিল। সে তোমাকে জান দিয়ে ভালোবাসে, কেট।'

'ওহ্, মাই গড,' তীব্র ব্যথায় মুখ কুঁচকে গেল ইভের। 'ও–ও ঠিক আছে তো?' তার কণ্ঠ কর্কশ শোনাল।

'ও এখন ভালো আছে।'

কেট শূন্যে তাকিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ, জন। খবরটা আমাকে দেবার জন্য অনেক ধন্যবাদ।'

'আমি তোমাকে একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিচ্ছি। এই বড়িগুলো আনিয়ে খাবে।' প্রেসক্রিপশন লেখা শেষ করে তাকিয়ে ডাক্তার দেখে চলে গেছে কেট ব্ল্যাকওয়েল।

দরজা খুলে ভূত দেখার মতো চমকে গেল ইভ। তার দাদীমা শিরদাঁড়া টানটান করে দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়।

'আমি কি ভেতরে আসতে পারি?' জিজ্ঞেস করল কেট।

একপাশে সরে দাঁড়াল ইভ, যা ঘটছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে তার কাছে। 'নিশ্চয়ই।'

কেট ঘরে ঢুকে ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে চোখ বুলিয়ে নিল তবে কোনো মন্তব্য করল না। 'বসতে পারি?'

'আয়াম সরি। প্লিজ বসো। মাফ করবে– বাসাটা এমন অগোছালো– তোমার জন্য কিছু নিয়ে আসি? কী খাবে তুমি চা না কফি?'

'না, কিছু লাগবে না। ধন্যবাদ। তুমি ভালো আছ, ইভ?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ। আমি ভালো আছি।'

'আমি এইমাত্র ডা. জনের কাছ থেকে এলাম। সে বলল তুমি নাকি অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলে।'

দাদীমাকে সতর্কভাবে লক্ষ্য করছে ইভ। বুঝতে পারছে না বৃদ্ধার মতলব কী। 'হ্যাঁ...

'বলল তুমি নাকি প্রায়... মরতে বসেছিলে। এবং আমাকে জানাতে চাওনি আমি দুশ্চিন্তা করব বলে।'

তাহলে ব্যাপার এই! পায়ের নিচে মাটি খুঁজে পেল ইভ। 'হ্যাঁ, দিদা।'

'তার মানে,' কেটের গলা বুজে এল। 'তারমানে তুমি আমার কথা ভাবো। আমাকে ভালোবাসো।'

স্বস্তিতে চোখে জল চলে এল ইভের। 'অবশ্যই আমি তোমার কথা ভাবি। আর আমি সবসময়ই তোমাকে ভালোবাসতাম।'

পরের মুহূর্তে দাদীর কোলে সেঁধিয়ে গেল ইভ। কেট নাতনীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সোনালি চুলে ওষ্ঠ চেপে ধরল।

ফিসফিস করে বলল, 'আমি তোমাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে খুব বোকার মতো একটা কাজ করেছি। তুমি কি আমাকে ক্ষমা করে দেবে?' কেট লিনেনের রুমাল বের করে নাক মুছল।

'তোমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি আমি,' বলল সে। 'তোমার কিছু হলে আমি মোটেই সইতে পারতাম না।'

দাদীর নীল শিরা ওঠা হাতে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'ঠিক আছে, দিদা। সব

ঠিক আছে।'

সিধে হলো কেট, অশ্রু ঠেকাতে পিটপিট করছে চোখ। 'আমরা আবার নতুন করে সবকিছু শুরু করব, কেমন?' ইভকে সে টেনে তুলল। 'আমি হয়েছি আমার বাপের মতো একগুঁয়ে আর জিদ্দি। এর কাফফারা দিতেও আমি রাজি আছি। প্রথমেই যে কাজটি আমি করব তা হলো উইলে তোমার ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে নিয়ে আসব।'

যা ঘটছে বিশ্বাস হতে চাইছে না ইভের। 'আ-আমার টাকার দরকার নেই। আমার শুধু তোমাকে পাশে পেলেই চলবে।'

'তোমরা আমার উত্তরাধিকার– এ পৃথিবীতে আমার তো আর কেউ নেই।'

'আমি এমনিতে ভালোই আছি,' বলল ইভ, 'তবে সম্পত্তির মালিকানা দিতে পারলে তুমি যদি সুখী হও–'

'আমি খুবই সুখী হব, ডার্লিং। দারুণ সুখী হব। তুমি কবে আমার বাড়িতে এসে উঠতে পারবে?'

একটু ইতস্তত করে ইভ বলল, 'এখানে থাকতে পারলেই আমার জন্য ভালো। তবে তোমার যখনই আমাকে দেখতে মন চাইবে, আমি চলে আসব। ওহ্, দিদা, তুমি জানো না কী যে একা একা লাগত আমার।'

নাতনীর হাত ধরল দিদা। 'আমাকে কি তুমি ক্ষমা করতে পারবে না?'

ইভ তার দিদার চোখে চোখ রেখে আকুল গলায় বলল, 'অবশ্যই আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারব।'

কেট চলে যাওয়ামাত্র ইভ স্কচের সঙ্গে পানি মিশিয়ে একটা ড্রিংক বানিয়ে কাউচে শুয়ে পড়ল একটু আগে ঘটে যাওয়া অবিশ্বাস্য দৃশ্যটির স্মৃতিচারণ করতে। আনন্দে তার আকাশ-বাতাস ফাটিয়ে চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে। ব্ল্যাকওয়েল পরিবারের সমস্ত ধন দৌলতের মালিক এখন সে আর আলেকজান্দ্রা। আলেকজান্দ্রাকে সে সহজেই পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এখন যে কাঁটা হয়ে বিঁধে রইল জর্জ মেলিস। এ কাঁটাটাকে উপড়ে ফেলা দরকার।

'পরিকল্পনা বদলে গেছে,' জর্জকে বলল ইভ। 'কেট তার উইলে আবার আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।'

সিগারেট ধরাতে গিয়ে মাঝপথে থেমে গেল জর্জ। 'তাই নাকি? অভিনন্দন।'

'এখন যদি আলেকজান্দ্রার কিছু হয়, ব্যাপারটা সন্দেহজনক দেখাবে। কাজেই ওর ব্যাপারে আমরা পরেও ব্যবস্থা নিতে পারব যখন–'

'কিন্তু আমি তা চাই না।'

'মানে?'

'আমি গাধা নই, ডার্লিং। আলেকজান্দ্রার কিছু হলে আমি ওর সমস্ত সম্পত্তি পেয়ে

যাব। তুমি আসলে আমাকে দৃশ্যপটের বাইরে রাখতে চাইছ, তাই না?'

কাঁধ ঝাঁকাল ইভ। 'তুমি আসলে মিথ্যা সন্দেহ করছ। তোমার সঙ্গে আমি একটা চুক্তিতে আসতে চাই। আলেকজান্দ্রাকে ডিভোর্স দিয়ে দাও। তারপর যত দ্রুত আমার হাতে টাকা আসবে আমি তোমাকে–'

হো হো করে হাসল জর্জ। 'তুমি বোকার মতো কথা বলছ। এতে কোনো ফায়দা হবে না। কোনো কিছুই বদলায়নি। শুক্রবার রাতে ডার্ক হারবারে আমি আর অ্যালেক্স মিলিত হতে যাচ্ছি।'

ইভ এবং দাদীমার মিলনের কথা শুনে ভীষণ খুশি আলেকজান্দ্রা। 'আমরা আবার একটি পরিবার হয়ে গেলাম,' হাসতে হাসতে বলল সে।

'হ্যালো, আশা করি তোমাকে আমি বিরক্ত করছি না, ইভ। কিথ ওয়েবস্টার বলছি।'

সে সপ্তাহে দু'তিনবার করে ইভকে ফোন করতে শুরু করেছে। আগে কিথের বোকা বোকা আচরণে আমোদ পেত ইভ, এখন বিরক্ত লাগছে।

'তোমার সঙ্গে এখন কথা বলতে পারব না,' বলল ইভ। 'আমি বাইরে যাচ্ছি।'

'ওহ্' ক্ষমা প্রার্থনার সুর কিথের কণ্ঠে। 'তাহলে তোমাকে ধরে রাখব না। আগামী সপ্তাহের ঘোড় দৌড় দেখার জন্য দুটো টিকেট কিনেছিলাম। আমি জানি তুমি ঘোড়দৌড় খুব পছন্দ করো তাই ভাবলাম–

'দুঃখিত, আগামী সপ্তাহে আমি শহরে থাকছি না।'

'ও আচ্ছা,' কিথের কণ্ঠে পরিষ্কার হতাশা। 'তাহলে তার পরের সপ্তাহে। আমি নাটকের টিকেট কিনে রাখব। নাটক দেখবে?'

'ওসব নাটক আমার সব দেখা,' কাঠখোট্টা গলায় বলল ইভ। 'আমি রাখলাম। তাড়া আছে।' রিসিভার রেখে দিল ও। ড্রেস পরবে। ররি ম্যাকেনার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। ররি এক তরুণ অভিনেতা, ব্রডওয়ের শোতে তার সঙ্গে ইভের পরিচয়। ইভের চেয়ে বয়সে পাঁচ বছরের ছোট সে, তবে বুনো স্ট্যালিয়নের মতো গায়ের জোর। বিছানায় দারুণ খেলুড়ে। ররির সঙ্গে মিলনের কথা মনে হতেই দুই উরুর মাঝখানটা ভিজে গেল ইভের। আজ রাতটা জমবে বেশ।

বাড়ি ফেরার পথে আলেকজান্দ্রার জন্য ফুল কিনল জর্জ মেলিস। ফুরফুরে মেজাজে আছে সে। ইভকে বৃদ্ধা আবার তার উইলে জায়গা করে দিয়েছে শুনে অবাকই হয়েছিল জর্জ। তবে এতে কোনোকিছুই বদলাবে না। আলেকজান্দ্রার অ্যাক্সিডেন্টের পরে সে ইভের ব্যবস্থা নেবে। সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন। শুক্রবার ডার্ক হারবারে তার জন্য অপেক্ষা করবে আলেকজান্দ্রা। 'শুধু তুমি আর আমি,' ওকে চুমু খেয়ে বলেছিল জর্জ। 'ওইদিন বাসায় যেন কোনো চাকর বাকর না থাকে, ডার্লিং।'

আলেকজান্দ্রা মেলিসের চিন্তা মাথা থেকে দূর করতে পারছে না পিটার টেম্পলটন। তার মন বলছে মেয়েটি মস্ত বিপদে আছে। কিন্তু তবু সে কিছু করতে পারছে না। নিজের সন্দেহের কথাও সে নিক পাপাসকে বলতে পারবে না। কারণ তার হাতে তো কোনো প্রমাণ নেই।

ক্রুগার-ব্রেন্ট লিমিটেডের অফিসে বসে নতুন একটি উইলে দস্তখত করছিল কেট ব্ল্যাকওয়েল। এ উইল অনুযায়ী তার দুই নাতনী এখন কোম্পানির বিশাল সহায়-সম্পত্তির মালিক।

শুক্রবার সকাল ১০:৫৭

লা গুয়ারডিয়া এয়ারপোর্টে ইস্টার্ন এয়ারলাইন্সের সামনের শাটল টার্মিনালে একটি ট্যাক্সি থামল। ট্যাক্সি থেকে নেমে এল ইভ ব্ল্যাকওয়েল। সে ড্রাইভারকে একশো ডলারের একটি নোট দিল।

'এটার ভাংতি নাই আমার কাছে,' বলল ড্রাইভার। 'ছোট নোট নাই?'

'না।'

'তাহলে ভেতরে গিয়ে টাকাটা খুচরো করে আনেন।'

'আমার সময় নেই। আমি নেক্সট শাটল ধরে ওয়াশিংটন ফিরব। 'সে কব্জিতে বাঁধা Baume and mercier ঘড়িটি দেখল। বলল, 'তুমি পুরোটাই রেখে দাও।'

টার্মিনালের দিকে দ্রুত কদমে এগোল ইভ। ওয়াশিংটন শাটল লেখা ডিপারচার গেটে প্রায় ছুটতে ছুটতে ঢুকল। 'ওয়াশিংটনের একটা টিকেট দিন তো,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ইভ।

ঘড়ি দেখে ডানে বামে মাথা নাড়ল টিকেট বিক্রেতা।

'আপনি দু'মিনিটের জন্য প্লেন মিস করেছেন। ওটা এইমাত্র টেক অফ করল।'

'হায়! হায়! আমার ডেটটা মিস হয়ে যাবে– অন্য কোনো উপায় নেই?'

'এক ঘণ্টা পরে আরেকটা শাটল আছে।'

'দুরো– তাতে কোনো লাভ হবে না।' নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল ইভ। 'আচ্ছা, আমি অপেক্ষা করব। এখানে কোনো কফিশপ আছে?

'না, ম্যাম। তবে করিডোরের ওপাশে একটা কফি মেশিন পাবেন।'

'ধন্যবাদ।'

টিকেট বিক্রেতা ইভের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, *কী সুন্দরী মেয়ে! যে এ মেয়ের সঙ্গে ডেটিং করবে তাকে আমার হিংসে হচ্ছে।*

শুক্রবার বেলা ২:০০

আমি যেন দ্বিতীয় হানিমুনে যাচ্ছি, ভাবছে আলেকজান্দ্রা। আইডিয়াটি তাকে

উত্তেজিত করে তুলছে। সে ডার্ক হারবার যাচ্ছে জর্জের সঙ্গে সাক্ষাত করতে। তবে পৌঁছাতে দেরি হয়ে যাবে ওর। একটা লাঞ্চের দাওয়াত ছিল ওখানেই সময় খেয়ে নিল। সে তার মেইডকে বলল, 'আমি গেলাম। সোমবার সকালে ফিরব।'

আলেকজান্দ্রা সদর দরজায় পৌঁছেছে! বাজতে শুরু করল ফোন। *আমার দেরি হয়ে গেছে। বাজুক ফোন!* সে বেরিয়ে গেল দরজা খুলে।

শুক্রবার সন্ধ্যা ৭:০০

জর্জ মেলিস ইভের প্ল্যানটা বারবার খুঁটিয়ে দেখেছে। কোথাও কোনো খুঁত নেই। তোমার জন্য ফিলব্রুক কোভে একটি মোটর লঞ্চ অপেক্ষা করবে। ওটা তোমাকে পৌঁছে দেবে ডার্ক হারবারে। তবে সাবধান কেউ যেন তোমাকে দেখতে না পায়।

কর্সএয়ারের স্ট্যার্টের সঙ্গে লঞ্চ বেঁধে নেবে। আলেকজান্দ্রাকে নিয়ে সাগরে বেরিয়ে পড়বে ভরা পূর্ণিমার রাত উপভোগ করতে। যখন সাগরে ঢুকবে, তখন ওকে নিয়ে যা খুশি তুমি করতে পার জর্জ– তবে কোথাও যেন রক্তের দাগ না থাকে। লাশটা সমুদ্রে ফেলে দিয়ে উঠে পড়বে লঞ্চে। কর্সএয়ার সাগরেই ভাসতে থাকুক। লঞ্চ নিয়ে ফিরে আসবে ফিলব্রুক কোভে, তারপর লিংকনভিল ফেরি ধরে চলে আসবে ডার্ক হারবারে। ট্যাক্সি নিয়ে পৌঁছাবে বাড়ি। যে কোনো একটা অজুহাত দেখিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে নিয়ে ভেতরে চলে আসবে যাতে দু'জনেই দেখতে পাও জেটিতে অদৃশ্য কর্সএয়ার। আলেকজান্দ্রাকে না পেয়ে ফোন করবে পুলিশ। ওরা লাশটা খুঁজে পাবে না। কারণ স্রোতের টানে গভীর সমুদ্রে ভেসে যাবে লাশ। দু'জন বিখ্যাত ডাক্তার এটাকে আত্মহত্যা বলে সাক্ষ্য দেবেন।

ফিলব্রুক কোভে মোটর বোটটি বাঁধা দেখতে পেল জর্জ। সে আলো না জ্বেলেই বে অতিক্রম করল চাঁদের আলোয় পথ দেখে। যাত্রাপথে কয়েকটি নৌকা চোখে পড়ল। তবে কেউই ওর মোটরবোট লক্ষ করল না। ব্ল্যাকওয়েল স্টেটের জেটিতে এসে ভিড়ল জর্জের লঞ্চ। সে ইঞ্জিন বন্ধ করে কর্সএয়ারের সঙ্গে দ্রুত বেঁধে ফেলল লঞ্চ।

জর্জ লিভিংরুমে ঢুকে দেখে ফোনে কথা বলছে আলেকজান্দ্রা। স্বামীকে দেখে হাত নাড়ল সে, রিসিভার চেপে ধরে বলল 'ইভ! তারপর ও প্রান্তের কথা শুনে বলল, 'এখন আমি ছাড়ব ইভ। আমার প্রিয়তম চলে এসেছে। আগামী সপ্তাহে দুবোনে একসঙ্গে লাঞ্চ করব, কেমন?' রিসিভার রেখে জর্জের কাছে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল আলেকজান্দ্রা। 'তুমি আগেই চলে এসেছ। আমি খুব খুশি হয়েছি।'

'তোমার জন্য খুব মন কেমন করছিল। তাই সব কাজ ফেলে চলে এসেছি।'

জর্জকে চুমু খেল আলেকজান্দ্রা। 'আই লাভ য়ু।'

'আই লাভ ইউ, matiamou চাকর বাকরদের দূর করে দিয়েছ তো?'

হাসল আলেকজান্দ্রা। 'বাড়িতে শুধু আমরা দু'জন। জানো তোমার জন্য আমি মুসাকা বানিয়েছি।'

আলেকজান্দ্রার সিল্ক ব্লাউজ ফুঁড়ে থাকা দৃঢ় স্তনে হাত বুলিয়ে জর্জ বলল, 'পচা অফিসটাতে বসে সারাদিন কী চিন্তা করেছি জানো? ভাবছিলাম দু'জনে মিলে সেইলিংয়ে গেলে কেমন হয়? ফুরফুরে হাওয়া বইছে। চলো না কিছুক্ষণের জন্য বোট ভ্রমণ করে আসি?'

'তা যাওয়া যায়। কিন্তু আমার মুসাকা–'

মুঠো করে ওর বক্ষযুগল চেপে ধরল জর্জ। 'ডিনার অপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু আমি পারব না।'

হেসে উঠল আলেকজান্দ্রা। 'ঠিক আছে। আমি কাপড় বদলে আসছি। বেশিক্ষণ লাগবে না।'

'চলো, আমিও যাই।'

দোতলায় উঠে আলমারি খুলে গ্ল্যাবস, সোয়েটার আর বোট-শু পরে নিল জর্জ। এখন সময় উপস্থিত, তীব্র উত্তেজনা জাগছে শরীরে, যেন বিস্ফোরিত হবে।

আলেকজান্দ্রার গলা শুনতে পেল সে, 'আমি রেডি, ডার্লিং।'

ফিরল জর্জ। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে সে। পরনে সুয়েটার, চুলগুলো ছোট নীল ফিতে দিয়ে বাঁধা। মাই গড, ওকে দারুণ লাগছে। ভাবল জর্জ। এই সৌন্দর্য ধ্বংস করে দেবে ভাবতে খারাপই লাগছিল ওর।

'আমিও,' ওকে বলল জর্জ।

ইয়টের স্টার্নের সঙ্গে বাঁধা মোটরবোট দেখে আলেকজান্দ্রা জানতে চাইল, 'এটা কেন, ডার্লিং?'

'বে-র মাথায় ছোট একটি দ্বীপ আছে ওখানে কোনোদিন যাইনি,' ব্যাখ্যা করল জর্জ। 'আজ যাব। লঞ্চে গেলে ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খাওয়ার ভয় নেই।'

কর্সএয়ারে উঠে ইয়ট ছেড়ে দিল জর্জ। চলল সাগর অভিমুখে। বাতাস পেয়ে ফুলে উঠল পাল। চনমনে হাওয়া। আকাশে রূপোলি মস্ত চাঁদ। ঝিলমিল করছে সাগরের পানি। ভারী রোমান্টিক একটি পরিবেশ।

চারদিকে চোখ বুলিয়ে আলেকজান্দ্রা মন্তব্য করল, 'ভারী সুন্দর! আয়াম সো হ্যাপি, ডার্লিং।'

হাসল জর্জ। 'আমিও।'

সে দিগন্তে তাকাল। কাছে পিঠে অন্য কোনো বোট দেখা যাচ্ছে না। শুধু দূরের বন্দরে বাতি জ্বলছে। এইবার সময় হলো।

বোট আটোমেটিক পাইলটে দিয়ে রেইলিং-এ হেঁটে এল জর্জ। উত্তেজনায় লাফাচ্ছে কলজে।

'অ্যালেক্স,' ডাকল সে। 'এদিকে এসো।

আলেকজান্দ্রা হেঁটে এল। তাকাল নিচের শীতল, কালো জলে।

'আমার কাছে এসো,' কর্কশ গলায় আদেশ দিল জর্জ।

জর্জের বাহুডোরে বাঁধা পড়ল আলেকজান্দ্রা। জোরে ওর ঠোঁটে চুমু খেল জর্জ। চেপে ধরল বুকের সঙ্গে। তারপর ওর কোমর দুই হাতে ধরে তুলে ফেলল শূন্যে। রেইলিং-এর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল ভীত আলেকজান্দ্রা। 'জর্জ!'

ওকে আরও উঁচুতে তুলে ধরল জর্জ। হাত-পা ছুড়ছে বটে আলেকজান্দ্রা কিন্তু জর্জের সঙ্গে শক্তিতে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। এখন প্রায় রেইলিং-এর ওপরে উঠে গেছে তার শরীর, জোরে জোরে পা ছুঁড়ছে সে। জর্জ ওকে ধাক্কা মেরে রেইলিং থেকে ফেলতে যাবে, বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করল। *আমার হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে,* ভাবল ও। কথা বলার জন্য মুখ খুলেছে, গলগল করে বেরিয়ে এল রক্ত। আলেকজান্দ্রাকে ছেড়ে দিল জর্জ। নিজের বুকের দিকে চাইল অবিশ্বাস নিয়ে। বুকে একটা গর্ত। কলকল করে রক্ত গড়িয়ে নামছে ক্ষতটা থেকে। মুখ তুলে চাইল সে। আলেকজান্দ্রার হাতে রক্তাক্ত কটি ছোরা। সে হাসছে।

জর্জ মেলিস মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বুঝতে পারল ওটা আলেকজান্দ্রা নয়, ইভ...

তেষট্টি

রাত দশটায় ডার্ক হারবারের বাড়িতে এসে পৌঁছল আলেকজান্দ্রা। বহুবার জর্জকে ফোন করেছে সে। পায়নি। দেরি হওয়ার জন্য জর্জ রেগে আছে কিনা কে জানে। সবকিছু উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে। বিকেলে ডার্ক হারবারের উদ্দেশে রওনা হচ্ছিল আলেকজান্দ্রা, এমন সময় ফোন বেজে ওঠে। দেরি হয়ে গেছে ভেবে সে আর ফোন ধরেনি। কিন্তু গাড়িতে ওঠার সময় বাড়ির চাকরানি ছুটতে ছুটতে এসে বলেছিল, 'মিসেস মেলিস! আপনার বোন ফোন করেছেন। বলছেন খুব জরুরি।'

আলেকজান্দ্রা ফোন তোলার পরে ইভ বলল, 'ডার্লিং, আমি ওয়াশিংটন ডিসিতে আছি। মস্ত ঝামেলায় পড়েছি। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার।'

'নিশ্চয়,' সঙ্গে সঙ্গে বলল আলেকজান্দ্রা। 'আমি এখন ডার্ক হারবারে যাচ্ছি জর্জের সঙ্গে দেখা করতে। সোমবার সকালে ফিরব। তখন–'

'আমি ততোদিন অপেক্ষা করতে পারব না,' মরিয়া শোনাল ইভের কণ্ঠ। 'লা গুয়ারডিয়া এয়ারপোর্টে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে? আমি পাঁচটার প্লেনে আসছি।'

'পারলে যেতাম, ইভ। কিন্তু জর্জকে কথা দিয়েছি–'

'বিষয়টি খুব জরুরি, অ্যালেক্স। তবে থাক। তুমি যেহেতু খুব ব্যস্ত...

'দাঁড়াও! দাঁড়াও! আমি আসব।'

'ধন্যবাদ, ডার্লিং। জানতাম তোমার ওপর ভরসা করা যাবে।'

ইভ খুব কমই বিপদে পড়ে আলেকজান্দ্রার কাছে সাহায্য চেয়েছে। তাই আর সে প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। জর্জের অফিসে ফোন করল বলতে যে ওর আসতে দেরি হবে। কিন্তু অফিসে নেই জর্জ। সেক্রেটারিকে খবরটা দিল আলেকজান্দ্রা। তারপর ট্যাক্সি নিয়ে চলে এল লা গুয়ারডিয়া এয়ারপোর্টে বোনের সঙ্গে দেখা করতে। ইভকে পেল না। ঘণ্টা দুই অপেক্ষা করল আলেকজান্দ্রা। ইভের কোনো খবর নেই। ওয়াশিংটনে কোথায় ফোন করলে ইভকে পাওয়া যাবে জানে না সে। শেষে করার কিছু নেই দেখে প্লেনে চড়ে দ্বীপে চলে এল আলেকজান্দ্রা। সেডার হিল হাউজে এসে দেখে বাড়ি অন্ধকার। জর্জের তো এতক্ষণে চলে আসার কথা। আলেকজান্দ্রা প্রতিটি ঘরে গিয়ে বাতি জ্বালাল।

'জর্জ?'

কোনো চিহ্ন নেই জর্জের। ম্যানহাটনের বাড়িতে ফোন করল আলেকজান্দ্রা। জবাব

দিল চাকরানি।

'মি. মেলিস কি আছেন বাড়িতে? জিজ্ঞেস করল আলেকজান্দ্রা।

'না, মিসেস মেলিস। উনি বললেন আপনারা দু'জন নাকি ছুটি কাটাতে কোথায় যাবেন।'

'ধন্যবাদ, মেরী। ও বোধহয় কোথাও আটকে গেছে কাজে।'

অনুপস্থিতির যৌক্তিক কোনো কারণ নিশ্চয় আছে। শেষ মুহূর্তে হয়তো কোনো কাজ চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল ওর কাঁধে। জর্জের কোনো পার্টনার ওকে বিষয়টি সামাল দিতে বলেছে। এর আগেও যেমন কয়েকবার হয়েছে। জর্জ নিশ্চয় যেকোনো সময় চলে আসবে। সে ইভের নাম্বারে ডায়াল করল।

'ইভ।' চেঁচিয়ে বলল আলেকজান্দ্রা। 'তোমার ব্যাপারটা কী বলোতো?'

'তোমার কী ব্যাপার! আমি কেনেডি এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করলাম। অথচ তোমার কোনো খবরই নেই।'

'কেনেডি! তুমি না বললে লা গুয়ারডিয়া!'

'না, ডার্লিং, কেনেডি।'

'কিন্তু–' অবশ্য এখন কিছুই আসে যায় না। 'আমি দুঃখিত,' বলল আলেকজান্দ্রা। 'আমি হয়তো শুনতে ভুল করেছি। তুমি ঠিক আছ তো?'

ইভ বলল, 'এখন ঠিক আছি। খুব বাজে একটা সময় গেছে। আমার সঙ্গে ওয়াশিংটনের খুব বড় এক রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্বের পরিচয় হয়েছে। সে আমাকে ছাড়া আর কিছু চেনে না এবং– হেসে উঠল ও। 'ফোনে এত কথা বলা যাবে না। ফোন কোম্পানি আমাদের দু'জনেরই ফোন টেপ করতে পারে। সোমবার তোমাকে ঘটনাটা বলবখন।'

'ঠিক আছে,' বলল আলেকজান্দ্রা। সে এখন খুব স্বস্তিবোধ করছে।

'হ্যাভ আ নাইস উইকএন্ড,' বলল ইভ। 'জর্জের কী খবর?'

'ও এখানে নেই,' গলার স্বরে উদ্বেগ আড়াল করল আলেকজান্দ্রা। 'বোধহয় কোনো কাজে আটকে গেছে এবং আমাকে আর ফোন করার সুযোগ পায়নি।'

'ও সুযোগ পেলেই ফোন করবে। গুডনাইট, ডার্লিং।'

'গুডনাইট, ইভ।'

আলেকজান্দ্রা রিসিভার রেখে দিয়ে ভাবল *ইভ যদি তার মনের মানুষকে খুঁজে পায় তাহলে খুব ভালো হবে। জর্জের মতো দয়ালু এবং ভালো কাউকে।* ঘড়ি দেখল ও। প্রায় এগারোটা বাজে। এতক্ষণে জর্জের ওকে ফোন করা উচিত ছিল। ব্রোকারেজ ফার্মের নাম্বারে ডায়াল করল আলেকজান্দ্রা। কোনো সাড়া নেই । জর্জের ক্লাবে ফোন করল। না, মি. মেলিস আজ ক্লাবে আসেনি। মাঝরাত পেরিয়ে যেতে খুব দুশ্চিন্তা হতে লাগল আলেকজান্দ্রার রাত একটার দিকে সে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ল। কী করবে বুঝতে পারছে না। হয়তো জর্জ কোনো ক্ল্যায়েন্টের সঙ্গে বেরিয়েছে এবং সেখান থেকে ফোন

করার কোনো মওকা নেই কিংবা কোথাও গেছে ও, এবং যাওয়ার আগে আলেকজান্দ্রাকে কোনো মেসেজ দিতে পারেনি। সে পুলিশে ফোন করতে পারে। কিন্তু পরক্ষণে যদি জর্জ বাড়িতে ঢোকে, বেকুব বনে যাবে আলেকজান্দ্রা।

রাত দুটোর সময় সে পুলিশে ফোন করল। আইলল বোরে দ্বীপে কোনো পুলিশ ফোর্স নেই, সবচেয়ে কাছের থানা হলো ওয়াল্ডো কাউন্টি। ঘুমঘুম চোখে আলেকজান্দ্রার ফোন ধরল কাউন্টি শেরিফের বিভাগে দায়িত্বরত সার্জেন্ট ল্যামবার্ট। তাকে জর্জের খবর জানাল উদ্বেগাকুল আলেকজান্দ্রা। সার্জেন্ট তাকে অভয় দিয়ে বলল তার স্বামী হয়তো বিশেষ কোনো কাজে আটকা পড়েছে, পরদিন সকালে ফিরে আসবে।'

কিন্তু পরদিন সকালেও জর্জ ফিরল না দেখে ম্যানহাটনের বাড়িতে আবার ফোন করল আলেকজান্দ্রা। না, বাড়ি ফেরেনি জর্জ।

ভীষণ ভয় পেয়ে গেল আলেকজান্দ্রা। কুডাক ডাকছে মন– অ্যাক্সিডেন্ট করেছে জর্জ, পড়ে আছে কোনো হাসপাতালে। আহত অথবা মৃত। কিংবা ওকে কেউ অপহরণও করতে পারে। কী হয়েছে জর্জের? কী হতে পারে ওর? কোনো ক্লু খুঁজে পাচ্ছে না আলেকজান্দ্রা। সে জেটিতে গিয়ে দেখল কর্সএয়ার যথাস্থানে বাঁধা আছে।

আলেকজান্দ্রা ওয়াল্ডো কাউন্টি শেরিফের বিভাগে ফোন করল আবার। ফোন ধরল লেফটেন্যান্ট ফিলিপ ইনগ্রাম। সে বাইশ বছর ধরে পুলিশের চাকরি করছে। শুনেছে জর্জ মেলিস গত রাতে বাড়ি ফেরেনি। সে আলেকজান্দ্রাকে বলল 'ওনার কোনো খবর নেই তাই না, মিসেস মেলিস। ঠিক আছে আমি নিজেই আসব।' জানে সময়ের অপচয়। আলেকজান্দ্রার স্বামী হয়তো কারও সঙ্গে পরকীয়ায় ব্যস্ত। তবু ব্ল্যাকওয়েল পরিবারের ফোন বলে কথা। আর কেটকে সে চেনেও। দু'একবার তার সঙ্গে দেখাও হয়েছে।

'আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরব,' বলল সে ডেক সার্জেন্টকে।

লেফটেন্যান্ট ইনগ্রাম আলেকজান্দ্রার গল্প শুনল, বাড়ি এবং জেটি চেক করে দেখল। শেষে বলল, 'আমরা হাসপাতাল এবং ম–' মর্গ শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়েও ব্রেক কষে থামাল নিজেকে। '– এবং অন্যান্য জায়গায় খোঁজ-খবর নেব।'

আলেকজান্দ্রা বহু কষ্টে সংবরণ করে রেখেছে কান্না। সে বলল, 'ধন্যবাদ, লেফটেন্যান্ট। আপনি আমার জন্য যা করছেন তাতে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার জানা নেই।'

'এটাই আমার কাজ,' বলল লেফটেন্যান্ট ইনগ্রাম।

থানায় ফিরে হাসপাতাল এবং মর্গগুলোতে ফোন করে খোঁজ নিল লেফটেন্যান্ট। সব জায়গা থেকে নেতিবাচক খবর এল। জর্জ মেলিসের নামে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট রিপোর্ট নেই। এরপর ইনগ্রাম Main courier পত্রিকার একজন সাংবাদিককে ফোন করে খবরটা দিল এবং বিভিন্ন কাগজে 'মিসিং পার্সন' বুলেটিন পাঠিয়ে দিল।

বিকেলের খবরের কাগজগুলোতে হেডলাইন ছাপা হলো
HUSBAND OF BLACKWELL HEIRESS MISSING

ডিটেকটিভ নিক পাপাসের কাছ থেকে খবরটি শুনল পিটার টেম্পলটন। জানাল জর্জ মেলিস অকস্মাৎ উধাও হয়ে গেছে। পাপাস পিটারকে অনুরোধ করল জর্জ কেন হঠাৎ নিখোঁজ হয়েছেন এ সম্পর্কিত কোনো তথ্য বা ধারণা যদি পিটারের থাকে তাহলে যেন সে পাপাসকে জানায়। কারণ ঘটনাটা নিয়ে রীতিমত শোরগোল পড়ে গেছে। 'জানাব,' বলল পিটার।

ত্রিশ মিনিট পরে আলেকজান্ড্রা মেলিস ফোন করল পিটার টেম্পলটনকে। তার কণ্ঠে পরিষ্কার আতংক।

'আমি– জর্জ নিখোঁজ। কেউ জানে না তার কী হয়েছে। ভাবলাম আপনাকে হয়তো জর্জ কিছু বলেছে যদি আপনি কোনো ক্লু দিতে পারবেন–' তার গলা বুজে এল।

'আমি দুঃখিত, মিসেস মেলিস। তিনি আমাকে কিছু বলেননি। আমিও বুঝতে পারছি না তার কী হয়েছে।'

'ওহ।'

মেয়েটিকে সান্ত্বনা দেয়ার মতো যদি কিছু বলতে পারত পিটার? 'তবে আপনাদের কাজে আসে এমন কোনো কথা মনে পড়লে অব্যশই জানাব। আপনাকে কোথায় পাব?'

'আমি এ মুহূর্তে ডার্ক হারবারে রয়েছি। তবে আজ রাতে ফিরে যাচ্ছি নিউইয়র্ক। দাদীমার সঙ্গে থাকব।'

একা থাকার কথা কল্পনাও করতে পারছে না আলেকজান্ড্রা। সকালে দাদীমার সঙ্গে বেশ কয়েকদফা কথা হয়েছে তার।

'ওহ ডার্লিং, এত চিন্তা কোরো না,' বলেছিল কেট। 'ও সম্ভবত কোনো ব্যবসায়িক কাজে শহরের বাইরে গেছে এবং তোমাকে ফোন করতে ভুলে গেছে।'

তবে কথাটি দু'জনের কেউই বিশ্বাস করেনি।

জর্জের নিখোঁজ সংবাদ টিভি পর্দায় দেখতে পেল ইভ। সেডার হিল হাউজের ছবি দেখাচ্ছে, বিয়ের পরে বরবধূ বেশে আলেকজান্ড্রা এবং জর্জের ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে। একটা ক্লোজআপে ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে জর্জ। ছবিটি দেখে ইভের স্মৃতিতে ভেসে উঠল মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে দারুণ অবাক হওয়া জর্জের মুখচ্ছবি।

টিভির খবর পাঠক বলছিল, 'এখন পর্যন্ত কোনো অপহরণ বা মুক্তিপনের দাবি করা হয়নি। পুলিশের ধারণা জর্জ মেলিস সম্ভবত অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন এবং তার স্মৃতিবিলোপ ঘটেছে।' সন্তুষ্টচিত্তে হাসল ইভ।

ওরা কোনোদিনই লাশ খুঁজে পাবে না। স্রোতের টানে লাশ ভেসে গেছে খোলা

সাগরে। বেচারি জর্জ। ইভের প্ল্যানটা অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেছিল। কিন্তু ইভ প্ল্যান বদলে ফেলেছিল। সে মেইনে উড়ে গিয়ে ফিলব্রুক কোভে একটি মোটরবোট ভাড়া করেছে। দ্বিতীয় আরেকটি বোট ভাড়া করেছে কাছের একটি জেটি থেকে। তারপর ওটা নিয়ে চলে গেছে ডার্ক হারবারে। ওখানে সে জর্জের জন্য অপেক্ষা করছিল। জর্জ তাকে একটুও সন্দেহ করেনি। ইয়ট নিয়ে জেটিতে ফেরার আগে খুব সাবধানে ডেক ধুয়ে সাফ করেছে ইভ। তারপর জর্জের ভাড়া করা মোটরবোট নিয়ে এসেছে জেটিতে, নিজের বোট যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে আকাশ পথে ফিরে এসেছে নিউইয়র্ক এবং অপেক্ষা করেছে আলেকজান্দ্রার ফোনের জন্য। কারণ সে জানত তার বোন তাকে ফোন করবে।

এ এক পারফেক্ট ক্রাইম। পুলিশ এ ঘটনা তাদের নথিতে লিখে রাখবে 'রহস্যময় নিখোঁজ' হিসেবে।

খবর পাঠক বলছিল, 'এবারে অন্যান্য খবর...' টিভির সুইচ অব করে দিল ইভ।

রবি ম্যাকেনার সঙ্গে আজ তার ডেটিং। এখন সে ওখানে যাবে।

পরদিন সকাল ছ'টার দিকে মাছ ধরার একটি নৌকা জর্জ মেলিসের লাশ দেখতে পেল পেনিমসকট বের ব্রেকওয়াটারে। বাঁধের সঙ্গে আটকে রয়েছে দেহ। সকালের কাগজগুলো একে দুর্ঘটনাজনিত ডুবে মরা মৃত্যু হিসেবে অভিহিত করলেও এ সম্পর্কে যখন তথ্য আসতে শুরু করল, গল্পের পুরোটাই গেল ঘুরে। কারাগারের অফিস থেকে জানা গেল প্রথমে জেটিকে হাঙরের কামড়ের ক্ষত বলে মনে করা হয়েছিল আসলে সেটি ছুরিকাঘাতের চিহ্ন। সান্ধ্য কাগজগুলো তারস্বরে চেঁচাতে লাগল এ হেডিং দিয়ে জর্জ মেলিসের রহস্যময় মৃত্যু খুন বলে সন্দেহ... ছুরিকাঘাতে কোটিপতির মৃত্যু।

লেফটেন্যান্ট ইনগ্রাম আগের সপ্তায় সামুদ্রিক স্রোতের চার্টে চোখ বুলাচ্ছিল। কাজ শেষে চেয়ারে হেলান দিল। হতভম্ব চেহারা। বাঁধে আটকে না থাকলে জর্জ মেলিসের লাশ খোলা সাগরে ভেসে যেত। তবে লেফটেন্যান্টকে বিস্মিত করেছে যে ব্যাপারটি তা হলো ডার্ক হারবার থেকে বহমান স্রোত জর্জ মেলিসের লাশ সাগরে ভাসিয়ে এনেছে। কিন্তু ওখানে তো জর্জের থাকার কথা ছিল না।

ডিটেকটিভ নিক পাপাস মেইনে উড়ে এল লেফটেন্যান্ট ইনগ্রামের সঙ্গে কথা বলতে।

'এ কেসে আমার বিভাগ তোমাকে সাহায্য করতে পারবে,' বলল নিক।

'জর্জ মেলিসের ব্যাপারে অনেক অজানা তথ্য আমাদের কাছে আছে। যদিও এটি আমাদের এখতিয়ারভুক্ত এলাকা নয়, তবে তুমি আমাদের সহযোগিতা চাইলে সানন্দে তোমাকে আমরা সাহায্য করতে পারব, লেফটেন্যান্ট। আর এতে সমস্ত ক্রেডিট তোমারই থাকবে।'

গত কুড়ি বছর ধরে ওয়াল্ডো কাউন্টি শেরিফ ডিপার্টমেন্টে কাজ করছে লেফটেন্যান্ট ইনগ্রাম। কিন্তু উল্লেখ করার মতো উত্তেজক কোনো কেস এখনও পায়নি। জর্জ মেলিসের হত্যাকাণ্ডের খবর সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠাজুড়ে ছাপা হচ্ছে, ফলে এতে ইনগ্রামের নামটিও ছড়িয়ে যাওয়ার একটি সম্ভাবনা রয়েছে। ভাগ্য সহায়তা করলে এ কেসটিই হয়তো তাকে নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্টে গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করার সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে। সে নিক পাপাসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা, আমি রাজি।'

চৌষট্টি

বিছানায় শুয়ে আছে আলেকাজন্দ্রা। শক্তিশালী ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে তাকে। জর্জ খুন হয়েছে এ ব্যাপারটি ওর মন কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। এটা কী করে সম্ভব? কে জর্জকে খুন করবে? পুলিশ ছুরিকাহতের কথা বলছে। কিন্তু ওরা ভুল বলছে। জর্জ কোনো অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। কেউ তাকে খুন করেনি... কেউ তাকে হত্যা করতে চাইবে না... ঘুমের ওষুধের প্রভাবে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল আলেকজান্দ্রা।

জর্জের লাশ খুঁজে পাওয়ার কথা শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গেল ইভ। *হয়তো এতে একদিক থেকে ভালোই হয়েছে।* ভাবল সে। আলেকজান্দ্রাকে *সবাই সন্দেহ করবে। কারণ সে ওখানে ছিল, দ্বীপে।*

ড্রইংরুমে, কাউচে, কেট বসে ছিল ইভের পাশে। খবর শুনে দারুণ মর্মাহত কেট।

'কে জর্জকে খুন করবে?' জিজ্ঞেস করল সে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইভ। 'জানি না, দিদা। জানি না। বেচারি অ্যালেক্সের জন্য আমার বুকটা কষ্টে ফেটে যাচ্ছে।'

লেফটেন্যান্ট ইনগ্রাম ফোনে কথা বলছে নিক পাপাসের সঙ্গে।

'এ পর্যন্ত যেটুকু তথ্য পেয়েছি তা মনে ধন্ধ তৈরি করেছে। লিংকনভিন আইলেস রোরো ফেরির অ্যাটেনডেন্টের সঙ্গে কথা বলে জানলাম শুক্রবার রাতে, দশটার দিকে মিসেস মেলিস প্রাইভেট প্লেনে চড়ে আইলেসবোরো এয়ারপোর্টে হাজির হন। তবে তাঁর সঙ্গে তখন তাঁর স্বামী ছিলেন না। জর্জ মেলিস প্লেন বা ফেরি কোনো কিছুতে চড়েই আসেননি। ওই রাতে দ্বীপে তাকে একদমই দেখা যায়নি।'

'যে-ই জর্জ মেলিসকে খুন করে থাকুক, তাকে হত্যার পরে বোট থেকে ফেলে দেয়া হয়, স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তুমি কি কর্সএয়ার চেক করেছ?'

'আগাপাশতলা চেক করেছি। কোনো ধস্তাধস্তি বা রক্তের চিহ্ন চোখে পড়েনি।'

'আমি ওখানে একজন ফরেনসিক এক্সপার্ট পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি আবার কিছু মনে করবে নাতো?'

'আমাদের ছোট্ট চুক্তিটির কথা যদি তোমাদের স্মরণে থাকে তাহলে কিছু মনে করব না।'

'মনে আছে। কাল দেখা হবে।'

নিক পাপাস এবং একদল এক্সপার্ট পরদিন সকালে পৌঁছাল। লেফটেন্যান্ট ইনগ্রাম তাদেরকে নিয়ে গেল ব্ল্যাকওয়েলদের জেটিতে। জেটির সঙ্গে বাঁধা কর্সএয়ার। দুইঘণ্টা পরে ফরেনসিক এক্সপার্ট বলল, 'আসল জিনিস আমরা পেয়ে গেছি, নিক। রেইলিং-এর নিচে রক্তের দাগ।'

সেদিন বিকেলে পুলিশ ল্যাবরেটরি রক্তের দাগ পরীক্ষা করে জানাল এটা জর্জ মেলিসের রক্ত। নিক পাপাস ফরেনসিক রিপোর্টে আরও জানল মেলিস ব্ল্যাকওয়েলদের ইয়টে খুন হয় এবং তাকে ইয়ট থেকে পানিতে ঠেলে ফেলে দেয়া হয়। তার সন্দেহ গিয়ে পড়ল আলেকজান্দ্রা মেলিসের ওপর। সে তদন্ত করে জেনেছে অ্যালেকজান্দ্রা রাতে দেরি করে দ্বীপে পৌঁছেছিল এই অজুহাত তুলে যে, তার বড় বোনের সঙ্গে সাক্ষাত করতে ভুল এয়ারপোর্টে গিয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে পাপাস তার বন্ধু পিটারের সঙ্গে কথা বলল। পাপাস কেন আলেকজান্দ্রাকে সন্দেহ করছে জিজ্ঞেস করলে গোয়েন্দা জবাব দিল, 'আলেকাজান্দ্রার একটা মোটিভ ছিল। কারণ তুমিই আমাকে বলেছিলে তার স্বামী জর্জ ছিল একটা সাইকো। সে যৌন নির্যাতন, শারীরিক আঘাত করে যৌনসুখ পেত। সে হয়তো আলেকজান্দ্রাকে ধরে মারত। আলেকজান্দ্রা আর তার সঙ্গে থাকতে চাইছিল না। সে হয়তো ডিভোর্স চেয়েছিল। কিন্তু তাকে ডিভোর্স দিতে রাজি হয়নি জর্জ। আলেকজান্দ্রা তাদের অশান্ত দাম্পত্য জীবনের কলহ আদালত পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে চায়নি লোকলজ্জার ভয়ে। তখন আর কোনো উপায় না দেখে সে তার স্বামীকে হত্যা করে।'

'তো তুমি আমার কাছে কী চাও?'

'তথ্য। তুমি দশদিন আগে মেলিসের স্ত্রীর সঙ্গে লাঞ্চ করেছ।' ডেস্কের ওপর রাখা একটি টেপ রেকর্ডারের বোতাম টিপে দিল পাপাস। 'আমরা এখন সমস্ত কথাবার্তা রেকর্ড করব, পিটার। ওই লাঞ্চের কথা বলো। তার আচরণ কেমন ছিল? সে কি খুব আড়ষ্ট হয়ে ছিল? নাকি ক্রুদ্ধ অথবা হিস্টিরিয়া রোগীর মতো সে ব্যবহার করছিল?'

'নিক, ওর মতো রিল্যাক্সড, সুখী মনের মানুষ আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি।'

পিটারের দিকে জ্বলন্ত চক্ষু মেলে তাকিয়ে থাকল নিক পাপাস। তারপর হাতের এক ঝটকায় বন্ধ করে দিল টেপ রেকর্ডার। 'আমার সঙ্গে মিথ্যাচার কোরো না, বন্ধু। আমি আজ সকালে ডা. জন হার্লির সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম। সে আলেকজান্দ্রা মেলিসকে ওষুধ দিচ্ছিল কারণ মেয়েটি আত্মহত্যার প্রবণতায় প্রবল ভুগছিল, ফর ক্রাইস্ট শেক।'

অপরাধবোধে ভুগছে জন হার্লি। ইভ ব্ল্যাকওয়েলকে যে মারধর করেছিল জর্জ মেলিস তা পুলিশকে জানায়নি সে। তার মনের একটা অংশ তাকে খোঁচাচ্ছে ঘটনাটি পুলিশকে জানিয়ে দেয়ার জন্য কিন্তু অপর অংশটি বাধা দিচ্ছে। ডা. হার্লি চাইছে

ব্ল্যাকওয়েল পরিবারকে রক্ষা করতে। ইভের ওপর হামলার ঘটনা জর্জের খুনের সঙ্গে কোনোভাবে জড়িত কিনা জানার কোনোই উপায় নেই, কিন্তু হার্লির সহজাত প্রবৃত্তি বলছে এ বিষয়টি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করাই মঙ্গল। সে যে কোনো উপায়ে কেট ব্ল্যাকওয়েলকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের মিনিট পনের বাদে হার্লির নার্স তাকে বলল, 'ডা. কিথ ওয়েবস্টার দুই নম্বর লাইনে আছেন, ডক্টর।'

কিথ ওয়েবস্টার বলল, 'জন, আজ বিকেলে তোমার ওখানে একটু আসতে চাই। তুমি ফ্রি আছ তো?'

'ফ্রি করে নেব। কখন আসবে?'

'পাঁচটায়?'

'বেশ, কিথ। তখন দেখা হবে।'

কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায় জন হার্লির অফিসে হাজির হলো কিথ ওয়েবস্টার। 'ড্রিংক চলবে?'

'না, ধন্যবাদ, জন। আমি ড্রিংক করি না। তোমাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।'

কিথ ওয়েবস্টারের সঙ্গে যখনই দেখা হয়েছে জন হার্লির, সবসময় কেমন সংকোচ লক্ষ করেছে তার মধ্যে। এত বিনয়ী, ভালো একটা মানুষ, সবসময় অন্যকে সাহায্য করতে উন্মুখ– ও যেন এক কুকুরছানা, মাথায় আদরের হাত চায়। একেবারেই সাদামাটা চেহারার এ মানুষটিকে দেখে বোঝার জো নেই কী অসাধারণ প্রতিভাবান একজন সার্জন লুকিয়ে আছে তার ভেতর।

'তোমার জন্য আমি কী করতে পারি, কিথ?'

বুক ভরে শ্বাস নিল কিথ। 'বিষয়টি হলো ইয়ে– জর্জ মেলিস যে ইভ ব্ল্যাকওয়েলকে প্রহার করেছিল তা নিয়ে।'

'তা নিয়ে কী?'

'তুমি তো দেখেছ মার খেয়ে ইভ প্রায় মরতে বসেছিল?'

'হুঁ।'

'এ ঘটনা পুলিশে কখনও জানানো হয়নি। তবে যা ঘটেছে– মেলিসের হত্যাকাণ্ড এবং অন্যান্য ঘটনা– আমি ভাবছিলাম পুলিশকে ব্যাপারটা জানাবো না।'

'তোমার যা ভালো মনে হবে তুমি তা-ই করবে, কিথ।'

মুখ অন্ধকার করে কিথ বলল, 'জানি আমি। কেট ব্ল্যাকওয়েলের ক্ষতি হয় এমন কিছু আমি করতে চাই না। কারণ তিনি বিরাট মাপের মানুষ।'

সতর্ক চোখে কিথকে দেখছে হার্লি। 'তাতো বটেই।'

ফোঁস করে শ্বাস ফেলল কিথ।' 'তবে সমস্যা হলো, আমি যদি এ ব্যাপারে এখন নিশ্চুপ থাকি এবং পুলিশ পরে ঘটনাটা জানতে পারে, আমার জন্য খুব খারাপ হবে।'

আমাদের দু'জনের জন্যেই খারাপ হবে, মনে মনে বলল জন হার্লি। তবে কণ্ঠে ঔদাসিন্য ফুটিয়ে বলল, 'পুলিশ ব্যাপারটা জানতে পারবে বলে মনে হয় না। ইভ কোনোদিনই কাউকে কথাটা বলবে না কারণ তুমি তো ওকে ওর আগের চেহারাই ফিরিয়ে দিয়েছ। ওই ছোট্ট দাগটা ছাড়া আর সব কিছু আগের মতোই আছে।'

চোখে পিটপিট করল কিথ। 'কীসের ছোট্ট দাগ?'

'কপালের লাল দাগটা। আমাকে বলল তুমি নাকি দু'এক মাসের মধ্যে দাগটা তুলে ফেলবে?'

ডা. ওয়েবস্টারের চোখের ঘনঘন পলক ফেলা আগের চেয়ে বেড়ে গেল। 'আমি ঠিক বুঝতে– ইভের সঙ্গে শেষ কবে তোমার দেখা হয়েছে?'

'ওর বোনকে নিয়ে একটা সমস্যার কথা বলতে দিন দশেক আগে একবার এসেছিল। কপালে ওই দাগ না থাকলে আমি চিনতেই পারতাম না কোনটা ইভ আর কোনটা আলেকজান্দ্রা। তুমি তো জানোই ওরা আইডেন্টিকাল টুইনস।'

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল ওয়েবস্টার। 'জানি।' খবরের কাগজে ইভের বোনের ছবি দেখেছি। দু'জনের চেহারায় অদ্ভুত মিল। 'তুমি বলছ কপালের ওই লাল দাগ ছাড়া ওদেরকে আলাদাভাবে চেনা সম্ভব নয়?'

'হ্যাঁ।'

চুপচাপ বসে নিচের ঠোঁট চিবোতে লাগল কিথ। শেষে বলল, 'পুলিশের কাছে আমার এক্ষুনি যাওয়া ঠিক হবে না। বিষয়টি নিয়ে আরেকটু ভেবে দেখি।'

'তা-ই ভালো, কিথ। ওরা দু'জনেই খুব ভালো মেয়ে। খবরের কাগজগুলো লিখছে পুলিশের নাকি ধারণা আলেকজান্দ্রা খুন করেছে জর্জকে। এ হতেই পারে না। আমার মনে আছে ওরা যখন ছোট ছিল...'

ডা. ওয়েবস্টার হার্লির কথা আর শুনছে না। গভীর ভাবনায় ডুবে গেছে।

চিন্তিত চেহারা নিয়ে ডা. হার্লির অফিস থেকে বেরিয়ে এল কিথ। সে খুব ভালোই জানে ইভের কপালে কোনো লাল ক্ষতচিহ্ন ছিল না। অথচ জন দাগটা দেখেছে। হয়তো অন্য কোন অ্যাক্সিডেন্টে ইভের কপালে অমন দাগ পড়েছে। কিন্তু তাহলে সে মিথ্যা বলল কেন? এর কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছে না কিথ।

সে প্রতিটি কোন্ দিয়ে বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখল, সকল ভিন্ন সম্ভাবনাগুলো পরখ করল শেষে যখন উপসংহারে পৌঁছাল, ভাবল *আমার ধারণা যদি সঠিক হয় এটা আমার গোটা জীবন বদলে দেবে।'*

পরদিন সকালে কিথ ওয়েবস্টার ফোন করল ডা. হার্লিকে।

'জন,' শুরু করল সে, 'বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। তুমি বলেছিলে ইভ ব্ল্যাকওয়েল তার বোন আলেকজান্দ্রার কথা বলতে তোমার কাছে এসেছিল, তাই না?'

'হুঁ।'

'ইভ আসার পরে আলেকজান্দ্রা কি তোমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ। সে পরের দিনই এসেছিল। কেন?'

'এমনি কৌতূহল। ইভের বোন কেন এসেছিল বলা যায়?'

'আলেকজান্দ্রা গভীর ডিপ্রেশনে ভুগছিল। ইভ তাকে সাহায্য করতে চাইছিল।'

ইভ মার খেয়েছে, আলেকজান্দ্রার স্বামীর হাতে মার খেয়ে প্রায় মরতে বসেছিল। আর এখন এ লোকটি খুন হয়েছে এবং আলেকজান্দ্রাকে সেজন্য দোষারোপ করা হচ্ছে।

কিথ ওয়েবস্টারকে স্কুলজীবনে কেউ প্রতিভাবান বলত না। শুধু পাস করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হতো তাকে। ক্লাসমেটদের সবসময়ের তামাশার খোরাক ছিল সে। সে না ছিল পড়াশোনায় ভালো না খেলাধুলায়। কিন্তু এই কিথ যখন মেডিকেল স্কুলে ভর্তির সুযোগ পেয়ে গেল অন্যদের চেয়ে বেশি অবাক হলো তার পরিবার। যখন সে সার্জারি নিয়ে পড়াশোনা শুরু করল কেউ কল্পনাই করতে পারেনি এ বিষয়ে একদিন সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে কিথ। তার ভেতরে লুকায়িত প্রতিভার বিস্ফোরণ ঘটেছিল। সে যেন এক ভাস্কর, কাদার বদলে রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে জাদু দেখায়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল কিথের খ্যাতি। তবে শৈশবের সেই মানসিক যন্ত্রণা থেকে আজও মুক্ত হতে পারেনি কিথ।

ভেতরে ভেতরে সে এখনও সেই ছোট্টটিই রয়ে গেছে যে সকলের বিরক্তি উৎপাদন করে এবং যাকে দেখলেই হাসাহাসি করে মেয়েরা।

ইভের বাড়িতে এসেছে কিথ। ফোন করেছিল। ওকে পাত্তাই দিতে চায়নি ইভ। কিন্তু কিথ যখন বলল ওর কাছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে যা ইভের জানা উচিত তখনই কেবল সে দেখা করতে রাজি হয়েছে। ইভ দরজা খুলেই বলল, 'আমি খুব ব্যস্ত। তুমি কী বলতে এসেছ বলো?'

'এটি নিয়ে কথা বলতে এসেছি,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল কিথ। হাতে ধরা ম্যানিলা খামটি খুলে একটি ফটোগ্রাফি বের করে ইভের হাতে গুঁজে দিল। ইভেরই ছবি।'

ছবিটির দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে ইভ বলল, 'কী এটা?'

'তোমার ছবি।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি,' এবারে বিরক্ত ইভ। 'কিন্তু এ ছবি দিয়ে কী হবে?'

'ছবিটি তোমার অপারেশনের পরে তোলা হয়েছে।'

'তো?'

'ওতে তোমার কপালে কোনো দাগ নেই, ইভ।'

ইভের চেহারা সাথে সাথে বদলে গেল।

'এসো, কিথ। বসো।'

ভেতরে ঢুকল কিথ। কাউচের এক ধারে, ইভের মুখোমুখি বসল। মেয়েটির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না। ডাক্তারী করার সুবাদে বহু সুন্দর মুখ দেখেছে সে

কিন্তু ইভ ব্ল্যাকওয়েলের তাদের সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না। সে অপরূপা, অনন্যা।

'ব্যাপারটা কী বিস্তারিত বলো।'

প্রথম থেকে শুরু করল কিথ। বলল, সে ডা. হার্লির কাছে গিয়েছিল, হার্লি তাকে কিথের কপালের রহস্যময় দাগটি সম্পর্কে বলেছে। কথা বলার সময় কিথ ইভকে লক্ষ করছিল। ইভের চেহারা ভাবলেশশূন্য।

কিথ ওয়েবস্টারের কথা শেষ হলে ইভ বলল, 'জানি না তোমার মতলবটা কী, তবে তুমি যা-ই ভাবো না কেন, বেহুদা আমার সময় নষ্ট করছ। আর ওই দাগ? ও আমি ইচ্ছে করে কপালে লাগিয়েছিলাম আমার বোনের সঙ্গে একটু মজা করার জন্য। ব্যস, এই-ই। তোমার কথা শেষ হলে তুমি যেতে পার। আমার তাড়া আছে।'

বসে রইল কিথ। 'তোমাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। কিন্তু ভাবলাম পুলিশের কাছে যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে একটু কথা বলি।' ওর কথা শুনে চমকে গেল ইভ।

'পুলিশের কাছে কেন যেতে চেয়েছিলে তুমি?'

'জর্জ মেলিস যে তোমার ওপর হামলা করেছিল তা পুলিশকে জানাতে আমি বাধ্য। তারপরে ধরো তোমার মাথার ভুয়া ক্ষতচিহ্ন। এ ব্যাপারটি আমার ঠিক মাথায় ঢুকছে না তবে পুলিশের কাছে তুমি হয়তো বিষয়টি ব্যাখ্যা দিতে পারবে।'

এই প্রথম ভয় পেল ইভ। তার সামনে বসা এই নির্বোধ চেহারার বেঁটে মানুষটির কোনো ধারণা নেই আসলে কী ঘটেছে। তবে সে যা জানে তা পুলিশকে বলে দিলে পুলিশ অবশ্যই ইভকে জেরা করবে।

জর্জ মেলিস প্রায়ই এ অ্যাপার্টমেন্টে আসত। জর্জকে এখানে আসতে দেখেছে এরকম সাক্ষীর অভাব হয়তো হবে না এ বাড়িতে। জর্জ খুন হওয়ার রাত্তিরে ওয়াশিংটনে থাকার ব্যাপারে মিথ্যা বলেছিল ইভ। তার কাছে সত্যিকারের কোনো অ্যালিবাই নেই। কখনও অ্যালিবাই প্রয়োজন হবে চিন্তাও করেনি। পুলিশ যদি জানতে পারে জর্জ তাকে প্রায় মেরে ফেলার দশা করেছিল, খুনের একটা মোটিভ তারা পেয়ে যাবে। পুরো রহস্য ফাঁস হয়ে যেতে শুরু করবে। এ লোকটিকে তার চুপ করিয়ে দিতে হবে।

'কী চাও তুমি? টাকা?'

'না!'

কিথের চেহারায় বিতৃষ্ণা ফুটে উঠতে দেখল ইভের টাকার কথায়। 'তাহলে?'

কার্পেটে চোখ নামাল ডা. ওয়েবস্টার, মুখ লাজরাঙা। 'আ-আমি তোমাকে খুব পছন্দ করি, ইভ। তোমার যদি খারাপ কিছু হয়ে যায় আমার খুব খারাপ লাগবে।'

ইভ জোর করে হাসল। 'আমার কিছু হবে না, কিথ। আমি কারও কোনো ক্ষতি করিনি। বিশ্বাস করো, এসবের সঙ্গে জর্জ মেলিসের খুনের কোনো সম্পর্ক নেই।' সে কথের একটি হাত ধরল। 'তুমি এ ব্যাপারটি ভুলে গেলে আমি খুব খুশি হব। কী বলো?'

ইভের হাতে চাপ দিল কিথ। 'আমি ভুলতেই চাই, ইভ। সত্যি ভুলে যেতে চাই। কিন্তু শনিবার করোনারের তদন্ত হবে। আমি একজন ডাক্তার। ইনকোয়েস্টে সাক্ষ্য দেয়া

আমার কর্তব্য। আমি যা জানি সব তাদেরকে আমি বলতে বাধ্য।'

ইভের চোখে মুখে আতংক। 'না। ওসব তুমি করবে না।'

ইভের হাতে হাত বুলাতে বুলাতে কিথ বলল, 'কিন্তু কাজটা আমাকে করতেই হবে। ডাক্তারী পড়ার সময় শপথ নিয়েছিলাম যে। তবে একটা কাজ করলে আমি আর ওসব করব না।'

'কী কাজ?' ব্যগ্র হয়ে জানতে চাইল ইভ।

খুব নরম গলায় কিথ বলল, 'একজন স্বামীকে কেউ তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করতে পারে না।'

পঁয়ষট্টি

কারোনারের ইনকোয়েস্টের দুই দিন আগে বিয়েটা হয়ে গেল। একজন বিচারক তাঁর প্রাইভেট চেম্বারে ওদের দু'জনের বিয়ে পড়িয়ে দিলেন। কিথ ওয়েবস্টারের মতো লোককে বিয়ে করতে যাচ্ছে ভাবতেই গা ঘিনঘিন করছিল ইভের কিন্তু এ ছাড়া তার কোনো উপায়ও ছিল না। *গাধাটা ভাবছে বিয়ের পরে সারাজীবন আমি বোধহয় ওর সঙ্গেই থাকব।* ইনকোয়েস্ট শেষ হওয়ার পরপরই বিয়ে বাতিলের জন্য আদালতে আর্জি পেশ করবে ইভ এবং ঘটনার পরিসমাপ্তি ওখানেই ঘটবে।

ডিটেকটিভ লেফটেন্যান্ট নিক পাপাস একটা ঝামেলায় পড়েছে। জর্জ মেলিসের হত্যাকারী কে সে জানে কিন্তু প্রমাণ করতে পারছে না। ব্ল্যাকওয়েল পরিবার এ হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে এমন রহস্যজনকভাবে নীরবতার দেয়াল তুলে রেখেছে যে দেয়ালটি ভাঙতে পারছে না নিক। শেষে সে বিষয়টি নিয়ে তার সুপিরিয়র ক্যাপ্টেন হ্যারল্ড কনের সঙ্গে আলোচনা করল। নিক বলল, সে কেট ব্ল্যাকওয়েলের সঙ্গে কথা বলতে চায়। হ্যারল্ড সম্মতি দিল। সেদিন বিকেলেই কেট ব্ল্যাকওয়েলের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করল নিক পাপাস। কেটের অফিসে তার সঙ্গে দেখা হলো নিকের।'

'আমার সেক্রেটারি বলল আপনি নাকি খুব জরুরি কী বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন, লেফটেন্যান্ট।'

'জ্বী, ম্যাম। জর্জ মেলিসের মৃত্যুর করোনারি ইনকোয়েস্ট হবে আগামীকাল। আমার বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আপনার নাতনী জড়িত।'

শিরদাঁড়া টানটান হয়ে গেল কেটের। 'এ আমি বিশ্বাস করি না।'

'আগে আমার কথা শুনুন, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। প্রতিটি পুলিশি তদন্ত শুরু হয় মোটিভের প্রশ্ন নিয়ে। জর্জ মেলিস ছিল অর্থলোভী এবং ভয়ংকর স্যাডিস্ট।' কেটের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করল সে তবে না থেমে বলে যেতে লাগল। 'সে আপনার নাতনীকে বিয়ে করার পরপরই আবিষ্কার করে তার হাতে কোটি কোটি টাকা চলে এসেছে। আমার ধারণা সে প্রায়ই আলেকজান্দ্রার গায়ে হাত তুলত এবং তাকে ডিভোর্স দিতে বলত। কিন্তু রাজি হতো না মেলিস, এ লোকের কবল থেকে তখন মুক্তি পাওয়ার একটিই রাস্তা ছিল তাকে হত্যা করা।'

নিক পাপাসের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কেট। ফ্যাকাসে চেহারা।

'আমি আমার থিওরির সমর্থনে প্রমাণ খুঁজতে শুরু করি। আমরা জানতে পারি অদৃশ্য হওয়ার আগে জর্জ মেলিস সেডারহিল হাউজে ছিল। মেইনল্যান্ড থেকে ডার্ক হারবারে যাওয়ার রাস্তা মাত্র দুটি– প্লেন অথবা ফেরীবোট। স্থানীয় শেরিফের অফিসের মতে, জর্জ মেলিস দু'টির একটিও ব্যবহার করেনি। আমি মিরাকলে বিশ্বাস করি না এবং মেলিস নিশ্চয় পানির ওপর দিয়ে হাঁটতে পারত না। সেক্ষেত্রে একটাই সম্ভাবনা থেকে যায় সে উপকূলের কোথাও থেকে বোট ভাড়া করেছিল। আমি বোট রেন্টালের জায়গাগুলো খুঁজতে থাকি। এবং গালকি হার্বারে আমার তীরটি বেঁধে যায়। যেদিন জর্জ মেলিস খুন হয়েছিল সেদিন বিকেল চারটায় এক মহিলা ওখানে একটি মোটর লঞ্চ ভাড়া করে এবং বলে তার এক বন্ধু পরে এসে লঞ্চটি নিয়ে যাবে। সে নগদ অর্থে ভাড়া শোধ করেছিল তবে তাকে সই করতেও হয়েছে। সে সোলাংডুনাস নামটি ব্যবহার করে। নামটি কি আপনার কাছে পরিচিত লাগছে?'

'হ্যাঁ। আমার নাতনী দুটির শৈশবে ওদের সে গভর্নেস ছিল। বেশ কয়েকবছর আগে সে ফ্রান্সে ফিরে গেছে।'

পাপাস মাথা ঝাঁকাল, তার চেহারায় সন্তুষ্টির ছাপ। 'উপকূল থেকে খানিকটা দূরে, সেই একই মহিলা আরেকটি বোট ভাড়া করেছিল। সে বোট নিয়ে চলে যায়, তিনঘ পরে আবার ফিরে আসে। এখানেও সে নিজের নাম সই করে সোলাং ডুনাস নামে আমি দুজন অ্যাটেনডেন্টকেই আলেকজান্দ্রার ছবি দেখিয়েছি। তারা নিশ্চিত ও-ই মহিলা, তবে সে সঙ্গে একটু দ্বিধাদ্বন্দ্বেও ভুগছিল কারণ বোট ভাড়া করা মহিলা স্বর্ণকেশী।

'এ দিয়ে প্রমাণ হয়–?'

'সে পরচুলা পরেছিল।'

আড়ষ্ট গলায় কেট বলল, 'আমি বিশ্বাস করি না আলেকজান্দ্রা তার স্বামীকে হত্যা করেছে।'

'আমিও করি না, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল।' বলল লেফটেন্যান্ট পাপাস। 'খুনটা করেছে তার বোন, ইভ।'

এখনও পাথরের মতো শক্ত হয়ে আছে কেট ব্ল্যাকওয়েল।

'আলেকজান্দ্রা কাজটা করতেও পারত না। হত্যাকাণ্ডের দিন সে কোথায় ছিল, কোথায় গেছে সমস্ত খোঁজ-খবর আমি নিয়েছি। দিনের প্রথম অংশ সে নিউইয়র্কে কাটিয়েছে তার এক বান্ধবীর সঙ্গে, তারপর নিউইয়র্ক থেকে প্লেনযোগে সোজা চলে আসে দ্বীপে। ওই দুটো মোটরবোট ভাড়া করার তার কোনো অবকাশই ছিল না।' সামনে ঝুঁকে এল পাপাস।

'কাজেই আমার হাতে বাকি থাকল আলেকজান্দ্রার মতো দেখতে অপরজন যে সোলাং ডুনাসের নাম সই করেছিল। এবং সেটা ইভ। আমি তার মোটিভ খুঁজতে শুরু করি। ইভ যে অ্যাপার্টমেন্টে থাকে সেখানকার ভাড়াটেদেরকে আমি জর্জ মেলিসের ছবি

দেখিয়েছিলাম। জানতে পারি ওখানে অবাধ যাতায়াত ছিল মেলিসের।

বিল্ডিংয়ের সুপারিনটেন্ডেন্ট আমাকে বলেছে মেলিস একরাত ও বাড়িতে ছিল এবং সে রাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে প্রায় মরতে বসে ইভ। এ কথা কি আপনি জানতেন?'

'না।' প্রায় ফিসফিসে শোনাল কেটের কণ্ঠস্বর।

'মেলিসের কাণ্ড ওটা। সে ওভাবেই মানুষকে মারে। আর ইভের মোটিভ ছিল প্রতিশোধ। সে মেলিসকে প্রলোভিত করে ডার্ক হারবারে নিয়ে যায় এবং তাকে খুন করে।'

কেটের দিকে তাকাল সে, মহিয়সী এ নারীকে দিয়ে এভাবে কথা বলাতে বাধ্য করছে বলে অপরাধবোধে দংশিত হচ্ছে নিক। 'ইভের অ্যালিবাই ছিল সে ওই দিন ওয়াশিংটনে ছিল। যে ট্যাক্সিতে চড়ে সে এয়ারপোর্ট গিয়েছিল তার ড্রাইভারকে একশো ডলার ভাড়া দিয়েছিল যাতে লোকটির তার কথা মনে থাকে। ওয়াশিংটনে শাটল মিস করে সে এবং টার্মিনালে একটু অভিনয়ও দেখায়। তবে আমার মনে হয় না সে ওয়াশিংটনে গিয়েছিল। আমার ধারণা সে কালোচুলের পরচুলা পরে কমার্শিয়াল প্লেন মেইনে যায় এবং সেখানে ওই বোটগুলো ভাড়া করে। সে মেলিসকে খুন করে, লাশটা ফেলে দেয় সাগরে তারপর ইয়ট বাঁধে জেটিতে এবং বাকি মোটর-বোটটি নিয়ে যায় রেন্টাল ডকে। ততক্ষণে ওই ডক বন্ধ হয়ে গেছে।'

অনেকক্ষণ গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে রইল কেট। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'আপনার সমস্ত এভিডেন্স অনুমাননির্ভর, তাই না?'

'জ্বী,' এবারে সে কফিনে শেষ পেরেকটা মারতে প্রস্তুত।

'করোনারের ইনকোয়েস্টের জন্য আমার জোরালো অভিযোগ দরকার। পৃথিবীর যে কারও চেয়ে আপনি আপনার নাতনীকে ভালো চেনেন মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। আপনার কাছ থেকে আমি এমন কিছু জানতে চাই যা আমাদের কাজে লাগবে।'

চুপচাপ বসে রইল কেট, কী বলবে ভাবছে। শেষে বলল, 'আপনাদের ইনকোয়েস্টের জন্য কিছু তথ্য দিতে পারব।'

নিক পাপাসের হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পেল। সে একটা ঝুঁকি নিয়েছিল এবং সেটা কাজে লেগেছে। অজান্তেই সামনে ঝুঁকে এল সে। 'বলুন, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল।'

ধীরে এবং স্পষ্ট উচ্চারণে কেট বলল, 'জর্জ মেলিস যেদিন খুন হয় সেদিন আমি আর আমার নাতনী ইভ একত্রে ওয়াশিংটন ডিসিতে ছিলাম।'

গোয়েন্দার মুখে বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখে কেট মনে মনে বলল 'ওরে গাধা, তুমি কি ভেবেছ ব্ল্যাকওয়েল পরিবারের একজনকে তোমার কাছে জবাই হতে দেব? সারা দুনিয়ায় ব্ল্যাকওয়েলদের নাম কলংকিত হবে? না, তা আমি কখনোই করব না। তবে ইভকে আমি নিজের মতো করে শাস্তি দেব।

করোনারের জুরির রায় হলো– অজানা হামলাকারী বা হামলাকারীদের হাতে মৃত্যু হয়েছে জর্জ মেলিসের।

ইভ বলল, 'আমি অ্যানালমেন্ট চাই, কিথ।'

বিস্ময়ে পিটপিট করে স্ত্রীর দিকে তাকাল কিথ ওয়েবস্টার।

'তুমি অ্যানালমেন্ট কেন চাইছ?'

'ওহ, কাম অন, কিথ। তুমি নিশ্চয় ভাবছ না আমি সারাজীবন তোমার সঙ্গে থাকব?'

'অবশ্যই ভাবছি। তুমি আমার বিবাহিত স্ত্রী, ইভ।'

'তুমি কী চাও? ব্ল্যাকওয়েলদের টাকা?'

'আমার টাকার দরকার নেই, ডার্লিং। আমি ডাক্তারি করে অনেক টাকা আয় করি। তুমি যা চাও তা-ই তোমাকে আমি দিতে পারি।'

'আমি যা চাই তা তো বললামই, অ্যানালমেন্ট।'

হতাশ ভঙ্গিতে ডানে-বামে মাথা নাড়ল কিথ। 'আমি তা পারব না।'

'ঠিক আছে তাহলে আমি ডিভোর্সের জন্য মামলা করব।'

'কাজটা করা ঠিক হবে না। দ্যাখো, কোনো কিছুই আসলে তেমন বদলায়নি, ইভ। তোমার বোনজামাইকে কে হত্যা করেছে পুলিশ এখনও তা বের করতে পারেনি। কাজেই কেসটা এখনও ওপেন। মার্ডারে কখনও স্টাটিউট অব লিমিটেশন থাকে না। তুমি যদি আমাকে ডিভোর্স দাও তাহলে আমি বাধ্য হব...'

'তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন আমি ওকে খুন করেছি।'

'তুমিই ওকে খুন করেছ, ইভ।'

দারুণ অবজ্ঞা ইভের কণ্ঠে 'তুমি কী করে জানো?'

'কথাটা আমি জানি বলেই তুমি আমাকে বিয়ে করেছ।'

প্রচণ্ড ঘৃণা নিয়ে কিথের দিকে তাকাল ইভ। 'ইউ বাস্টার্ড! তুমি কেন আমাকে এরকম করতে বাধ্য করলে।'

'কারণটা সহজ। কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

'আমি তোমাকে ঘৃণা করি। তুমি কি তা বোঝো না? তোমাকে দেখলেই ঘেন্নায় আমার গা রি রি করে ওঠে।'

করুণ হাসল কিথ। 'আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি।'

জর্জ মেলিসের মৃত্যুশোক তখনও ভুলতে পারেনি আলেকজান্দ্রা। ওকে প্রায়ই সান্ত্বনা দিতে আসে পিটার টেম্পলটন। সেদিন লবস্টার পাউন্ডে একসঙ্গে লাঞ্চ খেতে খেতে পিটার আলেকজান্দ্রাকে বলল, 'তোমার একটু বাইরে থেকে কোথাও ঘুরে আসা উচিত। তাহলে মনটা একটু শান্ত হবে।'

'হ্যাঁ, সেদিন ইভও বলেছিল একথা। ওরা বারবাডোস যাচ্ছে হানিমুনে। আমাকেও যেতে বলেছিল সঙ্গে। আমি রাজি হইনি।'

'ধীরে ধীরে শোকটা সামলে উঠতে পারবে তুমি।'

'হয়তো বা,' বলল আলেকজান্দ্রা। 'জর্জ এত চমৎকার মানুষ ছিল,' মুখ তুলে তাকাল পিটারের দিকে। তুমি তো ওর সঙ্গে অনেক সময় কাটিয়েছ। ও দারুণ মানুষ ছিল না?'

'হ্যাঁ, ছিল,' ধীরে ধীরে বলল পিটার।

আলেকজান্দ্রা এখন সপ্তাহে অন্তত একদিন পিটার টেম্পলটনের সঙ্গে লাঞ্চ করে। শুরুতে জর্জ প্রসঙ্গে কথা বলার জন্য পিটারের সঙ্গ প্রয়োজন ছিল তার। কারণ আর কারও সঙ্গে তো জর্জকে নিয়ে কথা বলা যায় না। কিন্তু মাসকয়েক পরে আলেকজান্দ্রা লক্ষ্য করল সে পিটারের সঙ্গে লাঞ্চ করতে চাইছে মানুষটার সান্নিধ্য ভালো লাগে বলে। এ লোকটার ওপর সহজেই নির্ভর করা যায়। সে আলেকজান্দ্রার মুড বোঝে, সে বুদ্ধিমান এবং রসিক। তার রসগল্প শুনে প্রাণখুলে হাসতে পারে আলেকজান্দ্রা।

বারবাডোসে হানিমুনে আসতে রাজি ছিল না ইভ। কিথের জেদের কারণে এসেছে। কিথ বলেছিল, 'আমরা যদি হানিমুনে না যাই ব্যাপারটা খুব খারাপ দেখাবে। আমরা নিশ্চয় লোকের অদ্ভুত সব প্রশ্নের জবাব দিতে প্রস্তুত নই?'

তবে এখানে মধুচন্দ্রিমা করতে এসে ইভের সময়টা কিন্তু খারাপ কাটছে না। রোদে চামড়া ঝলসে যাওয়ার ভয়ে ঘর থেকে বের হয় না কিথ। এই সময় প্রায় প্রতিদিন একা একা সৈকতে ঘুরতে যায় ইভ। তবে বেশিক্ষণ একা থাকতে হয় না তাকে। লাইফ গার্ড, টাইকুন আর প্লেবয়রা ঘিরে ধরে ইভকে। এদের থেকে যাকে মনে ধরে তার সঙ্গে বিছানায় যায় সে। ইভ কিথকে পদে পদে অপমান করতে চায়, তাকে রাগিয়ে দিতে চায়, চায় কিথ এমন রেগে যাক যাতে সে ইভকে ডিভোর্স দেয়। কিথের সঙ্গে বিছানায় মজা পায় না বলে সে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে চায় না।

হানিমুন থেকে ফিরে আসার এক সপ্তাহ পরে কিথ ভীরু গলায় ইভকে বলল, 'আমাকে কাজে যোগ দিতে হবে। অনেকগুলো অপারেশনের শিডিউল বাকি। আমি সারাদিন বাড়ি থাকব না। তোমার কোনো অসুবিধা হবে না তো?'

ইভ বলল, 'না, অসুবিধা হবে না।'

কিথ খুব ভোরে উঠে বেরিয়ে যায় কাজে। ইভ কিচেনে ঢুকে দেখে কিথ তার জন্য নাশতা বানিয়ে রেখে গেছে। সে ইভের নামে ব্যাংকে বড় অংকের অর্থ রেখেছে। ইভ খোলামকুচির মতো টাকা ওড়ায়। ইভকে খুশি দেখলেই কিথ সুখী। ইভ তার অভিনেতা প্রেমিক ররিকে দামী দামী উপহার কিনে দেয়। প্রায় প্রতিটি বিকেল তার কাটে ররির সঙ্গে। ররি কাজ করে খুব কম।

'আমি যেমন তেমন চরিত্রে অভিনয় করতে পারি না,' ইভকে বলে সে। 'তাতে আমার ইমেজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

'সে আমি বুঝতে পারছি, ডার্লিং।'

'তুমি ছাতা বুঝতে পারছ। তোমার আর কী? সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছ। তুমি স্ট্রাগলের কী বুঝবে?'

ররির বাড়ি ভাড়া দিয়ে দেয় ইভ, ররি সাক্ষাতকার দিতে গেলে তার জন্য দামী জামাকাপড় কিনে দেয়, ওকে দামী দামী রেস্টুরেন্টে ডিনার খাওয়ায় যাতে নামী প্রযোজকদের চোখে পড়ে ররি। চব্বিশ ঘণ্টাই ররির সঙ্গে থাকতে ইচ্ছে করে ইভের। কিন্তু স্বামীর জন্য পারে না। ইভ রাত আটটার দিকে বাড়ি ফিরে দেখে রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে রান্না করছে কিথ। ইভ কোথায় গিয়েছিল তা নিয়ে কখনও প্রশ্ন করে না কিথ।

ছেষট্টি

পরের বছর আলেকজান্দ্রা এবং পিটার টেম্পলটনের ঘনঘন দেখা-সাক্ষাৎ আরও বেড়ে গেল। একজন অপরজনের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। আলেকজান্দ্রা যখন তার বাবাকে পাগলা গারদে দেখতে যায়, তার সঙ্গী হয় পিটার। এই সঙ্গ আলেকজান্দ্রার ভেতরকার বেদনা অনেকটাই লাঘব করে।

একদিন আলেকজান্দ্রাকে নিয়ে যেতে তার বাড়ি এসেছে পিটার, দেখা হয়ে গেল কেটের সঙ্গে। 'তুমি তাহলে একজন ডাক্তার, তাই না? তুমি ব্যবসাপত্র কিছু বোঝো?'

'তেমন বুঝি না, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল।'

'কর্পোরেশন বোঝো?'

'জ্বী না।'

নাক কোঁচকাল কেট। 'তাহলে তুমি কিছুই বোঝো না দেখছি। আমার একজন ভালো ট্যাক্সম্যান দরকার। সে তোমাকে কর্পোরেশন কী বুঝিয়ে দেবে এবং—'

'ধন্যবাদ, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। আমি আমার পেশা নিয়েই ভালো আছি।'

'আমার স্বামীও খুব জিদ্দি মানুষ ছিলেন,' কেট ফিরল আলেকজান্দ্রার দিকে। 'ওকে একদিন ডিনারে দাওয়াত দাও। ওর মধ্যে কিছু সেন্স ঢুকিয়ে দেয়া দরকার।'

বাইরে এসে পিটার বলল, 'তোমার দাদীমা বোধহয় আমাকে পছন্দ করেন না।'

হেসে ফেলল আলেকজান্দ্রা। 'খুব পছন্দ করেন। দিদা যাদেরকে পছন্দ করেন না তাদেরকে যেসব কথা বলেন তা যদি শুনতে!'

'ভাবছি উনি কী প্রতিক্রিয়া দেখাবেন যদি শোনেন আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই, অ্যালেক্স...

আনন্দে উদ্ভাসিত হলো আলেকজান্দ্রা। 'আমরা দু'জনেই খুব খুশি হব, পিটার!'

কেট বেশ আগ্রহ নিয়ে আলেকজান্দ্রা আর পিটারের রোমান্স উপভোগ করছিল। তরুণ ডাক্তারটিকে তার বেশ পছন্দ হয়েছে, আলেকজান্দ্রার স্বামী হিসেবে মানাবেও বেশ। তবে কেটের রক্তে মিশে আছে ব্যবসা। সে এদিকটাকেই প্রাধান্য দেবে।

'সত্যি বলতে কী,' বলল কেট, 'বিষয়টি আমাকে বিস্মিতই করেছে। আমার সবসময়ই আশা ছিল একজন এক্সিকিউটিভকে বিয়ে করবে আলেকজান্দ্রা যে ক্রুগার-ব্রেন্টের দায়িত্ব নিতে পারবে।'

'এটা কোনো ব্যবসায়িক প্রস্তাব নয়, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। আলেকজান্দ্রা এবং আমি বিয়ে করতে চাই।'

'তাছাড়া,' পিটারের কথা যেন শুনতেই পায়নি কেট, 'তুমি একজন মনোবিজ্ঞানী। মানুষের মন নিয়ে তোমার কাজ কারবার। তুমি হয়তো একজন ভালো নোগোশিয়েটর হতে পারবে। আমি খুশি হব তুমি যদি কোম্পানির সঙ্গে জড়িত হও। তুমি পারবে–

'না,' দৃঢ় গলায় বলল পিটার। 'আমি একজন ডাক্তার। ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়ানোর কোনোই খায়েশ আমার নেই।'

'এটা ব্যবসা-বাণিজ্য নয়,' ধমকের সুরে বলল কেট। 'আমরা মুদি দোকান নিয়ে কথা বলছি না। তুমি পরিবারের একটি অংশ হবে। আমার এমন কাউকে দরকার যে আমার কোম্পানিটি–'

'দুঃখিত,' চূড়ান্ত সুরে বলল পিটার। 'ক্রুগার-ব্রেন্টের কোনো কাজে আমি আসতে পারব না। এজন্য আপনার অন্য কাউকে দেখতে হবে...'

কেট তাকাল আলেকজান্দ্রার দিকে। 'তুমি কী বলো?'

'আমি পিটারকে সুখী দেখতে চাই, দিদা।'

'যত্ত নিমকহারামের দল,' ফোঁস করে শ্বাস ফেলল কেট। 'তোমরা দু'জনেই স্বার্থপর, কী জানি, একদিন হয়তো তোমাদের মত বদলাবে।' সে নিরীহ সুরে জানতে চাইল, 'তোমাদের বাচ্চাকাচ্চা নেয়ার প্ল্যান আছে কি?'

হেসে উঠল পিটার। 'সেটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনি আসলে খুব বড় একজন ম্যানিপুলেটর, মিসেস ব্ল্যাকওয়েল। তবে অ্যালেক্স আর আমি আমাদের মত করে জীবনযাপন করব, আর আমাদের সন্তানরা– যদি আমাদের ছেলেমেয়ে হয়– তারা তাদের মত করে উপভোগ করবে জীবন।'

মিষ্টি করে হাসল কেট। 'আমি কিন্তু কখনও অন্য লোকের জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে যাই না, পিটার।'

মাস দুই পরে আলেকজান্দ্রা এবং পিটার তাদের মধুচন্দ্রিমা যাপন করে দেশে ফিরল। আলেকজান্দ্রা গর্ভবতী। খবরটি শুনে কেট মনে মনে বলল, *গুড। নিশ্চয় ছেলে হবে।*

ইভ বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখছে বাথরুম থেকে নগ্ন অবস্থায় বেরিয়ে এল ররি। ররি একহারা গড়নের রোগা-পাতলা, মেদহীন দেহ। সে ইভকে বেশ তৃপ্তিও দিতে পারে। তবে ররিকে খুব বেশি কাছে পায় না ইভ। ওর সন্দেহ ররির আরও শয্যাসঙ্গিনী রয়েছে। তবে প্রশ্নটা করতে সাহস পায় না পাছে ওকে হারাতে হয়। বিছানায় এসে ররি ইভের গায়ে হাত বুলাতে লাগল। চোখের নিচে আঙুল রেখে বলল, 'হেই, বেবী, তোমার চোখের নিচে দেখছি ভাঁজ পড়েছে। অবশ্য খারাপ লাগছে না দেখতে।'

প্রতিটি শব্দ ইভকে ছুরির আঘাত হানল। মনে করিয়ে দিল ররির সঙ্গে তার বয়সের ফারাক। ইভের এখন পঁচিশ। ররির চেয়ে বয়সে পাঁচ বছরের বড় সে।

ওরা আবার মিলিত হলো তবে এই প্রথম ওর মন পড়ে রইল অন্যখানে।

রাত ন'টার দিকে বাড়ি ফিরল ইভ। কিথ তখন ওভেনে রোস্ট বানাচ্ছে।

ইভের গালে চুমু খেল সে। 'হ্যালো, ডিয়ার। তোমার খুব প্রিয় একটা ডিশ বানিয়েছি। আমরা–'

'কিথ, এই দাগগুলো তুমি দূর করে দেবে?'

চোখ পিটপিট করল কিথ। 'কীসের দাগ?'

চোখের চারপাশটা দেখাল ইভ। 'এগুলো।'

'ওগুলো লাফ লাইন, ডার্লিং। ওগুলো দেখতে আমার ভালোই লাগে।'

'আমার ভাল লাগে না! আই হেট দেম!' চিৎকার দিল ইভ।

'বিলিভ মি, ইভ। ওগুলো–'

'ফর ক্রাইস্টস শেক, ওগুলো দূর করে দাও। তোমার কাজই তো এটা, তাই না?'

'হ্যাঁ, তবে– ঠিক আছে,' ওকে শান্ত করার জন্য বলল কিথ। 'তুমি যেহেতু চাইছ কাজটা করে দেব।'

'কবে?'

'মাস দেড়েকের মধ্যে। আমার শিডিউল এখন খুব টাইট–'

'আমি তোমার ফালতু পেশেন্টদের কেউ নই,' খেঁকিয়ে উঠল ইভ। 'আমি তোমার স্ত্রী। কাজটা তুমি এখুনি করবে– আগামীকাল।'

'শনিবার ক্লিনিক বন্ধ থাকে।'

'তাহলে ক্লিনিক খোলো!'

'আচ্ছা, ও ঘরে একবার চলো।' ড্রেসিংরুমে ইভকে নিয়ে গেল কিথ।

শক্তিশালী আলোর নিচে বসল ইভ। ওকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করল কিথ। ভীরু, লাজুক, ব্যক্তিত্বহীন মানুষ থেকে মুহূর্তে তার রূপান্তর ঘটল প্রতিভাবান শৈল্যচিকিৎসকে। ব্যাপারটি পরিষ্কার টের পেল ইভ। মনে পড়ল তার বিধ্বস্ত চেহারাটা কী অলৌকিকভাবে ঠিকঠাক করে দিয়েছিল কিথ। কিথের কাছে এ অপারেশনটি অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে কিন্তু ইভের কাছে এটা খুবই প্রয়োজনীয়। ররিকে হারানোর কথা কল্পনাও করতে পারে না সে।

বাতি নিভিয়ে দিল কিথ। 'নো প্রবলেম,' ইভকে আশ্বস্ত করল সে। 'আমি কাল সকালে কাজটা করব।'

পরদিন সকালে দু'জনে মিলে ক্লিনিকে গেল। 'সাধারণত এসব কাজে একজন নার্স আমাকে সাহায্য করে,' কিথ বলল ইভকে।

'তবে ছোট্ট এ অপারেশনটির জন্য কারও সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। তোমাকে

আমি এখন ইনকেজশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেব। ফলে তুমি কিছুই টের পাবে না। আমি আমার প্রিয়তমাকে ব্যথা দিতে চাই না।'

হাইপডারমিক ইনজেকশনে ঘুমের ওষুধ ভরে ইভকে ইনজেকশন দিল পিটার। অবশ্য ব্যথা পেলেও কিছু মনে করত না ইভ। কারণ সে এসব কিছুই করছে রবির জন্য। ডার্লিং রবি। তার লোহাপেটা শরীর আর খাইখাই চোখ দুটোর কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল ইভ।

ওর ঘুম ভাঙল ক্লিনিকের ব্ল্যাক রুমে। বিছানার পাশে, একটি চেয়ারে বসে আছে কিথ।

'অপারেশন কেমন হলো?' ঘুম জড়ানো কণ্ঠে জানতে চাইল ইভ।

'চমৎকার,' হাসল কিথ।

মাথা দুলিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল ইভ।

আবার ঘুম ভেঙ্গে কিথকে বিছানার পাশে পেল ইভ। কিথ জানাল, 'কয়েকদিন তোমার মুখে ব্যান্ডেজটা থাকবে। তারপর তোমার ব্যান্ডেজ খুলে দেব।'

'আচ্ছা।'

কিথ প্রতিদিন ওর মুখ পরীক্ষা করে দেখল এবং প্রতিবারই সন্তুষ্টচিত্তে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে।'

'আমি নিজের চেহারা কবে দেখতে পাব?'

'শুক্রবারের মধ্যে তুমি সেরে উঠবে,' ওকে আশ্বস্ত করল কিথ।

ইভ হেড নার্সকে হুকুম দিল তার বিছানার সঙ্গে একটি প্রাইভেট টেলিফোনের সংযোগের ব্যবস্থা করতে। প্রথমেই রবিকে ফোন করল।

'হেই, বেবী, কোথায় তুমি?' বলল রবি। 'আমি কামোত্তেজিত হয়ে আছি।'

'আমিও তাই, ডার্লিং। আমি ফ্লোরিডার এক ক্লিনিকে। সামনের সপ্তাহে ফিরব।'

'তাড়াতাড়ি ফেরো।'

'আমাকে মিস করছিলে?'

'সাংঘাতিক।'

ইভ কার যেন ফিসফিস শুনতে পেল। 'তোমার সঙ্গে কেউ আছে নাকি?'

'ইয়াহ, উই আর হ্যাভিং আ লিটল ওরজি,' রবি তামাশা করতে পছন্দ করে। 'রাখলাম।' লাইন কেটে গেল।

ইভ এরপর আলেকজান্দ্রাকে ফোন করল। মা হবে সে উত্তেজনায় অস্থির ছোট বোনের বিরক্তিকর প্যাঁচাল কিছুক্ষণ শুনল সে ধৈর্য ধরে। তারপর মন্তব্য করল, 'খালা হওয়ার জন্য আমার আর তর সইছে না।'

দাদীমার সঙ্গে ইভের ইদানিং খুব কম দেখা হয়। দাদী যেন ওকে এড়িয়ে চলছেন। কারণটা বুঝতে পারছে না ইভ। কেট ইভের কাছে কিথের ব্যাপারে কখনও কিছু জিজ্ঞেস

করেনি। এজন্য দাদীকে দোষ দেয় না ইভ। কারণ কিথ একেবারেই পরিচয় দেয়ার মতো কোনো মানুষ নয়। ররিকে একদিন বলতে হবে কীভাবে কিথের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তাহলে ররির সঙ্গে তার সম্পর্কটা চিরস্থায়ী হতে আর সমস্যা থাকবে না। ইভের কাছে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্যই মনে হয় কারণ সে প্রতিদিন তার স্বামীর সঙ্গে প্রতারণা করে চলেছে অথচ কিথ না ওকে সন্দেহ করছে, না এ নিয়ে তার ভেতরে কোন হেলদোল আছে। তার একটাই প্রতিভা আছে। সে যাক গে, আসছে শুক্রবার ইভ তার স্বামীর প্রতিভার নতুন করে পরিচয় পাবে। ওইদিন তার ব্যান্ডেজ খোলা হবে।

'সরি, ডার্লিং,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল কিথ। 'সারাদিন সার্জারিতে ব্যস্ত ছিলাম–'

'তুমি জাহান্নামে থাকলেই বা আমার কী। শিগগির ব্যান্ডেজ খোলো। আমি দেখতে চাই।'

'আচ্ছা।

ইভ বিছানায় উঠে বসল, স্থির হয়ে বসে রইল। কিথ দক্ষতার সঙ্গে এবং দ্রুত তার মুখের ব্যান্ডেজ কেটে ফেলল। তারপর কদম পিছিয়ে গিয়ে পরখ করল ওকে। ইভ তার চোখে মুখে সন্তুষ্টির ছাপ ফুটতে দেখল। 'পারফেক্ট,' মন্তব্য করল কিথ।

'আমাকে একটা আয়না এনে দাও।'

ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল কিথ, ফিরে এল একটি আয়না নিয়ে। মুখে গর্বের হাসি ফুটিয়ে আয়নাটি ইভের হাতে দিল।

ইভ ধীরে ধীরে আয়নাটি মুখের সামনে নিয়ে এল, তাকাল নিজের প্রতিচ্ছবির দিকে।

এবং ভয়ংকর চিৎকার করে উঠল।

উপসংহার

কেট ১৯৮২

সাতষট্টি

কেটের মনে হচ্ছে সময়ের চাকাটি খুব দ্রুত ঘুরে চলেছে। সে আশি পেরিয়েছে। বয়সটা যেন কত? মাঝে মাঝে নিজের বয়সটাও ভুলে যায় সে। তবে আয়নায় তাকালে এখনও নিজেকে সুস্থ সবল মনে হয়, অহংকারী, দৃঢ়প্রত্যয়ী এক নারী।

কেট এখনও প্রতিদিন অফিসে যায়। তবে সেটা নিয়ম রক্ষার্থেই যাওয়া। নিয়মরক্ষা করে প্রতিটি বোর্ড মিটিংয়েও হাজির থাকে, কিন্তু মিটিংয়ের সবকিছু আর তার কাছে আগের মতো পরিষ্কার মনে হয় না। মনে হয় তার চারপাশের মানুষজন খুব দ্রুত কথা বলছে। তবে কেটের কাছে সবচেয়ে বিব্রতকর ব্যাপার হলো মনের ওপর তার আর নিয়ন্ত্রণ নেই। অতীত আর বর্তমান প্রায়ই মিলেমিশে যায়। তার পৃথিবীটা ক্রমে ছোট হয়ে বন্ধ হয়ে আসছে।

লাইফলাইন বলে যদি কিছু থাকে সেটা আঁকড়ে ধরে আছে কেট, একটা অদম্য শক্তি তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, সে এ আশা নিয়ে বেঁচে আছে একদিন পরিবারের কেউ ক্রুগার-ব্রেন্টের হাল ধরবে। জেমি ম্যাক গ্রেগর, মার্গারেট সে আর ডেভিডের তিলতিল পরিশ্রমে গড়ে তোলা এ কোম্পানি বহিরাগতের হাতে তুলে দেয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই কেটের।

ইভ, যার ওপর সবচেয়ে বেশি আশা করেছিল কেট, সে একজন খুনি। আর কী যে বীভৎস চেহারা হয়েছে তার। কেটকে নিজ হাতে তার নাতনীকে শাস্তি দিতে হয়নি। ইভকে একবার মাত্র দেখেছিল কেট। তবে এখন যে অবস্থা, যথেষ্ট শাস্তিই পেয়েছে ইভ।

আয়নায় যেদিন নিজের চেহারা দেখেছিল ইভ, আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল সে। এক বোতল ঘুমের বড়ি খেয়ে ফেলেছিল। কিন্তু কিথ পাম্প করে সমস্ত বড়ি পেট থেকে বের করে এনেছিল। সে তারপর থেকে পাহারা দিয়ে রাখছে ইভকে। সে যখন হাসপাতালে যায়, বাড়িতে নার্সরা ইভকে পাহারা দেয়।

'প্লিজ, আমাকে মরতে দাও,' স্বামীকে অনুনয় করেছে ইভ। 'প্লিজ, কিথ। আমি এ চেহারা নিয়ে আর বেঁচে থাকতে চাই না।'

'তুমি এখন শুধুই আমার,' কিথ বলেছে ওকে। 'আর আমি তোমাকে সবসময় ভালোবাসব।'

ভয়ংকর, বিকট চেহারাটা কাউকে দেখতে দিতে চায় না বলে বাড়ি থেকে বেরুনো

বন্ধ করে দিয়েছে ইভ। কিথের হাতে পায়ে ধরে নার্সগুলোকে বিদায় করেছে সে। কারণ নার্সরা ভয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকত ইভের দিকে।

আলেকজান্দ্রা বহুবার ফোন করেছে ইভকে। কিন্তু ইভ তার সঙ্গে আর দেখা করেনি। এমনকি যেসব জিনিসপত্র ডেলিভারি আসে, সেগুলোও দরজার বাইরে রেখে যেতে হয় ডেলিভারি ম্যানকে। একমাত্র কিথই ইভকে দেখতে পারে। একটা পর্যায়ে কিথ হয়ে উঠল পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগে ইভের একমাত্র মাধ্যম। ইভ এখন ভীষণ ভয়ে থাকে কিথ না যেন তাকে ছেড়ে চলে যায়। এখন তো ইভের কিচ্ছু নেই– শুধু ভীষণ কুৎসিতদর্শন একটা মুখ ছাড়া।

প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় কিথ ঘুম থেকে উঠে হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিকে যায়। ইভ তার আগেই ঘুম থেকে উঠে স্বামীর জন্য নাশতা বানিয়ে রাখে। প্রতিরাতে ডিনার রান্না করে। কিথ যখন বাসায় থাকে না ইভ আতংক নিয়ে ভাবে, *ও যদি অন্য কোন মেয়ে মানুষের দিকে ঝুঁকে পড়ে তাহলে আমার কী হবে? ও যদি আর আমার কাছে না ফেরে?*

দরজায় তালা খোলার শব্দ হলেই উড়ে যায় ইভ, সেঁধিয়ে যায় কিথের বুকে, ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। ইভ কখনও সেধে মিলিত হতে চায় না কিথের সঙ্গে এ ভয়ে যদি কিথ ওকে প্রত্যাখ্যান করে? কিন্তু কিথ যখন ওর সঙ্গে প্রেম করে, আদর-ভালোবাসায় ভরিয়ে দেয় সে ইভকে।

একবার ভীরু গলায় কিথকে জিজ্ঞেস করেছিল ইভ, 'ডার্লিং, আমাকে তো তুমি অনেক শাস্তি দিয়েছ। আমার মুখটাকে কি এখন সারিয়ে দেয়া যায় না?

ইভের দিকে তাকিয়ে গর্বের গলায় জবাব দিয়েছে কিথ, 'এ কোনোদিন সারানো সম্ভব নয়।

যত সময় গড়াল, কিথের চাহিদা ততই বেশি বাড়তে লাগল, সে হয়ে উঠল প্রচণ্ড কর্তৃত্বপরায়ণ, এক সময় ইভ পরিণত হলো তার ক্রীতদাসীতে। কিথের প্রতিটি আদেশ সে পালন করে বিনা ওজর-আপত্তিতে। তার কুৎসিত চেহারা তাকে কিথের সঙ্গে লোহার শিকলের চেয়েও শক্ত বাঁধনে জড়িয়ে দিয়েছে।

আলেকজান্দ্রা এবং পিটারের একটি ছেলে হয়েছে, রবার্ট। ভারী চটপটে এবং সুদর্শন। তাকে দেখলে ছোটবেলাকার টনির কথা মনে পড়ে যায় কেটের। রবার্টের বয়স এখন আট, বয়সের তুলনায় অনেক বড় দেখায় তাকে এবং মাথায়ও অনেক বুদ্ধি। আর এটাই চেয়েছে কেট।

পরিবারের সকলে একইদিনে আমন্ত্রণ পেল। আমন্ত্রণ পত্রে লেখা '২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ ইং তারিখে, মেইনের ডার্ক হারবারের সিডার হিল হাউজে, নব্বুইতম জন্মদিন পালন উপলক্ষে মিসেস কেট ব্ল্যাকওয়েল আপনার সহৃদয় উপস্থিতি কামনা করছেন।'

কিথ দাওয়াতপত্র পড়ে ইভের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা যাব।'

'ওহ্, না! আমি পারব না। তুমি যাও। আমি–'

'আমরা দু'জনেই যাচ্ছি।'

পাগলা গারদের বাগানে বসে ছবি আঁকছিল টনি। তার সঙ্গী এসে বলল, 'তোমার চিঠি আছে, টনি।'

খাম খুলে চিঠি পড়ল টনি, আবছা হাসি ফুটল মুখে। বলল, 'আমি বার্থডে পার্টি খুব পছন্দ করি।'

পিটার টেম্পলটন আমন্ত্রণপত্রটি পড়ে মন্তব্য করল, 'বিশ্বাসই হয় না মানুষটা নব্বুইতে পা দিয়েছেন। শি ইজ রিয়েলি অ্যামেজিং।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই,' সায় দিল আলেকজান্দ্রা। 'মজার ব্যাপার কী জানো, দিদা রবার্টকে আলাদাভাবে দাওয়াত পাঠিয়েছেন।'

আটষট্টি

অতিথিদের সবাই চলে গেছেন। শুধু ব্ল্যাকওয়েল পরিবারের মানুষজন মিলিত হয়েছে সিডার হিল-এর লাইব্রেরি কক্ষে। কেট ব্ল্যাকওয়েল এক এক করে সবার দিকে তাকালেন। টনি হাসছে। এই টনি তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল। অথচ তার কত না সম্ভাবনা আর আশা ছিল। ইভ, খুনি, মনের ভেতরে শয়তানীর বীজ পুঁতে না রাখলে সে হতে পারত পৃথিবীর অধীশ্বরী। বেচারি কী কঠিন শাস্তিটাই না পেয়েছে তার গোবেচারা স্বামীর কাছ থেকে। তারপর আলেকজান্দ্রা। সুন্দরী, দয়ালু, স্নেহময়ী, কিন্তু ক্রুগার-ব্রেন্টের ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ নেই এবং সে এমন একজনকে স্বামী হিসেবে বেছে নিয়েছে যে কোম্পানিতে যোগদান করতে অনীহা প্রকাশ করেছে বহু আগেই। ওরা দু'জনেই নিমকহারাম। তাহলে অতীতে এত যে কষ্ট করা হলো কোম্পানির জন্য সব কি বৃথা যাবে? *না,* ভাবলেন কেট। *আমি এভাবে এর শেষ হতে দেব না। আমি অহংকার করার মতো একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছি। কেপটাউনে আমার নামে একটি হাসপাতাল আছে। আমি স্কুল এবং গবেষণাগার তৈরি করেছি, সাহায্য করেছি বান্ডার মানুষজনকে।* তাঁর মাথাটা হঠাৎ ব্যথা করতে শুরু করল। ঘরটি হঠাৎ ভরে যেতে লাগল প্রেতাত্মাদের আগমনে। জেমি ম্যাকগ্রেগর এবং মার্গারেট– কী যে সুন্দর লাগছে তাদেরকে– বান্ডা হাসছে তাঁর দিকে তাকিয়ে। আর প্রিয় ডেভিড, হাত বাড়িয়ে রেখেছে সে। কেট মাথা ঝাঁকালো। দৃশ্যটা দেখতে চাইছেন না। তিনি এখনও ওদের জন্য প্রস্তুত নন। তবে শীঘ্রি প্রস্তুত হবেন তিনি। শীঘ্রি।

ঘরে এখন পরিবারের আরও একজন সদস্য উপস্থিত। কেট ব্ল্যাকওয়েলের অতি সুদর্শন প্রোপৌত্র। তিনি বললেন, 'আমার কাছে এসো, সোনা।'

রবার্ট তাঁর কাছে হেঁটে এল। তাঁর হাত ধরল।

'খুব ভালো পার্টি হয়েছে, গ্রান।'

'ধন্যবাদ, রবার্ট। তোমার ভালো লেগেছে তাতেই আমি খুশি। তোমার স্কুল কেমন চলছে?'

'সবগুলোতে A পেয়েছি। তুমি বলেছিলে সব সাবজেক্টে যেন A পাই। আমি ক্লাসের ফার্স্ট বয়।'

কেট পিটারের দিকে তাকালেন। 'রবার্ট একটু বড় হলে ওকে হোয়াইট স্কুলে পাঠিয়ে দেবো ওটা সবচেয়ে সেরা–'